প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস

প্রথম খণ্ড : প্রথম ভাগ

ভারত সরকারের শিক্ষাধিকারিক বিভাগের উদ্যোগে
লিখিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকমণ্ডলী
সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণন্
সভাপতি
আর্‌দেশির রাতন্‌জি ওয়াডিয়া
ধীরেন্দ্রমোহন দত্ত
হুমায়ুন কবির
কর্মসচিব

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা ১২

মওলানা আবুল কালাম আজাদ

স্মরণে

প্রথম খণ্ড :: প্রথম ভাগ

যাঁহারা অনুবাদ করিয়াছেন

অমিয়কুমার মজুমদার, অরুণা মজুমদার
দক্ষিণারঞ্জন ভট্টাচার্য, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
বিশু মুখোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন বসু

● ●
●

নিবেদন

মানুষের চিন্তাভাবনার ইতিহাসই মানুষের সত্যিকার ইতিহাস। যেদিন মানুষ ভাবতে সুরু করল, সেদিন থেকেই জীবজগতে তার বিশিষ্ট স্থান। প্রাণী হিসাবে মানুষের অনেক দুর্বলতা,—তার দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, গতিশক্তি অন্যান্য জন্তুর তুলনায় ক্ষীণ, শারীরিক শক্তি-সামর্থ্যেও তার স্থান উচ্চে নয়, কিন্তু এত দুর্বলতা সত্বেও বুদ্ধির উৎকর্ষে এবং পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতার ফলে মানুষ সমস্ত প্রাণী-জগতকে নিজের আয়ত্তে এনেছে। মানুষ যেভাবে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করে, প্রাণীরাজ্যের অন্য কোন স্তরে তার তুলনা মেলে না। ভাষার মাধ্যমে সে সহযোগিতা ভিন্ন মানুষ বাঁচতেই পারত না, কিন্তু সে সহযোগিতার মূলেও মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি ও চিন্তাশক্তি কার্যকরী। বুদ্ধিশক্তির দ্বারা কেবল প্রাণী-জগতকে নয়, প্রকৃতির শক্তিকেও মানুষ নিয়ন্ত্রণ করে নিজের কাজে লাগাতে চায়, এবং তার সে উদ্দেশ্য বহুল পরিমাণে সফলও হয়েছে।

মানুষ হিসাবে আবির্ভাবের সঙ্গেই তাই মানুষের চিন্তার সুরু। জীবনের নিত্যনৈমিত্তিক ও প্রত্যক্ষ প্রয়োজনগুলি মেটাবার জন্যই হয়তো মানুষ প্রথম ভাবতে সুরু করেছিল, কিন্তু সে ভাবনা বর্তমান ও সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতার মধ্যে আবদ্ধ থাকেনি। প্রথম থেকেই মানুষ অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করতে সুরু করেছে, অতীতের স্মৃতি ও ভবিষ্যতের কল্পনাকে প্রতিদিনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সংযোগ করে জ্ঞানের সাধারণ সূত্রের সন্ধান করেছে। অসংখ্য ঘটনার অনন্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যস্থাপনের জন্যই হয়তো ধারণার উদ্ভব, কিন্তু উদ্ভূত হবার সঙ্গে সঙ্গেই ধারণা অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ সত্যের সন্ধান দিতে সুরু করেছে। শুধু তাই নয়, জীবনের দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটাবার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের মনে নিজের জন্ম, মৃত্যু, অদৃষ্টের বিচিত্র বিলাস ও বিশ্বজগতের সত্তা ও সত্য নিয়ে প্রশ্ন জেগেছে। সে সম্বন্ধে মানুষের চিন্তাধারা সুসংবদ্ধ হতে হয়তো হাজার হাজার বছর লেগেছে, কিন্তু বিস্ময় ও জিজ্ঞাসায় মানবজীবনের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই এ সমস্ত প্রশ্নের উদয়ে দর্শনের জন্ম।

মানুষের অভিজ্ঞতার কেন্দ্রস্থলে তাই দর্শনের অভিব্যক্তি। সজ্ঞানে হোক, অজ্ঞানে হোক, মানবগোষ্ঠীর প্রত্যেকটি বোধশক্তিমান ব্যক্তিই তাই দার্শনিক।

কেন জন্ম হ'ল, জীবনের উদ্দেশ্য কি, ঘটনাপ্রবাহের তাৎপর্য কি—এ সমস্ত প্রশ্ন মানুষ কোনদিনই এড়াতে পারেনা। শুধু তাই নয়, দৃশ্যমান স্পর্শমান জগতের যে বিচিত্র প্রকাশ, তার মধ্যে অগণিত সঙ্গতি অসঙ্গতি প্রত্যেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সে সম্বন্ধে যেদিন মানুষ ভাবতে সুরু করল, সেদিনই দর্শনের গোড়াপত্তন। সে চিন্তাধারাকে যদি সংহত ও সুসংবদ্ধ না করি, তবে আমাদের চিন্তায় বারে বারে ভুল হবে। সংহত ও সুসংবদ্ধ করবার চেষ্টা করলেও বহুক্ষেত্রে তবু ভুল হবে, কিন্তু এ সমস্ত বিষয়ে চিন্তা না করে থাকাও মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। সৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই মানুষ এসব বিষয়ে চিন্তা করেছে এবং তাই মানুষের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই দর্শনেরও আবির্ভাব।

পৃথিবীর প্রত্যেক দেশ এবং প্রত্যেক যুগেই মানুষ দর্শনের সমস্যা নিয়ে বিচার করেছে। ব্যক্তি এবং জাতির বৈশিষ্ট্য এবং অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্যে সে চিন্তাধারায়ও প্রচুর বৈচিত্র্যের পরিচয় মেলে। অতীতে অনেক সময়ই এক দেশের দর্শন চিন্তার সঙ্গে অন্য দেশের দার্শনিকদের পরিচয় ছিল না। তাই বহু ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন দার্শনিকের একই ধরণের সিদ্ধান্ত, একই ধরণের ভাবনা এবং একই ধরণের ভুলের পরিচয় মেলে। যদি পৃথিবীর দর্শন-চিন্তার সমগ্ররূপ সকলের সম্মুখে উপস্থিত করা যায়, তবে তাতে প্রত্যেকেরই লাভ, এবং প্রত্যেকের দর্শন-চিন্তায়ই তাতে নতুন গভীরতা, নতুন শক্তি ও বেগ আসবে।

বিজ্ঞানের সঙ্গে দর্শনের একটি বড় পার্থক্য এই যে, বিজ্ঞানের ইতিহাসে যে ধরণের প্রগতির পরিচয় মেলে, দর্শনে তা মেলে না। অতীতের বিজ্ঞানের ভিত্তিতেই আজকার বিজ্ঞানের বিকাশ, কিন্তু বিজ্ঞানের আধুনিক সিদ্ধান্ত বহুক্ষেত্রেই অতীতের সিদ্ধান্তকে অস্বীকার করে। শুধু তাই নয়, অতীতের যে সমস্ত সিদ্ধান্ত আজ ভ্রান্ত বলে গণিত, আধুনিককালে বিজ্ঞানের ছাত্র তাকে অনেকখানি উপেক্ষাও করতে পারে। দর্শনের ক্ষেত্রে কিন্তু তা সম্ভব নয়। আজ যে সব সিদ্ধান্তকে আমরা ভুল মনে করি, তাকেও পুরোপুরিভাবে দর্শন অগ্রাহ্য করতে পারে না। তাদের অস্বীকার করলে বর্তমানকে বোঝাও কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তা ছাড়া কাল যা ঠিক মনে হয়েছিল, আজ হয়তো তাকে ভুল ভাবছি, কিন্তু আগামীকাল আবার সেই বিগতকালের সূত্রকেই নতুন করে মানার পালা আসবে। দর্শনে এরকম পরিণতি বার বার দেখা গেছে। অতীতের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানের বিচার এবং বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে অতীতের বিচার করাই দর্শনের সাধনা। হেগেল দর্শনের ইতিহাসকেই দর্শন বলেছিলেন। সে কথা সম্পূর্ণ না মানলেও একথা কিন্তু মানতেই হবে যে, দর্শনের ইতিহাসকে বাদ দিয়ে দর্শন অধ্যয়ন সম্ভব নয়।

জীবনের প্রতি ক্ষেত্রেই মানুষের ভাবনা মানুষের ক্রিয়া-কার্যকে প্রভাবিত করে। দর্শন-চিন্তা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ বা অবহিত না হলেও দেশকালের চিন্তাধারার প্রভাব ব্যক্তি বা গোষ্ঠী এড়াতে পারে না, তাই প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে মানুষের ইতিহাসে দর্শনের প্রভাব সুগভীর। বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন দেশে যে বিভিন্ন জীবন-দর্শনের বিকাশ, বর্তমান যুগে মানুষের পক্ষে তার পরিচয় আরো প্রয়োজনীয়। বিজ্ঞান ও টেকনিকের অগ্রগতিতে পৃথিবী আজ একসূত্রে বাঁধা, তাই যে কোন দেশে যা ঘটে, মানুষ যা ভাবে, সমস্ত দেশেই তার প্রভাব পড়ে। পৃথিবীর দর্শন-চিন্তার সঙ্গে পরিচয় তাই আজ প্রত্যেক শিক্ষিত মানবের কর্তব্য। সমগ্র পৃথিবীর ঐক্যের কথা মানুষের দর্শন-চিন্তায় বহুদিন হ'ল ধরা দিয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সমগ্র পৃথিবীর দর্শন-চিন্তার ইতিহাস রচনার কাজ আজও বেশীদূর এগোয় নি। ইউরোপে যে সমস্ত দর্শনের ইতিহাস প্রচলিত, ইউরোপ ভূখণ্ডের চিন্তার পরিচয় দিয়েই তারা তৃপ্ত। প্রথম যুগের গ্রীক দার্শনিকদের চিন্তার উপর প্রাচ্য চিন্তাধারার প্রভাব রয়েছে, একথা স্বীকার করেও ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাস ভারতীয়, মিসরী বা চীন দর্শনের কোন বিবরণ দেয় নি। স্বতন্ত্রভাবে ভারতবর্ষের দর্শনের ইতিহাসও অনেক রচিত হয়েছে, কিন্তু সে ইতিহাসে পাশ্চাত্যদর্শন, চীনদর্শন বা আরবদর্শনের কোন বিবরণ নাই। স্বতন্ত্রভাবে বিভিন্ন দেশের দর্শনের ইতিহাস হয়তো অনেক মিলবে—তাদের মধ্যে বহু শ্রেষ্ঠ মনীষীর রচিত শ্রেষ্ঠ পুস্তকও রয়েছে—কিন্তু বিশ্ব-দর্শনের ইতিহাস রচনার চেষ্টা বড় একটা হয়নি।

১৯৪৮ সালে সর্বভারতীয় শিক্ষা সম্মেলনের উদ্বোধন বক্তৃতায় মওলানা আবুল কালাম আজাদ প্রস্তাব করেন যে, ভারত সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় সর্বদেশ ও সর্বকালের দর্শন-চিন্তার ইতিহাস রচিত হোক। বোধ হয় পৃথিবীর অন্য কোন দেশে এ ধরণের প্রস্তাব সরকারের তরফ থেকে আসত না। এ কথাও বোধ হয় ঠিক যে মওলানা আজাদের মতন দর্শনবিজ্ঞান অনুরাগী ও সুপণ্ডিত মন্ত্রীর পক্ষেই এরকম প্রস্তাব করা সম্ভব হয়েছিল। তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে বিভিন্ন চিন্তাধারা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার সমবায়ে ভারতবর্ষে যে বিচিত্র মানবসমাজ গড়ে উঠেছে, তার মধ্যে ভবিষ্যৎ পৃথিবীর বিশ্ব-সমাজের পূর্বাভাস মেলে। ভারতবর্ষের প্রাঙ্গণে পূর্ব ও পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ এসে মিলেছে। বহু জাতি, বহু ধর্ম, বহু ভাষার পারস্পরিক সহযোগিতায় এখানে বিবিধের মধ্যে মহান্ মিলন রচিত হয়েছে। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে ঠিকভাবে বুঝতে হলে পৃথিবীর সমস্ত সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় প্রয়োজন। ভারতীয় দর্শনের

বৈচিত্র্য ও বহুমুখিনতার মধ্যে পৃথিবীর মানুষের চিন্তাধারার ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের পরিচয় মিলবে, এ বিষয়ে মওলানা আজাদের মনে কোন সন্দেহ ছিল না।

মওলানা আজাদের অনুপ্রেরণায় পূর্ব ও পাশ্চাত্য দর্শনের এ ইতিহাস রচনা সুরু হয়। অধ্যাপক সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণন্, অধ্যাপক আরদেশির ওয়াদিয়া, অধ্যাপক ধীরেন্দ্রমোহন দত্ত ও বর্তমান লেখককে নিয়ে যে সম্পাদকমণ্ডলী গঠিত হয়, প্রায় ষাটজন খ্যাতনামা পণ্ডিতের সহায়তায় সেই মণ্ডলী সমস্ত পৃথিবীর দর্শনের এই ইতিহাস সংকলিত করেন। বিভিন্ন দেশ ও যুগের দর্শনের এরকম সমাবেশ পূর্বে বোধ হয় কোনদিন হয়নি—সেদিক থেকে এ গ্রন্থখানি বিশ্ব-দর্শনের প্রথম ইতিহাস বলে দাবী করতে পারে। সম্পাদকমণ্ডলীর বিশ্বাস যে, মানবাত্মার অন্তর্নিহিত ঐক্য এ গ্রন্থে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। বহিঃপৃথিবীর স্বরূপ নিয়ে আলোচনা হয়তো পাশ্চাত্য দর্শনে খানিকটা বেশী, হয়তো ভারতীয় দর্শনে মনস্তত্ত্ব ও পরাবিদ্যার প্রতি অনুরাগ প্রবলতর, চীনদেশের চিন্তাধারায় হয়তো সামাজিক সমস্যার প্রশ্ন নিয়েই বেশী আলোচনা, বিভিন্ন যুগ ও বিভিন্ন দেশের দর্শনে এ ধরণের বিভিন্ন সমস্যার প্রতি মনোনিবেশে তফাৎ হতে পারে, কিন্তু মানবচিত্তের মূল সমস্যাগুলির পরিচয় দর্শনের এ সমস্ত ক্ষেত্রেই মিলবে। বর্তমানে পাশ্চাত্য দেশে এবং খানিকটা পরিমাণে ভারতবর্ষেও ভাষাগত বিশ্লেষণ বা ন্যায় শাস্ত্রের প্রশ্ন নিয়ে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি। সম্পাদকমণ্ডলীর বিশ্বাস যে, বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন সভ্যতার চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচয়ের ফলে বর্তমান যুগের এ সংকীর্ণতাও হয়তো খানিকটা কাটবে, এবং দর্শনের মহত্তর সমস্যা নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হবে।

ইংরেজীতে গ্রন্থখানি ১৯৫২ সালে প্রকাশিত হয়। এক অর্থে পৃথিবীর দর্শন-সাহিত্যে গ্রন্থখানিকে স্বাধীন ভারতের প্রথম অবদান বলা চলে এবং প্রথম থেকেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সুধীবৃন্দ বইখানির সাদর অভ্যর্থনা করেন। বিভিন্ন দেশ ও জাতির পরস্পরের পরিচয়ের জন্য রচিত এ গ্রন্থ ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল ও বিভিন্ন ভাষাভাষীর পারস্পরিক পরিচয়েও সাহায্য করবে, এ আশা প্রথম থেকেই আমাদের ছিল। প্রথম থেকেই তাই উদ্দেশ্য ছিল যে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় গ্রন্থখানির অনুবাদ হোক, এবং সেই উদ্দেশ্য অনুযায়ী আজ বাঙলাভাষায় এ অনুবাদ প্রকাশিত হোল।

যাঁদের সাহায্য ভিন্ন এ অনুবাদ প্রকাশ করা সম্ভব হ'ত না, তাঁদের সকলকেই আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। বাঙলা গ্রন্থখানির জন্য যে সম্পাদক-মণ্ডলী গঠিত হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে সকলেই এবং বিশেষ করে শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার, শ্রীচন্দ্রোদয় ভট্টাচার্য এবং শ্রীকল্যাণচন্দ্র গুপ্ত গ্রন্থখানির প্রকাশের

ব্যাপারে যে ভাবে খেটেছেন, তা সত্যই প্রশংসনীয়। শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়ও গ্রন্থখানির অনুবাদ ও প্রকাশের কাজে যথেষ্ট সহায়তা করেছেন। প্রকাশক এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স-এর শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার মহাশয় এগিয়ে না আসলে বইখানি প্রকাশ এত সহজে হোত না। ভারত সরকার কেবলমাত্র মূল গ্রন্থ সংকলনে নয়, বাঙলা অনুবাদের জন্যও নানা ভাবে সাহায্য করেছেন। ভারত সরকার এবং বাঙলা সরকারের আর্থিক সহায়তার ফলে গ্রন্থখানির দাম কমানো সম্ভব হয়েছে। আশা করি যে, তার ফলে স্কুল, কলেজ, লাইব্রেরী ছাড়াও দর্শন-অনুরাগী পাঠক বইখানি ব্যবহার করতে পারবেন।

পূর্বেই বলেছি যে ইংরেজী বা অন্য কোন ইউরোপীয় ভাষায়ও বিশ্ব-দর্শনের এ ধরণের ইতিহাস পূর্বে রচিত হয়নি। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় আজকাল দর্শন আলোচনা বা দর্শন রচনার পরিচয় আরো কম মেলে। সেদিক থেকেও ভারতীয় ভাষায় এ ধরণের বইয়ের অনুবাদ যে কত দরকার, সে সম্বন্ধে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। স্বাধীন ভারতবর্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্ররূপ বরণ করে নিয়েছে। শিক্ষিত এবং চিন্তাশীল জনসাধারণের সহযোগিতা ভিন্ন গণতন্ত্র কি করে সার্থক হবে? নিজের মাতৃভাষার মাধ্যম ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে দেশের জনসাধারণ পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডার থেকে মনের খোরাক সংগ্রহ করতে পারে না। তাই প্রত্যেক ভারতীয় ভাষায়ই সমস্ত পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডার প্রকাশিত না করতে পারলে ভারতীয় জনসাধারণের প্রতি অবিচার করা হবে। নানা ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় আজও সমৃদ্ধ সাহিত্যের অভাব। আমার বিশ্বাস যে প্রত্যেক ইংরেজী-শিক্ষিত ভারতবাসী যদি নিজের মাতৃভাষায় বিদেশী ভাষালব্ধ জ্ঞানের পরিচয় দিতে চেষ্টা করেন, তবে পাঁচ-ছয় বৎসরের মধ্যেই ভারতীয় বিভিন্ন ভাষা বর্তমান যুগোপযোগী সাহিত্যে সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। বর্তমান গ্রন্থখানি যদি বিশ্বের দর্শন-চিন্তার বিপুল ঐশ্বর্য সম্বন্ধে বাঙালী পাঠককে সচেতন করে তুলতে পারে, সেই ঐশ্বর্যের প্রতি বাঙালী পাঠকের মনে কৌতূহল ও আগ্রহ জাগায়, তবেই আমাদের সমস্ত পরিশ্রম সার্থক মনে করব।

হুমায়ুন কবির

২২ আগষ্ট, ১৯৫৯

ভূমিকা

(মূল ইংরেজী সংস্করণের)

ভারত সরকারের আনুকূল্যে একখানি দর্শনের ইতিহাস প্রণয়ন করিবার প্রস্তাব সর্বপ্রথম ভারতের শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় মওলানা আবুল কালাম আজাদ উত্থাপন করেন। পৃথিবীর বিভিন্ন সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে মানুষের চিন্তাধারার বিকাশ কি ভাবে ঘটিয়াছে তাহার যথাযথ চিত্র এই দর্শনের ইতিহাসে প্রতিফলিত হইবে, ইহাই ছিল মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর অভিপ্রায়। ১৯৪৮ সালে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত শিক্ষা-সম্মেলনের উদ্বোধন প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন যে, ইউরোপে "সাধারণ দর্শনের ইতিহাস ও গ্রীক দর্শন হইতে সুরু করিয়া আধুনিক ইউরোপীয় দর্শনে শেষ হয়; ভারত ও চীনদেশের চিন্তাধারাকে এই ইতিহাস কোন মতে স্পর্শ করে মাত্র। ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এই জাতীয় দর্শনের ইতিহাসেরই এতকাল পঠন-পাঠন হইতেছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, আপনারা অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে, এই জাতীয় দর্শনের ইতিহাসে পৃথিবীর দার্শনিক চিন্তাধারার বিকাশ সম্যক্ প্রতিফলিত হয় নাই। তত্ত্ববিদ্যা ও দর্শনের ক্ষেত্রে ভারতীয় মনীষীদের প্রকৃষ্ট অবদানের কথা আজ কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। একথা অবশ্য সত্য যে, সম্প্রতি ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ভারতীয় দর্শন পাঠ্য-বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, কিন্তু তবুও একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, পৃথিবীর দর্শনের ইতিহাসে ভারতীয় দর্শন তাহার যোগ্য স্থান পায় নাই।"

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ১৯৪৮-৪৯ সালের বাজেট-বিতর্ককালে তাঁহার এই ধারণা আরও বিশদভাবে প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন—

"মাননীয় সদস্যেরা অবশ্যই অবগত আছেন যে, ভারতীয় দর্শন মানবসভ্যতার অন্যতম গর্বের সম্পদ। আমাদের কলেজ-পাঠ্য দর্শনের ইতিহাসে ভারতীয় দর্শন অবজ্ঞ এক অখ্যাত কোণে স্থান পাইয়াছে। দর্শনশাস্ত্রকে যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতে বুঝিতে হইলে প্রাচীন গ্রীস ও বর্তমান ইউরোপে দার্শনিক চিন্তার যে বিকাশ ঘটিয়াছে তাহা এবং সেই সঙ্গে দার্শনিক চিন্তায় ভারতের দান সম্বন্ধে প্রত্যেক ছাত্রের সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। ডক্টর রাধাকৃষ্ণন্‌কে সভাপতি করিয়া প্রসিদ্ধ দার্শনিকদের একটি

পরিষদ গঠন করিবার প্রস্তাব আমি উত্থাপন করিতেছি। এই পরিষদের কাজ হইবে এমন একখানি দর্শনের ইতিহাস রচনা করা, যাহাতে পূর্ববর্ণিত বিষয়গুলির উপর যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হইবে।"

উদ্ধৃত বিবৃতি অনুসরণে সভাপতি ডক্টর রাধাকৃষ্ণন্ এবং অধ্যাপক এ. আর. ওয়াদিয়া, ডি. এম্. দত্ত ও হুমায়ুন কবিরকে লইয়া একটি পরিষদ গঠন করা হয়। এই পরিষদ পূর্বোক্ত পরিকল্পনা অনুসারে একখানি গ্রন্থ প্রকাশের উদ্দেশ্যে সম্পাদকমণ্ডলী হিসাবে কাজ করে। পৃথিবীর সকল দেশের দার্শনিক চিন্তার বিকাশ, বিশেষ করিয়া ভারতে দর্শনের বিকাশকে অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থ রচনা করিতে হইবে ইহাই ছিল সম্পাদকমণ্ডলীর উদ্দেশ্য।

সৌভাগ্যবশতঃ আমরা ষাট জন পণ্ডিতের সাগ্রহ এবং অকুণ্ঠ সহযোগিতা লাভ করিয়াছি, যাঁহারা তাঁহাদের বিশেষভাবে অধীত বিষয় অবলম্বন করিয়া উক্ত গ্রন্থে প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত করিয়াছেন। লেখকদের অধিকাংশ ভারতীয় হইলেও আমরা চীন, জাপান ও ইউরোপের পণ্ডিতগণকে আহ্বান জানাইতে দ্বিধা করি নাই। এই গ্রন্থের সকল লেখকদের প্রতি তাঁহাদের মূল্যবান সাহায্যের জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। যদিও সম্পাদকগণ লেখক নির্বাচন ও বিষয়বস্তু নির্ধারণ করিয়া দিয়াছিলেন, তথাপি লেখকদের বিষয়বস্তু পরিবেশনে যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিল। এই জাতীয় বহু লেখকদের সমবেত প্রচেষ্টার মধ্যে যে গুরুতর ক্রটি থাকিয়া যায় সে সম্বন্ধে সম্পাদকগণ অবশ্য অবহিত আছেন। তথাপি তাঁহারা সমগ্র প্রচেষ্টার মধ্যে একটি উদ্দেশ্যগত ঐক্য সম্পাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

দর্শনশাস্ত্র প্রগতিশীল বিজ্ঞানের মত নয়—যে বিজ্ঞানের ইতিহাস তাহার স্বল্প আলোকপ্রাপ্ত অতীতের মধ্যে নিহিত। বিজ্ঞানের প্রগতি বহির্জাগতিক ও পরিমাপ-যোগ্য সাক্ষ্যপ্রমাণের উপর নির্ভর করে। দর্শনশাস্ত্রে বিচারের জন্য যে প্রমাণাদি ব্যবহার করা হয়, তাহারা বাহ্য প্রমাণ নহে বলিয়া অবশ্য দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গী কিছু কম বৈজ্ঞানিক নহে। তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিজ্ঞানের উন্নতি সত্ত্বেও একথা আমরা জোর করিয়া বলিতে পরি না যে, অতীতের চিন্তানায়কদের তুলনায় আমাদের দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টি গভীরতর। কাহারও কাহারও মতে বুদ্ধ ও প্লেটোর যুগে দার্শনিক চিন্তার যে গভীরতা দেখা গিয়াছিল বর্তমান যুগের দার্শনিক চিন্তা তাহার তুলনায় অনেক কম পরিপক্কতা ও পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। সে যাহাই হউক, দর্শনের ইতিহাসের সম্যক্ জ্ঞান না থাকিলে কেহই দর্শন শাস্ত্রের সুগভীর আলোচনা করিতে সমর্থ হন না। মোহমুক্ত মন লইয়া স্বাধীনভাবে দর্শন আলোচনা করার যে মূল্য, দর্শনের ইতিহাসের অবশ্য সে মূল্য নয়। তথাপি ইহা দর্শনশাস্ত্রের

আলোচনাকে বোধগম্য ও ফলপ্রদ করিবার জন্য একটি কাঠামো রচনা করিয়া থাকে।

দার্শনিক চিন্তার অগ্রগতি বৈজ্ঞানিক জ্ঞানবৃদ্ধির মত নয়। উভয়ের মধ্যে গুণগত পার্থক্য রহিয়াছে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জ্ঞানের সীমা নির্দিষ্ট তথ্যের সাহায্যে বৃদ্ধি পাইয়াছে; দর্শনের ক্ষেত্রে জ্ঞানের পরিমাণগত বৃদ্ধি হয় নাই, স্বাভাবিক উন্নয়ন ঘটিয়াছে। অতীতের দার্শনিক চিন্তাধারার সঙ্গে বর্তমান চিন্তাধারার যথেষ্ট মিল রহিয়াছে, কিন্তু আজ আমরা সেই চিন্তাধারাকে নূতন দৃষ্টিভঙ্গীতে, নূতন গভীরতা ও সূক্ষ্মতার সঙ্গে উপলব্ধি করিয়া থাকি।

বর্তমান গ্রন্থে বিভিন্ন দেশের এবং বিভিন্ন যুগের দর্শনকে এক সূত্রে গ্রথিত করা হইয়াছে; ইহার ফলে বিদগ্ধ পাঠক মানব সমাজে দার্শনিক দৃষ্টির বিভিন্ন ও বিচিত্র প্রকাশকে তুলনা করিতে পারিবেন। এই দিক হইতে বর্তমান গ্রন্থকে পথপ্রদর্শক বলা যাইতে পারে। ইহা হয়ত উন্নততর আন্তর্জাতিক বোধ জাগ্রত করিতে সমর্থ হইবে এবং ভৌগোলিক ও জাতিগত বাধা অতিক্রম করিয়া মানব-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে যে ঐক্য বিরাজ করিতেছে তাহার পরিচয় দিতে পারিবে। বিভিন্ন যুগের চিন্তার মধ্যে যে পার্থক্য দেখা যায় তাহা শুধু বিষয়বস্তুর উপর গুরুত্ব প্রয়োগ ব্যাপারে। পাশ্চাত্য দর্শন যেমন বহির্জগতের স্বভাবের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করে, ভারতীয় দর্শন, বিশেষতঃ হিন্দু ও বৌদ্ধ দর্শন, তেমনি মনস্তত্ত্ব ও তত্ত্ববিদ্যার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করে। চীন দেশের চিন্তাধারার মধ্যে আবার সামাজিক সমস্যা আলোচনার দিকে বেশী প্রবণতা দেখা যায়।

চিন্তাজগতের যে রূপ-রেখা এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে তাহা পাঠক-চিত্তকে আনন্দ দান করিতে পারিবে বলিয়া আশা করি, কারণ বর্তমান যুগে কোন কোন দেশে দর্শনের সীমারেখা সঙ্কুচিত হইয়া আসিয়াছে এবং ইহা শুধু তাত্ত্বিক ও ভাষাগত বিশ্লেষণে পর্যবসিত হইয়াছে।

যদিও সকল দেশের দার্শনিক চিন্তার প্রধান ধারাকে আমরা এই গ্রন্থে পরিবেশন করিয়াছি, তবুও এই ব্যাপারে আমরা সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছি এমন বলিতে পারি না। এই প্রকার বিমিশ্র-গ্রন্থে একজাতীয় মান রক্ষা করা সুকঠিন। লেখকদের ব্যক্তিগত অভিরুচি ও পক্ষপাতের প্রতি আমাদিগকে লক্ষ্য রাখিতে হইয়াছে। শব্দের বানানের বিষয়ে আমরা একজাতীয় মান বজায় রাখিবার চেষ্টা করিয়াছি।

বিভিন্ন জাতির সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মধ্যে যে দার্শনিক মত গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাদের তুলনা করা খুব সহজ কাজ নহে। এক মতবাদে যে ভাব, ধারণা বা

পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে, অন্য মতে তাহাদের ঠিক প্রতিশব্দ খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। উদাহরণস্বরূপ, হিন্দু দর্শনে ব্যবহৃত 'আত্মা' ও 'মায়া' শব্দ দুইটি যথাক্রমে অহং ও ভ্রান্তি অর্থে অসঙ্গতভাবে প্রয়োগ করা হইয়াছে।

নিখুঁত কালানুক্রম রক্ষা করিয়া দর্শনের ইতিহাস প্রণয়ন করা সম্ভবপর নহে। কারণ, দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী বিভিন্ন দেশে এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে স্বাধীন ভাবেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সেই জন্য এই গ্রন্থের নাম "দর্শন: প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য" রাখার কথা আমরা প্রথমে চিন্তা করিয়াছিলাম। কিন্তু কিছুকাল পরে প্রায় ঐ নামের একখানি গ্রন্থের সন্ধান আমরা পাই এবং পাছে গ্রন্থের নাম লইয়া কোন বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় সেই জন্য আমরা বর্তমান নাম গ্রহণ করিয়াছি। "গণিত ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে এবং অন্যান্য বিজ্ঞানে ভারতের অবদান" এই নামে একটি পরিচ্ছেদ এই গ্রন্থে কেন রাখা হইয়াছে, সে সম্বন্ধে হয়ত কিছু কৈফিয়ত দিবার প্রয়োজন আছে। বহু লোকের মনে বদ্ধমূল ধারণা আছে যে, ভারতবাসীর মন প্রধানতঃ তত্ত্ববিদ্যাভিমুখী। বর্তমান যুগের ভারতীয় বৈজ্ঞানিকরা এই মতের অসারতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কিন্তু ইহাও আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্যণীয় যে, সুপ্রাচীন যুগেও বিজ্ঞানের অগ্রগতির জন্য ভারতবাসী মূল্যবান কীর্তি রাখিয়া গিয়াছে। এই পরিচ্ছেদ প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের পটভূমিকা হিসাবে গ্রহণ করা যাইবে।

মাননীয় মওলানা আবুল কালাম আজাদ এই গ্রন্থ প্রণয়নে যে অনুপ্রেরণা দিয়াছেন সেজন্য তাঁহার নিকট আমরা কৃতজ্ঞ।

লণ্ডনস্থ স্কুল অব ওরিয়েণ্টাল এ্যাণ্ড্ এ্যাফ্রিকান্ স্টাডিজ-এর অধ্যাপক এস্ ভট্টাচার্য এম এ., পি. এচ্. ডি., ডি লিট্., ব্যারিস্টার-এ্যাট্-ল মহাশয়ের প্রতি সম্পাদকগণ বিশেষভাবে ঋণ স্বীকার করিতেছেন। লণ্ডনে থাকিয়া অধ্যাপক ভট্টাচার্য বর্তমান সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষ হইতে প্রুফ্-সংশোধন ও নির্ঘণ্ট প্রস্তুতিরূপ অস্বস্তিকর অথচ প্রয়োজনীয় কাজ করিয়াছেন।

সম্পাদকবৃন্দ

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

ভারতীয় চিন্তাধারার ভিত্তি

দ্বিতীয় খণ্ড

বিষয় পৃষ্ঠা

ভারতীয় দর্শনের পরম্পরাগত সম্প্রদায়সমূহ

সূচনা

আবুল কালাম আজাদ

ইরাণ দেশের এক কবি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরিচয় দিতে গিয়ে তাকে পুরানো পুঁথির পাণ্ডুলিপির সঙ্গে তুলনা করেছেন। পুঁথির সুরু ও শেষের পাতা খোওয়া গেছে, কাজেই কিভাবে তার আরম্ভ ও কোথায় তার পরিসমাপ্তি, সে কথা কেউ জানে না, জানবার কোন সম্ভাবনাও নাই।

মা যি আঘায যি আনজাম-ই-জাহাঁন বে-খবর-ইম
আওয়াল-ও-আখের-ই-ইন কুহনা কেতাব উফ্‌তাদ আস্ত।

মানুষের আত্মচেতনার সুরু থেকে সে এই হারানো পাতা খুঁজে বেড়াচ্ছে। মানব-আত্মার সেই অভিযান ও তার ফলে সে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, তারই নাম দর্শন। পুঁথির পরে পুঁথি লিখেও দার্শনিকের পক্ষে দর্শনের সংজ্ঞা ও প্রকৃতির বিবরণ দেওয়া কঠিন, কিন্তু কবি একটি শ্লোকেই দর্শনের মর্মকথা ব্যক্ত করেছেন।

জীবন ও সত্তার তাৎপর্য উপলব্ধিই দর্শনের লক্ষ্য। মানুষ যেদিন আত্মসচেতন হয়ে চিন্তা করতে সুরু করল, তার মনে সেদিন দুটি প্রশ্ন প্রবল হয়ে দেখা দিল : মানব জীবনের তাৎপর্য কি? যে বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে মানুষের বাস তার স্বরূপই বা কি? প্রশ্নের উত্তর খুঁজে মানুষ কতকাল নানাদিকে নানাভাবে হাতড়ে বেড়িয়েছে সে কথা আমরা জানি না, তবে খুঁজতে খুঁজতে যেদিন পথের হদিস পেল, তখন থেকে লক্ষ্য স্থির করে সে প্রজ্ঞা ও চিন্তার পথে অগ্রসর হতে চেষ্টা করেছে। সুসংবদ্ধ বিচার ও আলোচনার সেই থেকে সুরু। মানুষের বুদ্ধি যেদিন এই নতুন কর্ম-পন্থা অবলম্বন করল, সেইদিন দর্শনের জন্ম।

অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত ইউরোপের দর্শনের ইতিহাস মধ্যযুগের আরব দার্শনিক ও ঐতিহাসিকের ধারা অনুসরণ করে এসেছে।[1] দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দর্শনের বিকাশ বিচারের বদলে তাঁরা বিভিন্ন দার্শনিক ও তাদের সাঙ্গোপাঙ্গের বিবরণ দিয়েই ক্ষান্ত থাকতেন। এক কথায় দর্শনের ইতিহাস না বলে এ সমস্ত বিবরণকে দার্শনিকের ইতিহাস বলা চলে। প্রসঙ্গতঃ বলা উচিত যে, আরব লেখকের রচনায় তাদের নামকরণ

থেকেই একথা বোঝা যায়। আমরা যাকে দর্শনের ইতিহাস বলি, উনবিংশ শতকের গোড়ায় তার প্রথম আবির্ভাব। তখন যে ধারার প্রবর্তন, আজ পর্যন্ত তাই প্রচলিত আছে। ছাত্রদের জন্য পাঠ্যপুস্তক অথবা সাধারণ পাঠকের জন্য সাধারণ বিবরণ—যে ধরণের দর্শনের ইতিহাসই রচিত হোক না কেন,—আজকালকার লেখক এখানে ওখানে সামান্য অদলবদল করলেও উনবিংশ শতকের সেই ধারার বাইরে যেতে পারেন নাই।

গত একশো বছরে দর্শনের ইতিহাস ও আলোচনা অনেক এগিয়ে গেছে। নানা দেশের নানা জাতির পণ্ডিত বহু তথ্য ও তত্ত্বপূর্ণ পুঁথি লিখেছেন, কিন্তু সে সমস্ত বই যখন পড়ি,—একটা কথাই বার বার মনে আসে। দর্শনের উদ্ভব ও দর্শনের বিভিন্ন বিভাগের যে বিবরণ এ সমস্ত পুঁথিতে মেলে, আমার মতে সে বিবরণ পূর্ণাঙ্গ নয়। দর্শনের ইতিহাসের পূর্ণতর বিবরণের প্রয়োজন তাই আমি বার বার বোধ করেছি।

দর্শনের সামগ্রিক ইতিহাসের অনেক পাতা এমনভাবে বিনষ্ট হয়েছে যে, আজ তার পুনরুদ্ধার সম্ভব নয়। তাদের বিষয়ে তথ্য-সংগ্রহের সম্ভাবনাও আজ নাই। আমরা জানি যে ইউনানের বহুপূর্বে মিশর এবং ইরাকে সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল। আমরা একথাও জানি যে মিশরের আদিম জ্ঞান ইউনানী দর্শনের প্রথম বিকাশকে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল। প্লেটো তাঁর রচনায় যে ভাবে মিশরীয় জনশ্রুতির ব্যবহার করেছেন তাতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, এ সমস্ত জনশ্রুতিকে সেকালের লোক স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান বলে মেনে নিত। অ্যারিষ্টটল তো পরিষ্কার ভাবেই বলেছেন, মিশরী পুরোহিতেরাই পৃথিবীর আদিম দার্শনিক। মিশরের সঙ্গে ইউনানের সম্বন্ধ কি, সে বিষয়ে কিন্তু আমরা বিশেষ কিছু জানি না। এ বিষয়ে বিশদ জ্ঞানের কেবল যে অভাব তা নয়, সে জ্ঞান অর্জনেরও কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। বাবিলন বা নিনিভে যে সভ্যতার বিকাশ, তার দার্শনিক স্বরূপ ও প্রকৃতি সম্বন্ধেও আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত অসম্পূর্ণ। প্রাক্-ইউনানী এ সমস্ত সভ্যতায় যে প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসার সুরু, তারই ফলে ইউনানী দর্শনের বিকাশ সম্ভব হয়েছিল কিনা সে বিষয়েও আমরা স্থির করে কিছু বলতে পারি না। দর্শনের ইতিহাসের এ সমস্ত ফাঁক যে কোনদিন পূরণ হবে, সে আশাও সুদূরপরাহত।

প্রাচীন ইতিহাসের কয়েকটি অঞ্চলের বিষয়ে আমাদের জ্ঞান বর্তমান শতকে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। দর্শনের বিকাশের পূর্ণতর বিবরণ দেওয়া আজ তাই সম্ভব। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক নতুন তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। ঐতিহাসিক জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে দর্শনের বিকাশের ধারা সম্বন্ধে নতুন তথ্য-সংগ্রহের ক্ষেত্রও মিলেছে। এককালে বলা হ'ত যে ইউনানে দর্শনের সুরু। কিন্তু প্রাক্-ইউনানী যুগেও দর্শনের

বিকাশের ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায়; এবং সে বিকাশের প্রকৃতি ও ধারা সম্বন্ধেও আমরা আজ খানিকটা ধারণা করতে পারি। সাধারণভাবে কিন্তু তাতে আমাদের ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হয়নি—উনিশ শতকে দর্শনের ইতিহাসের যে ধারা প্রচলিত ছিল, সেই সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী আজও প্রবল।

ইউনানে দার্শনিক অনুসন্ধিৎসা থেকেই যে ইউরোপীয় দর্শনের সুরু সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। খৃষ্টধর্ম প্রচারের পরে দর্শনের বিকাশ ব্যাহত হয় এবং বহু শতাব্দী ধরে ইউরোপে দর্শনের কোন ঠিকানাই মেলেনা। কয়েক শ বছর পরে অষ্টম শতাব্দীতে আরব পণ্ডিতেরা আবার ইউনানী দর্শনের আলোচনা সুরু করেন এবং তাদের মাধ্যমেই ইউরোপে আবার দর্শনের পুনরুজ্জীবন হয়। এই আলোচনা ও অধ্যয়নের ফলে চিত্তবৃত্তির যে সম্প্রসারণ ও মুক্তি, তাই পরবর্তীকালে ইউরোপীয় রেনেসাঁসে বিকশিত হয়ে উঠল। আরব অনুবাদক ও টীকাকারদের মারফত যে জ্ঞানভাণ্ডারের সঙ্গে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের এতদিন পরোক্ষ পরিচয় ছিল, রেনেসাঁসের যুগে ইউনানী দর্শনের মূলগ্রন্থের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে সে জ্ঞান পূর্ণতর হয়ে উঠল। রেনেসাঁসের পরে যে নতুন চিন্তাধারার বিকাশ, আধুনিক দর্শন তারই পরিণতি। ফলে ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাসকে অনেক সময় আদিম, মধ্যযুগীয়, রেনেসাঁস এবং আধুনিক এই চার অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়।

উনিশ শতকে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা যখন দর্শনের ইতিহাসের খসড়া তৈরী করতে চেষ্টা করলেন, তখন এই চতুর্বর্গীয় বিভাগ স্বভাবতঃই তাঁদের মনে এল। ইউরোপীয় চিত্তবৃত্তির উপরে খৃষ্টান প্রভাবের ফলেও এধরণের বিভাগ সহজ মনে হয়। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা মানবসভ্যতার সমগ্র ইতিহাসকে খৃষ্টধর্মের আবির্ভাবের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে অভ্যস্ত। ফলে, মানব ইতিহাসের বিরাট বিস্তারকে তাঁরা দুটি বড় বড় খণ্ডে ভাগ করেছেন: খৃষ্টপূর্ব ও খৃষ্টপরবর্তী। খৃষ্টপরবর্তী যুগেরও দুই ভাগ। রিফরমেশনের আগেকার ও তার পরের যুগ। এরদ্‌মানের মত দার্শনিকও দর্শনের বিকাশের ইতিহাসকে এই ধাঁচে ফেলে তার বিভাগ করতে চেয়েছেন। এরদ্‌মানের মতে দর্শনের তিনযুগ, প্রাক্-খৃষ্টীয় ইউনানী দর্শন, খৃষ্টীয় মধ্যযুগীয় দর্শন এবং রিফরমেশনের পরবর্তী আধুনিক দর্শন।[২]

একটু বিবেচনা করলেই বোঝা যায় যে, এ বিবরণে দর্শনের সার্বজনীন ইতিহাস মেলে না, এ ইতিহাস একান্তভাবে ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাস। উনিশ শতকের গোড়ায় ভারতীয় এবং চৈনিক দর্শনের সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাব ছিল বলে এই আংশিক বিবরণকেই সার্বজনীন ইতিহাসের স্থান দেওয়া হয়। কালক্রমে সার্বজনীন ইতিহাস হিসাবে তা গ্রাহ্যও হয়। ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তক অথবা সাধারণের জন্য লেখা বিবরণ যে

রকমই হউক, ঊনিশ শতকে দর্শনের যত ইতিহাস লেখা হয়েছে, তাদের সবাই এ ধারা অনুসরণ করেছে। ফলে দর্শনের ইতিহাসের যে আংশিক ছবি সাধারণ পাঠকের মনে গেঁথে গেছে, পরবর্তী যুগের গবেষণায় নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কার সত্ত্বেও সে ছবি বদলায়নি। দর্শনের ইতিহাসের কথা ভাবলে তাই এই আংশিক ইতিহাসের কথাই আমাদের মনে আসে। তা নইলে বর্তমান শতকের দ্বিতীয় দশকে দর্শনের ইতিহাস লিখতে বসে থিলির মতন পণ্ডিত প্রাচ্য দর্শনের অবদানকে অস্বীকার করে ইউনানী দর্শনের বিবরণকে মানব ইতিহাসে সুসমঞ্জস চিন্তার প্রথম উদ্ভব বলবেন কেন?[৩]

আসলে কিন্তু দর্শনের প্রচলিত এ ইতিহাস আংশিক ও অসম্পূর্ণ। কেবল দর্শনের উদ্ভব নিয়ে নয়, পরবর্তী যুগের সম্পূর্ণ বিবরণও তাতে মেলে না। পাশ্চাত্য জগত দর্শনের যে তিন বা চার অধ্যায়কে স্বীকার করেছে তার প্রভাব আমাদের মনে এত প্রবল যে অন্য কোন পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দর্শনের ইতিহাস আলোচনা করতে চাই না। ইতিহাসের বিচার করলে কিন্তু একথা মানতেই হবে যে, খৃষ্টীয় যুগ আরম্ভ হবার অনেক আগে বৌদ্ধ-চিন্তাধারায় বিভিন্ন দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিশিষ্ট প্রকাশ ঘটেছিল। সেকালে দর্শনের প্রগতির বিচারে তাই ভারতীয় দর্শন-চিন্তাকে বাদ দিলে চলবে না; ইউনান এবং ভারতবর্ষে দর্শনচিন্তার প্রসার ও প্রকৃতির তুলনামূলক আলোচনা তাই কেবল চিত্তাকর্ষক নয়, দর্শনের ইতিহাস রচনার জন্য অপরিহার্য। মামুলী এবং প্রচলিত ইতিহাস কিন্তু কেবলমাত্র ইউরোপীয় দর্শন আলোচনা করেই তুষ্ট। প্রাচ্যে দর্শনের বিকাশ ও বিশ্ব-দর্শনে প্রাচ্যের অবদান তাদের চোখে পড়ে না। বিংশ শতকের গোড়া থেকে ভারতীয় এবং চৈনিক দর্শনের অনেক নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে, কিন্তু আজও সে জ্ঞান বিশেষজ্ঞদের মধ্যেই আবদ্ধ। সাধারণ পাঠকের জন্য রচিত দর্শনের প্রচলিত ইতিহাসে আজও তার যথাযোগ্য স্থান মেলে নাই।

সাম্প্রতিক লেখকদের মধ্যে কেউ কেউ দর্শনের ইতিহাসের এ পুরাতন ধারণা যে আংশিক ও অসম্পূর্ণ সে সম্বন্ধে সচেতন। তাই পুরাতন আংশিক বিবরণের বদলে দর্শনের সামগ্রিক ইতিহাস রচনার চেষ্টাও সুরু হয়েছে, কিন্তু তবু একথা বলা চলেনা যে, সে পুরানো দৃষ্টিভঙ্গীর পুরোপুরি রূপান্তর ঘটেছে। দর্শনের সামগ্রিক ইতিহাসে প্রাচ্য দর্শন আজও তার যথাযথ স্থান পায় নাই। তবে যে মালমসলা যোগাড় হয়েছে, তাকে সংগ্রহ করলে বিশ্ব-দর্শনের সামগ্রিক ইতিহাস আজ সম্ভবপর। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনের সমান স্বীকৃতি দিয়ে ইতিহাস রচনার দিন তাই আজ এসেছে।

২

এ প্রসঙ্গে দর্শনের উদ্ভব নিয়ে মৌলিক প্রশ্ন উঠে। দর্শনের কাহিনী সুরু করব কোত্থেকে? ভারতবর্ষে না ইউনানে? দর্শনের প্রাথমিক বিকাশের পরিচয় কোন্ দেশে মিলবে?

ইউনানী দর্শনের আদিম বিকাশের অনেক কথা সম্বন্ধেই আমরা ওয়াকিফহাল। একথা প্রায় সর্বস্বীকৃত যে, খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের আগে ইউনানে দর্শন আলোচনায় কোন সঠিক হদিস মেলে না। ইউনানী মনীষীদের মধ্যে থালিস প্রথম ব্যক্তি যাঁকে যথাযথ অর্থে দার্শনিক বলা যায়। একটি বিশিষ্ট ঘটনার দরুন আমরা তাঁর সাল তারিখ নির্ণয় করতে পারি। বলা হয় যে, খৃষ্টপূর্ব ৫৮৫ সালে যে সূর্যগ্রহণ হয়, থালিস গণনা করে তার সম্বন্ধে সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। থালিসের পরবর্তী কালে যে দুইজন মনীষী ইউনানী দর্শনের বিকাশের মোড় ফিরিয়ে দেন, তাঁদের নাম পিথাগোরাস ও সক্রেটিস। খৃষ্টপূর্ব ৫৩২ সালে পিথাগোরাস জীবিত ছিলেন এবং খৃষ্টপূর্ব ৩৯৯ সালে সক্রেটিসের মৃত্যু হয়।

খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের ভারতবর্ষের দিকে তাকালে কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য ধরণের অবস্থা চোখে পড়ে। ভারতবর্ষে ষষ্ঠ শতক দর্শনের উদ্ভবের যুগ নয়—দর্শনের পরিণতির যুগ। ইউনানে তখন দর্শনের প্রথম প্রভাত, কিন্তু ভারতবর্ষে তখন দর্শনের মধ্যদিন। দর্শন-পথে মানবচিত্তের প্রথম অনিশ্চিত পদক্ষেপের যুগ অতিক্রম করে ভারতবর্ষ সেদিন যেখানে পৌঁচেছিল, তার পিছনে বহুদিনের অভিযানের অভিজ্ঞতা সুস্পষ্ট।

সে যুগের বিবরণে দুটি কথা স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয়:

(১) বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনের বিকাশ এই যুগেই হয়েছিল।

(২) বুদ্ধ ও মহাবীরের আবির্ভাবের পূর্বে ভারতবর্ষে দর্শন বিচারের যে বিকাশ, তাকে অপ্রচুর বলা চলে না। বস্তুতঃপক্ষে দর্শনের যে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় সে যুগে মেলে, বহুকালব্যাপী গভীর ও সূক্ষ্ম চিন্তা এবং গবেষণা ভিন্ন তাদের বিকাশ সম্ভবপর নয়।

পৃথিবীর মহত্তম ব্যক্তিদের মধ্যেও গৌতম বুদ্ধের এক বিশেষ স্থান। তাঁকে পয়গম্বর বলা উচিত না দার্শনিক বলা উচিত, সে বিষয়ে মতভেদের অবকাশ রয়েছে। তাই তাঁর প্রচারিত বাণীর মর্ম নিয়ে প্রশ্ন উঠে: তিনি কি নতুন শ্রুতি বা ওহি প্রচার করেছিলেন, না দর্শনের নতুন আবিষ্কার ব্যক্ত করেছেন?
বিতর্কের পরেও ধর্ম ও দর্শন দুই-ই গৌতম বুদ্ধকে একান্তভাবে দাবী করে। সে পুরাতন তর্কের অবতারণা করতে আমি চাই না, কিন্তু আমার মনে হয় যে গৌতম বুদ্ধকে পয়গম্বর না বলে দার্শনিক বলাই বেশী সংগত। ঈশ্বর-উপলব্ধির জন্ম নয়,

জীবনের সমস্যা সমাধানের জন্যই তাঁর সাধনার স্থরু। সেই সমস্যার সমাধান করেই তাঁর অনুসন্ধিৎসার শেষ। ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা স্বরূপের প্রশ্ন তাঁর চিত্তকে আলোড়িত করে নাই। ভারতীয় ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গীতে অগণিত দেবদেবীর স্থান। গৌতম বুদ্ধের মানসজগতে তাদের কোন স্থান নাই। ঈশ্বরের বিষয় কোন প্রশ্ন না তুলে তিনি নিজের সমস্যার সমাধান খুঁজেছেন, এবং যে সমাধান তাঁর জিজ্ঞাসাকে তৃপ্ত করেছিল, তার মধ্যে ঈশ্বরের উল্লেখ নাই। যে মূলনীতিকে ভিত্তি করে তাঁর সন্ধান ও অনুসন্ধিৎসা, তা-ও মূলতঃ দার্শনিক। তাঁর মতে মানুষের সমস্ত প্রচেষ্টার লক্ষ্য জীবনের সমস্যার সমাধান, এবং ঈশ্বরকে বাদ দিয়েই সে সমস্যা সমাধান করা যায়। একথা সত্য যে, তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর শিষ্যদের মারফৎ তাঁর দার্শনিক চিন্তাধারা পুরোপুরি ধর্মমতে রূপান্তরিত হয়। তারা যখন দেখল যে, প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসে ঈশ্বরের যে স্থান, বুদ্ধ তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীতে সে স্থান শূন্য রেখেছেন, তখন তারা বুদ্ধকেই সে শূন্য সিংহাসনে বসিয়ে ক্ষান্ত হ'ল। বৌদ্ধ-মতবাদের এই পরিণতির জন্য কিন্তু বুদ্ধকে দায়ী করা চলে না।

জৈন মতবাদের উদ্ভব প্রায় একই সময়ে। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে জৈন মনীষীরা আরো নিস্পৃহ। গৌতম বুদ্ধের মত মহাবীরও ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রশ্ন না তুলেই জীবনের সমস্যার সমাধান খুঁজেছেন। জৈনবাদের চিন্তাজগতের যে কাঠামো, দর্শনের মূলনীতির উপরই তার বুনিয়াদ।

গৌতম বুদ্ধ বা মহাবীরের ব্যক্তিত্বের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি চাই, যে চিন্তাজগতের পশ্চাদপটে তাঁদের আবির্ভাব, পাঠকের দৃষ্টি সেই পশ্চাদপটের প্রতি আকৃষ্ট হোক। দর্শনের ঐতিহাসিকের পক্ষে এই পশ্চাদপটের আলোচনা সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন। ষষ্ঠ শতকের ভারতবর্ষে যে গৌতম বুদ্ধ বা মহাবীরের দৃষ্টিভঙ্গী ও চিন্তাপদ্ধতির বিকাশ সম্ভব হয়েছিল, তাতেই সে যুগের ভারতবর্ষের ব্যাপক ও গভীর দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টি প্রমাণিত হয়। বোঝা যায় যে, সে যুগের ভারতবর্ষের যে মানসিক আবহাওয়া তাতে জীবনের রহস্যের বিভিন্ন ও বিচিত্র বিবরণ পাশাপাশি বিকাশলাভ করেছে। এ কথাও বোঝা যায় যে, সে যুগের ভারতবর্ষ দার্শনিকতার এমন স্তরে পৌঁচেছিল যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অথবা ঈশ্বরের প্রত্যাদেশের প্রশ্ন না তুলেই এ সমস্ত গূঢ় সমস্যার সমাধান খোঁজা সম্ভব হয়েছিল।

ইউনানে এ ধরণের দৃষ্টিভঙ্গীর বিকাশ হয়েছে বহুদিন পরে। ইউনানের প্রাচীনতম দর্শনের মধ্যে আয়োনিয়ান মতবাদ অন্যতম। আয়োনিয়ান দর্শনের মতে গ্রহনক্ষত্র সজীব আত্মার বাহন। বস্তুতঃপক্ষে গ্রহনক্ষত্রের অধিষ্ঠাতা আত্মার সঙ্গে

লৌকিক ধর্মের দেবদেবীর কোন পার্থক্য নাই বললেই চলে। অলিম্পাস পাহাড়ের শিখরে যাঁরা অধিষ্ঠিত, তাঁরা লৌকিক ধর্মমতের দেবদেবী। তাঁরাই যখন দার্শনিকের বেশে আকাশে গ্রহনক্ষত্রের অধিষ্ঠাতা হলেন, তখন তাঁদের নাম নক্ষত্রজগতের আত্মা। পরবর্তীকালে বিভিন্ন ইউনানী মতবাদে আয়োনিয়ান দর্শনের প্রভাবে অনুরূপ বিশ্বাসের পরিচয় মেলে। আরিষ্টটলের রচনায় আত্মার উল্লেখ আছে। কিন্তু যদি এ সমস্ত আত্মার স্বরূপ বিশ্লেষণ করা হয়, তবে দেখা যাবে যে, ইউনানী দেবদেবীর সঙ্গে তাদের বিশেষ পার্থক্য নাই। সক্রেটিস এ ধরণের দেবদেবীর উপাসনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন বটে, কিন্তু তিনিও দেবদেবীর লৌকিক ধারণাকে দর্শন থেকে সম্পূর্ণ বাদ দিতে পারেন নি।

অন্যান্য দেশে, ধর্ম ও দর্শনের বিকাশের যে ধারা, তার সঙ্গে যদি ভারতীয় মনীষী কিভাবে এ সমস্ত সমস্যার সমাধান খুঁজেছিলেন তার তুলনা করা হয়, তবে দেখা যায় যে, ভারতবর্ষের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ অন্যরকম। অন্যত্র দর্শন ও ধর্মের লক্ষ্য স্বতন্ত্র, পথও বিভিন্ন। কখনো কখনো তাদের পথে মিল দেখা যায়, একে অপরকে প্রভাবিত করেছে তারও পরিচয় মেলে, কিন্তু তবু তারা কখনো এক হয় নি। ধর্ম ও দর্শনের পৃথক সত্তা সর্বদা বজায় রয়েছে। ভারতবর্ষে কিন্তু তাদের স্বতন্ত্র করে দেখা কঠিন। ইউনানে যা কখনো হয়নি এদেশে তাই ঘটেছে। আশ্রম বা শিক্ষায়তনে আবদ্ধ না থেকে দর্শন লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনে ধর্মে রূপান্তরিত হয়েছে।

বিশ্ব সৃষ্টির সমস্যার যে সমাধান গৌতম বুদ্ধ ও মহাবীর পেয়েছেন, সে সমাধান যে মূলতঃ দার্শনিক সে কথা আমরা আগেই দেখেছি। তা সত্ত্বেও কিন্তু সেমেটিক পয়গম্বরদের মতন তাঁরাও ধর্মগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা। পয়গম্বরদের প্রচারের ফলে নতুন ধর্মগোষ্ঠীর উদ্ভব—গৌতম বুদ্ধ ও মহাবীরের শিক্ষাও নতুন ধর্মগোষ্ঠীর সৃষ্টি করেছে। ইউনানী দার্শনিকদের মধ্যে বহু ব্যাপারে সক্রেটিসের স্থান অনন্য। তিনি যে প্রকৃত দার্শনিক এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু কেবলমাত্র দার্শনিক বললে তাঁর ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ পরিচয় দেওয়া হয় না। তাঁর স্বরূপের বিষয়ে চিন্তা করলে বার বার ঈসা মসীর কথা মনে পড়ে। সক্রেটিসের জীবনের বিষয়ে আমরা যেটুকু জানি, ইসরায়েলের পয়গম্বর বা ভারতবর্ষের যোগীঋষির জীবনের সঙ্গে তার গভীর মিল রয়েছে। সমাধিস্থ অবস্থায় তাঁর বহুসময় কাটত। ওহি অথবা অন্তর্বাণীতে তাঁর গভীর বিশ্বাস ছিল। সংশয় সন্দেহের মুহূর্তে সেই ওহি তাঁর কর্তব্য নির্দেশ করেছে। জীবনান্তের প্রাক্কালে যখন তিনি এথেনীয় বিচারকের সামনে শেষ জবানবন্দী দেন, তখন সেই ওহির নির্দেশ অনুসারেই তিনি ভাষণ দিয়েছিলেন।

এ সমস্ত কথাই সর্বজনগ্রাহ্য, কিন্তু তবু সক্রেটিসের স্থান দার্শনিক মহলে। তাঁর ব্যক্তিত্ব অথবা তাঁর শিক্ষার ভিত্তিতে তাঁর শিষ্য-সাকৃরেদরা নতুন ধর্মগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেনি। এই একটি দৃষ্টান্ত থেকেই ভারতীয় ও ইউনানী দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য বোঝা যায়। ইউনানে ধর্মের প্রসঙ্গ দর্শনের লক্ষণযুক্ত হয়ে দেখা দেয়—ভারতবর্ষের দর্শন ধর্মে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

দর্শন ও ধর্মের আমরা যে পার্থক্যের রেখা টেনেছি, ভারতবর্ষের সে রেখা সুস্পষ্ট নয়। ভারতীয় পরিস্থিতির সঠিক বিবরণ দিতে হলে, হয় কোন নতুন পার্থক্য চিহ্নের খোঁজ করতে হবে, অথবা স্বীকার করতে হবে যে অন্যত্র যাই হোক না কেন, ভারতবর্ষের দর্শন ও ধর্ম একই পথের পন্থী।

গৌতম বুদ্ধ ও মহাবীরের ব্যক্তিত্ব বিশ্লেষণের ভিত্তিতে আমরা খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের ভারতবর্ষের মানসিক পরিস্থিতির ধারণা করতে চেষ্টা করেছি। আভ্যন্তরীণ বিচারের ফলে যে সিদ্ধান্তে পৌঁচেছি, বহির্জগতের ঘটনা-সংস্থানে তার কোন সমর্থন মেলে কিনা এবার সে কথার আলোচনা করা যাক। যে সমস্ত নজীর মেলে তার একটির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আগেই আকর্ষণ করেছি। গৌতম বুদ্ধ ও মহাবীরের আবির্ভাবের পূর্বেই যে উপনিষদের চিন্তাধারার বিকাশ আরম্ভ হয়েছিল, ভারতীয় দর্শনের ঐতিহাসিকদের মধ্যে সে বিষয়ে আজ কোন মতভেদ নাই। সমস্ত উপনিষদের রচনাকাল এক নয়। প্রথম উপনিষদগুলি যে খৃষ্টপূর্ব অষ্টম শতকে রচিত হয়েছিল একথাও প্রায় সবাই মানেন। ভারতীয় ষড় দর্শনের পৌর্বাপর্য ও সময়ের বিষয়ে কিন্তু পণ্ডিতেরা একমত নন। কারো কারো মতে গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্বেই চার্বাক মতবাদের পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল। প্রমাণস্বরূপ তাঁরা বলেন যে, উপনিষদের কয়েকটি সূত্রে জড়বাদের ইঙ্গিত মেলে। কাজেই মনে হয় যে বিশ্বসৃষ্টির জড়বাদী বিবরণ সেকালে প্রচলিত ছিল, এবং জড়বাদই চার্বাক দর্শনের মর্মকথা। সাংখ্য ও যোগ দর্শন সম্বন্ধেও কোন কোন পণ্ডিতের ধারণা যে প্রাক্‌বৌদ্ধ যুগে তাদের বিকাশ হয়েছিল। বৌদ্ধ মতবাদের সঙ্গে সাংখ্য ও যোগ দর্শনের অনেক সিদ্ধান্তের মিল রয়েছে বলে তাঁরা মনে করেন যে, ভারতীয় দর্শনের এ দুটি বিশিষ্ট ধারার উদ্ভব বুদ্ধের পূর্বে বা সমসাময়িক যুগে হয়েছিল।

এ কথা মান্‌লে ভারতীয় দর্শনের গোড়াপত্তনের তারিখ খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতকের চেয়ে কয়েক শত বৎসর পিছনে টেনে নিতে হয়। একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, দর্শন আলোচনা কয়েকশো বছর আগে সুরু না হলে সপ্তম শতকে ভারতীয় দর্শনের এত পরিপূর্ণরূপ সম্ভব হ'ত না। ইউনানে থালিস ও অ্যারিষ্টটলের মধ্যে তিন শতাব্দীর ব্যবধান। ভারতীয় দর্শনের প্রথম আরম্ভ থেকে সাংখ্য, যোগ অথবা চার্বাক

দর্শনের বিকাশের জন্যও অন্ততঃ তিনশো বছর লাগলে আশ্চর্য হবার কিছু নাই। কাজেই একথা বলা অন্যায় হবে না যে, ভারতবর্ষে দর্শন আলোচনার প্রথম আরম্ভ খৃষ্টের আবির্ভাবের প্রায় হাজার বছর আগে সুরু হয়েছিল।

আমাদের সাম্প্রতিক জ্ঞান কিন্তু এ বিষয়ে কোন নিশ্চিন্ত সিদ্ধান্তে পৌছতে দেয় না। এ ধরণের অনুমানের মাল-মসলা অনেক মেলে, কিন্তু কল্পনা, সম্ভাব্যতা বা অনুমানের উপর নির্ভর করে ইতিহাস রচনা করা যায় না। ইতিহাস চায় সুস্পষ্ট প্রমাণ এবং এ কথা আমাদের মানতে হবে যে, ভারতীয় দর্শনের উদ্ভবের তারিখ কবে, সে বিষয়ে কোন নিশ্চিত প্রমাণ মেলে না। আধুনিক পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকে তাই বলেন যে, প্রাক্‌বৌদ্ধযুগে সাংখ্য বা যোগদর্শনের বিকাশের বিষয়ে নিশ্চিত কিছু বলা যায় না; শুধু এইটুকু জোর করে বলা চলে যে বুদ্ধের আবির্ভাবের যুগে সাংখ্য, যোগ প্রভৃতি বিভিন্ন দার্শানিক মতবাদের পূর্ণ পরিণতি না ঘটে থাকলেও পরবর্তী কালের ষড় দর্শনের বিকাশের ভিত্তি সে যুগে স্থাপিত হয়েছিল। বিভিন্ন দর্শনের সম্ভাবনা যে ষষ্ঠ শতকে দেখা দিয়েছিল, এ কথা না মানলে অন্যায় হবে, কিন্তু এর বেশী দাবী করলে তাও বাড়াবাড়ি হবে। উপনিষদের যে সমস্ত বাক্য ষড় দর্শনের অস্তিত্বের প্রমাণ মনে করা হয়, বস্তুতঃপক্ষে তাদের ষড় দর্শনের বিকাশের পূর্ব-সূচনা মনে করাই উচিত। বিভিন্ন বাক্যগুলির মধ্যে যে মতভেদ দেখা যায়, তাতে এই কথাই প্রমাণ হয় যে, তখনই বিভিন্ন মতবাদ সুরু হয়েছিল। কোন কোন বাক্যে জড়বাদের আভাস মেলে এবং একথা বোঝা যায় যে, সে যুগের মনীষীদের মনে বিশ্বসৃষ্টির জড়বাদী বিবরণের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। এ সমস্ত ইঙ্গিতকে চার্বাক দর্শনের প্রথম বুনিয়াদ মনে করা চলে, কিন্তু এ কথা বলা চলে না যে, পরিপূর্ণ মতবাদ হিসাবে চার্বাক দর্শনের বিকাশ সে যুগে হয়েছিল। বৌদ্ধমতবাদ এবং সাংখ্য বা যোগ দর্শনের মধ্যে কয়েক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে বলে যে সব পণ্ডিত মনে করেন যে বৌদ্ধমতবাদ বিকাশের আগেই সাংখ্য এবং যোগ দর্শনের বিকাশ ঘটেছিল, তাঁরা একটা কথা ভুলে যান—সাদৃশ্য রয়েছে বলে সাংখ্য বা যোগ দর্শনকেই প্রাচীনতর মনে করতে হবে কেন? বৌদ্ধমতবাদের বিকাশ যদি আগে হয়ে থাকে এবং তার প্রভাবে সাংখ্য ও যোগদর্শনের পরিণতি ঘটে থাকে, তা'হলেও তাদের মধ্যে সাদৃশ্য হতে পারে। কাজেই পারস্পরিক সাদৃশ্য থেকে কোন্ মতবাদের উদ্ভব আগে সে কথা বলা চলে না।

আমাদের আলোচনা থেকে দুটি বিষয় প্রমাণিত হয়:

(১) গৌতমবুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্বেই বিভিন্ন উপনিষদে দর্শনের বিকাশ ও পরিণতির পরিচয় মেলে।

(২) প্রাক্‌বৌদ্ধ যুগে ভারতীয় দর্শনে বিভিন্ন মতবাদের প্রথম সূত্রপাত দেখা দিয়েছিল। বিভিন্ন দর্শনের সুস্পষ্ট বিকাশ হয়েছিল কিনা সে সম্বন্ধে কোন নিশ্চিত প্রমাণ নাই। নিঃসন্দেহে শুধু এ কথা বলা যায় যে, বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্বেই দার্শনিক বিচার ও বিশ্লেষণের পরিণতি অনেক দূর এগিয়েছিল।

দর্শনের ইতিহাস বিচারের ফলে আমাদের স্থির সিদ্ধান্ত এই যে, ইউনানের আগেই ভারতবর্ষে দর্শনের আলোচনা সুরু হয়েছিল। খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে ইউনানে দর্শনের শৈশব, কিন্তু তখন ভারতবর্ষে দর্শনের পরিপূর্ণ যৌবন। বিশ্বদর্শনের ইতিহাস রচনা করতে হলে ইউনানে নয়, ভারতবর্ষে তার প্রথম অধ্যায় সুরু করা উচিত।

৩

উপনিষদে ভারতীয় দর্শনের প্রাচীনতম প্রকাশ। উপনিষদগুলির ধর্মীয় ও ধর্মবাদী স্বরূপ সুস্পষ্ট, কিন্তু তাই বলে তাদের বাদ দিয়ে দর্শনের ইতিহাস রচনা করা চলে না। যেলার বা এরদ্‌মান্‌ অভিজ্ঞতা-নির্ভর বা বুদ্ধিকেন্দ্রিক দর্শনের ইতিহাসে উপনিষদের স্থান স্বীকার করতে চাননি, কিন্তু এ সিদ্ধান্ত ঠিক নয়।[৪] একথা সত্য যে, বক্তি বিশেষের ঐকান্তিক অভিজ্ঞতা হিসাবে মর্মবাদকে দার্শনিক বিচারের কষ্টিপাথরে যাচাই করা যায় না, কিন্তু এ ধরণের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যখন সুসংবদ্ধ দর্শনদৃষ্টি গড়ে তোলবার চেষ্টা হয়, তখন সে প্রচেষ্টাকে দর্শনের ইতিহাসে স্থান দিতেই হবে। বস্তুতঃপক্ষে তখন সে প্রচেষ্টা দর্শন সাধনার এক জরুরী অংশ হয়ে উঠবে, দর্শন ভিন্ন অন্য কোন নামে তার ঠিক পরিচয় দেওয়া যায় না।

দর্শন বলতে আমরা কি বুঝি ? জীবন এবং সত্তার স্বরূপ বুঝবার চেষ্টার নামই দর্শন। সত্য উপলব্ধির পথ দু'টি। শ্রুতি ও ঐতিহ্যকে অবলম্বন করে সত্যের সন্ধানের নাম ধর্ম, বুদ্ধির অবারিত অনুসন্ধিৎসার পথে সত্যের সন্ধানের নাম দর্শন।

আদিম কাল থেকে বিশ্ব-সমস্যা সমাধানের জন্য দর্শন দু'টি স্বতন্ত্র পথ অনুসরণ করে এসেছে। শাশ্বত সত্যের সন্ধানে সত্যদ্রষ্টা অন্তরের গহনতম কেন্দ্রে প্রবেশ খুঁজেছেন। বহির্জগতের বিচিত্র প্রকাশে বৈজ্ঞানিক সেই একই সত্যের সন্ধান করেছেন। ভারতীয় চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য এই যে, বহির্জগতের চেয়ে অন্তরলোকের দিকে তার দৃষ্টি বেশী। বহির্জগতের বৈচিত্র্যবিশ্লেষণ করে ভারতীয় দর্শন আন্তর-সত্তার দিকে এগোয় নি, বরং আন্তরসত্তার উপলব্ধির ভিত্তিতে দৃশ্যমান বহির্জগৎকে বুঝতে চেয়েছে। উপনিষদে দর্শনের এই আভ্যন্তরীণ দৃষ্টিভঙ্গীরই প্রকাশ।

ইউনানী দর্শনের প্রাচীনতর পদ্ধতিগুলিতেও এই দৃষ্টিভঙ্গী বহুক্ষেত্রে অবলম্বিত হয়েছিল। অন্ততঃপক্ষে এ কথা নিঃসন্দেহ যে প্রাচীন ইউনানী দর্শনে এ দৃষ্টিভঙ্গীর স্থান রয়েছে। অরফিক বা পিথাগোরিয়ান দর্শনের বিষয় আমরা যা জানি তাতে এ কথার সাক্ষ্য মেলে। সক্রেটীসের দর্শনে দ্বন্দ্বমূলক বিচারপদ্ধতি সুস্পষ্ট, তাঁর দর্শনকে ন্যায়-নির্ভর বলা চলে। কিন্তু এ কথা ভুললে চলবে না যে, তাঁর নিজের স্বীকৃতিতেই আছে তিনি অন্তর-বাণীর দ্বারা চালিত হতেন। ভারতীয় দর্শনের মত গ্রীক দর্শনও তাই ঘোষণা করেছে: নিজেকে জান। প্লেটোর আদর্শবাদে মর্মবাদের ভবিষ্যৎ বিকাশের আভাস মেলে। আত্মদর্শনের পরিণতির বীজ তার মধ্যে নিহিত, কিন্তু প্লেটোর প্রধান শিষ্য আরিষ্টটলের দর্শনে মর্মবাদ বা আত্মদর্শন বিকাশের কোন প্রয়াস নাই। মর্মবাদের পূর্ণ পরিণতি পরে আলেকজান্দ্রিয়ায় হয়েছিল, এবং নিও-প্লেটোনিজম্ বা নব-প্লেটোবাদ তার পরিসমাপ্তি। উপনিষদের শিক্ষা এই আলেকজান্দ্রিয় দার্শনিক পদ্ধতির বিকাশের মূলে কিনা, সে বিষয়ে সঠিক বলা কঠিন। কিন্তু এ কথা আমরা জানি যে, সে যুগে আলেকজান্দ্রিয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শন ও ধর্মের মিলনক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। বিচিত্র ধর্মের দেবদেবীর পূজা আলেকজান্দ্রিয়ার বাজারে প্রচলিত ছিল, এবং তারই সর্বধর্ম সমন্বয়ের চেষ্টায় সিরাপিয়ম প্রতিষ্ঠিত হয়। মনে হয় যে দর্শনের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। বিভিন্ন দর্শনের ধারা, মানবচিন্তার বিভিন্ন পদ্ধতি ও লক্ষ্যের সমন্বয় সাধনা আলেকজান্দ্রিয়ায় এক সম্মিলিত চিন্তাধারার সৃষ্টি করেছিল।

ইন্দ্রিয়ের পথে তত্ত্বজ্ঞান মেলে না, এই বিশ্বাসই মর্মবাদের মূলনীতি। যদি সত্তার চরম বিকাশ উপলব্ধি করতে চাই, তবে ইন্দ্রিয়জগৎ বর্জন ক'রে আন্তর অভিজ্ঞতার জগতে প্রবেশ করতে হবে। পিথাগোরাস থেকে প্লেটো পর্যন্ত বিভিন্ন ইউনানী দার্শনিকের দর্শনে এ বিশ্বাসের পরিচয় মেলে। প্লেটোর দর্শনে জ্ঞানজগৎ ও ইন্দ্রিয় জগৎ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। মধ্যদিনের আলোর সঙ্গে গোধূলির আলোর তুলনা করে প্লেটো তাদের তফাত বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। প্লেটোর মতে গোধূলির আলোতে যেমন সবকিছু অস্পষ্ট ভাবে দেখা দেয়, ইন্দ্রিয়-জ্ঞানে বাস্তবের পরিচয় তেমনি অস্পষ্ট। বুদ্ধির আলোক দিবালোকের মতন বাস্তবকে উদ্ভাসিত করে। দৃশ্যমান জগৎ ও পারমার্থিক সত্তার স্বাতন্ত্র্য বোঝাতে গিয়ে প্লেটো বলেছেন যে, ইন্দ্রিয় দৃশ্যমান জগতের পরিচয় দিতে পারে, কিন্তু পারমার্থিক সত্তা কল্যাণস্বরূপ। বিজ্ঞান, জ্ঞান ও সত্য কল্যাণধর্মী, এবং কল্যাণের স্বরূপ প্রকাশ করতে চায়, কিন্তু একমাত্র কল্যাণকেই শাশ্বত সত্তা বলা যায়। ইন্দ্রিয়ের পথে সেই সৎ বা সত্তা মেলে না। "রিপাবলিক" গ্রন্থে গুহাবাসীদের পরিকল্পনায় প্লেটোর দর্শনের চরম বিকাশ প্রত্যক্ষাত্মক প্রজ্ঞা

উপনিষদের ভিত্তি। প্লেটোর দর্শনে তার স্পষ্ট উল্লেখ নেই বটে, কিন্তু যে ভাবে তিনি ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতা বর্জন করে সত্যকে খুঁজেছেন, তার সঙ্গে মর্মবাদীদের ইন্দ্রিয়-জগৎ বর্জনের মিল স্পষ্ট।

ভারতীয় ও ইউনানী দর্শনের মধ্যে আর এক ব্যাপারে মিল লক্ষ্যণীয়। ইউনানী দর্শনে নুস (nous) এবং ভারতীয় দর্শনে আত্মা—এ দু'টি ধারণার মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য দেখা যায় না। এনাকসেগোরাসের মত বর্জন করে প্লেটো বিশ্বাত্মা স্বীকার করেছেন। প্লেটোর দর্শনের মর আত্মার ও অমর আত্মার পরিকল্পনার সঙ্গে যদি ভারতীয় দর্শনের জীবাত্মা ও পরমাত্মার তুলনা করা হয়, তবে দেখা যাবে যে তাদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নাই।

উপনিষদের দর্শন-দৃষ্টি মর্মবাদী, এ অজুহাতে দর্শনের ইতিহাস থেকে উপনিষদের আলোচনা বাদ দেওয়া চলে না। যদি তা করা হয়, তবে ইউনানী দর্শনের অধিকাংশকেই দর্শনের ইতিহাস থেকে বাদ দিতে হবে।

একথাও আমাদের মনে রাখতে হবে যে, কেবলমাত্র বিষয়বস্তু বিচার করে দর্শনের ক্ষেত্র নির্ণয় করা চলে না। যে বিষয়কে আমরা প্রথম দৃষ্টিতে দর্শনের বহির্ভূত মনে করি, দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী ও বিচারপদ্ধতি অবলম্বনের ফলে তাও দর্শনের প্রতিপাদ্য হয়ে দাঁড়ায়। শ্রুতি বা ব্যক্তিসর্বস্ব অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে যদি কেউ সত্তার বিবরণ দিতে চায়, তবে সে বিবরণকে ধর্মতত্ত্ব বা মর্মবাদ বলা সঙ্গত তাকে দর্শন বলা চলে না। পক্ষান্তরে, ধর্মবিশ্বাস বা মর্মবাদী অভিজ্ঞতাকে স্বীকার করেও যদি কেউ বিচারবুদ্ধি দিয়ে তার বিশ্লেষণ করতে চায়, যদি সে মনে করে যে সৃষ্টিরহস্যের সমাধান জ্ঞানমার্গের দ্বারাই সম্ভব, তবে তাকে দার্শনিকের পর্যায়ে ফেলতে হবে। বস্তুতঃপক্ষে দর্শন বিচারের অনেক গূঢ় তত্ত্ব মর্মবাদী সাহিত্য বা ধর্মগ্রন্থ হতে আহরিত হয়েছে।

দর্শনকে ধর্মের অনুগামী করবার চেষ্টায় খৃষ্টান ও মুসলমান দার্শনিকদের মধ্যে কয়েকটি বিভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি হয়, কিন্তু তাঁদের রচনাও সর্বসম্মতিক্রমে দর্শন বলে স্বীকৃত হয়েছে। তার কারণ এই যে, যুক্তির আক্রমণ থেকে ধর্মকে বাঁচাবার জন্য তাঁরা যুক্তির অস্ত্রই ব্যবহার করেছেন। আগষ্টিন অথবা তাঁর পরবর্তী খৃষ্টান-ভাষ্যকারদের রচনাকে তাই দর্শন থেকে বাদ দেওয়া যায় না। মুসলমান ভাষ্যকারদের বেলায়ও একথা খাটে। ধর্মবিচারের এ সাহিত্য বাদ দিলে আরব দর্শনের একটি স্মরণীয় অধ্যায় বাদ দিতে হয়। আরব মনীষীদের মধ্যে ইবন্, সিনা ও ইবন্ আল্ রুশদ্ স্বনামধন্য। কিন্তু তাঁদের একান্তভাবে আরব দার্শনিক বলা চলে না। আরিষ্টটলের অনুগামী ও ভাষ্যকার এই তাঁদের সত্য পরিচয়। আরব দর্শনের স্বকীয় স্বরূপ জানতে হলে যে সব ভাষ্যকারের রচনা অধ্যয়ন করতে হয়, তাঁদের মধ্যে অনেককেই

গ্রীক দর্শনের বিরোধী মনে করা হ'ত। এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করবার জিনিস এই যে, বর্তমান যুগে বিশপ বার্ক্‌লি ধর্মতত্ত্ব প্রমাণের জন্যই দর্শন রচনা সুরু করেছিলেন, কিন্তু তাঁর স্থান অবিসংবাদীভাবে দার্শনিক মহলে। বার্কলির মতবাদের বিবরণ না দিলে দর্শনের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

যেলর অভিযোগ করেছিলেন যে, ভারতীয় দর্শন সর্বদাই ধর্মসাপেক্ষ; কোন কালেই ধর্মের বন্ধন হতে মুক্ত হতে পারে নাই। এই অভিযোগ ভিত্তিহীন।[৫] বেদ ও শ্রুতিতে বিশ্বাসের কথা স্মরণ করেই হয়তো যেলার এ কথা বলেছিলেন। কিন্তু তিনি বোধহয় জানতেন না যে, ভারতীয় দর্শনে বেদকে অস্বীকার করে এমন অন্ততঃ তিনটি বিদ্রোহী মতবাদের পরিচয় মেলে। বৌদ্ধ, জৈন ও চার্বাক দর্শন ঐতিহ্য অথবা শ্রুতিনির্ভর নয়। ষড় দর্শনের মধ্যেও ন্যায় ও সাংখ্য বাহ্যতঃ বেদ অনুগামী হলেও বহুক্ষেত্রে বেদের নির্দেশ অতিক্রম করেছে। তাই এ কথাও নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, বুদ্ধের যুগে ভারতীয় দর্শন ধর্মনিরপেক্ষ স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য স্থাপন করেছিল।

৪

সংশ্লিষ্ট আর একটি প্রসঙ্গের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে চাই। ইউনানের পূর্বে ভারতবর্ষে দর্শনের বিকাশ হয়েছিল, এ কথা যদি অবিসম্বাদী সত্য বলে মেনে নেওয়া হয়, তবে ভারতীয় দর্শনের প্রভাব ইউনানী দর্শনে পড়েছিল এ কথা মনে করা কি অন্যায় হবে? নীল নদী ও সাতিল আরবের সভ্যতা ইউনানী সভ্যতার বহু পূর্বে বিকশিত হয়েছিল সেকথা আমরা জানি। এ কথাও মনে করবার সঙ্গত কারণ রয়েছে এ দু'টি প্রাচীনতর সভ্যতা ইউনানী সংস্কৃতির বিকাশে সহায়তা করেছিল। ভারত ও ইউনানের মধ্যে কি সেরকম সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ সম্বন্ধ স্থাপন করা যায় না?

বর্তমান যুগের ঐতিহাসিকেরা এ সমস্যার আলোচনা করেছেন, কিন্তু কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌছতে পারেন নি। এ কথা অবশ্য ঠিক যে, ইউনানী দর্শনের প্রাচীনতম কয়েকটি মতবাদের সঙ্গে ভারতীয় দর্শনের বিস্ময়কর সাদৃশ্য রয়েছে। তাই অনুমান হয় যে ভারতীয় প্রভাবের ফলেই এ সাদৃশ্যের উদ্ভব। এ কথা বিশেষভাবে অরফিক মতবাদের বিষয়ে প্রযোজ্য। ঐতিহাসিকেরা প্রায় একমত যে অরফিক মতবাদে যে সব বিশ্বাসের পরিচয় মেলে, ইউনানী দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে তারা পুরোপুরি খাপ খায় না। তাদের সঠিক বুঝতে হলে অরফিক মতবাদ এসিয়া থেকে ইউনানে এসেছিল মনে করতে হয়। দেহের বন্ধন ছেদ করে আত্মা মুক্তিলাভ করে—এ বিশ্বাস অরফিক মতবাদের মর্মকথা। এ বিশ্বাসের উদ্ভব ভারতবর্ষে। যেলার নিজেও সে কথা স্বীকার করেছেন, কিন্তু তবু তাঁর ধারণা যে এ মতবাদ ইরাণ[৬] থেকে ইউনানে এসেছিল।

পরবর্তীকালের গবেষণায় কিন্তু এ কথা বলে না যে, মুক্তি বা মোক্ষে বিশ্বাস জরথুস্ত্রের মতবাদের অপরিহার্য অঙ্গ। কাজেই এ বিশ্বাস ভারতবর্ষ থেকে ইউনানে গিয়েছিল এবং সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে ইউনানী দর্শনের প্রথম প্রকাশকে প্রভাবান্বিত করেছিল, এ কথা মনে করা অসঙ্গত হবে না।

সে যুগের ইউনানে ব্যাপক বিশ্বাস ছিল যে, বিদ্যা ও জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রাচ্য-দেশে ভ্রমণ প্রয়োজন। বিভিন্ন দার্শনিকদের জীবনীতে উল্লেখ আছে যে, তাঁরা জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রাচ্যে যাত্রা করেছিলেন। দেমক্রিতসের বিষয় আমরা জানি যে, তিনি বহু বৎসর মিসর ও ইরাণে কাটিয়েছিলেন। পিথাগোরাসের বিষয় বলা হয় যে, স্বগৃহ পরিত্যাগ করে তিনি মিসর যাত্রা করেছিলেন। সোলোন এবং প্লেটোও যে প্রাচ্য দেশে ভ্রমণ করেছিলেন, সে কথা সর্ববিদিত। কাজেই পিথাগোরাস বা সে যুগের অন্য কোন দার্শনিক ভারতবর্ষে এসে থাকবেন একথা বিচিত্র নয়। অবশ্য এ ধরণের ভারত-ভ্রমণের কোন ঐতিহাসিক নজীর বা প্রমাণ মেলে না। কিন্তু একথা প্রায় সকলেই স্বীকার করেন যে, একান্তভাবে ভারতীয় এমন বিশ্বাস বা মতবাদের পরিচয় পিথাগোরাসের দর্শনে অনেক মেলে। যদি পিথাগোরাসের নাম উল্লেখ না করে তাঁর দার্শনিক মতবাদের বিবরণ দেওয়া হয়, ভারতীয় দর্শনের ছাত্র সহজেই ভারতীয় কোন দার্শনিকের বিবরণ বলে তাকে ভুল করতে পারেন। কেন এবং কি ভাবে তা সম্ভব হয়েছিল, দর্শনের ইতিহাস আজও সে রহস্যের সমাধান করতে পারে নি।

আলেকজাণ্ডারের গুরু এরিষ্টটল। তিনি আলেকজাণ্ডারকে ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের তথ্য সংগ্রহ করতে অনুরোধ করেছিলেন ইতিহাসে এ কথার উল্লেখ আছে। তাতেই মনে হয় যে, আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযানের পূর্বেই ভারতীয় তত্ত্বজ্ঞানের খ্যাতি ইউনান পর্যন্ত পৌঁচেছিল। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পরে তাঁকে নিয়ে নানা কাহিনী রচিত হয়। সে সব কাহিনী গ্রীক ভাষায় রচিত, কিন্তু প্রথমে সিরিয়ান এবং পরে সিরিয়ান থেকে আরবী ভাষায় তাদের অনুবাদ হয়। সে সমস্ত কাহিনীতে ভারতীয় দার্শনিকের সঙ্গে আলেকজাণ্ডারের সাক্ষাতের উল্লেখ আছে। ভারতীয় মনীষীর কাছে তিনি দার্শনিক সমস্যার সমাধান চাচ্ছেন এবং স্বীকার করছেন যে, ইউনানের চেয়ে ভারতবর্ষে দর্শন বেশী অগ্রসর, এ সমস্ত বর্ণনা হয়তো কাল্পনিক কিন্তু ঐতিহাসিক প্রমাণ বলে না মানলেও এ সমস্ত কাহিনীকে একেবারে অগ্রাহ্য করা যায় না। এ ধরণের কাহিনীর প্রচলন ছিল এবং লোকে আগ্রহ করে তা শুনত; এই থেকে বোঝা যায় যে, ভারতীয় দর্শনের খ্যাতি এ সব অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। বলা হয় যে খৃষ্টপূর্ব ও খৃষ্টপর প্রথম শতাব্দী এই দুই শত বৎসরের মধ্যে এ সব কাহিনী রচিত হয়েছিল।

যখন যে দেশ আলেকজাণ্ডার জয় করেছেন, সেখানেই তিনি ইউনানী উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন। ভারতবর্ষেও তার ব্যতিক্রম হয় নাই। সিন্ধু নদীর তীরে তিনি উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন একথা আমরা জানি। এ কথাও আমরা জানি যে, সন্দেহবাদী দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা পিরো (Pyrrho) তাঁর ভারতীয় অভিযাত্রী-বাহিনীর সঙ্গে এসেছিলেন। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর সেলুকস নিকেটর চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করেন এবং তাঁর রাজসভায় দূত হিসাবে মেগাস্থিনিসকে পাঠান। কাজেই দেখা যায় যে, অশোকের সিংহাসন লাভের পূর্বেই ভারতবর্ষ ও ইউনানের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। তাতেই মনে হয় যে, চিন্তার ক্ষেত্রেও তাদের মধ্যে যোগাযোগ ছিল। অশোকের যুগে এ যোগাযোগের নিশ্চিত খবর মেলে। অশোকের শিলালিপি থেকেই আমরা জানি যে অশোক ভূমধ্য সাগরের উপকূলের বিভিন্ন দেশে এবং মেসিডোনিয়ার রাজসভায় ধর্ম-প্রচারক পাঠিয়েছিলেন। দুঃখের কথা যে, এ সব প্রচারক দলের কোন পাশ্চাত্য বিবরণ আমরা পাই না।'

এই বিষয়ে যতটুকু সাক্ষ্য প্রমাণ মেলে তার ভিত্তিতে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত করা যায়। অশোকের শিলালিপিতে যে সব দেশের উল্লেখ আছে সেখানে বুদ্ধের বাণী পৌঁচেছিল এ কথা নিশ্চিত। সেকালে বৌদ্ধধর্মের সম্প্রসারণের যুগ। তাই উল্লিখিত দেশগুলি ভিন্ন অন্যত্রও যে বুদ্ধের বাণী পৌঁচেছিল এ কথা মনে করা অসংগত নয়। অশোকের পূর্বেই ভারতীয় প্রভাব ইউনানে পৌঁচেছিল এ কথাও সম্ভবতঃ সত্য। ভারতীয় চিন্তাধারা ও ইউনানের প্রাথমিক দার্শনিক মতবাদের, বিশেষ করে পিথাগোরাসের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে যে বিস্ময়কর সাদৃশ্য আছে সে কথার উল্লেখ আগেই করেছি। হয় এ সাদৃশ্য দৈবাৎ ঘটেছিল, অথবা মানতে হয় যে ভারতবর্ষ ও ইউনানের মধ্যে আদান-প্রদান থাকার ফলে এই রকম হয়েছিল। উভয়ের মধ্যে আদান-প্রদান ছিল এ কথা স্বীকার করলে ভারতীয় দর্শন যে ইউনানী চিন্তাধারাকে প্রভাবান্বিত করবে এটাই স্বাভাবিক, কারণ সে যুগে ইউনানের প্রাথমিক দর্শনের তুলনায় ভারতীয় দর্শন অনেক বেশী পরিণত ও সমৃদ্ধ ছিল। এ সমস্ত কথা ভেবে দেখলে মনে হয় যে, ভারতীয় দর্শন ইউনানী দর্শনের প্রথম বিকাশে সহায়তা করে-ছিল। অবশ্য সে প্রভাবের প্রকৃতি বা পরিমাণের কোন সঠিক ধারণা আমাদের নাই।

ভারতীয় দর্শন ইউনানী দর্শনের বিকাশে সহায়তা করেছিল কিনা, এতক্ষণ সেই বিচারই করেছি। এবার দেখা যাক যে, ভারতীয় দর্শনের উপর ইউনানী দর্শন ও বিজ্ঞানের প্রভাবের কোন নিদর্শন মেলে কিনা। সে প্রভাবের কোন বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া কঠিন, তবে একটা কথা নিশ্চিত যে খৃষ্টাব্দ চতুর্থ শতকের প্রারম্ভ থেকে ইউনানী নক্ষত্র-বিজ্ঞান ভারতীয় নক্ষত্র-বিজ্ঞানকে প্রভাবান্বিত করেছিল। তার

একটি প্রমাণ এই যে, ইউনানী কিছু পারিভাষিক শব্দ ভারতবর্ষে প্রচলিত হয়। বিখ্যাত ভারতীয় জ্যোতিষী বরাহমিহিরের মৃত্যু আনুমানিক ৫৮৭ খৃষ্টাব্দে হয়। তাঁর বৃহৎসংহিতায় ইউনানী জ্যোতিষীদের কথা তিনি লিখেছেন। আল্‌বেরুনীর বিখ্যাত ইণ্ডিকা (বা ভারতকথা) গ্রন্থে তিনি আরেকজন জ্যোতিষীর লেখা উদ্ধৃত করেছেন। তিনিও গ্রীক পণ্ডিতদের অনেক প্রশংসা করেছেন। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর পর থেকেই ভারতবর্ষ ইউনানী চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল এবং এদেশের মনীষীরা ইউনানী বিজ্ঞানের প্রভাবে এসেছিলেন, এ অনুমান অযৌক্তিক নয়। ষড় দর্শন অথবা বৌদ্ধ বা জৈন দর্শনের বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে কোনটি কতটুকু ইউনানী চিন্তাধারা প্রভাবান্বিত সে কথা ঠিক করে বলা যায় না।

এই আলোচনার ফলে বলা চলে যে, খৃষ্টপূর্ব এবং খৃষ্টপর যুগে ভারত ও ইউনানের সম্পর্কের দু'টি পর্যায় মেলে। খৃষ্টপূর্ব যুগে ভারতীয় দর্শন সম্ভবতঃ ইউনানী দর্শনকে প্রভাবান্বিত করেছিল, খৃষ্টপর যুগে ভারতীয় চিন্তাধারার কয়েকটি প্রকাশে ইউনানী চিন্তার ছায়া পড়েছিল, এ কথা মনে করারও সঙ্গত কারণ আছে।

৫

একটি কথা এবার স্পষ্ট করে বলা দরকার। দর্শনের সামগ্রিক ইতিহাস রচনার জন্য আমার যে আগ্রহ, ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজনই তার একমাত্র ভিত্তি। বিশ্ব-দর্শনের বিকাশে কোনও দেশ বা জাতির অবদান বাড়াবার বা কমাবার আমার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নাই। ভৌগোলিক সীমারেখার ভিত্তিতে আমরা মানবজাতিকে নানা সম্প্রদায়ে বিভাগ করেছি। পৃথিবীর মানচিত্রে এসিয়া, ইউরোপ এবং আফ্রিকার রঙ আলাদা, কিন্তু জ্ঞানের মানচিত্র এক এবং অবিচ্ছিন্ন, দেশ জাতি বা ধর্মের ভিত্তিতে তাকে আলাদা করা চলে না। জ্ঞান সমস্ত সীমা ও বন্ধনের বাইরে। পৃথিবীর যেখানেই তার উন্মেষ হোক না কেন, জাতিধর্মনির্বিশেষে জ্ঞানবিজ্ঞানে সর্বমানবের সমান অধিকার। উপনিষদের ঋষি ভারতীয় এবং সক্রেটিস ইউনানী এ কথা সত্য, কিন্তু মানুষের জ্ঞানভাণ্ডারে তাঁদের যে দান, তাকে ইউনানী বা ভারতীয় বলা অর্থহীন; সে জ্ঞান বিশ্বমানবের উত্তরাধিকার। ইউনানের পূর্বে ভারতবর্ষে দর্শনের বিকাশ হয়েছিল এ কথা মানলে দর্শনের ইতিহাসে ভারতবর্ষের বিবরণ প্রথম উল্লেখ করতে হবে, কিন্তু তাতে যে ভারতবর্ষের গৌরব বাড়ল অথবা ইউনানের মর্যাদা কমে গেল এমন মনে করা ভুল। বনু আমির জাতির বিষয়ে আরব কবি যে কথা বলেছেন, মানুষের জ্ঞানসাধনের বিষয়ে সে কথা সমান খাটে :

লা তকুল দারুহা বে-শরকী নজদীন
কুল্লু নজদীন লিল আমিরিয়্যতি দারু।

তার ঘর নজদের পূর্বে এ কথা বোলোনা,—
বন্ধু আমির জাতির যেখানে বাস, তার সবটাই নজদ!

৬

প্রকৃতিকে স্ববশে আনবার সাধনায় মানুষের চেষ্টা যে পরিমাণে সার্থক হয়, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের যোগসূত্র ততই নিবিড় হয়ে উঠে। ফলে বিভিন্ন সভ্যতা ও সংস্কৃতি আজ পরস্পরের এত কাছাকাছি এসেছে। নিবিড়তর সংস্পর্শের ফলে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, তাতে বিভিন্ন জাতির অবদান মানুষের সত্য-সাধনার একসূত্রে গাঁথা আজ সম্ভব। বিভিন্ন সভ্যতার অভ্যন্তরে যে বিভিন্ন দৃষ্টি কার্যকরী, ঘনিষ্ঠতর সংস্পর্শের ফলে আজ তাদের মেলানোও অপেক্ষাকৃত সহজ। বিশ্ব-দর্শনের বিকাশ আজ কেবলমাত্র জ্ঞানসাধনার দাবী নয়, মানুষের সম্মিলিত জীবনের জন্য আজ তা অপরিহার্য।

এ কথা মনে রেখে আজ তাই দর্শনের ইতিহাস নতুন করে লিখতে হবে। বিভিন্ন জাতি ও যুগের অবদানকে কেবল স্বীকার করলে চলবে না, এক সম্মিলিত বিশ্ব-দর্শনের বিকাশে তাদের যথাযথ স্থান দিতে হবে। একটি দৃষ্টান্ত দিলেই কথাটি পরিষ্কার হবে। জ্ঞান-সমস্যার সমাধানে আজ পর্যন্ত আমরা হয় ভারতীয় দার্শনিক, অথবা আরব মনীষী অথবা ইউনানী নৈয়ায়িকের মতামতের আলোচনা করেছি, কিন্তু ভারতীয়, ইউনানী এবং আরব চিন্তাধারার তুলনা ও বিচারের চেষ্টা করি নাই। ফলে দর্শনের সমস্যাকে বিশুদ্ধভাবে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে না দেখে জাতীয় বা দেশজ জিজ্ঞাসার মাপকাঠিতে তার বিচার করেছি। বিভিন্ন দেশ ও যুগের অন্তর্দৃষ্টির সমন্বয় করে আজ আমাদের দর্শনের সমস্যার সমাধান খুঁজতে হবে, তবেই প্রকৃত দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দর্শন রচনা সম্ভব।

৭

'সূচনা'র গোড়াতেই এক ইরাণী কবির কবিতা উদ্ধৃত করেছি। সেখানে কবি বলেছেন যে, সৃষ্টির আদি গ্রন্থের প্রথম ও শেষ পাতা খোওয়া গেছে। সেই হারানো পাতার সন্ধানের নাম দর্শন। আজ অন্ততঃ তিন হাজার বছর মানুষ তার সন্ধানে বেরিয়েছে, কিন্তু আজও হারানো পাতার কোন খোঁজ মেলেনি। কোনদিন যে খোঁজ মিলবে তারও বিশেষ আশা নাই। সেই সন্ধানের বিবরণ দর্শনের ইতিহাস।

এ অভিযানের ফলে গন্তব্যে আমরা পৌঁছি নাই, কিন্তু সেই যাত্রাপথে এক বিস্ময়কর সন্ধান ও জিজ্ঞাসার কাহিনী আমাদের মিলেছে।

দর্শনের তীর্থযাত্রী আজও মানসতীর্থের সন্ধান পায় নাই, কিন্তু যাত্রাপথে এক নতুন ঐশ্বর্য তার করায়ত্ত হয়েছে। দর্শনের অভিযানকে উপলক্ষ্য করে মানুষ বিজ্ঞানের আবিষ্কার করেছে। বিজ্ঞান মানুষকে নতুন ক্ষমতা দিয়েছে, কিন্তু মনে শান্তি দেয় নাই। সভ্যতা সংগঠনের উপাদান হিসাবে বিজ্ঞানের আবির্ভাব, কিন্তু আজ বিজ্ঞান মানুষের মারণাস্ত্রে রূপান্তরিত হতে বসেছে। দর্শনকে আজ তাই বিশ্বশান্তি স্থাপনার সাধনায় ব্রতী হতে হবে। যদি দর্শনের এ নতুন সাধনা সার্থক হয়, মানুষ আবার মনের শান্তি খুঁজে পায়, তবে সৃষ্টির ইতিহাসের হারানো পাতার পুনরুদ্ধার হোক আর না হোক, দর্শন মানব-সাধনার নতুন ইতিহাস রচনা করবে। ইরাণ দেশের আরেক জন কবির ভাষায় তখন দর্শনের এ কথা বলবার অধিকার হবে :

রাহ রাওঁ রা খাস্তাগি য়ে বাহ নিস্ত
ইশক হম রাহ আস্ত ও হাম খোদমনজিল আস্ত।

যারা এ পথে চলে, তারা কখনো ক্লান্তি জানে না—কারণ এ পথ একই সঙ্গে পথ ও গন্তব্য।

দ্রষ্টব্য

১। আরব লেখকগণ দুটি পৃথক ধরণের পুস্তক লিখেছেন। একটি প্রধানতঃ জীবন-বৃত্তান্ত সম্পর্কীয়; তাতে দার্শনিকদের জীবনীই মুখ্যতঃ আলোচিত হয়েছে; দার্শনিক তত্ত্ব সেখানে গৌণ। দ্বিতীয় শ্রেণীর পুস্তকে দার্শনিক তত্ত্ব সমূহই প্রাধান্যলাভ করেছে, দার্শনিকগণের জীবনবৃত্তান্ত প্রসঙ্গতঃ আলোচনা করা হয়েছে মাত্র। প্রথমশ্রেণীর পুস্তককে বলা হয়েছে "তারিখ-উল-হুকাম", অথবা "তারিখ-উল-ফলাসফ" ("দার্শনিকদের ইতিহাস"); দ্বিতীয় শ্রেণীর পুস্তকের নাম "কিতাব-উল-মিললে-ওয়ন-নহাল" (ধর্মীয় ও দার্শনিক সম্প্রদায়ের পুস্তক) অথবা "অল-আরা-ওয়াল-মলকালাত্" (মতামত ও আলোচনা)। অন্যান্য কতকগুলি পুস্তকে দর্শনের বিশেষ বিশেষ যুগ নিয়ে আলোচনাও করা হয়েছে। উদাহরণতঃ, অলফারাবী (জন্ম ৯২৫ খৃঃ) অ্যারিস্টটলের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী যুগ সম্বন্ধে একখানি পুস্তক লিখেছেন। এই আলোচনাকে আমরা বোধহয় ধারাবাহিক দর্শনের ইতিহাস প্রণয়নের প্রথম প্রচেষ্টা বলতে পারি।

২। এরদমান্, জে, ই, "হিস্ট্রি অব্ ফিলজফি" পৃঃ ৯

৩। থিলি, ফ্রাঙ্ক, "হিস্ট্রি অব্ ফিলজফি" পৃঃ ৩

৪। এরদম্যান্, জে, ই, "হিস্ট্রি অব্ ফিলজফি" পৃঃ ১৩

বেলার, ই, "আউটলাইন অব্ দি হিস্ট্রি অব্ গ্রীক ফিলজফি" পৃঃ ২

৫। বেলার, ই, "আউটলাইন অব্ দি হিস্ট্রি অব্ গ্রীক ফিলজফি" পৃঃ ২

৬। বেলার, ই, "আউটলাইন অব্ দি হিস্ট্রি অব্ গ্রীক ফিলজফি" পৃঃ ১৬

৭। তুলনীয়—

নিম্নলিখিত অশোকের শিলালিপি বেভানের "হাউস অফ সেলিউকাস"-এর প্রথম খণ্ডের ২৯৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হয়েছে—

"এবং আইনের দ্বারা জয়ই মহামান্য সম্রাটের মতে প্রধানতম জয়। মহামান্য সম্রাট এই মতবাদ তাঁর নিজের সাম্রাজ্য ও প্রতিবেশী রাজ্য সমূহেও কার্যকরী করেন। প্রায় ছয় শত সত্তররাজ্য এমন কি যেখানে গ্রীক রাজা আন্টিয়োকাস বাস করেন এবং আন্টিয়োকাস ছাড়াও টোলেমি, আন্টিগোনাস, মগস্ ও আলেকজাণ্ডার এই চারজন রাজা সেখানে বাস করেন এবং একই ভাবে সম্রাটের নিজের রাজ্যে "যূণ" দিগের (অর্থাৎ পাঞ্জাবের গ্রীকগণ) মধ্যেও কার্যকরী করেন।

প্রথম খণ্ড

ভারতীয় চিন্তাধারার ভিত্তি

*

ভারতীয় চিন্তাধারায় প্রাক্-বৈদিক উপাদান

লেখক : সি. কুহ্নন রাজা বি. এ, ডি. ফিল্ (অক্সফোর্ড)
সংস্কৃত-সাহিত্যের অধ্যাপক, মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাজ

বেদ

লেখক : তারাপদ চৌধুরী এম. এ, বি. এল, পি এচ্. ডি (লণ্ডন)
সংস্কৃত-সাহিত্যের অধ্যাপক, পাটনা কলেজ, বিহার

উপনিষদ্

লেখক : টি. এম. পি মহাদেবন এম. এ, পি এচ্. ডি
দর্শন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক, মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাজ

মহাকাব্য

রামায়ণ

লেখক : তারাপদ চৌধুরী

মহাভারত

লেখক : সুশীলকুমার দে এম. এ (কলিকাতা) ডি. লিট্ (লণ্ডন)
সংস্কৃত সাহিত্যের ভূতপূর্ব অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মনু ও কৌটিল্য

(সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারা)

লেখক : কে. এ. নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী এম. এ
ভারতীয় ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের ভূতপূর্ব অধ্যাপক, মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়

বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতপুরাণ

(প্রাচীন ইতিবৃত্ত ও ভক্তিমূলক চিন্তাধারা)

লেখক : এ. কে. বন্দ্যোপাধ্যায়
অধ্যক্ষ মহারাজ প্রতাপ ডিগ্রী কলেজ, গোরক্ষপুর

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভারতীয় চিন্তাধারায় প্রাক্-বৈদিক উপাদান

ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার বিকাশে দুইটি প্রধান ধারা দেখিতে পাওয়া যায়—একটি বৈদিক এবং অপরটি অবৈদিক। অবশ্য এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে মধ্যযুগের আরম্ভ হইতে বেদকেই ভারতীয় চিন্তার একমাত্র উৎস মনে করা হইয়াছে, কিন্তু বেদ শব্দটিকে অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যাখ্যা করিয়াই এরূপ মনে করা সম্ভবপর হইয়াছে। যেমন আগমশাস্ত্র এবং আয়ুর্বেদ ও সংগীতবিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞান ও শিল্পকলাগুলিকেও বেদের অঙ্গ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছিল, যদিও বেদের কোন প্রচলিত অংশেই এই সকলের সূচনা দেখানো সম্ভব নয়।

হিন্দু চিন্তাধারা এক সুপ্রাচীন দ্রাবিড় সভ্যতার সঙ্গে আর্য বা বৈদিক উপাদানের সংমিশ্রণের পরিণাম, না, পূর্ববর্তী আর্য বা বৈদিক সভ্যতার সহিত দ্রাবিড় সভ্যতা বা উপাদানের সংমিশ্রণের পরিণাম— এই বিষয়ে সুনিশ্চিতভাবে কিছুই বলা যায় না। সুনিশ্চিতভাবে মাত্র ইহাই বলা যায় যে হিন্দু চিন্তাধারা বলিয়া যাহা পরিচিত তাহা শুধু আর্য বা বৈদিক সভ্যতার সরল বিকাশ নয়। আর্য বা বৈদিক ব্যতীত অপর যে উপাদানটি এই চিন্তাধারার বিকাশে সাহায্য করিয়াছিল তাহাকেই বর্তমান প্রবন্ধে দ্রাবিড় বলিয়া অভিহিত করা হইবে। হিন্দু চিন্তাধারার অবৈদিক উপাদানগুলির মধ্যে দ্রাবিড় উপাদানটিই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, সুতরাং অপরাপর অবৈদিক উপাদানগুলির দিকে দৃষ্টি না দিলেও চলিতে পারে।

দ্রাবিড় শব্দটির সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন। বিশিষ্ট কয়েকটি ভাষাকে অথবা বিশিষ্ট এক গোষ্ঠীর লোককে অথবা বিশিষ্ট একটি সভ্যতাকে বুঝাইতে এই শব্দটির ব্যবহার করা হয়। আর্য ভাষাগুলির সঙ্গে মিশ্রিত হইলেও দ্রাবিড় ভাষাগুলি তাহাদের নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে সক্ষম হইয়াছে। ভারতবর্ষে জাতিগত সংমিশ্রণ এত বেশী হইয়াছে যে বর্তমানে দ্রাবিড় জাতির মানুষ কাহারা, সেকথা সঠিকভাবে বলা অসম্ভব। তেমনই আর্য বা বৈদিক সভ্যতা হইতে স্বতন্ত্রভাবে দ্রাবিড় সভ্যতার পূর্ণ সংজ্ঞা দেওয়াও সম্ভব নয়। ভাষাগত এবং জাতিগত পর্যবেক্ষণের ফলে এইকথা আজ সুস্পষ্ট যে, উত্তর ভারতকে সম্পূর্ণ আর্য এবং দক্ষিণভারতকে সম্পূর্ণ দ্রাবিড় মনে করা ভুল। ভাষার দিক হইতে অবশ্য এই বিভাগে অত্যধিক ভুল হয় না, যদিও উত্তর

ভারতে প্রচলিত কয়েকটি অপ্রধান ভাষায় স্পষ্টতঃই দ্রাবিড় প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ভারতীয় চিন্তাধারার যে অঙ্গগুলিকে বৈদিক-সাহিত্যের কোন অংশের প্রত্যক্ষ ও স্বাভাবিক বিকাশ বলিয়া বেদে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, আমাদের পক্ষে শুধু সেই-গুলিকেই ব্যাপকঅর্থে দ্রাবিড়ীয় বলিয়া গ্রহণ করা সম্ভব।

ভারতীয় চিন্তাধারার বিবর্তনে অরণ্যের ভূমিকা যথাযোগ্যভাবেই স্বীকৃতিলাভ করিয়াছে। ঋষিদের আশ্রমগুলি নিশ্চয়ই ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার বিকাশের কেন্দ্র। কিন্তু উপনিষদের যুগ হইতেই এইরূপ হইয়াছিল, উপনিষদ্-পূর্ব বেদগুলিতে অরণ্যের কোন ভূমিকাই নাই। ঋগ্বেদের ঋষিরা গৃহী ছিলেন। তাঁহারা নগরে ও গ্রামে বাস করিতেন, ধ্যান করিবার জন্য অরণ্যবাসী হইতেন না। ব্রাহ্মণ্য সভ্যতাতেও (বেদের ব্রাহ্মণাংশের সভ্যতা) অরণ্যের কোন ভূমিকা নাই। অবশ্য, তৈত্তিরীয়-আরণ্যকে গ্রাম ও গৃহ ব্যতীত স্থানান্তরেও স্বাধ্যায় করিতে হইবে এইরূপ উল্লেখ আছে, এবং সেইস্থানের বর্ণনা দিতে গিয়া বলা হইয়াছে যে, তাহা অ-চ্ছদি-দর্শ—অর্থাৎ তাহা এমন একটি স্থান যেখান হইতে গৃহসমূহের ছাদ (ছদি) দেখা (দর্শ) যায় না। পরবর্তী বৈদিক-সাহিত্যে হিন্দু জীবনযাপনের প্রসঙ্গে স্বাধ্যায়কে স্পষ্টই দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে,—গ্রাম্য, অর্থাৎ যাহা গ্রামে হইতে পারিত এবং আরণ্য, অর্থাৎ যাহা অরণ্যেই হওয়া উচিত।

বৈদিক দেবতারা আরণ্যক দেবতা নন। তাঁহারা অশ্বচালিত রথে আরোহণ করিয়া আসিতেন এবং উঁহাদের প্রসঙ্গে মৃগয়ার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু হিন্দুধর্মের অবৈদিক দেবতাগুলির সঙ্গে অরণ্য এবং মৃগয়ার সম্পর্ক দেখা যায়। হিন্দুধর্মের প্রায় সমস্ত শৈব দেবতাই অবৈদিক এবং তাঁহাদের দ্রাবিড়ীয় বলিয়া মনে করা হয়। এই দিক্ হইতে দুইটি দেবতার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কালী বা দুর্গা এবং আয়াস্পান (শেষোক্তটি দ্রাবিড়ীয় দেবতা। ইনি সমুদ্রমন্থনের পর শিবের ঔরসে অমৃত পরিবেশনকারিণী মায়া-রূপী বিষ্ণুর গর্ভজাত)। দক্ষিণ ভারতের কোন কোন অঞ্চলে এই দুইটি দেবতার মন্দির 'কাবু' নামে অভিহিত। 'কাবু' শব্দটির অর্থ অরণ্য বা কুঞ্জ। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, অরণ্যে এবং কুঞ্জেই এই দুইটি দেবতার পূজা করা হইত। সর্প-দেবতার বিগ্রহ যে সকল স্থানে প্রতিষ্ঠিত এবং পূজিত হয়, সেই স্থানগুলিকেও ঐ একই শব্দে অভিহিত করা হয়।

এই দেশের চিন্তাধারার বিকাশের পথে অবৈদিক উপাদানটি শুধুই যে নূতন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছিল তাহাই নয়, ইহা সত্যের সমস্যা সমাধানের প্রণালীতেও পরিবর্তন ঘটাইয়াছিল। বৈদিক সভ্যতা প্রধানতঃ ক্রিয়া-কলাপের উপর

প্রতিষ্ঠিত ছিল। যজ্ঞে সোম আহুতি দেওয়াই বৈদিক আর্যদের ধর্মজীবনের সর্বপ্রধান অনুষ্ঠান ছিল। বেদসমূহ এইরূপ আচারানুষ্ঠানের সহিত খুব ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ। বেদে যজ্ঞই প্রধান, চিন্তা বা তত্ত্ববিচার উহার অঙ্গমাত্র এবং উহার স্থান গৌণ। অবশ্য, ঋগ্বেদের কবিদের মধ্যে দেবতাদের সহিত সাযুজ্যের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, এমন কি বেদে তত্ত্ববিচার এবং দার্শনিক চিন্তারও অভাব নাই। কিন্তু যেখানে লোকে অনুষ্ঠানে এত ব্যাপৃত থাকে, সেখানে তত্ত্ববিচারের অথবা সূক্ষ্মচিন্তার বিকাশের অবকাশ নাই। সূক্ষ্মচিন্তার বিকাশের জন্য অনুধ্যান এবং নিবিষ্টচিত্ততা একান্ত প্রয়োজন, কিন্তু যজ্ঞানুষ্ঠান ইহার বিশেষ অনুকূল নয়। দৈবশক্তির অধিকতর মূর্ত আকারে উপাসনা করিলে ঈশ্বর ও বিশ্বজগৎ এবং ইহাদের পারম্পরিক সম্পর্কের বিষয়ে উচ্চতর চিন্তার প্রসার ঘটিতে পারে। দৈবশক্তির কোন প্রতীক অথবা কোন বিগ্রহ যেখানে প্রতিষ্ঠিত আছে, এমন কোন মন্দিরেই এই ধরনের উপাসনা হইতে পারে। সার্বজনীন অনুষ্ঠানরূপে যজ্ঞাদি বৎসরের কেবলমাত্র কয়েকটি নির্দিষ্ট মাসেই করা হইয়া থাকে, যদিও গৃহে অনুষ্ঠিত যজ্ঞ একটি দৈনন্দিন ব্যাপার। অপরপক্ষে, মন্দিরে দৈবশক্তির উপাসনা একটি স্থায়ী ও নিয়মিত অনুষ্ঠান। এই ক্ষেত্রে শুধুই যে জনকয়েক অতীন্দ্রিয়শক্তিসম্পন্ন কবির দৈবশক্তির সহিত সাযুজ্য ঘটে তাহাই নহে, অন্যেরাও ভগবৎশক্তির মূর্তরূপ দর্শন করিতে পারে। যজ্ঞানুষ্ঠানে ইহা সম্ভবপর নয়; কারণ সেখানে শুধু অগ্নি ছাড়া আর কিছুই দৃশ্যমান নয় এবং সেখানে তাহারা নিজেরা উপাসনার কার্যকলাপে যোগদান করিতে পারে না। মন্দিরে উপাসনা করিতে হইলে নিত্যপূজার ব্যবস্থা করিতে হয়, সকলকে একত্রে মিলিত হইতে হয় এবং মূর্ত বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করিতে হয়— এইগুলিই মননশীল চিন্তাধারার বিকাশের পক্ষে অনেক বেশী অনুকূল।

উপনিষদ্‌গুলিতে বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠান এবং অরণ্যে দৈবশক্তির উপাসনা, এই দুইটিরই সংমিশ্রণ দেখা যায়। যদিও আচার অনুষ্ঠান বর্জন করা হয় নাই, তথাপি অরণ্যে অগ্নিযজ্ঞে ক্রমশঃ ক্রমশঃ অনুধ্যানের দিকটাই প্রধান হইয়া উঠিয়াছিল।

আরণ্যক প্রতিষ্ঠান হিসাবেই মন্দিরগুলির সূত্রপাত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ নিজ নিজ গৃহে, গ্রামে এবং নগরে উপাসনা করিবার যে ধারাটি বৈদিক উপাসনাপদ্ধতির বৈশিষ্ট্য তাহার সহিত মন্দিরে উপাসনার সংযোগের ফলেই গ্রামে এবং নগরে মন্দির-গুলি গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইহার ফলেই গৃহে গৃহে দেবারাধনার জন্য মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এমন বহু মন্দির আছে যেখানে বিগ্রহগুলি স্বয়ং-প্রতিষ্ঠিত বলিয়া স্বীকৃত। এই বিগ্রহগুলি "স্বয়স্তু" নামে পরিচিত। এখন পর্যন্ত এমন মন্দিরও আছে

যেখানে বিগ্রহকে বৃষ্টির মধ্যে অনাচ্ছাদিত অবস্থায় রাখা হয়। মন্দির হয়ত একটা আছে, কিন্তু বিগ্রহের ঠিক উপরে কোন ছাদ নির্মাণ করা হয় না। মন্দির এবং বিগ্রহ উপাসনার সঙ্গে অরণ্যের যে মৌলিক সম্পর্ক ছিল, এই সকলই তাহার নিদর্শন। উপাসনার অনুষ্ঠান কালক্রমে নগর হইতে ধ্যানধারণার পক্ষে বিশেষ অনুকূল অরণ্যে স্থানান্তরিত হইল, তাহা ছাড়া যজ্ঞানুষ্ঠানের পরিবর্তে মন্দিরে মূর্ত বিগ্রহের উপাসনা প্রচলিত হইল— উভয় পরিবর্তনই অবৈদিক সভ্যতার ফল। ইহাদের দ্বারা দর্শনের বিকাশ বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিল।

বেদে বিশ্বের ঐক্যের ধারণা দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু দার্শনিক চিন্তার বিকাশের পক্ষে যাহা সর্বাগ্রে প্রয়োজন তাহার কোন অস্তিত্ব দেখা যায় না। হিন্দু-ধর্মের দুইটি প্রধান অবৈদিক উপাদানের প্রভাবে এই বিশ্বের ঐক্যস্বীকৃতি সম্ভবপর হইয়াছিল। বেদেও এই দুইটি উপাদানের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু পরবর্তীকালেই এইগুলির ব্যাখ্যা এবং সুসংবদ্ধ বিবরণ দেওয়া হইয়াছিল। উহাদের মধ্যে প্রথম উপাদানটি দেবতাগণের মধ্যে স্ত্রী-দেবতার আবির্ভাব। দৈবশক্তিকে পুরুষরূপে উপাসনা করাই বৈদিকধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য। বেদে দেবীর সংখ্যা খুবই কম, যে অল্প কয়েকটি দেবীর উল্লেখ সেখানে আছে তাঁহাদের গুরুত্ব তেমন বেশী নয়।

সম্ভবতঃ পৃথিবীর সঙ্গে অভিন্নরূপে কল্পিতা অদিতি-ই একমাত্র দেবী, যাঁহার বৈদিক দেবতাদের মধ্যে উচ্চ স্থান আছে ; কারণ তিনি দেবগণের মাতা। কিন্তু বৈদিক যুগে অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতাদের ন্যায় অদিতি পূজিত হইতেন না। বৈদিক দেব-দেবীদের মধ্যে সরস্বতীর স্থান খুবই নগণ্য। বেদে ইন্দ্রাণীর উল্লেখও কেবলমাত্র প্রসঙ্গক্রমেই করা হইয়াছে। হিন্দুধর্মে মাতৃ-দেবতার আবির্ভাব পরবর্তী যুগেই লক্ষ্য করা যায় এবং ইহার কারণ হিসাবে অবৈদিক দেব-দেবীগণের প্রভাবই ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। সেইজন্য কালক্রমে আমরা দেবীকেই বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি হিসাবে দেখিতে পাই, দেবী-ই সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতার সৃজনীশক্তি, এবং শেষ পর্যন্ত প্রায় প্রত্যেকটি প্রধান দেবতার সঙ্গেই সংযুক্ত এক একটি দেবীকেও আমরা দেখিতে পাই। এই ভাবে আমরা শ্রী (ধনসম্পদ এবং ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী) এবং ভূমি (পৃথিবীকে) বিষ্ণুর পত্নীরূপে, পার্বতীকে শিবের পত্নীরূপে এবং সরস্বতীকে ব্রহ্মার পত্নীরূপে দেখি। সুতরাং দৈবশক্তির ত্রিমূর্তির একটি শক্তি বা নারীরূপও ছিল।

কালিদাসের রচনাবলী হইতে আমরা জানিতে পারি যে, তৎকালীন ধর্মে ব্রহ্মা উচ্চস্থানে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বৈদিক এই দেবতাটি যে প্রধান দেবতারূপে স্থায়ী আসন লাভ করিতে পারেন নাই—এই ঘটনা হইতে ভারতীয় ধর্মজীবনে অবৈদিক ধারার

প্রভাব বেশ বুঝা যায়। যদিও পুরুষ দেবতাদের মধ্যে বিষ্ণু ও শিব উভয়েই শ্রেষ্ঠ মর্যাদা পাইয়া আসিয়াছেন, তথাপি স্ত্রী-দেবতাদের মধ্যে শিবের পত্নীই প্রাধান্যলাভ করিয়াছিলেন। হিন্দুধর্মে পরবর্তীকালে যে দেবী একটি স্বতন্ত্র স্থান অধিকার করিয়াছিলেন পার্বতী, কালী এবং দুর্গা তাঁহারই বিভিন্ন রূপ। এমন অনেক ধর্মসম্প্রদায় আছে যাহাদের নিকট মাতৃ-দেবতাই সর্বোচ্চ ভগবৎ-শক্তি এবং শিব কেবলমাত্র এই দেবীরই পতিরূপে পূজিত হন। শিবকে অর্ধ-নারীশ্বর রূপেও পূজা করা হইয়া থাকে। এই সর্বশ্রেষ্ঠ দেবী ছাড়াও মহাবিদ্যা, যোগিনী প্রভৃতি তাঁহার সঙ্গিনীও রহিয়াছেন। ইহা এবং অন্যান্য তথ্য হইতে দৈবশক্তির নারীরূপকে যে কত উচ্চস্থান দেওয়া হইয়াছিল তাহা বুঝিতে পারা যায়।

পুরাণগুলির ঈশ্বরবাদী সাংখ্যমতানুসারে বিশ্বজগতের উৎস এমন একটি দৈবশক্তি যাহা পুরুষ এবং প্রকৃতি এই দুইটি সত্তায় রূপান্তরিত হইয়াছে। পুরুষ এবং প্রকৃতির পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলেই এই জগতের সৃষ্টি ও স্থিতি। সাংখ্যদর্শনের এই তত্ত্বই উপনিষদের দার্শনিক চিন্তাধারার একটি প্রধান ভিত্তি। বেদে যাঁহাদিগকে পিতা ও মাতারূপে বর্ণনা করা হইয়াছে, সেই দ্যৌঃ এবং পৃথিবী এবং অদিতির ধারণা হইতে এই মতবাদের উন্মেষ সম্ভবপর হইতে পারে কি না তাহা সন্দেহের বিষয়। যাহাতে স্ত্রী-দেবতাদের যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে অবৈদিক এমন কোন চিন্তাধারার প্রভাব ব্যতীত উক্ত মতবাদের উদ্ভব হইতে পারে না বলিয়াই মনে হয়।

ভারতীয় চিন্তাধারায় পশু, পক্ষী, বৃক্ষ প্রভৃতিকে যে উচ্চস্থান দেওয়া হইয়াছে তাহার মূলেও অবৈদিক ধর্মগুলির প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। বেদে পশু এবং বৃক্ষের বিশেষ কোন গুরুত্ব নাই। নগরসভ্যতায় ইহাই স্বাভাবিক। অরণ্যে যে সভ্যতার বিকাশ একমাত্র তাহাতেই পশু এবং বৃক্ষের উচ্চ মর্যাদা থাকা সম্ভব। অবশ্য বেদে আমরা দেবতাদের রথবাহী অশ্ব এবং দুগ্ধদাত্রী গাভীর উল্লেখ দেখিতে পাই। বেদে অন্যান্য আরও অনেক পশুপক্ষী এমন কি মৎস্যেরও উল্লেখ আছে ; সোম এবং সোমরস এবং যজ্ঞস্থানে প্রোথিত কাষ্ঠখণ্ডেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু বেদে এই সমস্ত পশু, পক্ষী, বৃক্ষ এবং লতাপাতার উল্লেখ থাকিলেও ইহারা মোটেই তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়, ইহাদের উল্লেখ নিতান্তই প্রসঙ্গতঃ করা হইয়াছে।

কিন্তু পরবর্তীকালে হিন্দু-চিন্তাধারা পৃথক্ আকার ধারণ করিয়াছে। হিন্দু-জীবনে গো-উপাসনা একটি প্রধান অনুষ্ঠান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু বেদে এই ব্যাপারটির কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। পরবর্তী-হিন্দুধর্মে অন্যান্য আরও অনেক পশুপক্ষীকে বিভিন্ন দেবদেবীর বাহনরূপে, এবং তাঁহাদের ধ্বজা-চিহ্নরূপে দেখিতে

পাওয়া যায়। যেমন শিবের বাহন বৃষ, এবং বিষ্ণুর বাহন গরুড় (দ্রাবিড় "কাঝুগন" অর্থাৎ শকুনি এই শব্দটিরই সংস্কৃত রূপ 'গরুড়'), ব্রহ্মার বাহন হংস। তাহা ছাড়া, পৃথিবীর ভারবাহী শেষ বা অনন্তনাগের কুণ্ডলীকৃত দেহের উপর বিষ্ণু শায়িত আছেন এবং সর্প বাসুকী শিবের অলঙ্কাররূপে শোভা পান। হস্তী, সিংহ, ব্যাঘ্র, মহিষ প্রভৃতি নানা পশুকেও আমরা ক্রমশঃ বিভিন্ন দেবদেবীর সঙ্গে যুক্ত হইতে দেখি। দেবদেবীর পূজার সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের বাহনগুলিও পূজার পাত্র হইয়া উঠিল। বেদ-পরবর্তী যুগে হিন্দুরা বৃক্ষকে বিশেষতঃ বটবৃক্ষকে পূজা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। অন্যান্য নানা বৃক্ষ এবং লতাপাতাও ক্রমশঃ বিভিন্ন শক্তির সহিত যুক্ত হইয়াছিল। এইভাবে দৈব-শক্তির প্রকাশের ক্ষেত্র বৃহত্তর হইয়া উঠিল এবং কালক্রমে নদী এবং সমুদ্রকূলে পুণ্য-স্থান অর্থাৎ তীর্থসমূহের উদ্ভব হইল। দৈবশক্তি শুধু যে মন্দিরেই আছেন তাহা নয়, এই পৃথিবীর কোন কোন বিশিষ্ট স্থানেও আছেন এবং এই সকল স্থানের সংস্পর্শে আসিলে মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়—তীর্থবাদের পশ্চাতে এইরূপ বিশ্বাস বর্তমান।

মানুষকে দেবতার পর্যায়ে উন্নীত করা বেদ-পরবর্তী ধর্মের আর একটি বৈশিষ্ট্য। মহাপুরুষদের সম্বন্ধে কল্পনা করা হইয়াছে যে, তাঁহারা আসলে দেবতা এবং মানব-জাতিকে রক্ষা করিবার জন্য পৃথিবীতে নররূপে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহাদের জন্যও মন্দির নির্মিত হইয়াছিল এবং ইঁহারা এই সব মন্দিরে দেবতারূপে পূজিত হইতেন। ইহার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ রাজপুতানার কর্ণীজী দেবী। ইঁহার পূজা আধুনিক কাল পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। অবশ্য বেদেও মরুৎ এবং ঋভুদের ন্যায় কোন কোন মানুষকে দেবতার পর্যায়ে উন্নীত হইতে দেখা যায়, আবার অঙ্গিরসের ন্যায় কোন কোন মানুষকে দৈবশক্তিসম্পন্ন এবং দৈবশক্তির ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইতে দেখা যায়। কিন্তু মানুষ হিসাবে মর্ত্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এমন কোন দেবতার উল্লেখ বেদে পাওয়া যায় না। বেদ-পরবর্তী হিন্দুধর্মে ঈশ্বর পশুরূপও ধারণ করিয়াছেন দেখা যায়—যেমন কপি-দেবতা হনুমান্ এবং হস্তী-মানব দেবতা গণেশ। শিবের অনুচর নন্দীর বৃষ-রূপ আর স্কন্দ বা সুব্রহ্মণ্যের সর্পরূপ। বিষ্ণুর সঙ্গে জড়িত যে অবতারবাদের সৃষ্টি হইয়াছে তাহাও অনেক পরের যুগের। বিষ্ণুর অবতাররূপগুলির মধ্যে মাত্র একটিকেই বেদে খুঁজিয়া পাওয়া যায়, এবং তাহা হইল সেই বামনদেবের যিনি তিনটি পদক্ষেপে সমগ্র বিশ্ব পরিমাপ করিয়াছিলেন। বেদে যে 'বরাহ' শব্দটির উল্লেখ আছে তাহাকে অনেক টীকাকার বরাহ অবতারের উল্লেখ বলিয়াই ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এইরূপ ব্যাখ্যার কোন ভিত্তি নাই। বিষ্ণুর অন্যান্য অবতারগুলি অবৈদিক।

বেদের দেবতাদের ব্যক্তিত্ব খুবই কম এবং তাঁহারা স্পষ্ট আকারও ধারণ করেন নাই। কিন্তু পরবর্তী হিন্দু-চিন্তাধারায় ঈশ্বরের ধারণার আমূল পরিবর্তন হইয়াছে। ইহার আকার আরও স্পষ্ট হইয়াছে এবং বিভিন্ন দেবতার ভিন্ন ভিন্ন শক্তি ও কার্যাবলী নির্দিষ্ট হইয়াছে। জগৎসৃষ্টির কর্তৃত্ব ব্রহ্মার উপর অর্পিত হইয়াছে, কিন্তু জগৎস্রষ্টার ধারণাটি অস্পষ্ট এবং সূক্ষ্ম বলিয়া ধর্মে ইহার মাহাত্ম্য কমিয়া আসিল। অবশ্য পৌরাণিক কাহিনীতে ব্রহ্মার স্থান রহিয়া গেল। পক্ষান্তরে শিব এবং বিষ্ণুর ধারণা ক্রমশঃ স্পষ্ট, মূর্ত এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হওয়ার ফলে হিন্দু-চিন্তাধারায় ইঁহারা সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিলেন।

শ্রী ও ভূমি—এই দুই পত্নীসহ শেষনাগের কুণ্ডলীকৃত দেহে শয়ান জগৎপালক বিষ্ণুর যে বিগ্রহ আমরা দেখিতে পাই, তাহা বেদবর্ণিত ঈশ্বরের কোন ধারণা হইতেই উদ্ভূত হইতে পারে না। পত্নী পার্বতী এবং পুত্র অনুচরগণসহ কৈলাসপর্বতে অবস্থিত যে শিব উন্নততর জগৎসৃষ্টির জন্য জগতের সংহারকার্যে নিযুক্ত, তাঁহার সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। গণেশ, স্কন্দ এবং অন্যান্য আরও অনেক দেবতাও ক্রমশঃ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং ভিন্ন ভিন্ন নির্দিষ্ট কার্যের অধিকারী হইলেন।

দেবতাদের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে লোকের ধারণা যতই বাড়িতে লাগিল ততই হিন্দুধর্মে ভক্তিবাদের বিকাশ হইল। বেদেও, বিশেষতঃ বরুণের স্তোত্রগুলিতে, ভক্তির কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু যে দেবতারা অশরীরী ও সূক্ষ্ম, এবং এমন কি বিগ্রহরূপেও যাঁহারা দৃশ্যমান নহেন, সেই বৈদিক দেবতাদের সম্বন্ধে প্রকৃত ভক্তি কি করিয়া সম্ভবপর হইতে পারে? বৈদিক যজ্ঞোপাসনা গৃহ বা গ্রামের অনুষ্ঠানমাত্র ছিল এবং মন্দিরে উপাসনা-পদ্ধতিই জাতীয় বা সার্বজনীন অনুষ্ঠানরূপে গড়িয়া উঠিয়াছিল। বৈদিকযুগের ঋষিরা দেবতাদের সহিত সাক্ষাৎ সঙ্গলাভের অধিকারী ছিলেন, কিন্তু এখন তাঁহাদের পরিবর্তে, দেবতাদের নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন এমন অনেক পরমভক্তের আবির্ভাব হইল।

হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বৈদিক-সাহিত্য হইতে পৃথক্ একটি নূতন সাহিত্য গড়িয়া উঠিল। ইহাই মন্দির-উপাসনা সম্পর্কিত আগম-শাস্ত্র। তামিল ভাষায় শৈবসম্প্রদায়ের এক বিরাট সাহিত্য আছে। তামিলের প্রাচীনতম ধর্ম-সাহিত্য হইতেছে 'আলোয়ার' বলিয়া খ্যাত সন্তদের ভক্তিমূলক সঙ্গীতসমূহ। এই সমস্ত ভক্তিমূলক সঙ্গীত একত্র সঙ্কলিত হইয়া 'তিরু-মুরাই' নামে পরিচিত। 'নাল্-আডিয়ার', 'তিরু-বাচকম্' 'তেবারম্' প্রভৃতি রচনাগুলি দক্ষিণ ভারতে সমধিক প্রসিদ্ধ। বৈষ্ণবমতাবলম্বীদেরও 'দিব্য-প্রবন্ধ' নামে পরিচিত অনুরূপ সাহিত্য আছে। খৃষ্টযুগের প্রথম কয়েক শতকের মধ্যে রচিত

এই সব রচনা এবং 'মণিমেখলাই' প্রভৃতি মহাকাব্যে যথেষ্ট দার্শনিক বিচার এবং বৌদ্ধ ও জৈন মতের খণ্ডন আছে। এই সকল সন্তরা দেশের রাজাদিগকে বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম হইতে পুনরায় হিন্দুধর্মে আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু এই রাজারা যে হিন্দুধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন তাহা যে বৈদিক হিন্দুধর্ম একথা বলা যায় না।

বেদের অনুষ্ঠান-পদ্ধতি এবং দার্শনিক চিন্তাধারার ব্যাখ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত যথাক্রমে ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ্‌-সাহিত্যের যুগ হইতে কুমারিল ভট্ট এবং শঙ্করাচার্যের যুগ পর্যন্ত একটা সুদীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হইয়াছে। এই দুই হাজার বছরে একদিকে যেমন মীমাংসা এবং বেদান্তের সূত্রসমূহ রচিত হইয়াছে, অন্যদিকে তেমনই সংস্কৃত ভাষায় মহাভারতের অঙ্গহিসাবে ভগবদ্গীতাসহ মহাকাব্যগুলি এবং তামিলভাষায় একটি বিরাট উপাসনা-সাহিত্যেরও সৃষ্টি হইয়াছে। এই সাহিত্যগুলি বৈদিকধর্মের পুনরুজ্জীবনের পথ প্রশস্ত করিয়াছিল, কিন্তু এই সঙ্গে ইহাও দ্রষ্টব্য যে অবৈদিক বিরাট সাহিত্য রচিত হইয়াছিল। তাহা ছাড়া শৈব-সিদ্ধান্ত প্রভৃতি সম্প্রদায়গুলি এবং বৈষ্ণবধর্মের কোন কোন সম্প্রদায় তাঁহাদের মূল গ্রন্থগুলিকে বেদের অঙ্গরূপে গণনা না করিয়া স্বতন্ত্ররূপেই প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। বৈদিকধর্মের এই পুনরুজ্জীবন প্রায় সম্পূর্ণভাবেই চারিটি প্রধান দ্রাবিড় ভাষাভাষী ব্যক্তিদের দ্বারাই ঘটিয়াছিল ইহা লক্ষ করিবার বিষয়। কুমারিল ভট্ট ছিলেন অন্ধ্র দেশের লোক, শঙ্করাচার্য কেরালায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, রামানুজাচার্য তামিলদেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এবং মাধবাচার্যের জন্মভূমি ছিল কর্ণাটক দেশ। ইহা অবশ্য সত্য যে যাঁহারা ধর্মের এই সংস্কার করিয়াছিলেন তাঁহারা বৈদিকধর্মের নামেই ইহা করিয়াছিলেন, মন্দির-উপাসনারূপ কোন নূতন ধর্মের নামে করেন নাই। শেষোক্ত ধর্মমত সংক্রান্ত যাবতীয় মূল সাহিত্য বেদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিত এবং ইহার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হইয়া যে নূতন ধর্ম-সাহিত্য গড়িয়া উঠিল, তাহা বেদেরই অঙ্গ বলিয়া বেদে স্থান পাইল। শঙ্করের অদ্বৈতবাদ উপনিষদের উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার ঈশ্বরতত্ত্ব নিশ্চয়ই বৈদিক নহে। রামানুজ এবং মাধবের দর্শনের মূলসূত্রগুলিই শুধু বেদ হইতে গৃহীত হইয়াছিল, কিন্তু উহাদের ব্যাখ্যা পরবর্তীযুগের মন্দির-উপাসনার ধর্ম এবং আগমশাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত।

বেদের বিষ্ণুর সঙ্গে পরবর্তীকালের হিন্দুধর্মের 'ত্রি-বিক্রম' বিষ্ণুর শুধু নামেই মিল আছে। বেদের রুদ্রের সঙ্গে তেমনই পরবর্তী হিন্দুধর্মের শিবেরও খুব কম মিল আছে। শুধু শিবের অপর একটি নাম হিসাবেই রুদ্র শব্দটি প্রচলিত ছিল। কালক্রমে

হিন্দুধর্মে বহু গ্রামীণ দেব-দেবীর আবির্ভাব হইল। ইহাদের বিভিন্ন কার্য ও গুণাবলী কল্পিত হইল, ইহাদের সম্বন্ধে বহু উপাখ্যান প্রচলিত হইল। এই নূতন ধর্ম বেদের আনুগত্য স্বীকার করিয়া লইলেও ইহা বৈদিকধর্মে এক বিপ্লব আনয়ন করিয়াছিল।

মোহেন্-জো-দারো এবং হারাপ্পায় সিন্ধু উপত্যকায় যে সুপ্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার ফলে বিগত ত্রিশ বৎসরে ভারতীয় চিন্তাধারার বিবর্তনে অবৈদিক উপাদানের প্রভাব সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান আরও অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই দুই স্থলে যে সকল পুরাকালের বস্তু আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেগুলি হইতে বুঝা যায় যে, খৃষ্টপূর্ব তিন সহস্র বৎসর পূর্বেও এই অঞ্চলে বহু নগর ছিল; এই সভ্যতা সম্পর্কে অনুসন্ধান এবং গবেষণার কাজ এখনও তেমন অগ্রসর হয় নাই, এবং বৈদিক সভ্যতার সঙ্গে এই সভ্যতার কালিক সম্পর্ক বিষয়ে এখনও প্রচুর মতভেদ আছে। তৎসত্ত্বেও এই যুগের লোকদের নাগরিক, সামাজিক এবং ধর্মজীবন সম্বন্ধে যে মূল্যবান তথ্যাদি পাওয়া গিয়াছে তাহার ফলে প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা অনেক স্থলে দূর হইয়াছে।

সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতায় বৈদিক আচার অনুষ্ঠানপদ্ধতির অনুরূপ কিছু ছিল, ইহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু অবৈদিক সভ্যতার এমন অনেক চিহ্ন এখানে পাওয়া যায়, যাহা পরবর্তীকালের হিন্দুধর্মের বিকাশে একটি বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। উদাহরণস্বরূপ, তৎকালীন সিন্ধুদেশের লোকদের ধর্মে লিঙ্গপূজা একটি প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিল। লিঙ্গ দৈবশক্তির সৃজনীক্ষমতার একটি দ্যোতক। বেদে এই ধারণা অত্যন্ত অস্পষ্ট। বেদে বিশ্বসৃষ্টির প্রাথমিক পর্যায়ে কয়েকটি ব্যাপারে বিভিন্ন দেবতাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন শক্তি আরোপ করা হইয়াছে বটে, কিন্তু বিশ্বস্রষ্টারূপে ঈশ্বরের কল্পনা বেদে দেখা যায় না। যাহারা যজ্ঞ করে না এবং দক্ষিণা প্রদান করে না, বেদে তাহাদের নিন্দা করা হইয়াছে। সম্ভবতঃ সিন্ধু-উপত্যকার প্রাচীন অধিবাসীগণ এই নিন্দার লক্ষ্যস্থল।

মাতৃ-দেবতার উপাসনা সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতার আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই অঞ্চলে মাতৃ-দেবতার বিভিন্ন মূর্তি পাওয়া গিয়াছে, সেইগুলি যে একই দেবতার বিভিন্ন রূপ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং এই সভ্যতায় ঈশ্বরের স্ত্রী-রূপের যে অবৈদিক ধারণার প্রাধান্য লক্ষ করা যায় তাহা ভারতীয় সভ্যতার পরবর্তী বিকাশের ধারাকে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। মন্দির-উপাসনাও এই সভ্যতার একটি প্রধান অঙ্গ। পূর্ববর্ণিত দ্রাবিড় সভ্যতাতেও এই দুইটি অঙ্গ বর্তমান। সিন্ধু-

উপত্যকার এই সভ্যতাটি মুখ্যতঃ নগর-সভ্যতা ; এবং যাহা কিছু ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা যখন শুধু নগর হইতেই হইয়াছে, তখন এই সভ্যতার অন্য কোন রূপ থাকাও সম্ভবপর নয়। দ্রাবিড়-সভ্যতার অনুরূপ এই সভ্যতার মধ্যেও পশু এবং পক্ষীর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। সিন্ধু উপত্যকায় নানারূপ মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, কিন্তু এইগুলি অলঙ্করণের উদ্দেশ্যে না উপাসনার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইত তাহা সঠিক ভাবে বলা যায় না। এইগুলি চিত্রদ্বারা লেখনপদ্ধতির বর্ণমালাও হইতে পারে। এই সভ্যতা সংক্রান্ত এমন অনেক বিষয় আছে যাহাদের সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যায় না, কিন্তু ইহার মধ্যে পশুদের প্রাধান্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়।

সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতায় অপর যে একটি প্রধান অবৈদিক উপাদান স্পষ্টই দেখা যায়, তাহা হইল মৃতদেহের সংকার পদ্ধতি। সিন্ধু-উপত্যকায় অনেক সমাধিপাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল হইতে বুঝা যায় যে, এখানে মৃতদেহ দাহ করা হইত না, সমাধিস্থ করা হইত। বৈদিকপদ্ধতি হইতে এই পদ্ধতি সম্পূর্ণ পৃথক, কারণ মৃতদেহ দাহ করাই বৈদিক রীতি। মৃতদেহ সমাধিস্থ করার উদ্দেশ্য কি ছিল সে সম্বন্ধে গবেষণা খুবই কৌতূহলোদ্দীপক হইবে। আত্মা পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করিয়া সম্ভবতঃ একই দেহকে আশ্রয় করিতে পারে, এই আশাতেই কি দেহটিকে একেবারে ধ্বংস করা হইত না ? এই ধারণা হইতেই কি জন্মান্তরবাদের সূত্রপাত হইয়াছে ? অবশ্য মৃত্যুর পর পৃথিবীতে মানবাত্মার প্রত্যাবর্তনের বিশ্বাসটি বৈদিক-সাহিত্যে একেবারে নাই এমন নয় ; কিন্তু মৃত্যুর পর আত্মা উন্নততর এবং অধিকতর সুখময় অন্য জগতে অবস্থান করে এই বিশ্বাসই বেদে অধিক প্রাধান্যলাভ করিয়াছে। পৃথিবীতে আবার জীবনধারণের জন্য আত্মার পুনরাগমনে বিশ্বাস এতখানি প্রাধান্য লাভ করে নাই।

বৈদিক-সাহিত্যের প্রথম যুগে কর্মবাদের কথাও খুব অস্পষ্ট। কর্মবাদ শুধু সংকর্মের ফল হিসাবে সুখলাভে বিশ্বাসই নয়। এই তত্ত্বের মূল কথা এই যে, বর্তমানের মানুষ যেমন তাহার অতীতের ফলস্বরূপ, তেমনই সে তাহার নিজের ভবিষ্যতেরও স্রষ্টা। শ্রাদ্ধাদি বৈদিক আচার হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, স্বকৃত কুকর্মের প্রায়শ্চিত্ত অন্যেও করিতে পারে এইরূপ বিশ্বাসই বৈদিক যুগে প্রচলিত ছিল। পুনর্জন্মবাদ এবং কর্মবাদ – এই দুইটিই পরস্পরাশ্রিত এবং উপনিষদে এই দুইটি তত্ত্বেরই গুরুত্ব আছে, কিন্তু প্রাচীন উপনিষদগুলিতে এই দুইটি মতবাদের সন্ধান পাওয়া গেলেও তাহা অত্যন্ত অস্পষ্ট। মৃতব্যক্তি নিজেই তাহার ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ

করিতে পারে এবং এই পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করিতে পারে, এই বিশ্বাস হইতেই বোধহয় অবৈদিক সমাজে মৃতদেহ দাহ করা হইত না। মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্যনিয়ন্তা এবং নিজেই পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিতে পারে, এই ভাবটি অবৈদিক ধর্মের সঙ্গে যতটা খাপ খায়, বৈদিকধর্মের সঙ্গে ততটা নয়। কারণ আচার-অনুষ্ঠান-আশ্রিত বৈদিকধর্মে মানুষ দেবতাকে সন্তুষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে যজ্ঞানুষ্ঠান করে এবং দেবতা সন্তুষ্ট হইয়া মানুষের উপকার করেন। দাক্ষিণাত্যের ভাষাসমূহে মৃতদেহ সংকার করিবার অনেকগুলি পদ্ধতিরই উল্লেখ আছে, তাহাদের মধ্যে সমাধিস্থ করা একটি, যদিও দাহ করার পদ্ধতিও একেবারে অজ্ঞাত নয়। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের সাহিত্যে মৃতদেহ দাহ করার যে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সম্ভবতঃ বৈদিক পদ্ধতির প্রভাবেই ঘটিয়াছে। সন্ন্যাস-আশ্রম প্রাচীন বৈদিক সভ্যতা হইতে সাক্ষাৎ ও স্বতন্ত্রভাবে উদ্ভূত হয় নাই। সন্ন্যাসীদের মৃতদেহ দাহ না করিয়া সমাধিস্থ করা হয়, এই প্রথা আজ পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। যে সময়ে দাহ করার পরিবর্তে সমস্ত মৃতদেহই সমাধিস্থ করা হইত, সেই যুগেরই প্রভাব হয়ত এই রীতিতে বিদ্যমান রহিয়াছে। যোগবলে সন্ন্যাসীরা যাহাতে পুনর্জীবন লাভ করিতে পারেন হয়ত সেইজন্যই তাঁহাদের মৃতদেহকে দাহ করিয়া একেবারে ভস্মীভূত করা হইত না।

সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতা এবং দ্রাবিড়-সভ্যতার পার্থক্য সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। এই দুইটি সভ্যতার মধ্যেই যে প্রচুর মিল আছে পণ্ডিতেরা তাহা স্বীকার করিয়াছেন। এই কারণেই ভারতীয় চিন্তাধারার বিকাশে দ্রাবিড় উপাদানগুলির এত পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করা হইল। দ্রাবিড় সভ্যতা সম্পর্কে যে সমস্ত কথা বলা হইল তাহা প্রায় সবই সিন্ধু-উপত্যকার এই সভ্যতা সম্পর্কেও প্রযোজ্য।

মোট কথা এই যে অবৈদিক অর্থাৎ দ্রাবিড় এবং সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতার প্রধান উপাদানগুলি নিম্নরূপ: (১) সর্বসাধারণের জীবনে অরণ্যের প্রভাব; (২) মন্দিরে উপাসনা এবং তাহার সহিত অধিকতর মূর্ত আকারে দেবতার অনুধ্যান; (৩) বিশ্বজগতের পরিকল্পনাধারার মধ্যে পশুপক্ষী, বৃক্ষ প্রভৃতির উচ্চস্থান লাভ; (৪) ঐশীশক্তির স্ত্রীরূপকে উচ্চতর মর্যাদা দান; (৫) ঈশ্বরের স্রষ্টৃত্ব এবং (৬) জাতীয় মহাপুরুষ হিসাবে দেবতাদের আবির্ভাব এবং মানুষের দেবত্বে উন্নয়ন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বেদ

§১ মূল-সাহিত্য

বেদের দুটি অঙ্গ : মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ। মন্ত্র চারিভাগে বিভক্ত ; ইহাদের মধ্যে তিনটি প্রধানতঃ যজ্ঞানুষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, যেমন—(১) আবৃত্তির যোগ্য ছন্দোবদ্ধ বাক্য (ঋক্) (২) গীতোপযোগী ছন্দোবদ্ধ বাক্য (সামন্) এবং গদ্যময় মন্ত্রাদি (যজুস্) এবং (৪) অথর্বাঙ্গিরস। শেষোক্ত রচনাগুলির প্রথম এবং তৃতীয় শ্রেণীর রচনা হইতে কোন আকারগত পার্থক্য লক্ষিত হয় না, এইগুলির বিষয়বস্তু হইতেছে ইন্দ্রজাল এবং ধর্মের বিবিধ অনুষ্ঠান। স্বাভাবিক ধ্বনিগত সাদৃশ্যের ভিত্তিতে এই রচনাগুলি এক একটি নির্দিষ্ট আকারে সঙ্কলিত হইয়া সংহিতা নামে পরিচিত হইয়াছিল। এইভাবে ঋগ্বেদ-সংহিতা সামবেদ-সংহিতা যজুর্বেদ-সংহিতা এবং অথর্ববেদ-সংহিতার উৎপত্তি হইল। যজুর্বেদের দুই ভাগ—কৃষ্ণ এবং শুক্ল। প্রথমটিতে ব্রাহ্মণ নামক অংশ আছে, দ্বিতীয়টিতে নাই। ব্রাহ্মণগুলি বিভিন্ন সংহিতাকে অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে। এইগুলি গদ্যে লিখিত এবং ইহাদের মধ্যে যজ্ঞের বিস্তৃত বর্ণনা এবং প্রশংসা আছে। একটি না একটি সংহিতার সঙ্গে এইগুলি সংযুক্ত এবং গূঢ়তত্ত্ব ও দার্শনিক আলোচনা সমন্বিত আরণ্যক এবং উপনিষদ্-গুলি ইহাদের অন্তর্ভুক্ত বলিয়াই গৃহীত হয়। আরণ্যক এবং উপনিষদ্‌গুলির বিষয় পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হইবে। কালক্রমে প্রত্যেকটি সংহিতা এবং কয়েকটি ব্রাহ্মণেরও ভিন্ন ভিন্ন পাঠ প্রচলিত হয়।[১]

ভারতীয় ঐতিহ্যে বেদের রচয়িতাদের অথবা উহার রচনাকালের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। ভারতীয়গণ বেদকে সর্বদাই শাশ্বত এবং অপৌরুষেয় বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন। বেদের ঋষিরা বেদের রচয়িতা ছিলেন না, কেবল প্রত্যেক যুগারম্ভে তাঁহাদের নিকট বেদ প্রকাশিত হইয়াছিল। ম্যাক্স্‌মুলরই সর্বপ্রথম বেদের রচনাকাল নির্ণয়ের চেষ্টা করেন।[২] তাঁহার মতে এই রচনাকাল খৃঃ পূঃ ১২০০ হইতে ৬০০ বৎসর, কিন্তু এই কালনির্ণয়ের জন্য তিনি কোন যুক্তি দেন নাই। অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় এই যে, পরবর্তী অধিকাংশ পণ্ডিত ব্যক্তি এই মতটিকেই সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহারা এই সিদ্ধান্তের সমর্থক অনেক যুক্তি দিবার

চেষ্টাও করিয়াছেন এবং কাহারও এই মতের প্রামাণ্য অস্বীকার করিবার স্পর্ধা হইলে তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। বেদের মূল-গ্রন্থে জ্যোতির্বিজ্ঞান সংক্রান্ত যে সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ আছে, তাহার উপর ভিত্তি করিয়া তিলক তাঁহার Orion (বোম্বাই—১৮৯৩) নামক গ্রন্থে এবং জ্যাকবি Festgruss an Rudolf von Roth (Stuttgart, 1893)-এ প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে একই সঙ্গে এবং পরস্পর স্বতন্ত্রভাবে এই রচনাকাল খৃষ্টপূর্ব ৪৫০০ হইতে ২৫০০ বৎসরের মধ্যে ছিল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। তিলক ইহাও প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, কয়েকটি প্রাচীনতম স্তোত্রের রচনাকাল অনূর্ধ্ব খৃঃ পূঃ ৬০০০ বৎসর। ধৈর্যের সহিত বিচার করিলে এই সিদ্ধান্তই যে মূলতঃ সমীচীন ইহা প্রতিপন্ন হয়। জ্যাকবি তাঁহার অন্যান্য বহু প্রবন্ধে অন্যান্য যুক্তি দ্বারাও এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছিলেন।[৩]

আলোচনার সুবিধার জন্য বেদের দার্শনিক তত্ত্বগুলিকে আমরা নিম্নলিখিত শিরোনামায় উপস্থিত করিব: ধর্ম; ঈশ্বরতত্ত্ব; একেশ্বরবাদ, সর্বেশ্বরবাদ এবং অদ্বৈতবাদ; নীতিবিজ্ঞান; বিশ্বতত্ত্ব এবং সৃষ্টিতত্ত্ব; পরলোকতত্ত্ব; মনোবিজ্ঞান এবং যুক্তিবিজ্ঞান।

§২ ধর্ম

বৈদিক যুগের লোকেরা যে দেবতাদের উপাসনা করিত তাহার আলোচনা আমরা এই অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে করিব। স্তোত্রপাঠ, ভক্তিপ্রদর্শন এবং আহুতি প্রদান এইগুলিই ছিল প্রধানতঃ উপাসনার পদ্ধতি। যদিও পরে এইগুলি যজ্ঞের অঙ্গরূপেই স্বীকৃত হইয়াছিল, তথাপি পৃথক বা সংযুক্তভাবে প্রথম দুইটি ক্রিয়ার উপর যে স্বতন্ত্র মর্যাদা আরোপিত হইত তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। যজ্ঞে এক বা একাধিক অগ্নি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রজ্বলিত করিবার পূর্বে দুগ্ধ, মধু, ঘৃত, শস্য ও ঐগুলি দ্বারা প্রস্তুত বিভিন্ন দ্রব্য, মাংস, উত্তেজক সোমরস প্রভৃতি প্রিয় ভোজ্য ও পানীয় বস্তু উৎসর্গ করা হইত। এই সকল উৎসর্গ করিবার সময় নির্দিষ্ট বিধান ও রীতি অনুযায়ী যজুর্মন্ত্র উচ্চারণ, ঋক্‌স্তোত্র পাঠ এবং সামগান করা হইত। শ্রৌত-যজ্ঞ বলিয়া পরিচিত মহাযজ্ঞগুলির জন্য একাধিক পুরোহিতের প্রয়োজন হইত, কিন্তু নিজ গৃহের ধর্মানুষ্ঠানে (গৃহকর্ম) গৃহকর্তা এবং তাহার স্ত্রী কোন পুরোহিতের সাহায্যে অথবা বিনা সাহায্যেই তাহা সম্পন্ন করিতে পারিত। অগ্নিতে অর্পিত বা উৎসর্গীকৃত দ্রব্যাদি দেবতাদের নিকট পৌঁছাইয়া দিবার জন্য অথবা

সেইগুলি গ্রহণের উদ্দেশ্যে দেবতাদের আনয়ন করিবার জন্য অগ্নিদেবতার নিকট প্রার্থনা করা হইত। পার্থিব সুখ এবং মৃত্যুর পর মনোরম স্বর্গজীবন প্রাপ্তির উদ্দেশ্যেই দেবতাদের শুভেচ্ছা লাভের জন্য প্রথমতঃ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত; কিন্তু কালক্রমে যজ্ঞানুষ্ঠানে অসংখ্য বৈচিত্র্য আসিয়া পড়িয়াছিল এবং ক্রমশঃ ক্রমশঃ তাহা ক্রমবর্ধমান দুর্বোধ্য রহস্যে আবৃত হইয়া পড়িয়াছিল। যজ্ঞ যেমন আমাদিগকে সহজেই সুখৈশ্বর্য, তেমনই মৃত্যুও দান করিতে পারে; সেইজন্য তৈত্তিরীয় সংহিতায় (২।৫।৫।৬) যজ্ঞকে 'ক্ষুরধার' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে এবং যজ্ঞানুষ্ঠানকারীকে সদাচারের গুরুত্ব শিক্ষা দিয়াছে। ক্রমে যজ্ঞ যে কোন বস্তুলাভের স্বতন্ত্র উপায়রূপে গৃহীত হইল এবং প্রথমতঃ যজ্ঞে যে দেবতাদিগকে[৪] শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হইত, তাহাদের পরিবর্তে যজ্ঞই শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া পড়িল (ঋগ্বেদ: ২।২৬।৩; ১০।১৫১; তৈঃ সঃ ১।৬।৮।১; বাঃ সঃ ১৯।৭৭; তৈঃ ব্রাঃ ৩।১২।৩।২; কৌঃ ব্রাঃ ২।৮)। ইহারই ফলে আমরা দেখিতে পাই যে, সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতিসহ দেবতারা 'ব্রাহ্মণ'গুলিতে একাধিকবার নিজেরাই যজ্ঞকারীরূপে দেখা দিয়াছেন। গূঢ় অর্থে যজ্ঞ ক্রমশঃ প্রজাপতি, বিষ্ণু, সংবৎসর ও মৃত্যুর সহিত অভিন্ন বলিয়া গৃহীত হইল।

বেদের প্রাচীনতম স্তোত্রগুলিতেও মন্ত্রগুলিকে দেবতাদের মতই অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বলিয়া মনে করা হইত এবং এইজন্য উহাদিগকে ব্রহ্ম নাম দেওয়া হইয়াছিল। মন্ত্রের এই প্রবলশক্তির ধারণা ছাড়াও একটি বিশুদ্ধ ভক্তির সুর অসংখ্য স্তোত্রের মধ্যে লক্ষিত হয়। দেবতাদের উদ্দেশ্যে প্রিয় সম্বোধন বচনগুলিও এই কথার স্বপক্ষে একটি প্রমাণ (§৩)। দেবতাদের প্রকৃতি এবং মহিমা সম্বন্ধে ধ্যান করার কথা ঋগ্বেদের ১।২৪।১, ৩।৬২।১০, ৫।১।৪ ইত্যাদি সূক্তে খুব জোরের সহিত বলা হইয়াছে। তপস্যার (তপস্) ক্ষমতা এবং কার্যকারিতা সম্বন্ধে ঋগ্বেদে প্রশংসা করা হইয়াছে (ঋঃ ১০।১৫৪।২, ৪, ৫; তৈঃ সঃ ৫।৩।৫।৪; কৌঃ ব্রাঃ ২।৮, তৈঃ ব্রাঃ ৩।১২।৩।১)। তৈত্তিরীয় সংহিতায় (৫।২।১।৭) শান্তি এবং স্থৈর্যের অন্বেষ্টা, বদ্ধমুষ্টি, বাক্‌সংযমী যাযাবর তপস্বীর উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদের ১০।১৩৬ সূক্তে 'গন্ধর্ব, অপ্সর এবং মৃগ অধ্যুষিত স্থানে সঞ্চরমান' এবং দেবতাদের সঙ্গ উপভোগকারী নগ্ন বা গৈরিক ধূলায় আবৃত (ঐ ব্রাঃ ৭।১৩) লোমশ মুনির রহস্যময় এবং অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে বিস্তৃত বর্ণনা আছে। এই সমস্ত ধর্মকর্মের সহিত নীতির ধারণাও বিজড়িত ছিল। এই সম্পর্কে আমরা পরে আলোচনা করিব। (§৫) এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, মূর্তি বা মন্দিরের কোন উল্লেখ এই সকল সূক্তে পাওয়া যায় না; অবশ্য ঋগ্বেদের ১০।১০৭।১০ সূক্তে "দেবমান" (অর্থাৎ দেবতার আলয়)

শব্দটিকেই হয়ত ইহার একমাত্র উদাহরণ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। ঋগ্বেদের ৪।২৪।১০ (এবং সম্ভবতঃ ৮।১।৫) সূক্তে ইন্দ্রের কোন অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মূর্তির উল্লেখ আছে; এই মূর্তি বিক্রয় করা বা ভাড়া দেওয়া যাইত। নৈমত্তিকি বস্তু ও পশু-পক্ষী পূজা (Totemism) এবং সর্বপ্রাণিবাদের পৃথকভাবে কোন উল্লেখ নাই বটে, তথাপি সকল বস্তুতে ঈশ্বরের অস্তিত্বের ধারণা প্রসূত যে সর্বপ্রাণিবাদ তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

উপরে ধর্মবিশ্বাসের যে চিত্র অঙ্কিত হইল তাহার পাশাপাশি মন্ত্রতন্ত্র, বশীকরণ এবং ইন্দ্রজালের ক্ষমতা সম্বন্ধে সাধারণের যে ব্যাপক বিশ্বাস ছিল তাহাও এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন। বৈদিক সাহিত্যে সর্বত্রই এই বিষয়গুলির ইতস্ততঃ উল্লেখ আছে বটে তথাপি বিশেষভাবে এইগুলি অথর্ববেদ এবং তাহার অনুষ্ঠানাঙ্গ যে কৌশিকসূত্র উহাদের বিষয়। সেইজন্যই এই গ্রন্থদুইটিতে পরবর্তী তন্ত্রশাস্ত্রের সূচনা রহিয়াছে। অধিকাংশস্থলে এই সকল মন্ত্রতন্ত্র দৈত্য, দানব, যাদুকর, রোগ এবং দৈবদুর্বিপাক নিবারণের জন্য এবং সুখ, শান্তি ও পারস্পরিক সম্প্রীতি অর্জনের জন্য ব্যবহৃত হইত। অবশ্য কোন কোন মন্ত্রতন্ত্র প্রতিদ্বন্দ্বীর বিপক্ষে সুবিধালাভ এবং এমনকি শত্রুর অনিষ্টসাধনের জন্যও ব্যবহৃত হইত। এই ক্ষেত্রেও আমরা লক্ষ্য করি যে, দেবতারা বৈদিক মানুষের বন্ধুস্থানীয় ছিলেন এবং অসুরেরা শত্রুস্থানীয় ছিল। অন্যান্য বেদের মত অথর্ববেদেও যাদুবিদ্যাকে তীব্র নিন্দা করা হইয়াছে।

§৩ ঈশ্বরতত্ত্ব

অতিমানবীয় শক্তি ও জ্ঞান, ভাস্বরতা, অমরত্ব, করুণা এবং পাপে বিতৃষ্ণা বৈদিক দেবতাগণ ও তাঁহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট পদার্থসমূহে বিদ্যমান।[৫] এই দেবতাদের সম্বন্ধে ধারণা প্রধানতঃ তিন শ্রেণীর পদার্থকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল—(১) প্রকৃতির মহনীয় রূপসমূহ—এইগুলির নৈকট্যের মাত্রানুযায়ী দেবতাদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইত।[৬] (ক) স্বচ্ছ, যথা—স্বর্গ (দ্যৌঃ), ধরণী (পৃথিবী), সূর্য, উষা, বায়ু (বাত), অগ্নি, জল, (আপঃ) এবং বিভিন্ন নদী দেবতা এবং পানীয় দেবতা সোম; (খ) ঈষৎ স্বচ্ছ, যথা—পূষন্, বিষ্ণু, রুদ্র, অপাংনপাৎ ইত্যাদি এবং (গ) অস্বচ্ছ—যথা অদিতি, বরুণ, মাতরিশ্বন্, ঋভুগণ প্রভৃতি; (২) কয়েকটি বিশেষ ক্রিয়া—এইগুলির সহিত সংশ্লিষ্ট দেবতারূপে নির্মাতা (ত্বষ্টৃ), উদ্দীপক (সবিতৃ), মন্ত্রাধিপতি (বৃহস্পতি বা ব্রহ্মণস্পতি) ইত্যাদির নাম করা যায় এবং কয়েকটি অমূর্ত

ধারণা—যথা বিশ্বাস (শ্রদ্ধা), ক্রোধ (মন্যু), রোগ বা বিনাশ (নির্ঋতি ইত্যাদি)। শেষোক্ত দেবতাগুলি কেবলমাত্র সম্বোধনের পাত্র এবং তাঁহাদের কার্যকলাপও তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। ইতরপ্রাণী, উদ্ভিদ্, অচেতন বস্তু এমনকি মনুষ্যনির্মিত কোন কোন বস্তুও কখনও কখনও শান্তি ও সমৃদ্ধি প্রদান করিবার জন্য আহুত হইত।

মোটের উপর প্রাকৃতিক শক্তিগুলিতে মানবধর্ম আরোপ করিয়াই দেবতাদিগের কল্পনা করা হইয়াছিল। মানবধর্ম আরোপ সকলক্ষেত্রে খুব স্পষ্টভাবে করা হয় নাই। প্রায় স্বচ্ছ, অস্বচ্ছ এবং ক্রিয়ারূপী দেবতাগুলি সম্বন্ধে ইহা যতটা স্পষ্টভাবে করা হইয়াছিল, অন্যান্য দেবতা সম্বন্ধে ততটা স্পষ্টভাবে করা হয় নাই। প্রাকৃতিক শক্তিগুলিতে মানবধর্ম আরোপ করার ফলেই দেবতাদের মধ্যে যে বয়স, আকার এবং পারস্পরিক সম্বন্ধ সম্পর্কে বিভিন্নতা আছে (ঋঃ সঃ ১।২৭।১৩ ; অথ ১।৩০।২), তাঁহারা সন্তান উৎপাদন করেন, সোমপান করিয়া অমর হন (ঋঃ সঃ ৯।১০৬।৮), তপশ্চর্যা অথবা অন্যান্য আচার পালন করেন (ঋঃ সঃ ১০।১৬৭।১ ; অথ ৪।১১।৬ ; শত ব্রাঃ ১১।১।২।১২), কতকগুলি দেবতার অনুগ্রহভাজন হইয়া থাকেন (ঋঃ সঃ ৬।৭।৪ ; ৪।৫৪।২)—এইরূপ কল্পনা করা সম্ভবপর হইয়াছিল। কখনও বা দেবতারা সকলেই তুল্যশক্তি (ঋঃ সঃ ৮।৩০।১) এবং 'অমৃতের পুত্র' (ঋঃ সঃ ৬।৫২।৯ ; ১০।১৩।১) বলিয়া এই সমস্তই অস্বীকার করা হইয়াছে। তাঁহারা স্বর্গে বাস করেন এইরূপ বলা হইয়াছে, আবার কখনও কখনও তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ স্বর্গে, কেহ কেহ অন্তরীক্ষে, কেহ কেহ পৃথিবীতে বাস করেন এই বলিয়াও তাঁহাদের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে (ঋঃ সঃ ১।১৩৯।১১ ; অথ ১।৩০।৩)—সূর্য, বাত ও অগ্নিকে যথাক্রমে এই তিনশ্রেণীর প্রতিনিধিরূপে গ্রহণ করা যায় (ঋঃ সঃ ১০।১৫৮।১ ; তৈঃ সঃ ৭।৩।১২)। ইন্দ্র, বরুণ, সবিতৃ প্রভৃতি দেবতাদের মধ্যে প্রত্যেকেই কখনও কখনও সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গৃহীত হইয়াছেন। এই ব্যাপারকে—অর্থাৎ প্রত্যেক দেবতাকে পর্যায়ক্রমে অপর সকল দেবতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং স্বতন্ত্র বলিয়া বিশ্বাস করাকে—ম্যাক্সমূলার একাতিদেববাদ (Henotheism) বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।[৭] কিন্তু বৈদিক যুগে যে দেবতা সাময়িকভাবে কোন ব্যক্তির মনোযোগ আকর্ষণ করিতেন, সেই ভক্তের মনে তাঁহাকে সর্বাপেক্ষা মহনীয় করিয়া দেখার যে স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল, অথবা সকল দেবতাই সমান বা অভিন্ন এই বিশ্বাস ছিল বলিয়াই বিভিন্ন দেবতাকে এক এক সময়ে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করা সম্ভবপর হইয়াছিল বলিলে বোধ হয় এই ব্যাপারকে আরও সুষ্ঠুভাবে ব্যাখ্যা করিতে পারা যায় (ঋঃ সঃ ১।১৬৪।৪৬ ; ৮।৫৮।২ ; ১০।১১৪।৫ ; এবং §৪)।[৮]

স্বর্গ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং ধৃতি, অন্তরীক্ষে সূর্যের স্থাপন, নদীগুলির গতিপথ খনন এবং তাহাদের নিম্নাভিমুখী চিরন্তন প্রবাহ নির্দিষ্ট করা প্রভৃতি কতকগুলি বিশাল জাগতিক ক্রিয়া কয়েকটি বিশিষ্ট দেবতার উপর আরোপ করা হইয়াছে। তাঁহারা জাগতিক ব্যাপারের বিপর্যয়কারী অনাবৃষ্টি, অন্ধকার প্রভৃতি অসুরদের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত তাহাদিগকে পরাভূত করেন। যে জাগতিক শৃঙ্খলা চিরন্তন ও অলঙ্ঘ্য তাহাকে 'ঋত' বলা হইয়াছে। 'ঋত' শব্দের আক্ষরিক অর্থ "ঘটনার স্বাভাবিক নিয়ম"। ধর্মের নিয়ম এবং নৈতিক নিয়মও চিরন্তন ও অলঙ্ঘ্য বলিয়া 'ঋত' শব্দ খুব শীঘ্র এগুলিকেও বুঝাইতে লাগিল। দেবতারা, বিশেষ করিয়া আদিত্যগণ ও তাঁহাদের নেতা বরুণ এই ব্যাপক অর্থে গৃহীত ঋতের উৎসাহী রক্ষক। কেবল ইহাই নয় তাঁহারা ঋত হইতেই উদ্ভূত, ঋতের দ্বারাই পরিচালিত (ঋতাবৎ) এবং ঋতের দ্বারাই পুষ্ট (ঋতাবৃধ্)। কষ্ট বা রোগ উৎপাদনকারী ক্ষুদ্রতর ভূতপ্রেতাদির অপসরণ বা বিনাশ, শত্রুদের পরাস্ত করিতে সাহায্য, পাপের তির্যক্ গতির বিনাশ অথবা স্খলনের মার্জনা ভিক্ষার জন্যও মানুষ তাঁহাদের নিকট প্রার্থনা করে। তাঁহাদিগকে 'পিতা' 'মাতা' 'ভ্রাতা' 'সুহৃৎ', ও 'মিত্র' প্রভৃতি শব্দদ্বারা সম্প্রীতির সহিত সম্বোধন করা হয় এবং এই সকল সম্বোধন হইতেই পূজক ও পূজিতের মধ্যে কিরূপ সৌহার্দ্য ও শ্রদ্ধাপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান তাহা বুঝা যায়। আবার ইহাও দেখা যায় যে, কোন কোন সন্দেহবাদী ব্যক্তি স্পষ্টভাবেই ইন্দ্র অথবা অপর যে কোন দেবতার অস্তিত্ব অস্বীকার করিতেছেন, কারণ "তাঁহাকে কেই বা দেখিয়াছে?" (ঋ: স: ২।১২।৫ ; ৮।১০০।৩ ; অথ ১১।২।২৮ শ্র:)। তাহাদের এই মত খণ্ডন করিবার জন্য ঋষিদিগকে বেশ পরিশ্রম করিতে হইতেছে।

ব্রাহ্মণ-সাহিত্যে প্রায়ই প্রজাপতির দুই সন্ততি দেবতা ও অসুরদের সংগ্রামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু শতপথ ব্রাহ্মণে (১১।১।৬।৯।১০) দৃঢ়তার সহিত এরূপ ঘটনাকে অস্বীকার করিয়া প্রকৃত তথ্যের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। এই ব্রাহ্মণ রচনাটি ঋ: স: ১০।৫৪।২ এর পাঠান্তর এবং ইন্দ্রের যুদ্ধগুলিকে এই বাক্যে 'মায়া' বলিয়া অবজ্ঞা করা হইয়াছে। ঋ: স: ৩।৫৩।৮ এবং ৬।৪৭।১৮তেও ইন্দ্রের বিভিন্ন আকার ধারণকে মায়ার কার্য বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই পরিচ্ছেদের চতুর্থ অনুচ্ছেদে যাহা বলা হইয়াছে এবং দেবতাদের সম্বন্ধে 'মহাশক্তির সন্ততি', 'চরমসত্তা হইতে জাত', 'অমৃত' 'দক্ষ' অদিতি[১] (ঋ: স: ৮।২৫।৫ ক ; ৮।৬৯।৪ গ ; ১০।১৩।১ গ ; ৬।৫০।২ ক ; এবং ৮।২৫।৫ খ ; ৭।৬০।৫ ঘ) এবং 'মন হইতে জাত', 'মনের সমানধর্মা' (তৈ: স: ১।২।৩।১) প্রভৃতি যে সকল বিশেষণ প্রয়োগ করা হইয়াছে, সেগুলিকে এই

তথ্যের প্রসঙ্গে বিবেচনা করিলে বুঝা যায় যে, ঋষিগণ দেবতাদিগকে একই সর্বানুস্যূত সত্তার বিভিন্ন প্রকাশ বলিয়া জানিতেন। ভগবদ্‌গীতার দশম অধ্যায়ের ৪১ শ্লোকে যাহা বলা হইয়াছে—"যে যে বস্তুতে ঐশ্বর্য, শ্রী ও বীর্য আছে, তাহাকেই ভগবৎসত্তার অংশ বলিয়া বুঝিতে হইবে"—এবং ভাগবতপুরাণের ১০।৮৭।১৫ শ্লোকে যাহার সমর্থন পাওয়া যায় তাহাই তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন।

§৪ একেশ্বরবাদ, সর্বেশ্বরবাদ ও অদ্বৈতবাদ

ঋগ্বেদের ৩।৫৫ সূক্তে বলা হইয়াছে যে, "দেবগণের দেবত্ব একের মধ্যেই নিহিত"। দেবতারা পরস্পর হইতে উদ্ভূত[১০] এবং তাঁহাদের প্রত্যেকেই অপর সকল দেবতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি আপাতদৃষ্টিতে যে সকল অসঙ্গত কথা বলা হইয়াছে, ইহাদের পিছনে দেবতাদের অভিন্নতা সম্বন্ধে যে ধারণা ছিল, ঋগ্বেদের এই সূক্তে তাহাই ব্যক্ত করা হইয়াছে। ঋঃ সঃ ১।১৬৪।৬৪ তে যেখানে বলা হইয়াছে, "একই সদ্বস্তুকে ঋষিগণ নানাভাবে বর্ণনা করেন" এবং ১০।১১৪।৫ তে যেখানে বলা হইয়াছে যে জ্ঞানী ঋষিগণ তাঁহাদের বাক্যের সাহায্যে যে সুপর্ণ প্রকৃতই এক তাহাকে বহুরূপে পরিণত করেন —সেই ঐক্যের কথাই আরও স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে। সূর্যকে দেখিয়াই সম্ভবতঃ পরম সত্তাকে সুপর্ণরূপে কল্পনা করা হইয়াছিল, কারণ বেদে সূর্য এক বিরাট সৃজনশীল নিয়ামক ও জীবনদায়ক শক্তিরূপেই[১১] পরিচিত এবং সুপর্ণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে এবং মনে হয় অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা যথা সুবর্ণভ্রূণ বা হিরণ্যগর্ভের ধারণাও[১২] এই সূর্যের ধারণা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। এই এক সদ্বস্তু (একং সৎকে) ঋগ্বেদে 'অজ' (১।৬৭।৩; ১।১৬৪।৬; ৮।৪১।১০ প্রঃ) 'অসুর' (৫।৬৩।৩।৭; ১০।১৭৭।১), 'পিতা' (১।১৬০।২; ১৬৪।২২ এবং ১।১৬০।৪; ৪।৫৬।৩) অথবা 'এক' (১।১৬৪।৪৬; ৮।৫৬।২; ১০।১২৯।২)—এই সকল নির্বিশেষ উপাধিতে ভূষিত করা হইয়াছে। কিন্তু বিশ্বকর্মা সম্বন্ধে দুইটি সূক্তে (১০।৮১-৮২) এবং হিরণ্যগর্ভ সম্বন্ধে একটি সূক্তে (১০।১২১) সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা, নিয়ামক ও পালকরূপে ইঁহার গুণাবলীর সুস্পষ্ট বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে; ১।১৬৪।৩১ এ তিনি রক্ষক বা 'গোপা' বলিয়া উল্লিখিত। তিনি অবিশ্রাম ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করেন "কেন্দ্রানুগ এবং কেন্দ্রাতিগ শক্তিদ্বারা স্বয়ং আবৃত হইয়া পুনঃ পুনঃ বস্তুসমূহের অন্তরে আবর্তিত হন।" ইহা ছাড়া অথর্ববেদে তাঁহাকে 'দিব্যগন্ধর্ব' (২।১।২; ২।১), 'পোষক' (স্কম্ভ, ১০।৭-৮), রক্তবর্ণ (রোহিত, ১৩।১-৪) জীবনীশক্তি (প্রাণ ১১।৭) এবং 'কাল' (১৯।৫৩-৫৪)

রূপেও উল্লেখ করা হইয়াছে। এই একেশ্বরবাদ প্রায়ই সর্বেশ্বরবাদের ধারণাদ্বারা অনুরঞ্জিত। সকল দেবতাই অগ্নির মধ্যে বর্তমান (ঋঃ সঃ ৫।৩।১গ), ইন্দ্রের মধ্যে বর্তমান (৩।৫৪।১৭খ) এবং চক্রের মধ্যবিন্দুর মত সবিতার চারিদিকে সন্নিবিষ্ট (১।৬৫।৬গ)। আবার বিশ্বদেবগণের প্রতি উদ্দিষ্ট ১০।১০০ সূক্তে অদিতিকে সর্ব ('সর্বতাতি') বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ১০।৮২।৬ এবং ১০।১২১।৭-৮ সূক্তের বক্তব্যও ইহাই। কিন্তু যখন ১।৮৯।১০ সূক্তে অদিতিকে যাহা কিছুর ধারণা করা সম্ভব—যাহা কিছু জন্মিয়াছে বা জন্মিবে—এইরূপ সকল বস্তুর সহিত অভিন্ন বলা হইয়াছে, তখনই সর্বেশ্বরবাদ অদ্বৈতবাদে পরিণত হইয়াছে।

ঋগ্বেদের ৮।৫৮।২ সূক্তে বলা হইয়াছে যে যেমন সর্বত্র একই অগ্নি, একই সূর্য এবং একই উষা কার্য করে, সেইরূপ একই সত্তা নানারূপ ধারণ করিয়াছে। অনুরূপভাবে ২।৩৫।২।৮তে 'অপাংনপাৎ' দেবতা (জলসমূহের তনয়) সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, তাঁহার নিজেরই সৃষ্ট অন্য সমস্ত বস্তু তাঁহারই শাখা মাত্র। "প্রজাপতি গর্ভে সঞ্চরণ করেন—তিনি অজাত, নিজেকেই বিভিন্নরূপে উৎপন্ন করেন" (বাঃ সঃ ৩১।১৯ ক-খ)। "তিনি সমস্ত জগৎকে তাঁহার একার্ধ দিয়া সৃষ্টি করিলেন, যে আলোক তাঁহার অপর অর্ধ তাহা কোথায়?" (অথ ১০।৮।১৩ গ-ঘ)। শেষোক্ত অংশে চরম সত্তার সর্বানুস্যূততা ও সর্বাতিশয়ত্ব সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত আছে তাহা পুরুষসূক্তেও দেখিতে পাওয়া যায়। বিশ্বে যাহা কিছু আছে তাহা তাঁহার (পুরুষের) একচতুর্থাংশ মাত্র, তাঁহার অপর তিন অংশ স্বর্গে অমৃতরূপেই বিদ্যমান আছে (ঋঃ সঃ ১০।৯০।৩ গ-ঘ—অথ ১০।৭। ৮-৯ ও দ্রষ্টব্য)। অথর্ববেদের দুইটি স্কম্ভ-সূক্তেও (১০।৭-৮) অদ্বৈতবাদ বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ অদ্বৈতবাদের একটি অনুসিদ্ধান্ত। ঋঃ সঃ ৪।২৬ সূক্তে এই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই স্থানে দেখা যায় যে, বামদেব নিজেকে বিভিন্ন পৌরাণিক ব্যক্তি এবং দেবতার সহিত অভিন্ন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অপর এক ঋষি ঘোষণা করিয়াছেন, "আমিই সমস্ত কিছু"। (ঋঃ সঃ ১০।৬১।১৯) বাঃ সঃ ৮।৯তে অহং-এর বিশালতা ও রহস্য সম্বন্ধে জোরের সহিত বলা হইয়াছে এবং অথ—১০।৭।১৭ ক খ তে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, যাঁহারা মানুষের মধ্যে ব্রহ্ম অর্থাৎ পরমাত্মাকে উপলব্ধি করেন, তাঁহারা যিনি শীর্ষস্থানে অবস্থিত তাঁহাকে (পরমেষ্ঠীকে) জানেন (তৈঃ ব্রাঃ ৩।১০।৮)। ঋঃ সঃ ১।১৬৪।২০তে দুইটি আত্মাকে (অথবা দেহ ও আত্মাকে?)[১৩] একই বৃক্ষে অবস্থিত দুইটি পক্ষীর সহিত তুলনা করা হইয়াছে—ইহাদের মধ্যে একটি স্বাদু ফল ভক্ষণ করে এবং

অপরটিকে বিনা আহারেই উজ্জ্বল দেখায়। এই রহস্যময় সূক্তটির ২১, ২২, ৩০, ৩১ ঋক্ এবং সম্ভবতঃ ৩৭ সংখ্যক ঋকেরও আলোচ্য বস্তু আত্মা। স্তম্ভ সূক্ত দুইটিতে (অথ ১০।৭-৮; শঃ ব্রাঃ ১০।৫।৪।১৫-১৬; ১০।৬।৩; ১১।২।১৩) এবং আরও অনেকগুলিতে বহু ঔপনিষদিক চিন্তার[১৪] এমন কি ঋঃ সঃ ১০।৮।৩৭এ অদ্বৈতবেদান্তীদের মায়াবাদেরও[১৫] পূর্বাভাস দেখিতে পাওয়া যায়। "যেখানে মানব ও দেবতাগণ রথচক্রের নাভিতে শলাকাগুলির ন্যায় সন্নিবিষ্ট আমি সেই বারিসমূহের[১৬] পুষ্প (অর্থাৎ সারাংশ) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করি, আমি সেই স্থানের কথা জিজ্ঞাসা করি যেখানে ইহা মায়ার সহিত অবস্থিত।"

আত্মা এবং তাহার মুক্তি সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য সংক্ষেপে ১০।৮।৪৪ ঋকে এইরূপ বলা হইয়াছে—"তিনি কামনা হইতে মুক্ত, প্রাজ্ঞ, অমর, স্বয়ম্ভূ, রসতৃপ্ত, সর্বন্যূনতা বর্জিত—এই আত্মা জ্ঞানী, অজর এবং নবীন; ইঁহাকে জানিয়াই মানব মৃত্যুভয় অতিক্রম করে।" বাঃ সঃ ৩১।১৮-১৯এর বক্তব্যও এইরূপ।

§৫ নীতিবিজ্ঞান

নৈতিক শৃঙ্খলা যে মহিমান্বিত এবং অলঙ্ঘ্য এবং ইহার কার্যকারিতা অমোঘ এবং ন্যায়সঙ্গত, ঋতের (§৩) ধারণায় তাহাই সূচিত হইতেছে। উত্তরকালে ইহাই কর্মবাদে পরিণত হইয়াছে। অনুরূপভাবে ঐশ অনুশাসন (ব্রত) ব্যাপক অর্থে 'সঙ্কল্প' বা 'আচরণ'কেও অঙ্গীভূত করিয়াছে। দেবতাগণ (§৩) অন্তরের দিক্ হইতে মানবদের চিন্তা, বাক্য বা কার্যের দোষগুণ বিচার করিয়া থাকেন (ঋঃ সঃ ২।২৭।৩; ৮।৮।১৫) এবং তাহাদিগকে যথাযোগ্য শাস্তি বা পুরস্কার দিয়া থাকেন। 'সত্য' শব্দের মৌলিক অর্থ 'সতের অর্থাৎ সদ্বস্তুর সহিত সঙ্গতি' এবং 'অনৃত' শব্দের মৌলিক অর্থ 'ঋতের অপলাপ'। এই যে দুইটি শব্দ পরবর্তী যুগে কেবলমাত্র বাক্যের সত্যতা ও মিথ্যাত্ব বুঝাইতে ব্যবহৃত হইত, তাহারা বৈদিক যুগে নীতিঘটিত প্রসঙ্গে সাধারণভাবে পুণ্যকর্ম ও পাপকর্ম অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। (ঋঃ সঃ ৭।৪৯।৩; তৈঃ ব্রাঃ ৩।৭।১২।৩)। দুষ্ট অভিপ্রায়, শপথক্রিয়া, মিথ্যাবাদিতা, চক্রান্ত, নিন্দাবাদ, পরচর্চা, অসাধুতা, ইন্দ্রজাল, দ্যূতক্রীড়া, ঋণ, স্বার্থপরতা, স্বৈরাচার বা ব্যভিচার, চৌর্য এবং প্রাণিহিংসা এইগুলি পাপকার্য বলিয়া গণিত (ঋঃ সঃ ১।২৩।২২; ৪।৫।৫; ৭।১০৪।১-২৫; অথ ৬।১১২।৩ ঘ; বাঃ সঃ ৩০।৫।১৩; সৈঃ সঃ ৪।১৪।১৭; তৈঃ ব্রাঃ ৩।৭।১২); অপরপক্ষে সততা, সরলতা, সহানুভূতি, বদান্যতা, অহিংসা, সত্যপরায়ণতা, হিত এবং

মনোহারী বাক্য, সংযম ও ব্রহ্মচর্য, সশ্রদ্ধবিশ্বাস, এবং কৃচ্ছ্রসাধন উচ্চপ্রশংসিত পুণ্য বলিয়া গণিত হইত। (ঋঃ সঃ ১০।১১৭।১৫৪ ; অথ ১১।৫ ; গোঃ ব্রাঃ ১।২।১-৪ ; বাঃ সঃ ১৯।৭৭ ; ২৬।২ ; কৌঃ ব্রাঃ ২।৮) যজ্ঞে যে পশুকে বলি দেওয়া হয় সে নিহত হয় না, স্বর্গে যায়—এই উক্তি কেবলমাত্র হত্যা সম্বন্ধে দ্বিধা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে (ঋঃ সঃ ১।১৬২।২১ ; ঐঃ ব্রাঃ ২।৬)। একই যজ্ঞের তিনবার অনুষ্ঠান, অবৈধ ভোজন এবং যথেচ্ছ দানগ্রহণ—এগুলিও দুঃখের কারণ (তৈঃ সঃ ১।১।১৩।৩ ; পঞ্চ ব্রাঃ ১৯।৪।১০-১১)। পাপীর সংসর্গও অশুচিতার কারণ (অথ ৭।৬৫।৩)। পাপীর বোধশক্তির অভাব থাকিলে (ঋঃ সঃ ৭।৮৬।৬ ; শঃ ব্রাঃ ৪।৪।৫।২৩) অথবা সে দোষ স্বীকার করিলে (শঃ ব্রাঃ ২।৫।২।২০) তাহার দুষ্কার্যের হেয়ত্ব হ্রাস পাইতে পারে, কিন্তু অজ্ঞানকৃত, আকস্মিক বা অনিবার্য পাপকার্যের জন্য প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন হয় (তৈঃ ব্রাঃ ২।৭।১২।১-৪)।

এক পরিবারভুক্ত ব্যক্তিগণকে পারস্পরিক অনুরাগ, শ্রদ্ধা ও অন্তরঙ্গতা, পিতা-মাতার আনুগত্য, একক্রিয়তা, মধুর হিতবাক্য, দাম্পত্য প্রেম ও দায়িত্ববোধ এই গুণগুলি অর্জন করিতে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে (অথ ৩।৩০ ; ঋঃ সঃ ১।৭৩।৩ ঘ ; ১০।৩৪।২)। জায়া স্নেহের উচ্চাসনের অধিকারী বলিয়া স্বীকৃত (ঋঃ সঃ ৩।৫৩।৪ক ; ১০।৮৫।৪৬ ; তৈঃ সঃ ৬।১।৮।৫ ; শঃ ব্রাঃ ৫।২।১।১০)। কোন কোন ক্ষেত্রে নারীর আপন পতি নির্বাচনের (ঋঃ সঃ ১০।২৭।১২ ; তৈঃ ব্রাঃ ২।৪।২।৭) এবং পুনর্বিবাহের অধিকার ছিল (অথ ৯।৫।২৭-৮) এবং পুরুষদিগের বহুবিবাহ অনুমোদিত হইলেও নারীর বহুপতিগ্রহণ অনুমোদিত ছিল না (তৈঃ সঃ ৬।৫।১।৪ ; শঃ ব্রাঃ ৯।৪।১।৬ ; গোঃ ব্রাঃ ২।৩।২০)[১৭]

প্রত্যেক ব্যক্তি ঋষি, দেবতা, পিতৃপুরুষ, নর ও পশুদের নিকট ঋণ লইয়াই সমাজে জন্মগ্রহণ করে এবং এই ঋণ যথাক্রমে স্বাধ্যায় (বেদপাঠ) যজ্ঞ, প্রজনন অতিথিসৎকার ও আহার্য দিয়া পরিশোধ করিতে হয়—এই পাঁচটিকে পঞ্চ 'মহাযজ্ঞ' বলা হইয়াছে (তৈঃ সঃ ৬।৩।১০।৫ ; শঃ ব্রাঃ ১।৭।২।১-৫ ; ১১।৫।৬।১)। যাজক (ব্রহ্মন্, ব্রাহ্মণ), শাসক (রাজন্য, ক্ষত্রিয়) এবং বৃত্তিজীবী (বিশ্, বৈশ্য) শ্রেণী দ্বারা গঠিত যে সমাজ প্রাচীনতম যুগ হইতেই চলিয়া আসিতেছিল বলিয়া মনে হয় তাহা একটি সেবক শ্রেণীকে (শূদ্র) অঙ্গীভূত করিয়া শক্তিমান্ হইয়া উঠিল। এই শূদ্রেরা এতদিন দাস বলিয়াই পরিচিত ছিল (অথ ৪।২০।৪-৮ ; ৫।২২।৭ ; তৈঃ সঃ ৩।২।৬।২)। আর্য বলিতে কিন্তু কেবল প্রথম তিন শ্রেণীকেই বুঝাইত, কিন্তু তখন পর্যন্ত জাতিভেদ প্রথার কঠোরতার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এই যুগেই

প্রথম আর্যের জীবনকে চারিটি ক্রমিক অবস্থায় বিভক্ত করা হইয়াছিল, যথা ব্রহ্মচর্য (ছাত্রাবস্থা) গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস। এইগুলিকে 'আশ্রম' বলা হইত এবং এইগুলির মধ্য দিয়া মানুষ আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিবে এইরূপ মনে করা হইত।[১৮] অথর্ববেদে (৭।১৫) শ্রমবিমুখ ব্যক্তির সমৃদ্ধিলাভের সম্ভাবনাকে স্পষ্টভাবেই অস্বীকার করা হইয়াছে।

রাষ্ট্রসংক্রান্ত ব্যাপারে দেখা যায় যে জননির্বাচিত এবং জনপ্রিয় রাজা (ঋঃ সঃ ১০।১২৪।৮ গ; ১০।১৭৩।১; অথ ৪।৮।৪) প্রজাদের রক্ষক ছিলেন (ঋঃ, সঃ ৩।৪৩।৫)। তাঁহার অনুগত মিত্র থাকিত (ঋঃ সঃ ১।৭৩।৩ খ) এবং তিনি ধনীদের সাহায্যপুষ্ট হইতেন (ঋঃ সঃ ১।৬৫।৭ খ)। শিষ্টাচারসঙ্গত বচন (বাঃ সঃ ২৬।২) সম্প্রীতি এবং একপ্রাণতা (ঋঃ সঃ ১০।১৯১) এবং রাষ্ট্রের মধ্যে পরম সমৃদ্ধির (বাঃ সঃ ২২।২২; ঋঃ সঃ ১।৯১।২০) জন্য উদ্বেগপ্রকাশ হইতে সেই যুগে নাগরিক দায়িত্ববোধ কতটা অধিক ছিল তাহা বুঝা যায়।

সৎকর্মের চরম লক্ষ্যরূপে কখনও সমৃদ্ধি (ঋঃ সঃ ১।১৮৯।১; ৮।৯৭।১৩), কখনও স্বর্গ (ঋঃ সঃ ১০।১৪৫।৪; অথ ১১।৪।১১) কখনও বা অমৃতত্বের (অথ ১১।৫।১৯) উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু ১০।৩১।২ ঋকে মানুষের বিবেক ও প্রজ্ঞাসম্মত সৎকর্মের নিজস্ব মূল্য আছে বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে এইরূপ মনে হয়।

§৬ বিশ্বতত্ত্ব এবং সৃষ্টিতত্ত্ব

বৈদিক ভারতবাসীর কাছে বিশ্ব তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত—পৃথিবী, অন্তরীক্ষ এবং নভোমণ্ডলের বাহিরে অবস্থিত স্বর্গ। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর অবস্থান, পারম্পর্য বা আচরণের অমোঘত্ব বা নিয়মানুবর্তিতা 'ঋত' নামক সর্বব্যাপী শৃঙ্খলার উপর নির্ভরশীল। সূর্যের স্বয়ংনির্ভরশীলতার এবং ঊষা, ঝঞ্ঝা প্রভৃতির প্রকাশের কারণরূপে বেদে কখনও কখনও স্বধা (ঋঃ সঃ ১।৬৪।৪; ৪।১৩।৫; ৭।৭৮।৪) নামক একটি অন্তর্নিহিত শক্তির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। স্বর্গ ও পৃথিবী স্তম্ভের উপর দাঁড়াইয়া আছে এইরূপ কল্পনা করা হইয়াছে, কিন্তু ইহা যে রূপকমাত্র তাহা বুঝা যায়, কারণ ইহার বিরোধী সুস্পষ্ট উক্তিও দেখিতে পাওয়া যায়। (ঋঃ সঃ ২।১৫।২; ৪।৫৬।৩; ১০।১৪৯।১) বিশ্বের উৎপত্তি বা সৃষ্টির সমস্যা যথেষ্ট কৌতূহলের সঞ্চার করিত (ঋঃ সঃ ১।১৬৪।৪; ১০।৩১।৭, ১০।৮১।২ ইত্যাদি)। বিভিন্ন সূক্তে, ব্রাহ্মণে, এবং কৃষ্ণযজুর্বেদান্তর্গত ব্রাহ্মণাংশে সৃষ্টিসম্বন্ধে অনেক

কাল্পনিক উপাখ্যান আছে। কিন্তু সেগুলির দার্শনিক তাৎপর্য অতি অল্প বলিয়া সৃষ্টিতত্ত্বপ্রসঙ্গে বেদে যে উচ্চাঙ্গের চিন্তার সন্ধান পাওয়া যায়, তাহার প্রকৃত মূল্য নির্ধারণের জন্য আমরা এখানে প্রধানতঃ ১০।৭২ এবং ১২৯ ঋকে এবং অন্যান্য স্থানে এই সম্বন্ধে যে সকল উক্তি আছে সেইগুলির আলোচনা করিব।

ঋঃ সঃ ১০।১২৯ সূক্তে বলা হইয়াছে যে, প্রাথমিক অবস্থায় 'অসৎ' বা 'সৎ' কিছুই ছিল না, বাতাস বা স্বর্গ, কোন আবরণ[১৯], আশ্রয়, জল বা গভীর গহন, মৃত্যু বা অমৃত, দিন বা রাত্রির কোন চিহ্ন ছিল না। "আপন অন্তর্নিহিত শক্তি (স্বধা) দ্বারা সেই নির্বাত 'এক' স্পন্দিত হইতেছিল", এবং ইহা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। অন্ধকার দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল এবং সমস্তই একাকার সলিলরূপ ছিল[২০]। তাহার পর সেই সম্ভূয়মান (আভুঃ)[২১] 'এক' যাহা শূন্যতার (তুচ্ছ্য) অন্তরালে ছিল তাহাই তপের (অন্তর্নিহিত দুর্দমনীয় শক্তি) প্রভাবে প্রকাশিত হইল। ইহা হইতে মনের আদিবীজ কামের উদ্ভব হইল। জ্ঞানীগণ অন্তরে অন্বেষণ করিয়া মনীষাদ্বারা অসতের মধ্যে সতের সূত্র (অর্থাৎ কারণ) খুঁজিয়া পাইলেন। তাঁহাদের পরিমাপক রজ্জু উপরে এবং নীচে বিস্তৃত হইয়া উৎপাদকসমূহ (রেতোধাঃ) এবং মহান্ শক্তিসমূহকে (মহিমানঃ)—অধোদেশে অন্তর্নিহিত প্রেরণা (স্বধা) এবং ঊর্ধ্বদেশে প্রযত্নকে (প্রয়তি) (১—৫ ঋক্) আবিষ্কার করিল।

এই সূক্তে বলা হইয়াছে যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের আবির্ভাবের পূর্বে এমন কিছু ছিল যাহাকে সৎ বা অসৎ কিছুই বলা যায় না,[২২] অর্থাৎ যাহার সহিত কালের কোন সম্পর্ক নাই। যাহা দ্বারা এই অনির্বচনীয় কিছুর ধারণা করিতে পারা যায় এমন কোন ঘটনাবলী ছিল না—এমন কি ইন্দ্রিয়গণ, মন এবং সমগ্র প্রাকৃত জগৎ তখন পর্যন্ত অস্ফুট ছিল। সৃষ্টিতত্ত্ব প্রসঙ্গে শ্রুতিতে প্রায়ই তপঃ শব্দটি পাওয়া যায় (ঋঃ সঃ ১০।১৯০।১; অথ ১০।৭।১; ১১।৮।২ ইত্যাদি) এবং সৃষ্টিক্রিয়ার পূর্বে প্রজাপতি তপস্যা করিয়াছিলেন ইহা স্পষ্টই বেদের ব্রাহ্মণাংশে উল্লিখিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে কিন্তু অথর্ববেদের উক্তি (১১।৮।৬)—"তখন তপঃ ছিল এবং কর্ম ছিল এবং তাহারা মহত্তমকে অর্চনা করিল," খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। সমবেত কর্ম হইতে এই জগতের উদ্ভব হইয়াছে এই মতবাদের সূচনা সম্ভবতঃ এইখানে পাওয়া যায় এবং তপঃ হয়ত 'অপূর্ব' 'অদৃষ্ট' ইত্যাদি পরবর্তীকালের ধারণার মত সমবেত কর্মের অন্তর্নিহিত শক্তির দ্যোতক মাত্র। আলোচ্যমান সূক্তে 'উদ্বেল সমুদ্র' অর্থে ব্যবহৃত 'অর্ণব' শব্দ, উপরে আলোচিত 'সলিল' এবং 'অপ্' (অথ ১০।২।৭; ৮।৩৪।৪০ ইত্যাদি) প্রভৃতি শব্দ কেবলমাত্র নিরাকার, অসীম, বিশ্বের চিরন্তন উৎসস্বরূপ অব্যক্ত শক্তির

দ্যোতক রূপেই ব্যবহৃত হইতে পারে, এবং নিঃসন্দেহে ইহাকেই পরবর্তীযুগে কারণ-বারি বলা হইয়াছে। 'কাম' সৃষ্টির প্রেরণামাত্র[২৩] এবং সমবেত মন বা বিশ্ব-মন এই কাম হইতেই উদ্ভূত। 'রেতোধাঃ' শব্দ পরবর্তীযুগে যাহাকে জীবাত্মা বা পুরুষ বলা হইয়াছে তাহাই বুঝাইতেছে এবং 'মহিমানঃ' শব্দ পরবর্তীযুগের দর্শনে ব্যবহৃত প্রকৃতির গুণগুলিকে বুঝাইতেছে। প্রযত্ন (প্রয়তি) এবং অন্তর্নিহিত প্রেরণা (স্বধা) বিপরীতক্রমে[২৪] এই দুইটিকে বুঝাইতেছে। পরবর্তী দর্শনের ভাষায় প্রকৃতিতে কতকগুলি অন্ধপ্রবণতা এবং জীবাত্মাদের কতকগুলি স্থায়ী মানসসংস্কার (কামনা—এখানে সংস্কার = তপঃ) আছে এখানে তাহাই বলা হইয়াছে।

ঋঃ সঃ ১০।৭২ হইতে আমরা তখনকার সৃষ্টিতত্ত্বের ধারণার আরও কিছু উপাদান পাই। "দেবতাদের আদিমতম যুগে অসৎ হইতে সতের উদ্ভব হইল। তাহার পর দিক্‌গুলি অর্থাৎ ব্যোমের আবির্ভাব হইল। এই সত্তাই বিশ্ব হইতে উদ্ভূত হইল, অর্থাৎ বিশ্বে প্রকাশিত হইল। অদিতি হইতে দক্ষ জন্মিলেন এবং দক্ষ হইতে অদিতি জন্মিলেন। কারণ, "হে দক্ষ! যখন তোমার কন্যা অদিতি জন্মিয়াছিলেন তখন তাঁহার পরে মহানুভব ও অমৃতত্বের সহিত সম্পর্কযুক্ত দেবতারা জন্মিলেন।" (২।৫) এস্থলে 'সৎ' বলিতে আদিমতম জগৎ যাহাকে দেশ ও কালে স্থাপিত করা যায় তাহাকেই বুঝিতে হইবে এবং অসৎ বলিতে তাহারও পূর্বে দেশকালাতীত যাহা ছিল তাহাকে বুঝিতে হইবে। 'বিস্তৃত-রূপে অবস্থিত' (উত্তান-পদ) (অথ ৩।২১।১০তে জলসমূহকে 'আপঃ' 'উত্তানশীবারিঃ' অর্থাৎ বিস্তৃতরূপে অবস্থিত বলা হইয়াছে) শব্দটি কেবলমাত্র উপরে উল্লিখিত সলিল বা অপ্‌ নামক অসীম, অনির্দেশ্য বস্তুকে বুঝাইতে পারে। ৫।৪-এর প্রথমার্ধ ৫।৩-এরই ব্যাখ্যা মাত্র, কিন্তু ইহার দ্বিতীয়ার্ধে অপর একটি প্রয়োজনীয় তথ্যের ব্যাখ্যা আছে। যে 'অদিতি' শব্দের আক্ষরিক অর্থ 'সীমাহীনতা' বা 'অসীমতা' তাহা এখানে 'উত্তান-পদ' বা অসৎ বলিয়া যাহাকে বিবৃত করা হইয়াছে কেবলমাত্র তাহাই বুঝাইতে পারে এবং 'দক্ষ' শব্দ যাহার আক্ষরিক অর্থ 'বুদ্ধি' বা 'চৈতন্য' তাহা বিষয়ীতত্ত্বকেই বুঝাইতে পারে। এই ভাবে অদিতি হইতে দক্ষের আবির্ভাবের বিবরণের সহিত চরক-সংহিতায় উদ্ধৃত (৪।১।৬১।৬৫) যে সাংখ্য মতবাদে অব্যক্তকে প্রকৃতি-পুরুষের ভেদের আবির্ভাবের পূর্ববর্তী অবস্থা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহার সহিত সামঞ্জস্য আছে; আর দক্ষ হইতে অদিতির আবির্ভাবের বিবরণে যে মতবাদ অনুসারে চিন্মাত্রই প্রথম তত্ত্ব এবং জড়বস্তু ইহারই উপাধি বা গুণ তাহারই সূচনা দেখিতে পাওয়া যায়।

কোন কোন স্থলে সৃষ্টি একবারমাত্র হইয়াছিল এইরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়

(ঋঃ সঃ ৬।৪৮।২২ ; ১০।৭৪।৪ ; বাঃ সঃ ৩৩।২৮)। কিন্তু ঋঃ সঃ ১০।১৯০।৩তে স্রষ্টা (ধাতা) বিভিন্ন জাগতিক বস্তুকে পূর্বের মত (যথাপূর্বম্) এবং অথ ১০।৭।২৬তে স্কম্ভ সৃজনকালে পুরাতনকেই আবর্তিত করিয়া রূপায়িত করিয়াছিলেন বলা হইয়াছে, অন্যদিকে আবার প্রায়ই সৃষ্টি ও প্রলয় চরমসত্তায় নিরবচ্ছিন্নভাবে ঘটিতেছে (অথ ১০।৮।২৯ ; ৩৯।৩২ ; ঋঃ সঃ ১০।৯০।২ ইত্যাদি) এবং অমৃতত্ব এবং মৃত্যু ইহারই অন্তরে অনুস্যূত আছে (ঋঃ সঃ ১০।১২১।২ ; অথ ১০।৭।১৫) ইহাও বলা হইয়াছে।

§৭ মৃত্যুতত্ত্ব

বৈদিক যুগের ভারতীয়দের যে পরজগৎ অপেক্ষা ইহজগতেই অধিক অনুরক্তি ছিল তাহা কেবলমাত্র তাঁহাদের দীর্ঘজীবন এবং তাহার সৌভাগ্যসুখের জন্য প্রার্থনা হইতে নয়, পরন্তু এই জগৎকে 'সর্বাপেক্ষা প্রিয়' (অথ ৫।৩০।১৭) অথবা অমৃতত্বপূর্ণ জগৎরূপে বর্ণনা (অথ ৮।১।১) এবং পরজগৎ সম্বন্ধে কোন কোন স্থলে আস্থাহীনতা-সূচক ইঙ্গিত (কাঃ সঃ ৮।৮ ; তৈঃ সঃ ৬।১।১) হইতেও বুঝা যায়। মর্ত্যজীবের অমৃতত্ব বুঝাইতে 'ঐহিক উন্নতি' (কাঃ সঃ ৮।১) বা পূর্ণায়ু জীবন (অর্থাৎ শত বৎসর) এবং সমৃদ্ধি (পঃ ব্রাঃ ২২।১২।২) এবং সন্ততির মধ্য দিয়া নিজের জীবনকে রক্ষা করার (তৈঃ ব্রাঃ ১।৫।৫।৬ ; ঋঃ সঃ ৫।৪।১০) কথাই বলা হইয়াছে। পুনর্জন্ম-লাভকে এমনকি পুরস্কারস্বরূপ গণ্য করা হইয়াছে। অতএব ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই যে, পরজীবনসম্পর্কিত চিন্তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু দ্বারাই উদ্বোধিত হইয়াছে। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পর্কে নানা কাহিনীর সৃষ্টি হইয়াছিল, কিন্তু মৃতদেহ সৎকারের অন্যান্য পদ্ধতির উল্লেখও মাঝে মাঝে দেখিতে পাওয়া যায়) অথ ১৮।২।৩৪ ; ঋঃ সঃ ১০।১৮।১০-১৩)। অগ্নি মৃত ব্যক্তিকে বহন করিয়া সর্বোচ্চ স্বর্গে পিতৃপুরুষদের সকাশে লইয়া যান, এবং এখানে তাহাদের পথ-প্রদর্শক এবং রাজা যম এবং বরুণের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয় (ঋঃ সঃ ১০।১৪।১, ৭, ৮)। এই প্রক্রিয়াটিকে অসু-নীতি বা অসু নীত—'আত্মাকে পথপ্রদর্শন' অথবা 'সূক্ষ্মাবস্থায়' লইয়া যাওয়া (ঋঃ সঃ ১০।১৫।১গ) নামে অভিহিত করা হয়। অগ্নি শুধু দেহকে দগ্ধ করেন, কিন্তু জীবের 'অজাত অংশ'[২৫] বা বিদেহ আত্মা জ্যোতিষ্মান্ (ঋঃ সঃ ১০।৫৬।১) এবং পূর্ণায়ত (৬।১২০।৩) দেহ ধারণ করিয়া যেন পিতা মাতা হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়। (শঃ ব্রাঃ ২।২।৪।৮) মৃত ব্যক্তি ইহলোকে তাহার উদ্দেশ্যে উৎসৃষ্ট দ্রব্যাদি ভোগ করে এবং স্বর্গের আনন্দসমূহও উপভোগ করে—এইরূপ যে

বর্ণনা আছে তাহা হইতেই বুঝা যায় যে, এই দেহ স্থূল না হইলেও ইন্দ্রিয়-বিশিষ্ট। স্বর্গত আত্মার দেহের এই ধারণা পরবর্তীযুগের সূক্ষ্মশরীরের ধারণার অনুরূপ[২৬]।

ঋঃ সঃ ৯।১১৩।৭-১১তে স্বর্গস্থ প্রমোদের বর্ণনা করিয়া বলা হইয়াছে যে, "সেইখানে চির-উৎসারিত আলোক এবং বেগবতী স্রোতস্বিনী আছে, সকলের গতি অবারিত, শক্তি, অন্ন এবং তৃপ্তির প্রাচুর্য, উল্লাস, সচ্ছলতা, আনন্দ ও সর্বকামের পরিতৃপ্তি আছে"[২৭]। বেদের অন্যান্য স্থানে আরও কয়েকটি আনন্দপ্রদ বর্ণনা আছে (ঋঃ সঃ ১০।১৩৫।৭ ; অথ ৩।২৯।৩ ; ৪।৩৪ ; শঃ ব্রাঃ ১৪।৭।১।৩২-৩৩ প্রঃ)। সদ্যোমৃতকে এইস্থানে লইয়া যাইবার জন্য অগ্নির নিকট প্রার্থনা করা হইতেছে (ঋঃ সঃ ১০।১৫৪।২-৫)। যাঁহারা কঠোর নিয়ম পালন (তপঃ) করিয়াছেন, যুদ্ধে বীরের মৃত্যু বরণ করিয়াছেন, প্রভূত যজ্ঞানুষ্ঠান ও আহুতিপ্রদান করিয়াছেন, কিম্বা সত্যপরায়ণতার (ঋত) নিয়ম পালন করিয়াছেন, এই স্থান কেবলমাত্র তাঁহাদেরই জন্য নির্দিষ্ট। বিপরীতক্রমে, যে স্থানে অধিকারানুযায়ী পাপীরাই স্থান পায়, সেই নরককে 'অতলস্থান', 'অন্তহীন গভীর' 'অনিরূপ্য তমিস্রা' (ঋঃ সঃ ৪।৫।৫ ; ৭।১০৪।৩,১৭) বা 'হীনতম, কৃষ্ণ বা অন্ধ তমিস্রা' (অথ ৮।২।২৪ ; ৫।৩০।১১ ; ৯।২।১০) বলিয়া অস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। বাঃ সঃ ৩০।৫ এবং অথ ১২।৪।৩৬ এই প্রথমে এই স্থানকে 'নরক' বা 'নারক লোক' বলা হইয়াছে। অথ ৫।১৯এ নরকযন্ত্রণার সামান্য বর্ণনা আছে, এবং শঃ ব্রাঃ ১১।৬।১ ও জৈঃ ব্রাঃ ১।৪২-৪৪তে ইহার বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়।

স্বর্গস্থিত আত্মা যজ্ঞ এবং দানাদি কর্মের ফল ভোগ করে (ঋঃ সঃ ১০।১৪।৮ ; বাঃ সঃ ১৮।৬৪)। পূর্বেই বলা হইয়াছে (§৬) যে, অথর্ববেদে 'কর্মন্' শব্দটির ব্যবহার অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ (১১।৭।১৭)। শঃ ব্রাহ্মণে বলা হইতেছে যে, "মানুষ তাহার আপনার নির্মিত জগতেই জন্মগ্রহণ করে" (৬।২।২।২৭) এবং মানুষের পুণ্য ও পাপ কর্মের মূল্য নির্ধারণ করিবার জন্য তাহাকে পরজগতে তুলাদণ্ডে স্থাপিত করা হয় (১১।২।৭।৩৩)। সুতরাং যথাযোগ্য পুরস্কারের ধারণা ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইতেছে দেখা যায়। শঃ ব্রাঃ ১০।৬।৩।১ আরও অগ্রসর হইয়া ঘোষণা করিয়াছেন যে, যেহেতু মানুষ তাহার কামনাদ্বারাই গঠিত (ক্রতুময়), সেই হেতু সে পরজগতে এইগুলি লইয়াই জন্মগ্রহণ করিবে।

ঋঃ সঃ ১০।১৬।৩এ বিগতদেহ আত্মাকে অন্যান্য স্থানের মধ্যে উদ্ভিদ্‌গণের মধ্যে যাইতে এবং সেইখানে দেহযুক্ত হইয়া থাকিতে বলা হইয়াছে। ম্যাক্‌ডোনেল[২৭] এইস্থলে পুনর্জন্মবাদের সূচনা আছে বলিয়া মনে করেন। পুনর্জন্মসম্পর্কে ক্রমবর্ধমান

বিশ্বাসের পরিচয় ব্রাহ্মণগুলিতে (যেমন শঃ ব্রাঃ ১।৫।৩।১৪ ; ১০।৪।৩।১০) পাওয়া যায় এবং জন্মান্তর বুঝাইবার জন্য 'পুনর্মৃত্যু', 'পুনর্-অসু (পুনরায় জীবনলাভ—শঃ ব্রাঃ, তৈঃ ব্রাঃ) এবং পুনর্ আয়াতি (পুনর্জন্ম) প্রভৃতি শব্দ সৃষ্টি করা হইয়াছে। কোন কোন পণ্ডিত[২৮] 'পুনর্মৃত্যু'কে পরজগতে পুনরায় মৃত্যু বলিয়া ব্যাখ্যা করেন এবং মনে করেন যে, ইহার সহিত জন্মান্তরে বিশ্বাসের কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু কোন মৃত ব্যক্তির 'পুনঃপুনঃ মৃত্যু' বলার মধ্যে কোন অর্থই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। 'পুনর্জন্মে'র পরিবর্তে 'পুনর্মৃত্যু'র কথাই যে বৈদিক মানবেরা বেশী চিন্তা করিতেন তাহার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, তাঁহারা মৃত্যুকেই অধিক ভয় করিতেন, পরবর্তী যুগের মানবদের মত জন্মকে নয়।[২৯] তাঁহাদের এই দৃষ্টিভঙ্গীর দিক্ হইতে ব্যাখ্যা করিলে ঋঃ সঃ ১০।১৪।৮ গ'তেও পুনর্জন্মেরই আভাস রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই সূক্তে মৃত ব্যক্তিকে 'পুনরায় গৃহে আসিতে'[৩০] বলা হইতেছে এবং ঋঃ সঃ ১০।১৬।৫এ অগ্নির নিকট তাহার আয়ুঃ এবং সন্ততিলাভের জন্য প্রার্থনা করা হইতেছে।

শঃ ব্রাঃ ২২।২।৬।১৩-১৪ এবং ১০।৬।৩।১-২এ দেবারাধনা অপেক্ষা যথার্থ পদ্ধতিতে ধ্যানের সাহায্যে আত্মার ভজনা করাকে অধিক মূল্যবান ফলপ্রদ বলিয়া শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। আত্মা সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানের সাহায্যে মৃত্যু বা পুনর্জন্মের আতঙ্ক হইতে চরম মুক্তিলাভ হইতে পারে এই বিশ্বাস এবং জগতের ঘটনাপরম্পরা সম্পর্কে অধিকতর তত্ত্বান্বেষী মনোভাব সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। (§৪, §৬)

§৮ মনোবিজ্ঞান

সমস্ত মানসিক ক্রিয়া যে বস্তুদ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে তাহার সাধারণ নাম 'মনস্'। এই শব্দটি প্রায়ই যাহা চিন্তা করে, আবার যাহা দেহকে সঞ্জীবিত করে, এমন বস্তুকেই বুঝাইয়া থাকে। (ঋঃ সঃ ১।১৬৪।১৮ ; ১০।৫৭।৪-৬ ; ৫৯।৫ ইত্যাদি)। মনকে হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট 'আলোক' রূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। ঋঃ সঃ ৬।৯।৬ ; ৭।৩৩।৮ ; বাঃ সঃ ৩৪।১-৬ এ ইহার আলোচনা আছে। বহুস্থলে আবার যে বস্তু দেহকে সঞ্জীবিত করে কেবলমাত্র তাহাকেও বুঝাইতে এই শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে এবং ইহাকে অপর বস্তু হইতে পৃথক্ করা হইয়াছে। (ঋঃ সঃ ৩।২৬।৮ ; অথ ১০।২।৩১-৩২ ; ৮।২৮।৪৩)। সাধারণতঃ হৃদয়কে মনের আধার বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে, কিন্তু কোন কোন স্থলে হৃদয় একটি ইন্দ্রিয় এবং মন হৃদয়ের ক্রিয়া মাত্র (ঋঃ সঃ ৩।২৬।৮ ; ৫।৫৬।২ ; ১০।৭১।৮ ইত্যাদি) অথবা হৃদয়ের সম্পূর্ণ অন্ত ক্রিয়া আছে এই বলিয়া হৃদয়

এবং মনের মধ্যে পার্থক্য করা হইয়াছে। (অথ ৩।২০।৯; ৫।২১।২; ঋঃ সঃ ১০।১৯১।৪)। অল্প কয়েকটি স্থলে কিন্তু মস্তককে বিশেষ কতকগুলি মানসক্রিয়ার আবাসস্থলরূপে কল্পনা করা হইয়াছে (ঋঃ সঃ ২।১৬।২; ৮।৯৬।৩; ৫।৫৭।৬)। "আত্মার বাসস্থানস্বরূপ নবদ্বারবিশিষ্ট ত্রিগুণ-সমন্বিত পদ্ম" (অথ ১০।৮।৪৩) স্পষ্টই মনের সহিত অভিন্ন হৃদয়কেই বুঝাইতেছে। এই উদ্ধৃত বচনটিতে মনের সাংখ্যসম্মত উপাদানগুলির ইঙ্গিত রহিয়াছে। (ইহার সহিত অথ ৮।২।১ যেস্থলে রজস্ এবং তমস্ এই দুইটি শব্দ একত্রে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাও তুলনীয়)। কামনাকে পূর্বেই মনের প্রথম বীজরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। (§৬)

ঋঃ সঃ ১০।১৬৪; অথ ১৯।৫৬-৫৭এ মনের জাগ্রৎ, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি এই তিনটি অবস্থার কথা বলা হইয়াছে। স্বপ্নকে "জীবিতাবস্থা এবং মৃত্যু এই দুই হইতে পৃথক্" "এবং উত্তপ্ত মন-প্রসূত" (অথ ১৯।৫৬।৫) বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। অন্য সকলে যখন সুপ্ত তখন প্রাণ সতেজ ও জাগ্রত থাকে (অথ ১১।৪।২৫)। মহীধর বাঃ সঃ ৪।১৯এ চিৎ, মনস্ এবং ধী শব্দগুলিকে যথাক্রমে পরবর্তী যুগের চিত্ত, মন এবং বুদ্ধি শব্দের সহিত একার্থক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। চিত্তের ক্রিয়া নির্বিকল্প জ্ঞান, মনের ক্রিয়া সঙ্কল্প বিকল্প এবং বুদ্ধির ক্রিয়া নিশ্চয়। মনের ক্ষিপ্রতা ও চাঞ্চল্য এবং ইহার সর্ব দেশও সর্ব কালব্যাপিত্ব সম্বন্ধে প্রায়ই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। (বাঃ সঃ ৩৪।১।৪; অথ ১০।৭।৩৭) অথ ১৯।৯।৫ এ পঞ্চেন্দ্রিয় এবং ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়রূপে মনের উল্লেখ আছে। কিন্তু ঋগ্বেদে ইন্দ্রিয় শব্দ 'ইন্দ্রের সম্পর্কিত' বা ইন্দ্রের শক্তি বা ক্ষমতা অথবা তত্তুল্য শক্তি বা ক্ষমতা অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। শঃ ব্রাঃ ১১।৫।৭।১এ প্রাপ্ত ইন্দ্রিয়-সংযম, একারামতা (মনের অভিনিবেশ) এবং যুক্ত-মনস্[৩১] (মনেতে অভিনিবেশ) শব্দগুলি যোগদর্শনের সূচনা করে।

§৯ যুক্তি-বিজ্ঞান

ঋগ্বেদে মানবের অজ্ঞতার কথা (১।১৬৪।৫, ৬; ১০।৮৮।১৮ ইত্যাদি) এবং সত্যের অনিরূপ্যতার কথা (৫।৮৫।৮; ১০।১৩৯।৫; ৮।১০০।৩) স্পষ্টভাবেই স্বীকার করা হইয়াছে। (১) ইন্দ্রিয় বা মনের সাহায্যে প্রত্যক্ষজ্ঞান (১।১৮৪।২; ৮।২৫।৯; ১০।৬৭।২; ১০।১৩০।৬ (২) জ্ঞানীর বচন (১।১৬৪।৪; ১০।১২৯।৬) এবং (৩) মনের দ্বারা অনুসন্ধান অর্থাৎ অনুমান (১০।৮১।৪; ১০।১২৯।৪,৫) সত্যে উপনীত হইবার বিভিন্ন উপায়। বিশেষ অন্তর্দৃষ্টির উৎসরূপে তপশ্চর্যার উল্লেখ শুধু ব্রাহ্মণ এবং অপর

বেদগুলিতেই নয়, এমন কি ঋগ্বেদেও রহিয়াছে (তৈঃ সঃ ৫।৩।৫।৪ ; ঋঃ সঃ ৮।৫৯।৬)। জ্ঞানের উৎস হিসাবে বেদগুলি যে অভ্রান্ত এবং স্বতন্ত্র প্রমাণ তাহা ব্রাহ্মণগুলিতে পূর্বেই স্বীকৃত হইয়াছে (শঃ ব্রাঃ ১০।৪।২।২১-২২ ; তৈঃ ব্রাঃ ৩।১২।৯।১) এবং সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষজ্ঞান এবং পরোক্ষজ্ঞানকে প্রায়ই পৃথক্ করা হইয়াছে।

উপাদানকারণ এবং নিমিত্তকারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা সুপ্রচলিত ছিল (ঋঃ সঃ ১০।৮১।২,৪ ; ১৬৮।৩)। 'নিদান' অর্থাৎ বন্ধন মূলকারণ (ঋঃ সঃ ১০।১১৪।২ ; ১৩০।৩, 'বন্ধু' অর্থাৎ সংযোগ>কারণ (ঋঃ সঃ ১০।১২৯।৪ ; অথ ৪।১।৩) 'নাভি' অর্থাৎ নাভিমণ্ডল>উৎস-মুখ (বাঃ সঃ ২৩।৫৯) এবং আরম্ভণ' অর্থাৎ ধারণ (পর্যালোচনা)>সম্পাদন (ঋঃ সঃ ১০।৮১।২ = বাঃ সঃ ১৭।১৮) প্রভৃতি শব্দের অর্থের বিবর্তনের ধারা হইতেও ইহা বুঝিতে পারা যায়। আরও কয়েকটি পারিভাষিক শব্দের প্রবর্তন অথবা তাহাদের অর্থের ক্রমপরিণতিও এই ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যাইতে পারে। এই শব্দগুলি এবং বন্ধনীর মধ্যে এইগুলি কোথা হইতে সংগৃহীত হইয়াছে তাহা দেওয়া হইল—'কারণ' (গোঃ ব্রাঃ), 'ক্ষেত্র'—ভূমি>পরিসর বা প্রসার এবং ক্ষেত্রবিদ্—কোন বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞানসম্পন্ন (ঋঃ সঃ) 'নানাত্ব'—ভেদ (ব্রাঃ), 'পক্ষ'—পাখা>(আলোচনায়) কোন বিশেষ মতের সমর্থক (ঋঃ সঃ) 'প্রকৃতি'—উৎস বা আদিরূপ (গোঃ ব্রাঃ), 'প্রাকৃত'—মৌলিক (শঃ ব্রাঃ) 'বিকৃত' —পরিবর্তন বা ভিন্নরূপ গ্রহণ (শঃ ব্রাঃ) 'ভূত' এবং 'ভুবন'—বস্তু (ঋঃ সঃ) এবং 'মজমন্', 'মহিমন্' বা 'মহমন্'—বৃহত্ত্ব বা শক্তি>গুণ (ঋঃ সঃ ; অথ ১০।২।১২)

খলু, বৈ হি প্রভৃতি অব্যয়দ্বারা সূচিত যুক্তিনির্ভর উক্তি প্রায়ই দেখা যায়। উপমানুমানের একটি দৃষ্টান্ত (ঋঃ সঃ ৮।৫৮।২) পূর্বেই উদ্ধৃত করা হইয়াছে। (§৪) (১) বিচিকিৎসা (সন্দেহ) (২) মীমাংসা (প্রগাঢ় চিন্তা) এবং (৩) স্থিতি (চরম সিদ্ধান্ত)—এই তিনটি উপাদানে গঠিত 'মীমাংসা' নামক একপ্রকার অবরোহানুমানের উল্লেখ ব্রাহ্মণগুলিতে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়।[৩২] 'প্রাশ্'—জিজ্ঞাসা বা সমস্যা, 'প্রতিপ্রাশ'—বিতর্কের প্রতিপক্ষ (অথ ২।২৭), 'প্রশ্নিন্'—প্রশ্নকর্তা, 'অভিপ্রশ্নিন্'-প্রতিপ্রশ্নকর্তা, 'প্রশ্নবিবাক'—মধ্যস্থ এবং 'মর্যাদা'—সীমা অর্থাৎ প্রচলিত নিয়মাবলী (বাঃ সঃ ৩০।১০) প্রভৃতি শব্দ হইতে সে যুগে বিতর্ক কিরূপ জনপ্রিয় ছিল তাহা বুঝা যায়। (i) ইষ্ (পুষ্টি)—ঊর্জ (বল) ইষ্ট (যজ্ঞ)—পূর্ত (দাক্ষিণ্য), নামন্ (বৈশিষ্ট্য)—রূপ (বহিরাকৃতি) প্রভৃতি ভিন্নার্থক কিম্বা (ii) বিদ্যা (জ্ঞান) —অবিদ্যা (অজ্ঞান) ; সৎ (ভাব)—অসৎ (অভাব) প্রভৃতি বিপরীতার্থক শব্দদ্বয়ের সাহায্যে চিন্তাপ্রকাশের রীতি ক্রমশঃই অধিক প্রচলিত হইতেছে। ব্রাহ্মণাংশগুলিতে

বিভিন্ন সমজাতীয় প্রসঙ্গ বা অবস্থার বর্ণনায় পরস্পরসম্বন্ধ অথচ বিরোধী ধারণার সুদীর্ঘ তালিকা রচনার প্রবণতা প্রায়ই দেখা যায় (অথ ১২।৫ ; ১৩।৪ ; ১৫।২-৭)। ব্যুৎপত্তি নির্ণয় দ্বারা বা অন্য উপায়ে শব্দের লক্ষণ নির্ণয়ের চেষ্টাও বিরল নয় (অথ ৩।১৩।১-১৪ ; ১১।৮।৩৪ ; কৌঃ ব্রাঃ ২।৮ ; শঃ ব্রাঃ ৪।১।৪।১)

চিন্তাও বাক্যের নিবিড় সম্পর্কের উপর প্রায়ই জোর দেওয়া হইয়াছে। (ঋঃ সঃ ৬।৯।৬ ঘ ; ১০।৭১।২ ; ১৭৭।২)। কৌঃ ব্রাঃ ২।৭ অনুসারে সমস্ত অনুভূতিকেই প্রকাশের পূর্বে ভাষায় রূপান্তরিত করিতে হইবে, আবার ৯।৩এ বলা হইতেছে যে, মন ও ভাষার মধ্যেই সব কিছু নিহিত আছে। ঋঃ সঃ ১।১৬৪।৪৫' এবং ৮।১০০।১০, ১১তে 'বাচ্' কে (স্বর, বাক্য) বিশ্বব্যাপী সুর-শক্তি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে এবং দ্বিতীয়োক্ত সূক্তে ইহাকে 'রাষ্ট্রী', সর্বময় শাসক এবং ঋঃ সঃ ১০।১২৫এ ইহাকেই রহস্যময় ঐশ স্বভাব, দেবতা, মানব এবং অন্যান্য সমস্ত বস্তুর ক্রিয়া-কলাপের নিয়ামক ও শাসকরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। ঋঃ সঃ ১০।৭১এ বাক্যের মনোহারী ও হিতকারী তাৎপর্য যত্নপূর্বক ও যথাযথভাবে প্রকাশ ও অনুধাবন করিতে হইবে ইহা বিশেষভাবে বলা হইয়াছে আর অথ ১০।৮।৩৩এ বলা হইয়াছে যে, শাশ্বতপুরুষই (অপূর্ব) বাক্যসমূহের প্রেরয়িতা এবং এই বাক্যগুলি সত্যকথা বলিয়া পরম দেবতার (ব্রাহ্মণম্) সমীপে গমন করে।

§১০ উপসংহার

পরবর্তীকালের ভারতীয় অধ্যাত্ম্য ও দার্শনিক চিন্তাধারার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য কিভাবে উদ্ভূত হইল তাহা উপরের আলোচনায় সুস্পষ্টভাবে দেখান হইয়াছে। যে সকল ভক্তিমার্গে পরব্রহ্মেরই প্রকাশরূপে কোন ইষ্টদেবতার কল্পনা করা হইয়াছে (§৩) এবং ভক্তির কোমলতা এবং ভক্তের কঠোর নৈতিক আচরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে (§২, §৫) তাহাদের সূচনা বেদে দেখিতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন রীতির তপশ্চর্যা, এমন কি তান্ত্রিক আচারগুলিরও পূর্বাভাস বেদে বর্তমান। (§২)। বেদান্তের অদ্বৈতবাদ এবং মায়া সম্বন্ধে ও জ্ঞানের মাধ্যমে মোক্ষলাভ সম্বন্ধে ইঙ্গিত (§৪), মীমাংসা মতানুযায়ী যজ্ঞের সর্বশক্তিমত্তা (§২) সাংখ্য দর্শন সম্মত ত্রিগুণ (§৮) এবং প্রকৃতির অন্ধ প্রবণতা (§৬) যোগদর্শনসম্মত ইন্দ্রিয়-সংযম এবং চিত্তের অভিনিবেশ (§৮) এবং ন্যায় বৈশেষিক মতানুসারে (§৯) ব্রহ্ম-প্রাপ্তির জন্য যথার্থ বৌদ্ধিক দৃষ্টি ও যথার্থ বাক্যের প্রয়োজনীয়তা এই সকলেরই পূর্বাভাস বেদে দেখিতে

পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত আত্মা (§৪), মন (§৭, §৮), পরব্রহ্ম (§৪) বিশ্বের অভিব্যক্তি (§৬), কর্ম (§৫, §৬, §৭), পুনর্জন্ম (§৭) এবং মোক্ষ (§৪) প্রভৃতি সম্বন্ধে সাধারণ সমস্যাগুলির আলোচনাও আছে। পরবর্তীকালে বেদগুলিকে যে যাবতীয় ধর্ম ও দর্শনের প্রধান উৎস বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছিল তাহাতে আশ্চর্যের বিষয় কিছু নাই।

সংক্ষিপ্ত শব্দের ব্যাখ্যা

(ক) মূল গ্রন্থ

ঐঃ ব্রাঃ	—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ
অথ	—অথর্ববেদ
ব্রাঃ	—ব্রাহ্মণ
গোঃ ব্রাহ্মণ	—গোপথ ব্রাহ্মণ
জৈঃ ব্রাঃ	—জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ
কৌঃ ব্রাঃ	—কৌষীতকি ব্রাহ্মণ
কাঃ সঃ	—কাঠক সংহিতা
মৈঃ সঃ	—মৈত্রায়ণীয় সংহিতা
পঃ ব্রাঃ	—পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ
ঋঃ সর্বাঃ	—ঋগ্বেদ সর্বানুক্রমণি
ঋঃ	—ঋগ্বেদ
শঃ ব্রাঃ	—শতপথ ব্রাহ্মণ
তৈঃ ব্রাঃ	—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ
তৈঃ সং	—তৈত্তিরীয় সংহিতা
বাঃ সং	—বাজসনেয়ী সংহিতা

(খ) অন্যান্য গ্রন্থ

এ এস্ লিঃ —Max Muller, History of Ancient Sanskrit Literature

বি আর ভি —Bloomfield's Religion of the Veda

গ্রাস্ —Grassman, Worterbuch zum Rigveda

জি আর আর —Griswold, The Religion of the Rigveda

জি ভি বি —Geldner, Vedismus und Brahmanismus

অচ আই লিঃ —Winternitz, History of Indian Literature (Eng. Trans.), Vol. I

আই পি —Radhakrishnan, Indian Philosophy Vol. I

এম্ ভি জি —Macdonell, Vedic Grammar

এম্ ভি এম্ —Macdonell, Vedic Mythology

এম্ ভি রী —Macdonell, A Vedic Reader

এম্ ডব্লিউ —Monier-Williams, A Sanskrit English Dictionary

ও এস্ টি —Muir, Original Sanskrit Texts Vols. I-V

আর পি ভি ইউ —Keith, Religion and Philosophy of the Veda and the Upanishads

দ্রষ্টব্য

১। এইগুলি এবং অন্যান্য বিশেষ বিষয়ের জন্য এচ্ আই লিঃ পৃঃ ৫৫-২২৫ দ্রষ্টব্য

২। এচ্ আই লিঃ ২৯২ ও পরবর্তী কয়েক পৃষ্ঠা

৩। ঐ ২৯৫ পৃঃ পাদটীকা

৪। আর পি ভি ইউ ৪৫৬ ও ৪৬২ পৃষ্ঠা

৫। ঋঃ ১০।৬৩।৪ এবং যাস্কের নিরুক্ত ৭।৪-১৩ দ্রষ্টব্য

৬। প্রায় অনুরূপ বিভাগ প্রথমে বি আর ভি ৯৬ পৃঃ এবং ১৫০ এবং পরবর্তী কয়েক পৃষ্ঠায় করা হইয়াছে

৭। এ এস্ লিঃ ৫২৬, ৫৩২, ৫৪৬ পৃষ্ঠা

৮। এম্ ভি এম্ ২৬ ও পরবর্তী কয়েক পৃষ্ঠা

৯। ও এস্ টি ৫ম খণ্ড ৫১ এবং পরবর্তী কয়েক পৃষ্ঠা

১০। দ্যাবাপৃথিবী, দেবতাগণ, অদিতি, দক্ষ, সবিতৃ, এক আদিত্য, দেবতাগণ, পুরুষ, বিরাজ্ প্রঃ ; এম্ ভি এম্ ১২ পৃঃ, ও এস্ টি ৫ম খণ্ড ৫০ পৃষ্ঠা

১১। ঋঃ ১।১১৫।১, ৩।৬২।১০, ৪।৫৩।৬

১২। এম্ ভি এম্ ১৩ পৃঃ আর এস্ ভূমিকা ২।১৪-১৫

১৩। জি ভি বি ৯৬ পৃঃ পাদটীকায় ইহার অন্তভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে

১৪। ঐ ১০৫ পৃঃ পাদটীকা

১৫। ঋঃ ৩।৫৩।৮, ৬।৪৭।১৮, ১০।৫৪।২ ; শঃ ব্রাঃ ১১।১।৬ § ৩এ পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে

১৬। § ৬ দ্রষ্টব্য

১৭। ও এস্ টি ৫ম খণ্ড ৪৫৭ ও পরবর্তী কয়েক পৃষ্ঠা

১৮। আই পি ১৩২ পৃঃ পাদটীকা ২। আর পি ডি ইউ ৪৭০ পৃঃ পাদটীকা ২

১৯। কিম্ আবরীবঃ ?

"কি আবৃত করিয়াছিল ?"

(: √ বৃ), ও এস্ টি ৪র্থ খণ্ড ৪ পৃঃ ; "ইহার মধ্যে কি ছিল ?"

এম্ ভি আর ২০৭ পৃঃ এবং এম্ ভি জি ; কোন্ বস্তু সম্মুখে এবং পশ্চাতে সঞ্চালিত হইয়াছিল ?

(: √ বৃং) অর্থাৎ, সেখানে কি বায়ু ছিল ? জি ভি বি ৮৮ পৃঃ গ্রাস্ এবং এম্ ডব্লিউ

২০। "আক্ষরিক অর্থে বন্যা, বিশৃঙ্খল অবস্থা" জি ভি বি—ঐ পৃষ্ঠা

২১। এস্ ভি আর—ঐ পৃঃ, "প্রাণের বীজ", জি ভি বি—ঐ পৃষ্ঠা

২২। জি ভি বি—ঐ পৃঃ , আই পি ১০১ পৃষ্ঠা

২৩। জি ভি বি—ঐ পৃষ্ঠা

২৪। ঐ ৮৯ পৃষ্ঠা

২৫। ও এস্ টি ৫ম খণ্ড ২১৭ পৃষ্ঠা

২৬। এম্ ভি এম্ ১৬৬ পৃষ্ঠা

২৭। ঐ ১৬৮ পৃষ্ঠা

২৮। আর্ পি ভি ইউ ৪৬৪ পৃষ্ঠা

২৯। এই অংশের প্রথম অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য

৩০। 'গৃহে আগমন' বলিতে এখানে স্বর্গকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। এম্ ভি এম্ ১৬৬ পৃঃ জি আর আর ৩১৬ পৃষ্ঠা

৩১। ও এস্ টি ৩য় খণ্ড ২১ পৃষ্ঠা

৩২। আর পি ভি ইউ ৪৮৩ পৃষ্ঠা

এতদতিরিক্ত কয়েকটি গ্রন্থ

Bergaigne—La Religion Védique.

Bloomfield—The Atharvaveda and the Gopatha-Brahmana.

Deussen—Philosophie des Veda.

Hillebrandt—Vedische Mythologie.

Hiriyanna—Outlines of Indian Philosophy.

Hopkins—Ethics of India.

Macdonell and Keith—Vedic Index of Names and Subjects.

Oldenberg Die Religion des Veda.

Ragozin—Vedic India.

Rapson—Cambridge History of India, Vol. I.

Zimmer—Altindisches Leben.

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

উপনিষদ্

১। ভূমিকা

কোন অতিশয়োক্তি না করিয়া এই কথা বলা যায় যে, ভারতীয় চিন্তাধারা ও সংস্কৃতির মূল উৎস হইল উপনিষদ্। উপনিষদ্ যে কেবল আস্তিক দর্শনগুলিকেই অনুপ্রাণিত করিয়াছে তাহা নহে, বৌদ্ধ দর্শনের মত তথাকথিত কয়েকটি নাস্তিক দর্শনকেও উদ্বুদ্ধ করিয়াছে।[১] উপনিষদাবলী সুসংবদ্ধ দর্শনগ্রন্থ নহে এবং ইহাদের রচয়িতা একজন নহেন। যে সকল আচার্যদের উপলব্ধ সত্য উপনিষদে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাঁহাদিগকে তত্ত্ববিদ্যার গবেষক না বলিয়া অতীন্দ্রিয় সত্যদ্রষ্টা বলাই অধিক সঙ্গত হইবে। তাঁহাদের উপদেশে একটি সহজ আবেদন এবং এমন একটি প্রামাণিকতা আছে যাহা চরম তত্ত্বের অপরোক্ষ অনুভূতি হইতে উদ্ভূত। আখ্যায়িকা, হিতোপদেশ, ঘরোয়া আলোচনা ও ঘনিষ্ঠ কথোপকথনের আকারে তাঁহারা তাঁহাদের উপলব্ধ তত্ত্বগুলি বিতরণ করিয়াছেন।[২] তাঁহাদের রচনায় তত্ত্ববিচার অপেক্ষা কাব্যই বেশী।[৩] এমন কি তাঁহাদের গদ্যরচনাতেও কাব্যগুণ সুস্পষ্ট। এ কথা সত্য যে, উপনিষদ্গুলিতে অনেকস্থলে প্রতীকের ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে এবং ইহার ফলে অর্থ পরিস্ফুট না হইয়া প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, কখনও কখনও শব্দশ্লেষের ব্যবহার এবং কিছু কিছু দুর্বোধ্য শব্দের রহস্যময় ব্যাখ্যাও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এ কথাও প্রণিধানযোগ্য যে ইহাদের দ্বারাও উপনিষদের আকর্ষণ বর্ধিত হইয়াছে।

২। উপনিষদ্সমূহের ক্রমবিবর্তন

উপনিষদের নাম বেদান্ত[৪], কারণ উপনিষদ্গুলির অধিকাংশই বেদের শেষ বা উত্তরভাগ এবং উপানষদের শিক্ষা বেদেরই উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের দ্যোতক। সংস্কৃত 'অন্ত' শব্দটি ইংরাজী 'end'-এর মত 'শেষপ্রান্ত' ও 'উদ্দেশ্য' এই দুই অর্থেই ব্যবহৃত হইতে পারে। পরবর্তীযুগের কতকগুলি দার্শনিক সম্প্রদায় উপনিষদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন বলিয়া দাবী করেন এবং এইজন্যই ইহারা বৈদান্তিক সম্প্রদায় বলিয়া খ্যাত। 'উপনিষদ্' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—উপ (নিকটে), নি (ভক্তিসহকারে), সদ্

(উপবেশন করা)—"ভক্তিসহকারে নিকটে উপবেশন করা" ; এবং এই অর্থ হইতেই বুঝা যায় যে, কিভাবে শিষ্যেরা ছোট ছোট আশ্রমে গুরুর কাছে বসিয়া প্রথমে ঔপনিষদিক মতবাদসমূহ শিক্ষালাভ করিত। সুতরাং উপনিষদের অর্থ 'অধিবেশন'। কালক্রমে এই ধরণের অধিবেশনে প্রদত্ত শিক্ষা-সম্পর্কেই নামটি প্রযুক্ত হইল। উপনিষদ্ পরম সত্যের শিক্ষা দেয় এই কথা মনে করা হইত। সুতরাং যাহারা অধিকারী অর্থাৎ যাহারা এই শিক্ষা গ্রহণ করিতে ও ইহার দ্বারা লাভবান হইতে পারিত, কেবল তাহাদিগকেই এই শিক্ষা দেওয়া হইত। যে কোন সময়েই এইরূপ যোগ্য ছাত্রের সংখ্যা অল্পই হইত। সুতরাং 'উপনিষদ্' শব্দটি 'গূঢ়' এই তাৎপর্য যুক্ত হইল ; এবং এই অর্থেই উপনিষদ্‌গুলিতে শব্দটি ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ, যেখানে উপনিষদে কোন গুরুত্বপূর্ণ বাক্য বলা হইয়াছে, সেখানে ইহাকে 'উপনিষদ্' এই আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। যেমন বৃহদারণ্যকে[৫] "সত্যের সত্য" (সত্যস্য সত্যম্) এই বাক্যটি সর্বভূতান্তরাত্মার 'উপনিষদ্' হিসাবে বর্ণিত হইয়াছে। উপনিষদের যে সকল বাক্যকে মুখ্য বলিয়া ধরা যায়, তাহাদের ক্ষেত্রে 'গুহ্য আদেশ'[৬] 'পরমং গুহ্যম্'[৭] প্রভৃতি বচন প্রযুক্ত হইয়াছে ইহাও আমরা দেখিতে পাই। যাহা 'অবিদ্যা' নাশ করে বা যাহা আমাদিগকে ব্রহ্মের নিকট লইয়া যায়[৮], এইরূপ অর্থে শঙ্কর প্রভৃতি ভাষ্যকারেরা উপনিষদ্ শব্দটির ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই অর্থ ব্যুৎপত্তির দিক হইতে সঠিক নাও হইতে পারে, কিন্তু তবুও এই অর্থটি উপনিষদের বিষয়বস্তু ও লক্ষ্যকে সঠিকভাবে নির্ধারিত করিয়াছে।

উপনিষদ্‌গুলি প্রায়শঃই 'ব্রাহ্মণের' শেষাংশ এবং সাধারণতঃ 'আরণ্যকে'র মাধ্যমেই 'ব্রাহ্মণ' হইতে উপনিষদে যাওয়া হয়। ব্রাহ্মণসমূহে আচারানুষ্ঠান-সংক্রান্ত বিধিনির্দেশ আছে, উপনিষদে চরমতত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। আরণ্যকে ক্রিয়াকাণ্ডের রূপকাকারে ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে এবং এমন কতকগুলি ধ্যানের বিধি আছে, যাহাতে উপনিষদের তত্ত্ববিচারের সূচনা পাওয়া যায়। এত দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে উপনিষদ্‌গুলি ঠিক কিভাবে বিকাশলাভ করিয়াছে তাহা আজ বলা শক্ত। 'সত্যস্য সত্যম্', 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি যে সকল বাক্যকে আমরা মুখ্য বাক্য বলিয়াছি, সম্ভবতঃ তাহাদের সম্বন্ধেই 'উপনিষদ্' শব্দটি প্রথমে ব্যবহৃত হইত। যখন ছাত্রদের এইসব বাক্য শিক্ষা দেওয়া হইত, তখন স্বভাবতঃই ইহাদের সঙ্গে ব্যাখ্যাও থাকিত। পরবর্তীকালে এইসব ব্যাখ্যা ও মূল বাক্যসমূহ যে রূপ ধারণ করিয়াছিল হয়ত সেইরূপেই উপনিষদ্‌গুলি আমাদের কাছে আসিয়াছে। অধুনা যে সকল গ্রন্থ 'উপনিষদ্' নামে পরিচিত, তাহাদের সংখ্যা দুইশতাধিক বলিয়া জানা যায়। 'মুক্তিকা' নামে একটি উপনিষদ্

একশত আটটি উপনিষদের নামোল্লেখ করিয়াছে। অবশ্য এই সকল গ্রন্থের অনেক-গুলিই পরবর্তীকালের রচনা—প্রাচীন প্রামাণ্য উপনিষদ্‌গুলির অনুকরণমাত্র। শঙ্কর অথবা তাঁহার সমতুল্য কোন দার্শনিক কোন উপনিষদের ভাষ্য লিখিয়াছেন কিনা, অথবা তাহা হইতে কোন বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন কিনা, ইহাই হইল সেই উপনিষদটি প্রামাণ্য কিনা তাহা স্থির করিবার মাপকাঠি। এই মাপকাঠিতে বিচার করিলে 'মুক্তিকা'য় উল্লিখিত প্রথম দশটি উপনিষদ্‌কে এবং অবশিষ্টের মধ্যে কয়েকখানিকে প্রাচীন ও বিশুদ্ধ বলিয়া মনে করা চলে। এইগুলি হইল ঈশাবাস্য, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, কৌষীতকি, মৈত্রায়ণীয় এবং শ্বেতাশ্বতর। ইহাদের মধ্যে আবার 'বৃহদারণ্যক' এবং 'ছান্দোগ্য' সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এইগুলি যে শুধু প্রাচীন ও পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ তাহাই নহে, উপনিষদ্ সমূহের নিষ্প্রপঞ্চ ও সপ্রপঞ্চ তত্ত্ববিষয়ক দুইটি প্রধান অথচ পরস্পর-অবিরোধী চিন্তা-ধারাই উপরোক্ত উপনিষদ্ দুইটিতে পরিলক্ষিত হয়।[৯]

প্রামাণ্য উপনিষদ্‌সমূহের কালিক অনুক্রম সম্পর্কে নিশ্চিতরূপে কিছু বলা সম্ভব নয়। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশেরই রচনাকাল বুদ্ধদেবেরও পূর্ববর্তী।[১০] উপনিষদের ঋষিদের সম্পর্কেও বিশেষ কিছু বলা সম্ভব নয়। ইহাদের মধ্যে যাজ্ঞবল্ক্য ও উদ্দালকের মত কয়েকজন ঋষি বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ইহাদের প্রত্যেকেরই বিশিষ্ট মতবাদ এবং এই মতের দ্বারা প্রভাবান্বিত শিষ্যসম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায়।

৩। বৈদিক দেবতা ও বৈদিক যাগযজ্ঞ সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গী

ঔপনিষদিক উপদেশের তাৎপর্য বুঝিতে হইলে প্রথমেই আমাদের বুঝা প্রয়োজন বেদের ব্রাহ্মণাংশে বিহিত যজ্ঞাদি সম্বন্ধে এই সকল উপনিষদের মত কি। উপনিষদ্-গুলির অন্তর্নিহিত ভাব স্বভাবতঃই ক্রিয়াকলাপের বিরোধী। বৃহদারণ্যকে বলা হইয়াছে,—যে ব্যক্তি আত্মা ব্যতীত অন্য কোনও দেবতার আরাধনা করে, সে দেব-গণের গৃহপালিত পশুবিশেষ;[১১] আরও বলা হইয়াছে যে, মৃত্যুদেবতা যম যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত এবং যজ্ঞ পুরোহিতের দক্ষিণায় প্রতিষ্ঠিত।[১২] ছান্দোগ্য উপনিষদে যজ্ঞ-পরিক্রমাকারী পুরোহিতদিগকে বিদ্রূপ করিয়া বলা হইয়াছে—উহারা যেন সারিবদ্ধ একদল কুকুর; উহারা "ওম্ আমরা খাইব, ওম্ আমরা পান করিব" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছে।[১৩]

মুণ্ডক্যোপনিষদে ক্রিয়াকলাপের উপর সর্বাপেক্ষা তীব্র আক্রমণের পরিচয় পাওয়া

যায়। সেখানে যজ্ঞপ্রক্রিয়াকে বিপজ্জনক নৌকার সহিত তুলনা করা হইয়াছে। ইহাও বলা হইয়াছে যে, যাহারা ইহাকে মূল্যবান মনে করে সেই সকল মূঢ়মতি বারবার জরা ও মৃত্যুর কবলগ্রস্ত হয়।[১৪] উপনিষদের বহুস্থলে অবশ্য কর্মকাণ্ডের প্রতি বিরুদ্ধতা তেমন স্পষ্ট নয়; যাগযজ্ঞের প্রচলিত রীতিকে গুরুত্ব না দিয়া তাহার একটি রূপকাত্মক অথবা দার্শনিক অর্থ দেওয়া হইয়াছে। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, আরণ্যকগুলির উদ্দেশ্য হইল ক্রিয়াকলাপকে রূপকাকারে ব্যাখ্যা করা; উপনিষদ্‌গুলিতে এই ধারারই অনুবর্তন করা হইয়াছে। বৃহদারণ্যকের উপোদ্ঘাতে আমরা ইহার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাই। সেখানে অশ্বমেধের রূপকাত্মক ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। অশ্ব বলি দিয়া পৃথিবীর উপর সার্বভৌমত্ব অর্জন করা যাইতে পারে, কিন্তু উপনিষদে যজ্ঞের অশ্বকে সমগ্র বিশ্ব বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, এই বিশ্বকে ত্যাগ করিলেই আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা লাভ করা যায়। ছান্দোগ্যে মানুষের সমগ্র জীবনকে সোমযজ্ঞের রূপক হিসাবে[১৫] ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এবং পঞ্চপ্রাণের উদ্দেশ্যে নিবেদিত আহুতি অগ্নিহোত্রের স্থান অধিকার করিয়াছে।[১৬] কর্মকাণ্ডের স্থান যে নিকৃষ্ট তাহা প্রতিপন্ন করিতে উপনিষদ্‌গুলি আর একটি প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা এই যে, যাগযজ্ঞের সাহায্যে কেবল পিতৃলোকেই যাওয়া যায়। পিতৃলোক মানুষের অস্থায়ী আবাসভূমি এবং এখান হইতে নির্দিষ্ট সময়ে প্রত্যেককেই জন্মমৃত্যু ভোগ করিবার জন্য পৃথিবীতে অবশ্য প্রত্যাবর্তন করিতে হয়।[১৭]

কিন্তু পরবর্তী যুগের কতকগুলি উপনিষদে যাগযজ্ঞেরও একটি স্থান দেওয়ার আগ্রহ দেখিতে পাই। উদাহরণস্বরূপ শ্বেতাশ্বতরে অগ্নি ও সোম প্রভৃতি দেবতাদের উদ্দেশ্যে প্রাচীন পদ্ধতিতে প্রার্থনার বিধান দেওয়া হইয়াছে (ব্রহ্মপূর্বম্), এবং এমন কথাও বলা হইয়াছে যে, যজ্ঞানুষ্ঠান অনুপ্রেরণার জনক।[১৮] কিন্তু যে ইষ্টের উদ্দেশ্যে এইরূপ যজ্ঞ করা উচিত, তাহা দেবলোক নহে কিন্তু ঈশ্বর—যাঁহাকে পাইলে সর্ববন্ধন হইতে মুক্তিলাভ হয়।[১৯]

উপনিষদ্‌গুলির প্রধান মতবাদের উদ্ভব কিভাবে হইল তাহা বুঝিতে হইলে ঋগ্বেদের যে সকল সূক্তে অদ্বৈতবাদী চিন্তার পরিচয় আছে[২০], সেইগুলির দিকেই দৃষ্টি দিতে হইবে,—কেবলমাত্র ক্রিয়াকাণ্ডের নিয়মগুলি যাহাতে সঙ্কলিত হইয়াছে সেই ব্রাহ্মণগুলির দিকে নয়। ঋগ্বেদের দার্শনিক অর্থবিশিষ্ট সূক্তগুলিতে বহুসংখ্যক দেবতাকে একই তত্ত্বে পরিণত করিবার যে প্রবণতা দেখা যায়, উপনিষদ্‌গুলিতে তাহাই বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে এবং এই মতবাদের প্রকৃত তাৎপর্য কি তাহাই বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।[২১] দেবতাদের সংখ্যা কত প্রশ্ন করায়

যাজ্ঞবল্ক্য প্রথমে বলিলেন, উহাদের সংখ্যা ৩৩০৬, তাহার পর ক্রমান্বয়ে এই সংখ্যা তেত্রিশ, ছয়, তিন, দুই, দেড় এবং অবশেষে এক বলিয়া উল্লেখ করিলেন। সেই এক দেবতা ব্রহ্ম এবং অপর দেবতারা তাঁহারই শক্তি। বসু, রুদ্র, আদিত্য এই সকল দেবতাদের প্রধান গোষ্ঠীগুলিকে সূর্য ও আকাশ, চন্দ্র ও নক্ষত্র, ইন্দ্রিয়সমূহ এবং মন[২২]—ব্রহ্মের এই সকল বিভিন্ন অংশের সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করা হইয়াছে।[২৩] মৈত্রায়ণীয় উপনিষদে ব্রহ্মা, রুদ্র এবং বিষ্ণুসমেত যাবতীয় দেবতাকে মৃত্যুহীন ও অশরীরী পরব্রহ্মের প্রকাশরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। কেনোপনিষদে ইন্দ্র উমা হৈমবতীর কাছে জানিতে পারিলেন যে, দেবতাদের শক্তি ও বৈভবের উৎস ব্রহ্ম।[২৪] কঠোপনিষদে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, পরব্রহ্মের ভয়েই দেবতারা তাঁহাদের নির্দিষ্ট কার্যক্রম পালন করিয়া থাকেন।[২৫] এমন কি বেদের ব্রাহ্মণাংশে যে দেবতা সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গৃহীত হইয়াছেন, সেই প্রজাপতিকেও ব্রহ্মের অধীন বলা হইয়াছে। কৌষীতকিতে ইন্দ্রের সঙ্গে তাঁহাকেও পরব্রহ্মের আবাসে দ্বারপালরূপে কল্পনা করা হইয়াছে।[২৬] অতএব উপনিষদ্গুলি সেই পরমসত্যাত্মক ব্রহ্মের কোন প্রতিদ্বন্দ্বীকে স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। তাই ঋগ্বেদের একমাত্র সত্য "একং সৎ" উপনিষদের "একমেবাদ্বিতীয়ম্" (অদ্বিতীয় এক) হইয়াছেন।

৪। পরা এবং অপরা বিদ্যা

উপনিষদে দুই প্রকার জ্ঞানের মধ্যে প্রভেদ করা হইয়াছে—উচ্চতর জ্ঞান অথবা পরা বিদ্যা এবং নিম্নতর জ্ঞান অথবা অপরা বিদ্যা। যাবতীয় ব্যবহারিক বিজ্ঞান ও কলা এবং নশ্বর পদার্থ ও ভোগ্যবস্তু সম্বন্ধীয় শাস্ত্রীয় জ্ঞান অপরা বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, চতুর্বেদকেও অপরা বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। লৌকিক এবং ধর্মসম্বন্ধীয় উভয়প্রকার বিদ্যাতেই অগাধ পারদর্শিতা থাকা সত্ত্বেও নারদ দুঃখোপহতচিত্তে তত্ত্বজ্ঞানলাভের জন্য সনৎকুমারের নিকট উপস্থিত হইলে, সনৎকুমার তাঁহার যাবতীয় বিদ্যাকে নামসর্বস্ব (নাম এব)[২৭] বলিয়া বিশেষিত করিলেন। যে বিদ্যাদ্বারা অবিনশ্বরকে (অ-ক্ষরকে) জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহাই পরা-বিদ্যা।[২৮] যে বিদ্যাদ্বারা যাহা কিছু অশ্রুতপূর্ব তাহাই শ্রবণগোচর হয়, যাহা অচিন্তিতপূর্ব তাহা চিন্তার বিষয়ীভূত হয়, যাহা বোধাতীত তাহাই পরা বিদ্যা।[২৯] ইহার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া আরও বলা হইয়াছে যে, জগতের চরমতত্ত্বের যে জ্ঞান তাহা সেই তত্ত্বের বিভিন্ন রূপ বা প্রকাশের জ্ঞানকে অঙ্গীভূত করিয়াও তাহা অতিক্রম

করে। যেমন একখণ্ড মৃত্তিকার জ্ঞান হইলেই সমস্ত মৃত্তিকানির্মিত বস্তুর জ্ঞান হওয়া সম্ভব—এই সকল বস্তুর বৈশিষ্ট্য একটি শব্দের উপর নির্ভরশীল নামমাত্র, মৃত্তিকাই একমাত্র সত্য—তেমনই চরমতত্ত্বের জ্ঞানও এইরূপ।[৩০] চরমতত্ত্ব অর্থাৎ পরমাত্মার জ্ঞানের তুলনায় নিম্নতর জ্ঞানকে অজ্ঞান অথবা মিথ্যাজ্ঞান (অবিদ্যা) বলা যাইতে পারে। কঠোপনিষদে বলা হইয়াছে, "যাহা অবিদ্যা এবং যাহা বিদ্যা বলিয়া পরিচিত এই দুইটি একান্তই পৃথক্ এবং বিরোধী।[৩১] শ্বেতাশ্বতরে বলা হইয়াছে যে, অবিদ্যা এবং বিদ্যা উভয়েই অক্ষর অনন্ত পরব্রহ্মের মধ্যে গূঢ়ভাবে বর্তমান—কিন্তু অবিদ্যা নশ্বর, বিদ্যা অবিনশ্বর।[৩২]

যাজ্ঞবল্ক্য একাধিকস্থলে আত্মাকে অজ্ঞেয় বলিয়াছেন। তাহা হইলে প্রশ্ন উঠে আত্মজ্ঞান কি করিয়া সম্ভব? পত্নী মৈত্রেয়ীকে শিক্ষাদান প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন, "দেহ হইতে মুক্তির পর (আত্মার) কোন চেতনা থাকে না।" মৈত্রেয়ী এই কথায় হতবুদ্ধি হইয়া ইহার তাৎপর্য জিজ্ঞাসা করিলে, যাজ্ঞবল্ক্য তাহার উত্তরে বলিলেন, "যেখানে দ্বৈতভাব আছে বলিয়া মনে হয় সেখানেই কেহ অপরকে দেখিতে পায়, অপর বস্তুকে ঘ্রাণ করিতে পারে, অপরকে শুনিতে পায়, অপর বস্তুকে মনন করিতে পারে, অপর বস্তুকে জানিতে পারে; কিন্তু যেখানে সমস্তই আত্মা হইয়া গিয়াছে, সেখানে কে কাহাকে কিসের দ্বারা দেখিবে, শুনিবে, বুঝিবে? কাহার সহিত বাক্যালাপ করিবে? কাহার বিষয় চিন্তা করিবে?[৩৩] তাহা হইলে আত্মার অজ্ঞেয়ত্ব সম্বন্ধীয় প্রশ্নের ইহাই হইল উত্তর। আত্মা জ্ঞানের বিষয় নয় বলিয়া যে অজ্ঞেয় তাহা নহে, কিন্তু উহা সমস্ত জ্ঞানের ভিত্তি এমন কি জ্ঞানস্বরূপ বলিয়াই অজ্ঞেয়। মোট কথা, বস্তুকে যেভাবে জানা যায় সেইভাবে ইহাকে জানা যায় না। "দর্শনক্রিয়ার কর্তাকে দেখা যায় না, শ্রবণক্রিয়ার কর্তাকে শোনা যায় না, মননক্রিয়ার কর্তাকে চিন্তা করিতে পারা যায় না, জ্ঞানক্রিয়ার কর্তাকে জানিতে পারা যায় না। তিনিই তোমার আত্মা এবং সকল বস্তুতেই বিরাজমান।"[৩৪] কেনোপনিষদ্ যখন বলেন যে, সেখানে অর্থাৎ আত্মার সমীপে চক্ষু, বাক্য, মন কিছুই যাইতে পারে না, তিনি জ্ঞাত বস্তু হইতে পৃথক্ এবং অজ্ঞাত বস্তুর উর্ধ্বে, তখন সেই তত্ত্বেরই শিক্ষা আমরা পাই।[৩৫] তৈত্তিরীয় ঘোষণা করিয়াছেন যে, বাক্য ও মন তাঁহার নিকট পৌঁছাইতে না পারিয়া প্রতিনিবৃত্ত হয়।[৩৬] আমাদের বাক্য ও চিন্তা বহুত্বের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, অদ্বৈত আত্মার সহিত সম্পর্কস্থাপনে অক্ষম। তথাপি চরমলক্ষ্যে পৌঁছিবার উপায় হিসাবে নয়, অভিজ্ঞাপক বা সূচক চিহ্ন হিসাবে এইগুলিকে আমাদের ব্যবহার করিতে হয়। "এই অজ্ঞেয়, নিষ্কলঙ্ক, অপ্রমেয়, শাশ্বত সত্য—অজ মহান্ নিত্য

আত্মাকে একটি ঐক্যরূপেই দেখিতে হইবে।"[৩৭] আত্মাকে 'ইহা আছে' রূপেই বুঝিতে হইবে।[৩৮] ইহাই হইল শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, পরা বিদ্যা বা প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান। উপনিষদ্ আমাদিগকে উপদেশ দিতেছেন এই জ্ঞানের আহরণ করিতে এমন এক উপযুক্ত গুরুর নিকট হইতে, যিনি কেবল বিদ্বান্ নন পরন্তু ব্রহ্মজ্ঞানেরও অধিকারী।[৩৯] এরূপ গুরু যে দুষ্প্রাপ্য এ কথা সত্য, কিন্তু যোগ্য শিষ্যও তেমনই দুর্লভ। সকল শ্রেষ্ঠ বস্তুই দুর্লভ ও দুঃসাধ্য। "ইহার উপদেষ্টা বিরল এবং ইহার অনুভবকারী সুনিপুণ। যিনি ইহাকে যথাযোগ্য শিক্ষাদ্বারা উপলব্ধি করিয়াছেন এমন ব্যক্তি দুর্লভ।"[৪০]

৫। ব্রহ্ম ও আত্মা

যে দুইটি শব্দের তাৎপর্য আয়ত্ত না করিলে উপনিষদ্গুলির মর্ম উপলব্ধি করা সম্ভব নয়, সেই দুইটি হইল ব্রহ্মন্ এবং আত্মন্। এই দুইটি শব্দরূপ স্তম্ভের উপর ভারতীয় দর্শনের প্রায় সমগ্র প্রাসাদটি যেন দাঁড়াইয়া আছে একথা বলা যায়। এই দুইটি শব্দ কিভাবে তাহাদের বর্তমান তাৎপর্য অর্জন করিল এবিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে কিছু মতানৈক্য দেখা যায়। 'বৃহ্' ধাতু (বিস্ফুরিত হওয়া বা বৃদ্ধি পাওয়া) হইতে নিষ্পন্ন ব্রহ্মন্ শব্দ আদিতে সম্ভবতঃ 'প্রার্থনা' বা 'বাক্য' বুঝাইত। কালক্রমে ইহার অর্থ দাঁড়াইল বিশ্বের অধিষ্ঠান বা সমগ্র সত্তার মূল কারণ যাহা বিশ্বরূপে বিকশিত হইয়াছে বা যাহা হইতে বিশ্ব উদ্ভূত হইয়াছে। অপর শব্দ 'আত্মন্' প্রথমে সম্ভবতঃ নিশ্বাসপ্রশ্বাস বুঝাইত, পরে প্রাণীর, বিশেষ করিয়া মানবের 'স্ব' বা 'অন্তরাত্মা'বোধক শব্দে পরিণত হইয়াছে। প্রাচীন ঋষিদের উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার এই যে, ব্রহ্ম ও আত্মা মূলতঃ এক ও অভিন্ন। আত্মাই ব্রহ্ম।[৪১] জগতের চিন্তারাজ্যে উপনিষদ্-গুলির মহত্তম অবদান এই ঐক্যতত্ত্ব।

উপনিষদ্গুলির বহুস্থানে 'ব্রহ্ম' ও 'আত্মা' সমানাধিকরণ পদরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং সমার্থক শব্দ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে দর্শনের মূল প্রশ্নটি যেভাবে উপস্থাপিত হইয়াছে তাহা এই—"আত্মা কি ? ব্রহ্মই বা কি ?"[৪২] বিশ্বের আদিকারণ সম্বন্ধে যেখানে প্রশ্ন উত্থাপন করা হইয়াছে, এরূপ কতকগুলি স্থলে 'আত্মন্' শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে এবং অন্যান্য কতকগুলি স্থলে মানবের প্রকৃত আত্মার প্রসঙ্গে 'ব্রহ্মন্' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। অশ্বপতি কৈকেয় ছয়জন ব্রাহ্মণকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহাতে বিশ্বের চরম সত্তাকে বৈশ্বানর-আত্মা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।[৪৩] তৈত্তিরীয় উপনিষদে দেখা যায় যে, ভৃগু আত্মার আচ্ছাদক কোষ-

গুলির বিশ্লেষণদ্বারা উহার প্রকৃত স্বরূপ নির্ধারণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কিন্তু এস্থলে প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মই তাঁহার জিজ্ঞাসার বিষয়।[৪৪] অতএব উপনিষদের ঋষিরা মানবের অন্তরে এবং বাহিরে যে এক অদ্বিতীয় চরম সত্তা আছে তাহাকে বুঝাইতে 'ব্রহ্মন্' এবং 'আত্মন্' এই দুইটি শব্দই প্রয়োগ করিতেন। বিশ্বের আদিকারণ এবং জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে গিয়া তাঁহারা আবিষ্কার করিলেন যে, এক অদ্বিতীয় সত্তাই বৈচিত্র্যময় জগৎ ও বহুজীবরূপে প্রতিভাত হইয়াছে।

যেমন আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে, তেমনই বিশ্বের চরম কারণ সম্বন্ধেও উপনিষদে প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে। উভয়ক্ষেত্রেই অনুসন্ধানের পদ্ধতি অনুরূপ—অর্থাৎ সত্যের স্থূলতর প্রকাশ হইতে সূক্ষ্মতর প্রকাশের দিকে অগ্রগতি। উপনিষদ্ হইতে কয়েকটি বিশেষ উদাহরণদ্বারা আমরা ইহা দেখাইতে চেষ্টা করিব।

রাজা জনকের সভায় যে দার্শনিক বিচার হইয়াছিল, তাহাতে গার্গী নামে এক নারী ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যকে সমস্ত বস্তুর আধার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। প্রশ্নের সঠিক আকারটি হইল, "এই সমস্ত টানা ও পোড়েন কিসের উপর বয়ন করা হইয়াছে?" যাজ্ঞবল্ক্য প্রশ্নকর্ত্রীকে ক্রমান্বয়ে কয়েকটি উত্তর দিয়া উচ্চ হইতে উচ্চতর জগতে লইয়া গেলেন এবং অবশেষে গার্গী যখন তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন, "মহাশূন্যের টানা ও পোড়েন কিসের উপর বয়ন করা হইয়াছে?" তখন তিনি উত্তর দিলেন যে, অবিনশ্বরই (অ-ক্ষর) মহাশূন্যের আধার।[৪৫] আর এক প্রশ্নকর্তা উদ্দালক সমস্ত বস্তুর অন্তর্নিয়ামক সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। কয়েকটি সুন্দর বাক্যে যাজ্ঞবল্ক্য বুঝাইয়া দিলেন যে, জীবের অন্তরে এবং সমগ্র বিশ্বের যাবতীয় বস্তুর অন্তরালে যে চরম সত্তা রহিয়াছে, যাহাকে এই বস্তুগুলি জানে না, কিন্তু যাহা অন্তর হইতে তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রণ করে, তাহাই অন্তর্যামী এবং উদ্দালককে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন, "এই অন্তর্যামী তোমারই মৃত্যুহীন আত্মা।" "যিনি সকল বস্তুতেই বর্তমান অথচ সকল বস্তু হইতে পৃথক্, যাঁহাকে এই বস্তুগুলি জানে না, সকল বস্তুই যাঁহার শরীর, যিনি সকলকে অন্তর হইতে নিয়ন্ত্রণ করেন—তিনিই তোমার আত্মা, অবিনশ্বর, অন্তর্যামী।"[৪৬]

তৈত্তিরীয় উপনিষদে দেখা যায় যে, ভৃগু তাঁহার পিতা বরুণের নিকট উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মের স্বরূপ জানিতে চাহিলেন।[৪৭] বরুণ পুত্রকে চরমতত্ত্বের সাধারণ স্বরূপ নির্দেশক একটি বাক্য দিলেন এবং তপস্যাদ্বারা নিজেই সত্যকে আবিষ্কার করিয়া লইতে উপদেশ দিলেন। "যাঁহা হইতে সমস্ত বস্তু উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া যাঁহার দ্বারা বর্ধিত হয় এবং বিনাশকালে যাঁহাতে অনুপ্রবিষ্ট হয়, তাঁহাকে জানিবার চেষ্টা কর, তিনিই ব্রহ্ম।" ভৃগু এই বাক্যটিকে তাঁহার তপশ্চর্যার ভিত্তিরূপে অবলম্বন করিয়া

সত্যের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার প্রথম আবিষ্কার হইল এই যে, খাদ্য (অন্ন অথবা জড়বস্তু) অস্তিত্বের জন্য অপরিহার্য। কিন্তু শীঘ্রই তিনি উপলব্ধি করিলেন যে, অন্নকে যাহা সক্রিয় করে, অর্থাৎ জীবন (প্রাণ), অন্ন তাহারই বহিরাবরণমাত্র। কিন্তু এই জ্ঞানেও তিনি সন্তুষ্ট হইলেন না, কারণ আরও অনুসন্ধান করিয়া তিনি দেখিলেন যে, প্রাণের আধার মন। পরবর্তী বিশ্লেষণে ভৃগুর নিকট প্রতিভাত হইল যে, মনও উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং তাহা তাঁহার পিতৃপ্রদত্ত ব্রহ্মের লক্ষণের সহিত মিলিতে পারে না। তখন তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে, বুদ্ধিমূলক চৈতন্যই (বিজ্ঞান) চরম সত্য। কিন্তু বস্তুবাদ, প্রাণবাদ এবং মনোবাদ যেমন সূক্ষ্মতর বিচারে অসম্পূর্ণ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিল, বুদ্ধিবাদও তেমনই অপরিণত বলিয়া প্রতিভাত হইল। অবশেষে ভৃগু এই চরম সত্যে উপনীত হইলেন যে, আনন্দই ব্রহ্ম। পরব্রহ্ম স্বরূপ এই আনন্দের মধ্যে ভোক্তা ও ভোগ্যবস্তুর কোনও পার্থক্য নাই। অসীমের মধ্যে কোনও ভেদ থাকিতে পারে না। আত্মার স্বরূপ বুঝিতে হইলে যে যোগ্যতা ও নিয়ত অনুসন্ধান উভয়েরই প্রয়োজন, ছান্দোগ্যে কথিত ইন্দ্র-বিরোচন উপাখ্যান সেই তথ্যের অপর একটি দৃষ্টান্তস্থল।[৪৮]

জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—চৈতন্যের এই তিনটি অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধানের পদ্ধতি আত্মার স্বরূপের উপলব্ধিতে উপনীত হওয়ার জন্য উপনিষদে সুপ্রচলিত উপায়গুলির মধ্যে একটি। যে মাণ্ডুক্য উপনিষদ্ সমগ্র বেদান্তের সার (সর্ববেদান্ত-সারিষ্ঠ) বলিয়া কথিত, তাহাতে এই পদ্ধতির সর্বাপেক্ষা সংক্ষিপ্ত ও সুসংহত বিবরণ পাওয়া যায়।[৪৯] এই উপনিষদের আরম্ভে 'ওম্' এই রহস্যময় ধ্বনিটিকে যাহা কিছু অস্তিত্ববান্ তাহার সহিত অভিন্ন প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। যাহা কিছু ছিল, যাহা আছে এবং যাহা হইবে এই সমস্তই 'ওম্'। কালের তিনটি বিভাগকে অতিক্রম করিয়া যাহা আছে, অর্থাৎ যাহা প্রকাশিত বিশ্বের অপ্রকাশিত ভিত্তি তাহাও এই 'ওম্'। এই সমস্তই ব্রহ্ম যাঁহার সাংকেতিক ধ্বনি 'ওম্'। আত্মাই ব্রহ্ম। তাহার পর আত্মার জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থাত্রয় 'ওম্'-এর অ, উ, ম এই তিনটি অংশের (মাত্রার) অনুরূপ এবং আত্মার যাহা স্বাভাবিক অবস্থা অর্থাৎ অব্যয়, নিরালম্ব, তুরীয় অবস্থা, তাহা 'ওম্'-এর মাত্রাহীন (অ মাত্র) অংশের অনুরূপ—এইভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। জাগ্রদবস্থায় আত্মা ইন্দ্রিয়ের বাহ্য বিষয়গুলির সঙ্গ করে এবং তাহার উপভোগগুলিও স্থূল, স্বপ্নে সে কল্পনার জগতে বিহার করে, এবং সেখানে তাহার অনুভূতি সূক্ষ্ম। সুষুপ্তিতে কোন বাসনা থাকে না, স্বপ্নও থাকে না, দ্রষ্টা ও দৃষ্টবস্তুর পার্থক্য অবলুপ্ত হইয়া যায়। আত্মা একাকার হইয়া যায় এবং কেবল চৈতন্যঘনরূপে অবস্থান করে—আনন্দ যেন

আনন্দকে উপভোগ করিতেছে। এই তিনটি অবস্থায় আত্মার যথাক্রমে তিনটি সংজ্ঞা দেওয়া হয়—বৈশ্বানর, তৈজস এবং প্রাজ্ঞ। চতুর্থ বা তুরীয় অবস্থাটি পরিবর্তনশীল রূপগুলির উর্ধ্বে, আর ইহাই আত্মার প্রকৃত স্বরূপ। যদিও এই তুরীয়াবস্থা জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিনটি অনুভূতি ধারার অধিষ্ঠান, তাহা হইলেও ইহা উহাদের সহিত জড়িত হয় না। ইহা অদৃশ্য, অব্যবহার্য (সাধারণ ব্যবহারের বিষয় নহে), ইহার পরিচয়জ্ঞাপক কোন চিহ্ন ইহাতে নাই। ইহা অচিন্ত্য এবং অসংজ্ঞেয়, ইহা চেতনার সারভূত এক আত্মা। ইহারই মধ্যে বিশ্ব অন্তর্লীন হয়, ইহাই প্রশান্ত, অদ্বৈত, আনন্দ। এইভাবে মাণ্ডূক্য উপনিষদ্ আত্মার প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন।

উপনিষদের মতে চরম সত্তার স্বরূপ সমস্ত বিষয় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ যে বিষয়ী তাহা নহে, ইহা বিষয় এবং বিষয়ী উভয়েরই অধিষ্ঠান। আত্মার বিশ্ব-রূপ এবং ব্যক্তি-রূপ এই দুইয়ের আপাত-পার্থক্যের অবসান হইলেই এই সত্যের উপলব্ধি সম্ভবপর। এই উপলব্ধির সহায়ক হিসাবে চৈতন্যের উক্ত প্রতিটি স্তরে আত্মার ব্যক্তি-রূপ ও বিশ্ব-রূপের মধ্যে অভেদ উপদিষ্ট হইয়াছে। এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতেই মাণ্ডূক্যে সুষুপ্ত অবস্থায় (প্রাজ্ঞ) আত্মাকে সর্বভূতের প্রভু রূপে বিশেষিত করা হইয়াছে।[৫০] ছান্দোগ্যে চক্ষুতে দৃষ্ট পুরুষকে সূর্যমণ্ডলে দৃষ্ট পুরুষের সঙ্গে[৫১] আর মন ও মহাশূন্যকে ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন কল্পনা করা হইয়াছে[৫২]। বৃহদারণ্যকে[৫৩] ও কৌষীতকিতে[৫৪] বালাকি ও অজাতশত্রুর কথোপকথনে প্রথমে বিষয়ের দিক্ হইতে চরমতত্ত্বের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হইয়াছে। বালাকি সূর্য চন্দ্র প্রভৃতি বস্তুর অধিষ্ঠাতা পুরুষকে ব্রহ্মরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। অজাতশত্রু দেখাইয়াছেন যে, জাগতিক বস্তুর প্রত্যেকটির অন্তরালেই একটি গভীরতর তত্ত্ব বর্তমান। এইগুলি হইল চরমতত্ত্বের অধিদেবরূপ। ইহার পর মানুষের ছায়া, প্রতিধ্বনি, দেহ, চক্ষু প্রভৃতি অধ্যাত্মরূপগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে এবং অবশেষে যে আত্মা হইতে যাবতীয় জগৎ, সমস্ত দেবতা এবং প্রাণী নির্গত হইয়াছে, অজাতশত্রু সেই বিশ্বাত্মার একটি বর্ণনা দিয়াছেন।

উদ্দালক তাঁহার পুত্র শ্বেতকেতুকে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহাতেও উপনিষদের মূল প্রতিপাদ্য যে অভেদ-তত্ত্ব তাহাই ব্যাখ্যাত হইয়াছে।[৫৫] সেস্থলে উদ্দালক সর্বসত্তার অধিষ্ঠান এবং সকল পদার্থের চরম কারণ যে সৎ, তাহাকে শ্বেতকেতুর আত্মার সহিত অভিন্ন বলিয়াছেন। "যাহা সূক্ষ্মতম সারবস্তু তাহাই সমগ্র জগতের আত্মা, তাহাই চরমতত্ত্ব, তাহাই আত্মা, তাহাই তুমি, হে শ্বেতকেতু।" এই অভেদ-তত্ত্বের

ঘোষণা নয় বার করা হইয়াছে এবং ইহা হইতে বুঝা যায় যে উদ্দালকের উপদেশের ইহাই মূল কথা। কিন্তু ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে যে, এখানে জীবাত্মাকেই সর্বসত্তার অধিষ্ঠান বলা হয় নাই। ঔপনিষদিক দর্শন বিষয়ীনিষ্ঠ বিজ্ঞানবাদের প্রকারবিশেষ নয়। জীবাত্মা যে পরমাত্মা হইতে অভিন্ন ইহা সত্য, কিন্তু পরমাত্মা দ্বারাই সমগ্র জগৎ এবং ব্যষ্টিরূপে জীবাত্মাসমূহের উপপত্তি হয়।[৫৬]

উপনিষদ্‌গুলিতে অদ্বয় ব্রহ্ম বা পরমাত্মাকে দুইভাবে চিন্তা করা হইয়াছে—(১) বিশ্বজগতের সার্বিক অধিষ্ঠানরূপে এবং (২) বিশ্ব যাহার প্রাতিভাসিক রূপমাত্র সেই চরম তত্ত্বরূপে। প্রথমটি ব্রহ্মের সপ্রপঞ্চ রূপ, অর্থাৎ বিশ্বে প্রকাশমান রূপ এবং দ্বিতীয়টি ব্রহ্মের নিষ্প্রপঞ্চ রূপ অর্থাৎ যাহাতে বিশ্বের অস্তিত্ব নাই। এই দুইটি দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে পার্থক্যের ফলে পরবর্তীকালে বৈদান্তিকদের মধ্যে ঈশ্বরবাদী এবং নির্গুণ ব্রহ্মবাদী এই দুইটি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উদ্ভব সম্ভব হইয়াছিল। এই দুইটি দৃষ্টিভঙ্গীর উদাহরণস্বরূপ আমরা উপনিষদ্ হইতে কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃত করিতেছি। নিম্নলিখিত বাক্যগুলিতে সপ্রপঞ্চ তত্ত্বসমর্থক মতবাদ দেখিতে পাওয়া যায়। "মনোময়, প্রাণ-শরীর, জ্যোতিঃস্বরূপ, সত্যসঙ্কল্প, আকাশাত্মা, সর্বকর্মা, সর্বকাম, সর্বগন্ধ, সর্বরস, সর্ব-জগৎব্যাপী, নির্বাক্ ও শান্ত—আমার হৃদয়স্থ এই আত্মাই ব্রীহি, যব, সর্ষপ, শ্যামাক কিম্বা শ্যামাকতণ্ডুল হইতেও সূক্ষ্মতর, আমার হৃদয়স্থ এই আত্মাই পৃথিবী হইতে বিশালতর, অন্তরীক্ষ হইতে বৃহত্তর, দ্যুলোক হইতে বৃহত্তর—এই সমস্ত লোক হইতে বিশালতর।"[৫৭] "এই আত্মাই নিম্নে, ইনিই ঊর্ধ্বে, ইনিই পশ্চিমে, ইনিই পূর্বে, ইনি দক্ষিণে, ইনি উত্তরে, ইনিই এই সমস্ত জগৎ।"[৫৮] "ইনি ব্রহ্ম, ইনি ইন্দ্র, ইনি প্রজাপতি, ইনি এই সকল দেবতা, ইনি পঞ্চ মহাভূত অর্থাৎ পৃথিবী, বায়ু, আকাশ জল ও তেজ—এই সকল এবং যেগুলিকে ক্ষুদ্রমিশ্র বলিয়া মনে হয়, এই সবই ইনি—ইনিই বিভিন্ন-প্রকারের বীজ, অপিচ সচল ও অচল সমস্তই অর্থাৎ অণ্ডজ, জরায়ুজ, স্বেদজ, ও উদ্ভিজ্জ জীব এবং অশ্ব, গো, মনুষ্য ও হস্তীসমূহ এবং অপর যে সকল প্রাণী পায়ে চলে, আকাশে উড়ে অথবা যাহারা অচল—এই সমস্তই ইনি।"[৫৯] যে সকল স্থলে নিষ্প্রপঞ্চ মতবাদ উপদিষ্ট হইয়াছে, সেগুলির উদাহরণস্বরূপ নিম্নলিখিত বাক্যগুলিকে লওয়া যাইতে পারে। "হে গার্গি, জ্ঞানীরা যাঁহার উপাসনা করেন ইহাই সেই অক্ষরতত্ত্ব—ইনি অস্থূল, অনণু, অহ্রস্ব, অ-দীর্ঘ, অ-লোহিত, অ-স্নেহ, অচ্ছায়, অতমঃ, অবায়ু, অনাকাশ, অসঙ্গ, অরস, অগন্ধ, অচক্ষুষ্ক, অ-শ্রোত্র, অ-বাক্, অ-মন, অ-তেজস্ক, অ-প্রাণ, অ-মুখ, অ-মাত্র, অনন্তর ও অবাহ্য। তিনি কাহাকেও ভক্ষণ করেন না, এবং অপর কেহও তাঁহাকে ভক্ষণ করে না।"[৬০] "যিনি শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধবিহীন, যিনি অক্ষয়,

শাশ্বত, অনাদি ও অনন্ত, যিনি মহৎ হইতে মহত্তর এবং ধ্রুব তাঁহাকে উপলব্ধি করিলে জীব মৃত্যুমুখ হইতে বিমুক্ত হয়।"[৬১]

ব্রহ্ম সম্বন্ধে নেতিবোধক বর্ণনা দেওয়ার তাৎপর্য ইহা নহে যে, ব্রহ্ম শূন্য অথবা অসৎ। ইহার তাৎপর্য এই যে, মানব-চিন্তা যেসকল ধারণার সহিত পরিচিত সেগুলি-দ্বারা ব্রহ্মকে পরিচ্ছিন্ন করা যায় না। ব্রহ্ম 'ইহা নহেন, ইহা নহেন'।"[৬২] যেসকল বাক্যে ব্রহ্মকে সৎ, চিৎ ও আনন্দ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, সেই সকল বাক্যের সহিত সঙ্গতি রাখিয়াই এই সকল নেতিবোধক বাক্যের ব্যাখ্যা করিতে হইবে। সৎ, চিৎ, আনন্দ—এই শব্দগুলিকে প্রচলিত অর্থে গ্রহণ করা যায় না সত্য বটে, কিন্তু মানব-মন আজ পর্যন্ত যে সকল ধারণার সাহায্যে পরমাত্মার স্বরূপ নির্দেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে এইগুলিই সর্বোত্তম। বৃহদারণ্যক উপনিষদে ব্রহ্মকে সত্যের সত্য (সত্যস্য সত্যম্) বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে[৬৩] এবং 'সত্যম্' পদটিকে স তি এবং যম্ এই তিনটি অংশে বিভক্ত করিয়া দেখান হইয়াছে যে, প্রথম এবং তৃতীয় অংশের অর্থ 'সত্য' এবং দ্বিতীয় অংশের অর্থ 'অসত্য', এবং সমগ্র শব্দটির অর্থ এই যে. অসত্য দুইপার্শ্বে সত্যদ্বারা বেষ্টিত।[৬৪] আত্মা যে চৈতন্যই ইহা অনেক-গুলি বাক্যে বলা হইয়াছে। আত্মাকে সর্বজ্যোতির জ্যোতি অথবা স্বয়ংপ্রভ বলিয়া বর্ণনা করা উক্ত তত্ত্ব শিক্ষা দিবার একটি রীতি। "সেখানে সূর্যের দীপ্তি নাই, চন্দ্র-তারকার দীপ্তি নাই; বিদ্যুৎ সকলেরও দীপ্তি নাই, এই অগ্নির দীপ্তি কি প্রকারে থাকিবে? তিনি দীপ্তিমান্ বলিয়াই সমস্ত বস্তু তদনুযায়ী দীপ্তিমান, তাঁহারই দীপ্তিতে সমগ্র জগৎ আলোকিত।"[৬৫] ব্রহ্ম যে অনন্যসাপেক্ষ সত্তাবান্ এবং স্বয়ংপ্রভ চৈতন্য শুধু ইহাই নহে তিনি পরমানন্দও। বৃহদারণ্যক[৬৬] এবং তৈত্তিরীয় উপনিষদে[৬৭] মানবের শ্রেষ্ঠ আনন্দকে এককরূপে গ্রহণ করিয়া এই আনন্দের পরিমাণ নির্ধারণ করা হইয়াছে। প্রথমোক্ত উপনিষদের মতে ব্রহ্মের আনন্দ মানবীয় আনন্দের শতকোটি গুণ, দ্বিতীয় উপনিষদের মতে মানবের শ্রেষ্ঠ আনন্দ হইতে এই আনন্দ কোটি কোটি গুণ শ্রেয়ঃ। এই সকল বাক্যের তাৎপর্য এই যে, ব্রহ্মের আনন্দ অসীম ও অপরিমেয়। ছান্দোগ্য উপনিষদে[৬৮] ব্রহ্মকে ভূমা বলা হইয়াছে। ভূমাই সুখ, অল্পে সুখ নাই। পরবর্তী বৈদান্তিক সাহিত্যে ব্রহ্মকে সচ্চিদানন্দ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। আমরা যে সকল বাক্য আলোচনা করিয়াছি এই শব্দটি সেইগুলি হইতে সংগৃহীত। বৃহদারণ্যকে ব্রহ্মকে বিজ্ঞান এবং আনন্দ বলা হইয়াছে (বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম)[৬৯] তৈত্তিরীয়ে ব্রহ্মকে সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত (সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম) বলা হইয়াছে।[৭০]

৬। জগৎ

উপনিষদে সপ্রপঞ্চ ব্রহ্ম ও নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্ম প্রতিপাদক দুইটি মতবাদের অনুরূপ জগৎ সম্বন্ধেও দুইটি মতবাদ দেখিতে পাওয়া যায়; তাহাদের মধ্যে একটি মতানুসারে জগৎ যথার্থই ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত হইয়াছে এবং অপর মতানুসারে জগৎ ব্রহ্মের অবভাস-মাত্র। উপনিষদে সৃষ্টিতত্ত্ব পরিপূর্ণভাবে অথবা বহুবার আলোচিত হয় নাই এবং যে সকল স্থলে এই তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে, সেই সকল স্থলেও বর্ণনাগুলির ভিতর সম্পূর্ণ সঙ্গতি নাই। কিন্তু সমগ্র জগৎ যে কোনও জড়বস্তু হইতে উৎপন্ন হয় নাই, কিন্তু আত্মা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে সে বিষয়ে মতৈক্য দেখা যায়। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের আরম্ভে এই প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসিত হইয়াছে—"এই জগতের কারণ কি? আমরা কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছি? কাহার দ্বারা জীবিত আছি? কাহাতে আমরা আশ্রিত? কাহার পরিচালনাধীনে আমরা সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকি? উপনিষদের মতে কোন জড়দ্রব্য বা সসীম পদার্থকে অবলম্বন করিয়া এই সকল প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়া যায় না। কাল, স্বভাব, নিয়তি, যদৃচ্ছা (আকস্মিকতা), পঞ্চভূত, যোনি অথবা পুরুষ ইহাদের মধ্যে কোনটিই আদিকারণ হইতে পারে না। এইগুলিকে গৌণ কারণ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে কিন্তু ভগবানের স্বকীয় গুণগুলিতে নিহিত তাঁহার আত্মশক্তিই ইহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে।"[১১]

সৃষ্টি-সংক্রান্ত ঔপনিষদিক বাক্যগুলির মধ্যে অপর যে বিষয়ে মতৈক্য দেখা যায়, তাহা এই যে, ব্রহ্ম কোনও বহিঃস্থিত বস্তু হইতে জগৎ সৃষ্টি করেন নাই; জগৎ ব্রহ্মের একাংশের প্রকাশমাত্র। অর্থাৎ, ব্রহ্ম বিশ্বানুস্যূত এবং বিশ্বাতীত দুইই। পরবর্তী বেদান্তের পরিভাষায় ব্রহ্ম একই সঙ্গে জগতের উপাদান এবং নিমিত্তকারণ উভয়ই। "এই সমস্তই ব্রহ্ম, ইনি শান্ত, ইহাকে তজ্জলান বলিয়া উপাসনা করা উচিত", শঙ্কর ছান্দোগ্য উপনিষদের এই বাক্যের অন্তর্গত তজ্জলান পদটির অর্থ করিয়াছেন, "যাহা (তৎ) হইতে জগৎ উৎপন্ন (জ) হয় যাহাতে জগৎ লয়প্রাপ্ত (লী) হয়, এবং যাহাতে জগৎ শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করে (অন) এবং বাঁচিয়া থাকে।"[১২] তৈত্তিরীয়ে স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে ব্রহ্মই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং ধ্বংসের কারণ।[১৩] ঈশ এবং কেন উপনিষদ্ দুইটিতে ব্রহ্মই যে জগৎকারণ তাহা দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ঈশোপনিষদের আরম্ভেই বলা হইয়াছে যে, এই সমস্তই (সমগ্র জগৎ) ঈশ্বর কর্তৃক ব্যাপ্ত: অর্থাৎ জগতের উপাদান ঈশ্বর হইতেই আসিয়াছে। কেনোপনিষদে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্ম সকল বস্তুর আদি প্রেরয়িতা। এই উপনিষদের নাম যে পদ হইতে

হইয়াছে অর্থাৎ 'কেন' (কাহার দ্বারা ?) তাহা করণকারককে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে জগতের নিমিত্ত কারণ সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়াই ইহার অভিপ্রায়।

উপনিষদের সৃষ্টিবাক্যগুলি এবং যে সকল উপমা দ্বারা উপনিষদে এক হইতে বহুর উদ্ভব ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, সেগুলি আলোচনা করিলেও বুঝিতে পারা যায় যে, জগতের উপাদানকারণ এবং নিমিত্তকারণ অভিন্ন। তৈত্তিরীয়ে বলা হইয়াছে, "তিনি ইচ্ছা করিলেন 'আমি আপনাকে উৎপন্ন করিব', তিনি তপস্যা করিলেন এবং তপস্যা করিয়া এখানে যাহা কিছু আছে সেই সব সৃষ্টি করিলেন। ইহা সৃষ্টি করিয়া তিনি তাহারই মধ্যে প্রবেশ করিলেন।"[৭৪] অনুরূপভাবে ছান্দোগ্যও বলিয়াছেন, "তিনি চিন্তা করিলেন 'আমি বহু হইব, আমি প্রকৃষ্টরূপে আপনাকে উৎপন্ন করিব'।" ইহার পর উক্ত উপনিষদে ক্রমান্বয়ে অগ্নি, জল এবং খাদ্যের উৎপত্তি বর্ণনা করা হইয়াছে।[৭৫] বৃহদারণ্যকে বলা হইয়াছে যে, জগৎ প্রথমে অব্যক্ত অবস্থায় ছিল এবং পরে নাম ও রূপের আকারে ব্যক্ত হইয়াছিল। উপনিষদের ভাষায় "জগৎকে ব্যক্ত করিয়া ঐ আত্মা জগতে প্রবেশ করিলেন। ক্ষুরাধারে যেমন ক্ষুর প্রবেশিত থাকে, অথবা অগ্নি যেমন স্বীয় উৎপত্তিস্থলে থাকে[৭৬] তেমনই এই আত্মা সমগ্র বিশ্বে নখাগ্র পর্যন্ত প্রবিষ্ট হইয়া আছেন। ব্রহ্ম হইতে জগতের অভিব্যক্তিকে উর্ণনাভ হইতে জালের নির্গমন[৭৭] অথবা অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গের বিকিরণ, মৃত্তিকা হইতে ওষধির উদ্‌গম[৭৮] এবং জীবিত মনুষ্যের মস্তক হইতে কেশোদ্‌গমের সহিত তুলনা করা হইয়াছে।[৭৯] যদিও এই ভেদযুক্ত জগৎ এই এক অন্তরাত্মা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, তাহা হইলেও এই জগতের দোষে অন্তরাত্মা দুষ্ট হন না। বহুরূপধারণকারী অগ্নি ও বায়ুকে ব্রহ্মের উপমানরূপে উল্লেখ করিয়া কঠোপনিষদ্‌ বলিতেছেন, "সূর্য যেমন সকল জীবের দর্শনের হেতু হইয়াও কোন চক্ষুর বাহ্য দোষ দ্বারা দুষ্ট হন না তেমনই সর্বভূতের অন্তরাত্মা জাগতিক দুঃখদ্বারা ক্লিষ্ট হন না, কারণ তিনি তদতীত।"[৮০]

আত্মা জগতের জড় ও জৈব—এই দুই উপাদানেরই মূল কারণ। পূর্বে উদ্ধৃত ছান্দোগ্য-বাক্যে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্ম হইতে ক্রমান্বয়ে অগ্নি, জল ও পৃথিবী—এই তিন ভূত উৎপন্ন হইয়াছে।[৮১] তৈত্তিরীয় উপনিষদে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল এবং পৃথিবী এই পঞ্চভূতের উল্লেখ দেখিতে পাই, ইহারা একের পর একটি আত্মা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির বিশেষ বিশেষ বিষয় যথা শব্দ, স্পর্শ, বর্ণ, রস ও গন্ধ যথাক্রমে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবীর বিশেষগুণ বলিয়া এই জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির সংখ্যাকে ভিত্তি করিয়া ভূত অথবা মৌলিক পদার্থগুলির সংখ্যা

নির্ধারিত হইয়াছে। অবশ্য এইগুলিকে আমাদের অনুভূত উপাদানগুলির সহিত অভিন্ন মনে করা উচিত নয়। শেষোক্ত পদার্থগুলি বিশুদ্ধ মৌলিক পদার্থ নয়, মিশ্রিত পদার্থ; এইজন্যই ইহাদিগকে স্থূলভূত বলা হয়। মৌলিক পদার্থগুলি সূক্ষ্ম। এইগুলি হইতেই পঞ্চীকরণ নামক পারস্পরিক মিশ্রণের এক প্রক্রিয়ার সাহায্যে স্থূল পদার্থগুলি রূপ পরিগ্রহ করে। প্রশ্নোপনিষদে সূক্ষ্ম পদার্থগুলিকে আকাশ-মাত্রা, বায়ুমাত্রা, তেজোমাত্রা, আপো-মাত্রা এবং পৃথিবী-মাত্রা বলা হইয়াছে।[৮২] 'পঞ্চীকরণ' শব্দটি পরবর্তীযুগে উদ্ভূত হইলেও মৌলিক পদার্থগুলির পরস্পর মিশ্রণের তত্ত্ব উপনিষদ্‌গুলিতে অবিদিত ছিল না, কারণ ছান্দোগ্যে যেখানে তিনটি মৌলিক পদার্থের কথা আছে, সেখানে উহাদের প্রত্যেককেই ত্রিবৃৎ করার (তিনেরই পরস্পরের সহিত মিশ্রিত করার) কথাও রহিয়াছে দেখা যায়।[৮৩] এই পঞ্চভূত হইতে যে বস্তুজগৎ বিবর্তিত হইয়াছে তাহা হইতে জীবগণ তাহাদের ভোগের বিষয়, সাধন (উপায়) এবং আয়তন (স্থান) প্রাপ্ত হয়। জৈব দেহগুলিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে—অণ্ডজ, জীবজ এবং উদ্ভিজ্জ।[৮৪] পরবর্তীযুগে এইগুলির সহিত একটি চতুর্থ শ্রেণী 'স্বেদজ' যোগ করা হইয়াছিল। অপেক্ষাকৃত প্রাচীন উপনিষদ্‌-গুলিতে সৃষ্টি ও লয়ের পুনঃ পুনঃ আবর্তনের কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু শ্বেতাশ্বতরে একাধিকস্থলে ইহার উল্লেখ আছে। রুদ্র সমস্ত জীব সৃষ্টি করিবার পর কালের অন্ত ঘটিলে তাহাদিগকে একাকার করিয়া দেন।[৮৫] মায়াজাল বিস্তৃত করার কাজ তিনি বহুবার করিয়া থাকেন—এরূপ কথাও বলা হইয়াছে।[৮৬]

নিষ্প্রপঞ্চ মতবাদ অনুসারে প্রকৃত সৃষ্টি বলিয়া কিছু নাই। গৌড়পাদ বলেন, "উপনিষদে মৃত্তিকা, ধাতু, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ প্রভৃতি দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিভিন্ন পদ্ধতিতে যে সৃষ্টিতত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, তাহা (ব্রহ্মও জগতের) অভেদ তত্ত্ব বুঝাইবার একটি উপায় মাত্র। ভেদের অস্তিত্ব কোন প্রকারেই নাই।[৮৭] জগতের অবভাস হয় মাত্র, ইহার প্রকৃত সত্তা নাই। এই মতের মধ্যেই মায়াবাদ নিহিত রহিয়াছে, কারণ মায়াদ্বারা নিরুপাধিক ব্রহ্ম কিরূপে সোপাধিকরূপে প্রতীয়মান হন তাহার উপপাদন করা হইয়া থাকে। উপনিষদে পূর্ণাকারে মায়াবাদ নাই ইহা সত্য বটে, কিন্তু উপনিষদের কোন কোন ঋষির নিকট এই চিন্তাধারা পরিচিত ছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যাজ্ঞবল্ক্যের উপদেশের মধ্যে মায়াবাদের সন্ধান পাওয়া যায়। এখানে ঋষি বলিতেছেন যে, জগতে যেন (ইব) দ্বৈতভাব আছে বলিয়া মনে হয়।[৮৮] "যেন ··বলিয়া মনে হয়" এই কথা দ্বারা বুঝা যায় যে, দ্বৈতযুক্ত জগতের প্রকৃত সত্তা নাই, উহা মিথ্যা মায়ামাত্র। ছান্দোগ্যে সকল পরিণামী বস্তুকে নামমাত্র

(নামধেয়), কথামাত্র (বাচারম্ভণ) বলা হইয়াছে।[৮৯] মৈত্রায়ণীয় উপনিষদে ব্রহ্মকে অগ্নিচক্রের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। পরবর্তীকালে গৌড়পাদ এই উপমাটিকে সম্প্রসারিত করিয়া জগতের মিথ্যাত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।[৯০] "ইন্দ্র মায়াদ্বারা বহুরূপ ধারণ করেন" ঋগ্বেদের এই বাক্যেও আমরা 'মায়া' শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাই।[৯১] বৃহদারণ্যকে জগতের প্রকৃত সত্তা অস্বীকার করিবার প্রসঙ্গে ঋগ্বেদের এই বাক্যটি উদ্ধৃত হইয়াছে ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়,[৯২] আর শ্বেতাশ্বতরে স্পষ্টভাবেই 'মায়া' শব্দ ভ্রান্তি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং সর্বজীবের ঈশ্বরকে 'মায়াবী' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।[৯৩] মায়ার সমার্থক 'অবিদ্যা' শব্দও একাধিক ঔপনিষদিক বাক্যে দেখিতে পাওয়া যায়।[৯৪] মায়া, অবিদ্যা প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার হইতে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, জগতের প্রকাশ একটি বিস্ময়কর ব্যাপার। বহুত্বপূর্ণ জগতের সৃষ্টি ব্রহ্মের অদ্বয় এবং অনন্যসাপেক্ষ স্বরূপের হানি ঘটায় না। "উহা পূর্ণ, ইহাও পূর্ণ, পূর্ণ হইতে পূর্ণের উদ্ভব হয়, পূর্ণ হইতে পূর্ণ গ্রহণ করিলে পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে।"

৭। জীবের বন্ধ ও মুক্তি

ব্যক্তি-আত্মাকে জীব বলা হইয়াছে। 'জীব্' ধাতুর অর্থ 'বাঁচিয়া থাকা'—'জীব' শব্দটি এই ধাতু হইতে ব্যুৎপন্ন। সপ্রপঞ্চ ও নিষ্প্রপঞ্চ এই উভয় মতানুসারেই জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে স্বরূপতঃ কোনও ভেদ নাই। "যিনি সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম এবং সকল জীবের অন্তরাত্মা তিনি কে?"[৯৫] উশস্ত চাক্রায়ণের এই প্রশ্নের উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, "তোমার আত্মাই সর্বভূতের অন্তরাত্মা।" দুইটি পক্ষীর যে উপমা দেওয়া হইয়াছে তাহার উদ্দেশ্য ব্রহ্ম ও জীবের ভেদ শিক্ষা দেওয়া নয়, কিন্তু ইহাদের মধ্যে ভেদ প্রতীয়মান হইতেছে কেন তাহা বুঝাইয়া দেওয়া। "সর্বদা সম্মিলিত ও পরস্পরের সহচর দুইটি পক্ষী একই বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। তাহাদের মধ্যে একটি সুস্বাদু ফল ভক্ষণ করে, অপরটি ভক্ষণ না করিয়া কেবল দর্শন করে। একই বৃক্ষে অবস্থিত একজন জগতের দুঃখসমূহে নিমগ্ন হইয়া মোহগ্রস্ত হয় এবং শক্তিহীনতার জন্য শোক করিয়া থাকে। কিন্তু যখন সে বহুজনপূজিত ঈশ্বর ও তাঁহার মহিমাকে দর্শন করে তখন সে বীতশোক হইয়া থাকে।"[৯৬] কঠোপনিষদে পরমাত্মা ও জীবাত্মাকে যথাক্রমে আলোক (আতপ) এবং ছায়ার সহিত তুলনা করা হইয়াছে।[৯৭] প্রশ্নোপনিষদে বলা হইয়াছে, "এই পরমাত্মা হইতে প্রাণের উদ্ভব

হইয়াছে। কোন ব্যক্তির সহিত তাহার ছায়া যেমন সংলগ্ন তেমনই ইহা (প্রাণ অর্থাৎ জীবাত্মা) তাহাতে (অর্থাৎ পরমাত্মাতে) সংলগ্ন থাকে।"[৯৮] সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, শরীর ও অন্তঃকরণ এই দুইয়ের দ্বারা আত্মা পরিচ্ছিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইলেই জীবভাবের উদয় হইয়া থাকে। শরীর ও অন্তঃকরণ জীবাত্মার বারবার জন্ম ও দুঃখের কারণ।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে [৯৯] আত্মার পাঁচটি কোষের উল্লেখ আছে—যথা খাদ্যনির্মিত সর্বাপেক্ষা উপরের বহিরাবরণ অন্নরসময় কোষ, বায়ুনির্মিত প্রাণময় কোষ, অর্থাৎ প্রাণ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময়, অর্থাৎ বুদ্ধিনির্মিত কোষ এবং আনন্দময় কোষ। পরবর্তীকালের বেদান্তে প্রথমটিকে স্থূলশরীর, তাহার পরবর্তী তিনটির সমষ্টিকে সূক্ষ্ম শরীর এবং শেষেরটিকে কারণ শরীর অথবা অজ্ঞান বা অবিদ্যা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। এইগুলির সমুচ্চয় আত্মার ব্যবহারিক আয়তন অথবা গৃহ বলিয়া অভিহিত হয়। এইগুলিদ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইয়া আত্মা বিষয়ের ভোগকর্তা হন। কঠোপনিষদে আত্মাকে রথীর সহিত, দেহকে রথের সহিত, বুদ্ধিকে সারথির সহিত, মনকে বল্গার সহিত, ইন্দ্রিয়গুলিকে অশ্বের সহিত এবং ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলিকে পথের সহিত উপমা দেওয়া হইয়াছে এবং ইহাও বলা হইয়াছে যে, জীবাত্মা শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনের সহিত সংযুক্ত হইয়া ভোগকর্তা হন।[১০০]

বিষয়ের সর্বজ্ঞানে এবং ভোগে অবশ্য মনের গুরুত্বই সর্বাপেক্ষা অধিক। বৃহদারণ্যকে মনের নিম্নলিখিত প্রধান ক্রিয়া বা বৃত্তিগুলির উল্লেখ করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, এই সমস্ত মনমাত্র—কাম, সঙ্কল্প, সংশয়, শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ধৃতি, অধৃতি, লজ্জা, বুদ্ধি, ভয়।[১০১] মন দশটি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কাজ করে—পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, যথা দর্শনেন্দ্রিয় (চক্ষু), শ্রবণেন্দ্রিয় (শ্রোত্র), স্পর্শেন্দ্রিয় (ত্বচ্), স্বাদের ইন্দ্রিয় (রসনা) এবং গন্ধের ইন্দ্রিয় (ঘ্রাণ)—পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়, যথা বচনেন্দ্রিয় (বাচ্) গ্রহণেন্দ্রিয় (পাণি), গমনেন্দ্রিয় (পাদ), মলত্যাগের ইন্দ্রিয় (পায়ু) এবং জননেন্দ্রিয় (উপস্থ)। জ্ঞানের সর্বপ্রধান ইন্দ্রিয় যে মন তাহা অন্যান্য পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জ্ঞান আহরণ করে এবং এই আহৃত জ্ঞানগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে এবং এক বা একাধিক কর্মেন্দ্রিয়ের সাহায্যে কর্মসম্পাদন করে।

দেহ (অন্নময় কোষ) এবং শ্বাসবায়ু (প্রাণময় কোষ) মন অপেক্ষা নিম্নস্তরের পদার্থ। প্রথমটিকে আশ্রয় করিয়া জীবাত্মার কর্ম ও ভোগ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে এবং দ্বিতীয়টি দেহকে জীবনীশক্তি দিয়া থাকে। বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষ মনোময় কোষ অপেক্ষা উচ্চস্তরের। প্রথমটি নৈতিক চেতনার এবং দ্বিতীয়টি নৈতিকাতীত

চেতনার নির্দেশক। বিজ্ঞানময় কোষের বিভিন্ন অংশের বর্ণনা করিতে গিয়া উপনিষদ্ বলিতেছেন, "শ্রদ্ধা ইহার মস্তক, ধর্মনিষ্ঠা (ঋত) ইহার দক্ষিণাঙ্গ, সত্য বামাঙ্গ, ধ্যান, (যোগ) ইহার শরীর, শক্তি (মহস্) নিম্নাঙ্গ অর্থাৎ ভিত্তি।"[১০২] বদ্ধদশায় জীবের চেতনা আনন্দময় কোষের ঊর্ধ্বে উঠিতে পারে না। এই অবস্থায় জীব সাময়িকভাবে সুখ ও শান্তি ভোগ করিতে পারে। সুষুপ্তিতে এবং রসোপভোগের আনন্দে জীবের এই অবস্থা হইয়া থাকে। এই চেতনাকে কিন্তু মোক্ষাবস্থা বলিয়া মনে করা উচিত নয়, কারণ মোক্ষ বলিতে আত্মার নিরবচ্ছিন্ন এবং শাশ্বত মুক্তি বুঝায়। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিনটি ব্যবহারিক অবস্থা হইতে পৃথক্ করিবার জন্য মোক্ষাবস্থাকে চতুর্থ বা তুরীয়াবস্থা বলা হইয়াছে।

উপনিষদের মতে জীবাত্মা দেহের সহিত জন্মগ্রহণও করেন না এবং ইহার ধ্বংসের সহিত বিনষ্টও হন না। "সেই জ্ঞানীর (অর্থাৎ জীবাত্মার) জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই। ইনি অন্য কিছু হইতে উদ্ভূত হন নাই, ইহা হইতেও কিছু উদ্ভূত হয় নাই। ইনি জন্মহীন, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাণ। শরীর নিহত হইলেও ইনি নিহত হন না"[১০৩] জীবের মৃত্যুকালে কেবলমাত্র তাহার জড়দেহের বিনাশ হইয়া থাকে। জীবাত্মা সূক্ষ্মশরীরকে আশ্রয় করিয়া এক জন্ম হইতে অন্য জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। এই জন্মান্তর গ্রহণের কারণ হইল অবিদ্যা। বৃহদারণ্যক উপনিষদেই আমরা প্রথমে জন্মান্তরবাদের স্পষ্ট উল্লেখ পাই। কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাহার শরীরের বিভিন্ন উপাদানগুলি অগ্নি প্রভৃতি পঞ্চভূতে বিলীন হইলে তাহার কি হয় যাজ্ঞবল্ক্যকে ইহা জিজ্ঞাসা করা হইলে যাজ্ঞবল্ক্য প্রশ্নকর্তাকে একান্তে লইয়া গিয়া তাঁহাকে গোপনে জীবাত্মার জন্মগ্রহণ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিলেন। এই আলোচনার সারাংশ উপনিষদে এইভাবে বিবৃত হইয়াছে। "তাঁহারা কর্মসম্বন্ধেই কথা বলিয়াছিলেন, তাঁহারা কর্মেরই প্রশংসা করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি শুভ কর্ম করে সে নিশ্চয়ই সাধু হয় এবং যে অশুভ কর্ম করে সে অসাধু হয়।"[১০৪] অপর এক প্রসঙ্গে এই ঋষি জন্মান্তর সম্বন্ধে তাঁহার মত আরও বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। একটি তৃণজলুক (জোঁক) যখন একটি তৃণের শেষপ্রান্তে আসে তখন সে তাহার শরীর সঙ্কুচিত করিয়া অপর একটি তৃণে লাফাইয়া যায়, ঠিক তেমনই মৃত্যুর পর জীবাত্মা তাহার বর্তমান দেহ পরিত্যাগ করিয়া অপর এক দেহে প্রবেশ করে। স্বর্ণকার যেমন পিতৃপুরুষদের গন্ধর্বদের, দেবতাদের, প্রজাপতি, ব্রহ্মা বা অন্য কাহারও মূর্তি হইতে অধিক সুন্দর মূর্তি নির্মাণ করে, তাহার সহিতও এই দেহান্তরপ্রাপ্তিরূপ প্রক্রিয়ার তুলনা করা যাইতে পারে। জীবাত্মা পরজন্মে কিরূপ দেহ ধারণ করিবে তাহা তাহার প্রাক্তন

কর্মের উপর নির্ভর করে। "মানুষের যেরূপ কামনা তাহার সঙ্কল্প সেইরূপ হইয়া থাকে, তাহার যেরূপ সঙ্কল্প সে সেইরূপ কর্ম করিয়া থাকে, সে যেরূপ কর্ম করিবে সেইরূপ ফল নিজের জন্য সম্পাদন করিবে।"[১০৫] মনুষ্যের আত্মা মনুষ্যেতর প্রাণীর দেহেও জন্মগ্রহণ করিতে পারে। কঠোপনিষদে বলা হইয়াছে, "নিজেদের কর্মফলানুযায়ী ও জ্ঞানানুযায়ী কেহ কেহ শরীর গ্রহণের জন্য মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে এবং অপর কেহ কেহ স্থাবরত্বপ্রাপ্ত হয়।"[১০৬] ছান্দোগ্যে বলা হইয়াছে, "যাহারা ইহজন্মে প্রশংসনীয় কার্য করে তাহাদের কোনও উচ্চশ্রেণীর জীবের গর্ভে—যথা ব্রাহ্মণগর্ভে, ক্ষত্রিয়গর্ভে অথবা বৈশ্যগর্ভে জন্মগ্রহণ করিবার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু যাহারা ঘৃণ্য কর্ম করে তাহাদের নীচশ্রেণীর গর্ভে—যথা কুকুর, শূকরী অথবা অস্পৃশ্য-গর্ভে জন্মগ্রহণ করার সম্ভাবনাই অধিক।"[১০৭] ইহাও বলা হইয়াছে যে, কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে ইহলোকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিবার পূর্বে সে তাহার পুণ্য অথবা পাপের ফল ভোগ করিবার জন্য স্বর্গ, নরক প্রভৃতি অন্যান্য লোকেও যাইতে পারে। যাহারা যাগযজ্ঞাদিতে লিপ্ত থাকে তাহাদের সম্বন্ধে মুণ্ডকোপনিষদে বলা হইয়াছে, "ইষ্টকর্ম করিবার ফলে স্বর্গপৃষ্ঠে সুখভোগ করিয়া তাহারা এই মনুষ্য-লোক অথবা হীনতর লোকে পুনরায় প্রবেশ করে।"[১০৮]

বেদে ঋত ও ইষ্টাপূর্ত এই যে দুইটি শব্দ আছে, তাহাদের মধ্যে কর্মবাদের আভাস পাওয়া যায়। 'ঋত' শব্দটি কেবলমাত্র প্রাকৃত ঘটনার শৃঙ্খলা বুঝাইত না, নৈতিক শৃঙ্খলাকেও বুঝাইত। ইষ্টাপূর্তের ধারণানুসারে মানুষ যজ্ঞ ও অন্যান্য হিতকর কর্ম করিলে তাহার যে পুণ্যলাভ হয়, উহার ফলে সে সুখভোগ করিয়া থাকে। নৈতিক জগতে কর্মের নিয়ম জড়জগতে কার্যকারণ নিয়মের অনুরূপ। কিন্তু ইহাও বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, জীবাত্মা যে কর্মচক্র হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে ঔপনিষদিক দর্শনে তাহা স্বীকৃত হইয়াছে।

মোক্ষ অথবা মুক্তি প্রত্যেক ব্যক্তির চরম লক্ষ্য। পুনর্জন্ম হইতে উদ্ধার লাভ করাই মুক্তি। উপনিষদে এই চরম লক্ষ্য সম্বন্ধে দুইটি মত আছে। তাহাদের মধ্যে একটি মতানুসারে কেবলমাত্র মৃত্যুর পরই মোক্ষলাভ হইতে পারে, অপর মতানুসারে ইহজীবনেই মোক্ষলাভ হইতে পারে। বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণাংশে পরলোকসম্বন্ধীয় যে সকল মতবাদ প্রচলিত ছিল তদনুসারে স্বর্গ একটি দূরবর্তী স্থান এবং জীবাত্মা কেবলমাত্র জড়দেহ পরিত্যাগ করিবার পর তথায় যাইতে পারে। প্রথমোক্ত ঔপনিষদিক মতটি এই সকল মতবাদ হইতেই আসিয়াছে। উপনিষদে কিন্তু এই মত পরিবর্তিত হইয়াছে। উপনিষদে মানব যাহা নয় তাহা হইবার চেষ্টাকে আদর্শ

বলিয়া গৃহীত হয় নাই, যে ব্রহ্ম হইতে সে স্বরূপতঃ অভিন্ন সেই ব্রহ্মকে লাভ করাই উপনিষদের মতে প্রত্যেকের প্রকৃত আদর্শ। উপনিষদের ঋষি বলিতেছেন, "যে ব্রহ্ম আমার আত্মা, ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া আমি সেই ব্রহ্মে প্রবেশ করিব।"[১০৯] যে জীবাত্মা এইভাবে ব্রহ্মের সহিত তাদাত্ম্য উপলব্ধি করেন, তাঁহার মার্গ দেবযান বলিয়া কথিত হয়। এই পথ পিতৃযান হইতে ভিন্ন। পিতৃযান হইল পুনর্জন্মের আবর্তে বদ্ধ আত্মার পথ। পিতৃযান ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, সূর্যের দক্ষিণায়নের ছয় মাস, পিতৃ-লোক, মহাশূন্যের মধ্য দিয়া চন্দ্রলোক পর্যন্ত গিয়া পুনরায় ইহলোকে ফিরিয়া আসিয়াছে। দেবযান জীবাত্মাকে আলোক, দিবস, শুক্লপক্ষ, সূর্যের উত্তরায়ণের ছয়মাস, বৎসর এবং সূর্যের মধ্য দিয়া চন্দ্রলোক পর্যন্ত লইয়া যায়। এইরূপ মুক্তিকে পরবর্তী বেদান্তে ক্রম-মুক্তি বলা হইয়াছে। লক্ষ্য সম্বন্ধে অপর মতবাদটি নিষ্প্রপঞ্চ-ব্রহ্ম মতবাদের অনুবর্তী। এই মতানুসারে মোক্ষ কোন নূতন প্রাপ্তব্য অবস্থা নয়, ইহা আত্মারই শাশ্বত স্বরূপ। বন্ধনের কারণ অবিদ্যা জ্ঞানের দ্বারা দূরীভূত হইলেই আত্মা ব্রহ্মের সহিত অভিন্নত্ব উপলব্ধি করেন। ইহাই মোক্ষ এবং ইহা দেহবিনাশের অপেক্ষা রাখে না। "হৃদয়স্থ সমস্ত বাসনা যখন দূরীভূত হয় তখনই মরণ-ধর্মা জীব অমরত্ব লাভ করে, ইহলোকেই সে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়।"[১১০] "তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয় না, সে ব্রহ্ম হইয়াই ব্রহ্মকে লাভ করে।"[১১১] পরবর্তী বেদান্তে মোক্ষের এই মতবাদকে সদ্যো-মুক্তি এবং জীবন্মুক্তি বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। এই দুইটি মতবাদের মধ্যে মোক্ষের স্বরূপসম্বন্ধে কোন পার্থক্য নাই। মোক্ষ হইল বন্ধন অথবা সংসার হইতে মুক্তি। ইহা কেবলমাত্র দুঃখাভাবরূপ কোন অভাববস্তু নয়, ইহা পরম আনন্দ, নিরবচ্ছিন্ন শান্তি।

মোক্ষলাভের যোগ্যতা অর্জন করিতে হইলে মানুষকে কি ভাবে জীবনযাপন করিতে হইবে তাহা উপনিষদগুলির বহুস্থলে বিবৃত হইয়াছে। সাধারণতঃ ইহা ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে, মুমুক্ষু ব্যক্তি অবশ্যই উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হইবেন। "যে ব্যক্তি দুষ্কার্য হইতে বিরত হয় নাই, যে অশান্ত, অসমাহিত, অসংযত-চিত্ত সে বুদ্ধি দ্বারা তাঁহাকে (ব্রহ্মকে) লাভ করিতে পারে না।"[১১২] কেবলমাত্র চরিত্রবান্ ব্যক্তিই ব্রহ্ম অথবা আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিবার অধিকারী ইহা ধরিয়া লওয়া হইয়াছে বলিয়া উপনিষদে নৈতিক অনুশাসনগুলির বিস্তারিত আলোচনা নাই। কিন্তু তাহা হইলেও উপনিষদে এরূপ বহু বাক্য আছে যাহাতে সুস্পষ্টভাবেই সৎজীবনযাপনের বিধান দেওয়া হইয়াছে। অতএব ইহা দুর্বোধ্য যে কি করিয়া কীথ্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, "উপনিষদে ব্রাহ্মণদের চিন্তাশীলতার যে

পরিচয় পাওয়া যায় তাহার তুলনায় নৈতিক আচরণ সম্বন্ধে আলোচনা অবশ্যই অকিঞ্চিৎকর ও মূল্যহীন"[১১৩] এবং "মানুষের নৈতিক জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট নয় এমন কতকগুলি বস্তুতেই ব্রাহ্মণদের মন নিবিষ্ট ছিল এরূপ বলিতে হয়।"[১১৪] তৈত্তিরীয় প্রভৃতি উপনিষদে পরস্পরের সহিত কিরূপ আচরণ করিতে হইবে সে সম্বন্ধে অতি সাধারণ নিয়মগুলিরও উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। বৃহদারণ্যকে অসুর, মানব এবং দেবতা যথাক্রমে এই তিনশ্রেণীর জীবকে লক্ষ্য করিয়া তিনটি অনুশাসন দেওয়া হইয়াছে—'দাম্যত' (চিত্তসংযম অভ্যাস কর), 'দত্ত' (দানশীল হও) 'দয়ধ্বম' (অনুকম্পাযুক্ত হও)। এই তিনটি অনুশাসনে সমগ্র নীতিতত্ত্বই সংক্ষিপ্তভাবে বলা হইয়াছে। অবশ্য এরূপ কথাও দেখিতে পাওয়া যায় যে, যিনি ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিয়াছেন তিনি সকল নিয়মের উর্ধ্বে—এরূপ ব্যক্তি যথেচ্ছ জীবনযাপন করিতে পারেন। কিন্তু এই বাক্যের অর্থ কেবল এই মাত্র যে কিছুই তাঁহাকে বাহির হইতে নিয়ন্ত্রণ করে না, তিনি স্বভাবতঃই সর্বোত্তম নৈতিক জীবনযাপন করেন। সুতরাং কেহ যদি বলেন যে, তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলে মানুষের অতীত পাপ বিনষ্ট হয় এবং তত্ত্বজ্ঞানী নিঃসঙ্কুচিতচিত্তে কোনপ্রকার শাস্তির ভয় না করিয়া পাপাচরণ করিতে পারেন ইহাই উপনিষদের বক্তব্য, তাহা হইলে উপনিষদের শিক্ষাকে বিকৃত করা হয়।[১১৫]

উপনিষদের মতে আত্মার নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে বিস্মৃতিই বন্ধনের মূল। এই বিস্মৃতির ফলে আত্মা ভুল করিয়া নিজেকে অহঙ্কার, মন এবং দেহের সহিত অভিন্ন মনে করিয়া থাকে এবং তাহার ফলেই আত্মা জন্ম-মৃত্যু-চক্রে জড়িত হইয়া পড়ে। মুক্তির পথ স্বভাবতঃই ইহার বিপরীতগামী হইবে। আত্মাকে প্রথমতঃ পরিচ্ছিন্ন জীবনের বেষ্টনী ভাঙ্গিয়া ব্যবহারিক সত্তার সঙ্কীর্ণ পরিধির বাহিরে যাইতে হইবে। ইহা সম্পাদন করিতে হইলে বৈরাগ্য বা ত্যাগসাধনের প্রয়োজন। কিন্তু জ্ঞানের উদয় হইলেই বৈরাগ্য পরিপূর্ণতালাভ করিতে পারে। কেবল ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারাই অজ্ঞান সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়। এখানে যে জ্ঞানের কথা বলা হইয়াছে তাহা বিচার-মূলকজ্ঞান অথবা বুদ্ধিদ্বারা আত্মার অদ্বয়ত্বগ্রহণও নয়। ব্রহ্ম হইয়া ব্রহ্মকে জানিতে হইবে। ব্রহ্মোপলব্ধি করিতে হইলে যথাক্রমে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন প্রক্রিয়া অবলম্বন করিতে হইবে।[১১৬] প্রথমটির অর্থ উপযুক্ত গুরুর নিকট উপনিষদের পাঠগ্রহণ, দ্বিতীয়টি হইল অক্লান্ত চিন্তা এবং যৌক্তিক বিশ্লেষণ দ্বারা উপনিষদের শিক্ষায় বৌদ্ধিক প্রতীতি অর্জন, তৃতীয় প্রক্রিয়া হইল নিরবচ্ছিন্ন ধ্যান, ইহাদ্বারা পরমজ্ঞান লাভ করা যায়। চিন্তার সহায়ক হিসাবে উপনিষদে বিভিন্ন প্রকারের

ধ্যান উপদিষ্ট হইয়াছে—ইহাদিগকে বিদ্যা বলা হয়। মুমুক্ষুকে অদ্বৈত-তত্ত্বে উপনীত হইতে সাহায্য করাই এই সকল সাধনার উদ্দেশ্য। "কোন ব্যক্তি যদি আপনাকে 'আমিই সেই' বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারে তাহা হইলে সে কোন্ বাসনায়, কিসের আকর্ষণে দেহের প্রতি আসক্ত হইয়া থাকিবে?" এমনই এক পরম পুরুষার্থের জন্য উপনিষদের ঋষি প্রার্থনা করিতেছেন—

"অসত্য হইতে আমাকে সত্যে লইয়া যাও
অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যাও
মৃত্যু হইতে অমৃতে লইয়া যাও।"[১১৭]

সংক্ষিপ্ত শব্দের ব্যাখ্যা

এস্ বি ঈ	—Sacred Books of the East
ঋক্	—ঋগ্বেদ
ঐত	—ঐতরেয় উপনিষদ্
কঠ	—কঠোপনিষদ্
কেন	—কেনোপনিষদ্
কৌষী	—কৌষীতকি উপনিষদ্
ছা	—ছান্দোগ্য উপনিষদ্
তৈ	—তৈত্তিরীয় উপনিষদ্
প্রশ্ন	—প্রশ্নোপনিষদ্
বৃহ	—বৃহদারণ্যকোপনিষদ্
মাণ্ডু	—মাণ্ডুক্যোপনিষদ্
মু	—মুণ্ডকোপনিষদ্
মৈত্রা	—মৈত্রায়ণীয় উপনিষদ্
শ্বেত	—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্

দ্রষ্টব্য

১। "নাস্তিক বৌদ্ধদর্শনকে লইয়া এমন কোন প্রধান হিন্দুদর্শন নাই যাহার মূল উপনিষদে নাই"—Bloomfield—The Religion of the Veda, পৃঃ ৫১। ভারতের বাহিরেও যে উপনিষদের প্রভাব

বিস্তারলাভ করিয়াছিল তাহার প্রমাণ-স্বরূপ নিও-প্লেটোনিক দর্শন, (গ) নষ্টিক দর্শন এবং সুফী-দর্শনের উল্লেখ করিতে পারা যায়। যে-সকল দেশে বৌদ্ধধর্ম এবং হিন্দুধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল উপনিষদ্ সমূহ সেই সকল দেশের চিন্তাধারাকে গৌণভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল।

২। "এক অর্থে বাক্যালাপকেই দার্শনিক আলোচনার শ্রেষ্ঠ আকার বলা যাইতে পারে, কারণ অন্ততঃ প্লেটোর মতে আত্মা নিজের সহিত যে বাক্যালাপ করে তাহাই চিন্তা, এবং তাহা ছাড়া বাক্যালাপে চিন্তা যেমন একদিকে বাহিরের শক্তির শাসন হইতে নিজেকে মুক্ত করে, তেমনই অন্য চিন্তার বশ্যতা স্বীকার করিয়া ব্যক্তিগত সঙ্কীর্ণতা হইতেও নিজেকে মুক্ত করে"—**Alexander Koye Discovering Plato** পৃঃ ৩ পাদটীকা।

৩। **M. Hiriyanna—Outlines of Indian Philosophy** পৃঃ ৫২। "দৈনিক ব্যবহারের ভাষায় কিছু পড়া যেন অন্যের কাছে কিছু শোনা, কিন্তু কবিতায় কিছু পড়া যেন সাক্ষাৎ অনুভব হইতে শিক্ষা করা"—**Max Easterman—Enjoyment of Poetry.**

৪। এই শব্দটি উপনিষদেই দেখিতে পাওয়া যায়। শ্বেত ৬।২২ এবং মু ৩।২।৬ দ্রষ্টব্য।

৫। বৃহ—২।১।২০

৬। ছা—৩।৫।২

৭। কঠ—৩।১৭, শ্বেত ৬।২২

৮। কঠ, বৃহ, তৈ এবং মু'র শঙ্করভাষ্যের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

৯। এই দুইটি উপনিষদের কোনটিতেই বিপরীত চিন্তাধারার চিহ্নের অভাব নাই।

১০। রাধাকৃষ্ণন্,—ভারতীয় দর্শন প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৪১ দ্রষ্টব্য। **Walter Ruben** তাঁহার **Die Philosophen der Upanishaden** গ্রন্থে উপনিষদের ঋষিদের সংখ্যা নির্ণয় করিবার এবং তাঁহাদিগকে পুরুষানুক্রমে পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিবার একটি মনোজ্ঞ চেষ্টা করিয়াছেন। উপনিষদে ঋষিদের পাঁচপুরুষের সন্ধান পাওয়া যায়, যাঁহারা বুদ্ধদেবের পূর্ববর্তী। এক এক পুরুষের স্থিতিকাল ত্রিশ বৎসর ধরিয়া তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, উপনিষদের যুগ ৭০০ খৃঃ পূঃ হইতে ৫৫০ খৃঃ পূঃ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

১১। বৃহ—১।৪।১০

১২। ঐ—৩।৯।২১

১৩। ছা—১।১২

১৪। মু—১।২।৭-১০

১৫। ছা—৩।১৪-১৭

১৬। ঐ—৫।১৯-২৪ ; কৌষী ২।৫

১৭। বৃহ—১।৫।১৬ ; ৬।২।১৬ ; ছা ৫।১০।৩-৭ ; প্রশ্ন—১।৯ ; মু—১।২।১০

১৮। শ্বেত—২।৬-৭

১৯। ঐ—২।১৫

২০। ঋক্—১।১৬৪।৪৬

২১। রাধাকৃষ্ণন্—ঐ পৃঃ ১৪৪ "বেদের অর্ধদেবতাগণ লুপ্ত হইলেন এবং প্রকৃত ঈশ্বরের আবির্ভাব হইল।"

২২। বৃহ—৩।৯
২৩। মৈত্রা—৪।৫-৬
২৪। কেন—২৫-২৬
২৫। কঠ—৬।৩
২৬। কৌষী—১।৫
২৭। ছা—৬।১।৪
২৮। মু—১।১।৪-৫
২৯। ছা—৬।১।৩
৩০। ঐ—৬।১।৪
৩১। ২।৪
৩২। শ্বেত—৫।১
৩৩। বৃহ—২।৪।১২-১৪
৩৪। ঐ—৩।৪।২
৩৫। কেন—১।৩
৩৬। তৈ—২।৪
৩৭। বৃহ—৪।৪।২০
৩৮। কঠ—৬।১৩
৩৯। মু—১।২।১২-১৩
৪০। কঠ—২।৭
৪১। বৃহ—৪।৪।৫ স বা ইয়মাত্মা ব্রহ্ম।
৪২। ছা—৫।১১।১ কো নু আত্মা, কিং ব্রহ্ম ?
৪৩। ঐ—৬।১১-২৪
৪৪। তৈ—৩
৪৫। বৃহ—৩।৬ ও ৮
৪৬। ঐ—৩।৭।১৫
৪৭। তৈ—৩
৪৮। ছা—৮।৭-১২
৪৯। দশোপনিষদ্—উপনিষদ্ ব্রহ্মযোগীর ভাষ্য (আদিয়ার পুস্তকালয়) প্রথম খণ্ড ; পৃঃ ২১২
৫০। মাণ্ডু—৬
৫১। ছা—১।৭।৫
৫২। ঐ—৩।১৮।১
৫৩। বৃহ—২।১
৫৪। কৌষী—৪
৫৫। ছা—৬।৮।৭

৫৬। **Josiah Royce** তাঁহার গিফোর্ড বক্তৃতাবলীর প্রথম খণ্ডের চতুর্থ বক্তৃতায় উপনিষদের অতীন্দ্রিয়ানুভূতিবাদ সম্বন্ধে বহু আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধের লেখক মনে করেন যে, তিনি উপনিষদের দর্শনকে এক প্রকার বিজ্ঞানবাদ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া ভুল করিয়াছেন। **The World and the Individual** প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৫৮

৫৭। ছা—৩।১৪।২-৩

৫৮। ঐ—৭।২৫।২

৫৯। ঐত—৫।৩

৬০। বৃহ—৩।৮।৮

৬১। কঠ—৩।১৫ উপনিষদ্ (জি, এ, নটেশন এ্যাণ্ড কোং) পৃঃ ৪০

৬২। বৃহ—৪।২।৪

৬৩। ঐ—২।১।২০

৬৪। ঐ—৫।৫।১

৬৫। কঠ—৩।১৫, মু—২।২।১০

৬৬। বৃহ—৪।৩।৩৩

৬৭। তৈ—২।৮

৬৮। ছা—৭।২৩

৬৯। বৃহ—৩।৯।২৮

৭০। তৈ—২।১ **Deussen** মনে করেন যে পুরাকালে 'আনন্দম্'কে ভুল করিয়া 'অনন্তম্' করা হইয়াছিল এবং পরে পরম্পরাক্রমে তাহাই প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে।

৭১। শ্বেত—১।১-৩

৭২। ছা—৩।১৪।১

৭৩। তৈ—৩।১

৭৪। ঐ—২।৬

৭৫। ছা—৬।২।৩-৪

৭৬। বৃ—১।৪।৭

৭৭। ঐ—২।১।২০ ; মু—১।১।৭

৭৮। ঐ—২।১।২০ ; মু—২।১।১

৭৯। মু—১।১।৭

৮০। কঠ—৫।৯-১১

৮১। ছা—৬।২।৩-৪

৮২। প্রশ্ন—৪।৮

৮৩। ছা—৬।৩।৩

৮৪। ঐ—৬।৩।১

৮৫। শ্বে—৩।২

৮৬। ঐ—৫।৩
৮৭। কারিকা—৩।১৫
৮৮। বৃহ—২।৪।১৪
৮৯। ছা—৬।১।৩
৯০। মৈত্রা—৬।২৪ ;
৯১। ঋক্—৬।৪৭।১৮
৯২। বৃহ—২।৫।১৯
৯৩। শ্বেত—৪।১০
৯৪। কঠ—২।৫
৯৫। বৃহ—৩।৪।১ এবং ৩।৫।১
৯৬। উপনিষদ্ (জি, এ, নটেশন এ্যাণ্ড কোং) পৃঃ ১০৮-৯ , মু—৩।১।১-২ ; শ্বেত—৪।৬-৭
৯৭। কঠ—৩।১
৯৮। প্রশ্ন—৩।৩
৯৯। তৈ—২
১০০। কঠ—৩।৩-৪
১০১। বৃহ—১।৫।৩
১০২। তৈ—২।৪
১০৩। কঠ—২।১৮
১০৪। বৃহ—৩।২।১৩
১০৫। ঐ—৪।৪।৩-৫
১০৬। কঠ—৫।৭
১০৭। ছা—৫।১০।৭
১০৮। মু—১।২।১০
১০৯। ছা—৩।১৪।৪
১১০। কঠ—৬।১৪
১১১। বৃহ—৪।৪।৬
১১২। কঠ—২।২৪
১১৩। ঐ গ্রন্থ পৃঃ ৫৮৪
১১৪। ঐ গ্রন্থ পৃঃ ৫৮৬
১১৫। **R. E. Hume, The Thirteen Principal Upanishads,** পৃঃ ৬০
১১৬। বৃহ—২।৪।৫
১১৭। ঐ—১।৩।২৮

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রামায়ণ

১। প্রাথমিক মন্তব্য

রামায়ণ প্রকৃত অর্থে মহাভারতের ন্যায় একখানি জাতীয় মহাকাব্য। আত্ম-প্রকাশের দিন হইতেই উক্ত গ্রন্থ ভারতবাসীর চিন্তা, ভাবনা ও আচার ব্যবহারের উপর এক গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিতেছে। ইহা পৌরুষ ও নারীত্বের এমন এক মহান্ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, যাহা সকল শ্রেণীর লোকেদের অন্তরে অনুকরণীয় আদর্শ হিসাবে স্থান পাইয়াছে। উক্ত আদর্শ তাহাদিগকে মহৎ করিয়াছে এবং দুর্যোগের দিনে তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিতে সাহায্য করিয়াছে। রামায়ণ ভারতবর্ষের কবিদের প্রেরণার এক অফুরন্ত উৎস। সংস্কৃত, প্রাকৃত ও দেশীয় ভাষাকে অবলম্বন করিয়া রামায়ণ হইতে তাঁহারা কেবলমাত্র কাব্যের বিষয়বস্তু সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাই নহে, কাব্যের মৌলিক ভাবধারা ও কল্পনার প্রেরণাও রামায়ণের মধ্যে তাঁহারা লাভ করিয়াছেন।

উক্ত গ্রন্থের অতুলনীয় জনপ্রিয়তা থাকা সত্ত্বেও এবং সম্ভবতঃ এই জনপ্রিয়তার জন্যই, গ্রন্থকার আদি কবি বাল্মীকি পরিকল্পিত রামায়ণের মূল রচনা আমাদের হস্তে আসিয়া পৌছায় নাই; বিকৃত অবস্থায় বহুবিষয়সংযুক্ত হইয়া গ্রন্থখানি আমাদের হস্তে আসিয়া পৌছিয়াছে। ইহা ছাড়া বর্তমানে রামায়ণের প্রধানতঃ তিনপ্রকার পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়: পশ্চিম ভারত, বঙ্গদেশীয় ও বোম্বাই-এর পাঠ। উক্ত পাঠ সকলের মধ্যে পার্থক্য এত অধিক যে, যে কোন একটি পাঠের প্রায় এক তৃতীয়াংশ শ্লোক অন্য দুই পাঠে[১] দেখা যায় না। জ্যাকবির 'ডাস্ রামায়ণ' (বন্, ১৮৯৯) নামক গ্রন্থে রামায়ণের বিষয়বস্তুর অতি সূক্ষ্ম আলোচনা আছে এবং উক্ত আলোচনা সম্ভবতঃ রামায়ণের সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট আলোচনা। জ্যাকবির মতে প্রচলিত সপ্তকাণ্ড রামায়ণের সপ্তম কাণ্ডের প্রায় সমগ্রই এবং প্রথম কাণ্ডের কিয়দংশ অপেক্ষাকৃত পরবর্তী যুগের সংযোজনা। জ্যাকবির মন্তব্য যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে উক্ত সংযোজনা সকল অতি প্রাচীনকালেই ঘটিয়াছিল; কারণ পূর্বোক্ত সকল পাঠেই এবং পরবর্তী যুগের পরম্পরায় এইগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। রামায়ণের বয়স আলোচনা

করিতে গিয়া জ্যাকবি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন[২] যে, রামায়ণ খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর পূর্বে অথবা সম্ভবতঃ সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দীতে রচিত।

বর্তমান প্রবন্ধে রামায়ণের যে দার্শনিক মতবাদ দেওয়া হইল তাহা বোম্বাই পাঠ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। পণ্ডিত ব্যক্তিদের মতে বোম্বাই পাঠই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং সর্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত। এইরূপ আশা করা যায় যে, উক্ত পাঠে রামায়ণের মূল ভাব সকল অপেক্ষাকৃত সঠিকভাবে বর্ণিত হইয়াছে এবং অন্যান্য পাঠে ইহার সমর্থনও পাওয়া যাইবে। বর্তমান প্রবন্ধে রামায়ণের যে সব স্থলের উল্লেখ আছে, সেইগুলি নির্ণয়সাগর প্রেসের দ্বিতীয় সংস্করণ (বোম্বাই ১৯০২) হইতে সংগৃহীত।

২। সামাজিক ও বৌদ্ধিক পটভূমি

রামায়ণে সমাজের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহাতে চারিবর্ণ ও চতুরাশ্রম দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ বর্ণোচিত কর্মে নিরত এবং বেদ ও ঋষিবাক্যে লোকের শ্রদ্ধা মজ্জাগত। রামায়ণে গো ও ব্রাহ্মণের পবিত্রতার কথা পুনঃপুনঃ জোরের সহিত বলা হইয়াছে। ধর্ম ও কর্তব্য কর্মের উপর এত অধিক গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে যে, পরিণামে ইহা এক প্রকার মানসিক বিকৃতিতে পরিণত হইয়াছে। যাহারা বানর ও রাক্ষস নামে অভিহিত হইত তাহাদেরও বেদাধ্যয়ন ও বৈদিক ক্রিয়াকলাপে অধিকার ছিল। নগর সকলে এবং সম্ভবতঃ গ্রামগুলিতেও বহু মন্দির ছিল। কোন কোন মন্দিরে বিগ্রহ থাকিত, আবার কোন কোন মন্দিরে থাকিত না। এইসব উপাসনার মন্দির আয়তন বা চৈত্য বলিয়া কথিত হইত। অরণ্য ও পর্বতনিবাসী বিভিন্ন শ্রেণীর সন্ন্যাসীরা লোকালয়ে ঘুরিয়া বেড়াইতেন তাঁহারা বিশেষ সম্মানের পাত্র ছিলেন। অপর দিকে অবিশ্বাসী নাস্তিকদেরও উল্লেখ আছে। ইহারা ধর্মাচরণকারীদের পক্ষে সর্বদাই উদ্বেগের কারণ ছিল। রাজা জনসাধারণের সম্মতিক্রমে ও সুবিজ্ঞ মন্ত্রীদের পরামর্শানুসারে রাজ্যশাসন করিতেন। তিনি বর্ণ ও আশ্রমের পালক এবং ধর্মের রক্ষক ছিলেন। যাহাতে তিনি জনসাধারণের সম্মুখে কোন নিন্দনীয় দৃষ্টান্ত রাখিয়া না যান, তাহার জন্য তাঁহাকে ব্যক্তিগত জীবনে খুব সাবধান থাকিতে হইত।[৩]

বুদ্ধি সংক্রান্ত ব্যাপারে বিদ্যার (বা বিনয়ের) উপর সমধিক গুরুত্ব অর্পিত হইত। বিনয়ের উদ্দেশ্য ছিল স্বাভাবিক গুণাবলীর প্রকাশ বা বৃদ্ধি। রামায়ণে দৃষ্ট, স্পষ্ট বা

অস্পষ্ট উল্লেখ হইতে মনে হয় যে, অন্যান্য বিষয়ের সহিত নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ও শিক্ষা দেওয়া হইত :

বেদ, উপনিষদ্, ছয় বেদাঙ্গ (অর্থাৎ শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দ, নিরুক্ত ও জ্যোতিষ), ধর্মশাস্ত্র, পুরাণ, অর্থশাস্ত্র, রাজনীতি, ধনুর্বেদ, আন্বীক্ষিকী, ফলিত জ্যোতিষ, চারুকলা (বৈহারিক শিল্প), ভেষজবিদ্যা, কৃষি, গো-জনন ও ব্যবসাবাণিজ্য (বার্তা)। পরবর্তী সাহিত্য শ্রুতি ও স্মৃতি বলিয়া যে দুইটি শব্দের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়, সেইগুলি রামায়ণের যুগেই প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। ব্যাকরণ, ধ্বনিশাস্ত্র, ন্যায় ও ধর্মশাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের প্রভাব শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কথাবার্তার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। সমাজে এইগুলিকে উচ্চ মূল্য দেওয়া হইত। আবার রাজা বা রাষ্ট্রের সম্বন্ধে আলোচনায়, রাজনীতির তত্ত্বগুলি স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জিহ্বাগ্রে বিরাজ করিত। ইহা ব্যতীত অনুমান করা যায় যে, সর্বসাধারণ লোকের মধ্যে ভবিষ্যৎ শুভ ও অশুভের লক্ষণ, অদ্ভুত ও অতিপ্রাকৃত ঘটনা এবং ইন্দ্রজাল, মন্ত্র ও তপস্যার শক্তিতে বিশ্বাস ছিল।

৩। দার্শনিক চিন্তার ফল্গুধারা ও সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী

রামায়ণের বহুস্থলে 'দর্শন'[৪] ও 'প্রদর্শন'[৫] শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। প্রথমটি 'দৃষ্টি' অথবা সমগ্রজীবনের প্রতি মনোভাব অথবা 'তত্ত্বালোচনা' এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। দ্বিতীয়টিকে টীকাকারগণ 'শব্দ ও অনুমান দ্বারা সূক্ষ্ম ও অতীন্দ্রিয় পদার্থের জ্ঞান' বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অতিপ্রাকৃতিক ঘটনা ও অবস্থার বহু বর্ণনা সত্ত্বেও, রামায়ণে যে অলঙ্ঘ্য প্রাকৃতিক নিয়ম ও শৃঙ্খলা স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা নিম্নোক্ত উক্তিগুলির মধ্যে দেখা যায় : "যেমন বৃদ্ধ বয়স, মৃত্যু, কাল বা দেবতার বিধান কোন বস্তুর মধ্যেই কখনও ব্যাহত হয় না…" ইত্যাদি।[৬] "পশুদিগের মধ্যে তিনটি দ্বন্দ্ব নির্বিকারে চলিয়া থাকে, তুমি এইভাবে তাহাদের বিষয়ে অভিভূত হইও না, কারণ এইগুলি অবশ্যম্ভাবী"[৭] ; "পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল ও আলোক প্রভৃতি নিজ নিজ স্বভাব অনুযায়ী তাহাদের চিরন্তন ধারায় হয়"[৮]; "কেহই জ্বলন্ত অগ্নিশিখা স্পর্শ করিয়া দাহ হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে না"[৯] ; এই জগতে কোন প্রাণীই চিরকাল অমর থাকিতে পারে না[১০]—ইহা ভিন্ন, প্রাকৃতিক, নৈতিক ও ধর্মসম্বন্ধীয় আলোচনায় প্রায়ই 'মর্যাদা' ও 'স্থিতি' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাও পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তেরই নির্দেশ দেয়। বহুসংখ্যক পারিভাষিক শব্দ[১১] রামায়ণের

প্রায় সর্বত্র ব্যবহৃত হইয়াছে। এইগুলি হইতে তৎকালীন দার্শনিক চিন্তার একটি প্রবল ফল্গুধারার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অবশ্য শাস্ত্রে প্রকাশিত অতীন্দ্রিয় জ্ঞানসম্পন্ন ঋষিদের বাক্যের প্রতি লোকের অত্যধিক শ্রদ্ধা ছিল; এবং সূক্ষ্ম বিষয়ে প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণ অপেক্ষা ঋষিবাক্যই আদৃত হইত।[১২] তথাপি কোন কিছুই এত পূজ্য ও পবিত্র বলিয়া স্বীকৃত হইত না যে, তাহাকে লোকায়ত সম্প্রদায়ের[১৩] তর্ক বিচারের উর্ধ্বে মনে করা হইত। লোকায়ত সম্প্রদায়ের উল্লেখ রামায়ণে যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

রামায়ণে জীবনের প্রতি যে সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা একটি যথোচিত আশাবাদ বলিয়া মনে হয়। জীবনের অবশ্যম্ভাবী সহচর যে সুখ ও দুঃখ, তাহাদের প্রতি যে অনাসক্ত দৃষ্টি, তাহার উপর এই আশাবাদ প্রতিষ্ঠিত। উপনিষদের শিক্ষা সত্ত্বেও রামায়ণে পরবর্তী সাহিত্যের ন্যায় জীবনকে কখনও বন্ধন বলিয়া মনে করা হয় নাই এবং জন্ম-মৃত্যুর চক্র হইতে চরম মোক্ষও পরম পুরুষার্থ বলিয়া উপদিষ্ট হয় নাই। "কোন প্রাণীই দুঃখ বিপদ হইতে মুক্ত নহে"[১৪]; "অবিচ্ছিন্ন সুখ সহজলভ্য নহে"[১৫]; "জীবিত থাকিলে, যে কোন ব্যক্তির জীবনে, শত বৎসর পরে হইলেও, সুখ আসে"[১৬]; "সৃষ্ট জীবের উদ্বেগকারী হৃদয়হীন পাপিষ্ঠ ব্যক্তি ত্রি-জগতের অধীশ্বর হইতে পারে, কিন্তু চিরকাল সে বাঁচিতে পারে না"[১৭]; "ধ্বংসেই সর্ববস্তুর পরিণতি, উত্থানের পতনে, মিলনের বিচ্ছেদে এবং জীবনের মৃত্যুতে"[১৮]। "দুইখানি কাষ্ঠখণ্ড যেমন সমুদ্রবক্ষে ভাসিতে ভাসিতে মিলিত হয় এবং কিয়ৎকাল পরেই বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, তদ্রূপ স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়স্বজন, ঐশ্বর্য সব কিছুই ক্ষণকালের জন্য মিলিত হয় এবং তাহার পর বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় কারণ, বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী। কোন প্রাণীই নৈসর্গিক নিয়ম লঙ্ঘন করিতে পারে না; মৃতের জন্য যে বিলাপ করে, সে এই ব্যাপারে নিরুপায়"[১৯]। "জীবন স্রোতের ন্যায় নিরন্তর ভাসিয়া চলিয়াছে", এই কথা মনে করিয়া, "প্রত্যেকেই সুখের দিকে তাহার চিত্তকে চালিত করিবে, কারণ সকল সৃষ্ট জীবই সুখ লাভ করিবার যোগ্য"[২০]। জীবের জন্মগত পাঁচটি ঋণের মধ্যে একটি তাহার নিজের কাছে। সুখানুভব দ্বারা এই ঋণ পরিশোধ করিতে হয়।[২১] কিন্তু প্রকৃত সুখ একমাত্র ধর্মের মধ্য দিয়াই লাভ করা যায়, কেবলমাত্র সুখান্বেষণের মধ্য দিয়া নহে।[২২]

৪। প্রধান প্রধান ধারণা

মনুষ্যজীবনের লক্ষ্য : যে সকল লক্ষ্য বা পুরুষার্থ মানুষের কর্মপ্রচেষ্টাকে প্রভাবিত করে এবং যাহা লাভ করিবার জন্য প্রতি মানুষেরই চেষ্টা করা কর্তব্য, রামায়ণের মতে সেই সব লক্ষ্য সংখ্যায় তিনটি। এইজন্য সমগ্রভাবে ইহারা ত্রিবর্গ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। এই ত্রিবর্গ হইতেছে 'ধর্ম' (বা আধ্যাত্মিক পুণ্য) 'অর্থ' (অথবা ধনসম্পত্তি বা বৈষয়িক সুখ-সুবিধা) এবং 'কাম' (বা কামনার চরিতার্থতা)। এইগুলির মধ্যে ধর্ম সর্বপ্রধান এবং অপর দুইটি (অর্থ ও কাম) ধর্মের অধীন। কেবলমাত্র অর্থাসক্ত জীব এই জগতে ঘৃণার পাত্র হিসাবে গণ্য হইয়া থাকে, আবার অত্যধিক সুখান্বেষণও প্রশংসনীয় বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই, কারণ ইহা শীঘ্রই মানুষকে দুঃখে লইয়া যায়।[২৩] প্রত্যেকে সমীচীন ও সুসমঞ্জস ভাবে এবং যথাযোগ্য সময়ে[২৪] ত্রিবর্গের প্রতিটি পুরুষার্থের জন্যই প্রযত্ন করিবে। কিন্তু যে ব্যক্তি অপর দুইটি বর্গকে অগ্রাহ্য করিয়া, কেবল সুখের পশ্চাতে ধাবিত হয়, তাহার বৃক্ষোপরি নিদ্রিত ব্যক্তির ন্যায় হঠাৎ পতনের পর নিদ্রাভঙ্গ হয়।[২৫]

রামায়ণের সর্বত্র ধর্মশব্দের ব্যবহার দেখা যায়। শব্দটি প্রায় বিনাবিচারে কখনও উপায় বা করণ অর্থে আবার কখনও লক্ষ্য অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। শাস্ত্রে বিহিত অথবা শিষ্টলোকের দ্বারা অনুমোদিত ধর্ম, সমাজ এবং নীতি সম্বন্ধীয় যে কোন অথবা সর্বপ্রকার কর্তব্য কর্মই ধর্ম। ভারতীয় চিন্তাধারায় ধর্মের ধারণা সর্বকালেই অতি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। ধর্ম শব্দের ব্যুৎপত্তি উহার অর্থের পরিচায়ক। বৈদিক যুগে 'ধর্ম' শব্দটি ধর্মন্ (: √ধৃ = "ধারণ করা") এই আকারে "অবলম্বন", বা "সহায়ক", "বিধি" বা "অনুশাসন" বুঝাইত। পরবর্তীকালে স্বাভাবিক ক্রমবিকাশে ইহার নিম্নলিখিত অর্থগুলিও হইয়াছিল: "কোন বস্তুর অন্তর্নিহিত স্বভাব", "প্রচলিত রীতি", "ধর্মীয় অনুশাসন" এবং "কর্তব্যকর্ম"। ধর্ম শব্দের এই সকল অর্থ অদ্যাবধি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। সুতরাং যাহা এই বিশ্বজগৎ ও সমাজকে ধারণ করিয়া আছে, ধর্ম শব্দ এই অর্থেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। "ধর্ম এই জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ" এবং "সকল বস্তুর সুদৃঢ় আশ্রয়"।[২৬] "বৈষয়িক সুযোগ-সুবিধা বা সুখ এই ধর্ম হইতেই উদ্ভূত হয়, ধর্মের মধ্য দিয়াই সকলে সব কিছু লাভ করিতে পারে; ধর্ম এই জগতের বিধারণ শক্তি (বা সার)[২৭] ধর্মকে যে রক্ষা করে ধর্ম তাহাকে রক্ষা করে"[২৮] এবং যাঁহারা ধার্মিক ও সত্যনিষ্ঠ তাঁহাদের মৃত্যুভয় থাকে না"।[২৯] কিন্তু ধর্ম অধর্মকে বিনষ্ট করিতে পারে না। ধর্মের ফল যেমন অবশ্যম্ভাবী, অধর্মের ফলও তেমনি অবশ্যম্ভাবী।[৩০]

ধর্মের পথ অতি সূক্ষ্ম, এমনকি জ্ঞানীব্যক্তির পক্ষেও ইহার তাৎপর্য উপলব্ধি করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য।[৩১] এই জগতের ঘটনাবলীর তাৎপর্য দুর্জ্ঞেয়; ন্যায়ের দিক হইতে ইহাদের সমর্থন হইতে পারে কিনা সেই সম্বন্ধে মনে প্রায়ই সন্দেহ উদিত হয়।[৩২] ধর্ম ও অধর্মের ফল সুখ ও দুঃখের মধ্যে এই জগতে আপাতঃদৃষ্টিতে এমন বৈপরীত্য দেখা যায় যে, কখনও কখনও ধর্ম ও অধর্মের শক্তি এমনকি ইহাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও প্রশ্ন জাগে; এবং লোকে ক্ষমতা, ঐশ্বর্য বা কৌশলে কার্যসিদ্ধির সমর্থন করে,[৩৩] আর যাঁহারা ধর্মের জন্য সুখের পথ পরিত্যাগ করিয়া কৃচ্ছ্রসাধন করেন তাঁহারা হাস্যাস্পদ বিবেচিত হন।[৩৪]

ঈশ্বরতত্ত্ব ও ধর্ম: রামায়ণের যুগে বৈদিক দেব-দেবী সকল সম্পূর্ণভাবে মানবীয় আকারে রূপান্তরিত হইয়াছিলেন এবং বহু নূতন দেব-দেবীরও প্রবর্তন হইয়াছিল। তাঁহাদের অমরত্ব অসীম নহে। উহা সাধারণ মানুষেরই অতিমাত্রায় বর্ধিত আয়ুষ্কাল মাত্র। সাধারণ মানুষও পুণ্যকর্ম দ্বারা তাঁহাদের স্তরে পৌছিতে পারিত। কিন্তু ইহাদের মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর নামক তিনজন অতিদেবতারও আবির্ভাব হইল। তাঁহারা বিশ্বের পুষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কর্তা এবং পরম ব্রহ্মের ত্রিবিধ পৌরুষেয় অভিব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত। ইঁহারা ত্রিমূর্তির অঙ্গ। 'অজ', 'শাশ্বত', 'কুটস্থ', 'বিভু', 'অসীম', 'পরম কারণ ও সর্বাধার' প্রভৃতি যে সব বিশেষণে পরব্রহ্মকে বিশেষিত করা হয়, সমষ্টি ও ব্যষ্টিরূপে এই ত্রিদেবতাকেও সেই সব বিশেষণে বিশেষিত করা হইল।[৩৫] ব্রহ্মার কারণ যে অপৌরুষেয় ব্রহ্ম, তাহা অব্যক্ত[৩৬] বা আকাশ[৩৭] (সর্বব্যাপী) এবং আত্মা বা পরমাত্মা (সর্বভূতের আত্মা) নামে অভিহিত হইল।[৩৮] আর জীবাত্মার বিশিষ্ট নাম হইল ভূতাত্মা[৩৯] (ইন্দ্রিয় বা ইন্দ্রিয়ানুভবে প্রতীয়মান আত্মা) বা লিঙ্গিন্[৪০] (চিহ্নবিশিষ্ট)। পরম-ব্রহ্মনিষ্ঠ যে অনির্বচনীয় শক্তিবশতঃ বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় সংঘটিত হয় ও ব্রহ্মের পৌরুষেয় রূপ গ্রহণ সম্ভবপর হয়, তাহার নাম মায়া।[৪১]

ধর্ম বিষয়ে, বৈদিক পূজা-পদ্ধতির সহিত মন্দিরে অধিষ্ঠিত বিগ্রহ পূজার প্রথাও প্রবর্তিত হইল। নৈবেদ্যের বিভিন্ন উপচারের সহিত পুষ্প, গন্ধ, মিষ্টান্ন এবং সকল প্রকার উৎকৃষ্ট খাদ্য-সামগ্রীও যুক্ত হইল; এবং ফলে "কোন ব্যক্তির নিজের খাদ্য ও তাহার দেবতার খাদ্য এক"[৪২] এইরূপ কথা একেবারে নিঃসন্দিগ্ধ সত্যে পরিণত হইল। এই প্রসঙ্গে "যথার্থ ভঙ্গীতে উপবেশন" (আসন)[৪৩], শ্বাস-নিয়ন্ত্রণ (প্রাণায়াম)[৪৪], চিত্তের একাগ্রতা (ধ্যান)[৪৫], এবং পূর্ণ মনঃসংযোগ (যোগ ও সমাধি) এবং নানাপ্রকার ব্রত উপবাসাদির বিষয় বহুস্থলে লিখিত আছে। তপস্যা,

বেদের নির্দিষ্ট অংশ অধ্যয়ন, ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রের প্রতি বদান্যতা, আতিথেয়তা, পিতৃ-পুরুষ ও ব্রাহ্মণদিগের প্রতি শ্রদ্ধা-প্রদর্শন প্রভৃতিও পুণ্যকর্মের অন্তর্ভূত।

পূজা-অর্চনাদির ব্যাপারে লোকের মনোভাব খুব উদার ছিল বলিয়া মনে হয়; এবং পরবর্তী যুগের সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার আদৌ কোন প্রশ্নই ছিল না।

চিন্তার আবহাওয়ার মধ্যে সন্ন্যাসের ভাব বেশ প্রবল ছিল। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের[৪৬] দীক্ষিত সন্ন্যাসী ছাড়াও প্রত্যেক ধার্মিক নরনারীর আচার-ব্যবহারের মধ্যেও সন্ন্যাসের প্রভাব দেখা যাইত। তাপস ও শ্রমণ নামে সম্ভবতঃ দুই শ্রেণীর সন্ন্যাসী ছিলেন (উভয়ের মধ্যেই নারীদেরও স্থান ছিল)[৪৭]। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে কোন সূক্ষ্ম পার্থক্য থাকিলেও, রামায়ণে কোথাও তাহার কোন স্পষ্ট উল্লেখ নাই। সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী অর্থে যথাক্রমে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী শব্দের উল্লেখ[৪৮] পাওয়া যায়। সাধারণ উপায়ে যে সকল বস্তু লাভ করা একপ্রকার অসম্ভব, যদিও তাহাদের জন্যই প্রায়শঃ লোকে তপস্যার আশ্রয় গ্রহণ করিত, তথাপি শ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসীদের মধ্যে সম্ভবতঃ তপস্যার উদ্দেশ্য উচ্চতর ছিল। ইঁহারা ইন্দ্রিয় ও হৃদয়াবেগের সংযম, বৈরাগ্য এবং সর্বজীবের প্রতি সহানুভূতি ও করুণা দ্বারা এক পরিপূর্ণ মানসিক সাম্যভাব লাভ করিতে সচেষ্ট হইতেন।[৪৯] ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, রামায়ণে পূর্ণ মুক্তি বা মোক্ষের স্পষ্ট উপদেশ নাই। কিন্তু মাঝে মাঝে এই জাতীয় ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, মোক্ষলাভই তপস্যার উদ্দেশ্য। শ্রেষ্ঠ তপস্বীদের পরম লক্ষ্য 'ব্রহ্মলোক' বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। কিন্তু ব্রহ্মলোক শব্দটি দ্ব্যর্থবোধক (উহা কি ব্রহ্মের লোক, না ব্রহ্মার লোক?)।[৫০] এইরূপ প্রতীয়মান হয় যে, রামায়ণের মতে সন্ন্যাসের অন্তিম স্তরের বৈশিষ্ট্য হইতেছে, দৈহিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি পরিপূর্ণ উপেক্ষা এবং নিয়ত আত্মানুধ্যান।[৫১]

নীতি-বিজ্ঞান ঃ ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে নৈতিকগুণের মূল্য রামায়ণে এত বেশী দেওয়া হইয়াছে যে, ইহাকে "কাব্যে-রূপান্তরিত-নীতি-বিজ্ঞান" বলিলে ভুল হইবে না। এইরূপ দুরূহ কাব্য-রচনায়, ইহা যে কতখানি কৃতকার্য হইয়াছে, তাহা যুগে যুগে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী ইহার প্রতি যে অগাধ প্রীতি ও শ্রদ্ধা দেখাইয়াছে, তাহা হইতে বুঝা যায়। সর্বভূতে দয়া, সত্যবাদিতা, আত্মসংযম, ধৈর্য, অপরের ত্রুটি সম্বন্ধে সহনশীলতা, আতিথেয়তা, আশ্রয়প্রার্থী শত্রুকেও আশ্রয় দান, মন, বাক্ ও কর্মের বিশুদ্ধতা প্রভৃতি সৎগুণাবলীকে রামায়ণে বিশেষভাবে প্রশংসা[৫২] করা হইয়াছে। মাতা-পিতা, আচার্য, জ্যেষ্ঠভ্রাতা, পতি ও প্রভুর প্রতি ভক্তি এবং কনিষ্ঠদের প্রতি তাঁহাদের তদনুরূপ স্নেহ এই সব সদ্গুণের উপর বারবার বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া

হইয়াছে। একদার-গ্রহণ ও সতীত্ব সর্বশ্রেষ্ঠ গুণগুলির মধ্যে স্থান পাইত।[৫৩] সাধারণ অবস্থায় স্ত্রীলোকেরা পিতা, স্বামী ও পুত্রের উপর নির্ভরশীল ছিলেন এবং সর্ব অবস্থায়ই তাঁহারা সহৃদয় ব্যবহার পাইবার যোগ্যা ছিলেন এবং কোন স্ত্রীলোককেই হত্যা করা নিষিদ্ধ ছিল।[৫৪] স্ত্রী ছিলেন স্বামীর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বা অর্ধাঙ্গিনী। ধর্মাচরণ ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সাথী বা সহধর্মিণী। তিনি সর্বদাই বিশেষ আদর যত্নের পাত্রী ছিলেন।[৫৫] চরিত্রই ছিল স্ত্রীলোকের শ্রেষ্ঠ বর্ম।[৫৬] সতী ও স্বামীভক্ত স্ত্রী সমাজে অতুলনীয় শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভ করিতেন, যাহা কোন উচ্চস্তরের সন্ন্যাসীর সম্মান অপেক্ষা কম নয়। রাজার উচ্চস্থান জনসাধারণের ভালবাসা ও সম্মতির উপর নির্ভর করিত, এবং রাজা নররূপী দেবতা বলিয়া সম্মানিত হইতেন। কারণ, রাজাই ছিলেন জনসাধারণের[৫৭] ধর্ম, ধন ও প্রাণের রক্ষাকর্তা। কিন্তু বিশেষ সুযোগসুবিধা ভোগ করিয়াও তিনি যদি তাঁহার কর্তব্য কর্মে[৫৮] অবহেলা দেখাইতেন তাহা হইলে তাহা গর্হিত অপরাধ বলিয়া গণ্য হইত। বিচারক ও ন্যায্য শাস্তিভোগকারী দোষী ব্যক্তি উভয়েই স্বর্গে যায়।[৫৯] যে প্রথমে আঘাত করে, তাহাকে হত্যা করা পাপ নহে; কারণ যে কোন উপায়েই হোক[৬০] প্রত্যেককেই নিজের জীবন রক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রেও যুদ্ধে বিরত, লুকায়িত এবং করযোড়ে আশ্রয়-ভিক্ষাকারী, পলায়নরত ও মাতাল শত্রুকে হত্যা করা উচিত নহে।[৬১] রাজা, স্ত্রীলোক, শিশু ও বৃদ্ধকে হত্যা করা কিম্বা আশ্রিত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করা গুরুতর পাপ[৬২] বলিয়া গণ্য হইত।

নৈতিক নিয়মের আত্যন্তিক অলঙ্ঘ্যনীয়তা রামায়ণে একাধিকবার[৬৩] স্পষ্টতঃ উক্ত হইয়াছে। কিন্তু মাঝে মাঝে দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তির মুখে এবং সংসারে কথনও কথনও নীতিমত্তার অনাদর দেখিয়া, তাহার প্রতিবাদরূপে নীতিধর্মের নিন্দাও পাওয়া যায়। মায়িক সীতাকে হত্যার সময়ে ইন্দ্রজিৎ বলিয়াছিলেন, "হে বানর! তোমরা বল যে স্ত্রীলোককে হত্যা করা উচিত নহে, কিন্তু শত্রুকে যাহা কষ্ট দেয় তাহাই করা উচিত।[৬৪] সমুদ্রের ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হইয়া রামচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "জগতের লোক যাহারা অহঙ্কারী, অসৎ-হৃদয় ও নির্লজ্জ এবং সকলকে অকারণ কষ্ট দেয়, তাহাদিগকেই সম্মান করে,"[৬৫] আবার "প্রহার ও বলপ্রয়োগই এই জগতে কার্যসিদ্ধির সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া মনে হয়; অকৃতজ্ঞের প্রতি ক্ষমা ও মিষ্ট বাক্যে এবং তাহাকে উপহার প্রদানে ধিক্।"[৬৬]

নৈতিক ন্যায়-অন্যায় নির্ধারণ করিবার সময়, নিম্নোক্ত বিষয়গুলি বিবেচিত হইত:

(১) পারলৌকিক কল্যাণ (২) শিষ্টলোকের অনুমোদন (৩) অন্যলোকের নীতির উপর প্রভাব এবং (৪) নিজের সদসদ্-বিবেকবুদ্ধি ও আত্মসম্মান।[৬৭]

অদৃষ্টবাদ : রামায়ণে প্রায়ই দেখা যায় যে, অপরিহার্য দুর্দশায় পড়িলে লোকে অদৃষ্টবাদের আশ্রয় গ্রহণ করে। "যাহা যুক্তির বহির্ভূত তাহাই দৈব। সর্বভূতে ইহার গতি অব্যাহত।"[৬৮] দৈব কালে পরিপক্কতা লাভ করে এবং উভয়ে এইরূপ অবিচ্ছেদ্য-ভাবে সম্বদ্ধ যে, জগতে যাহা কিছু ঘটে কালকেই তাহার জন্য দায়ী করা হয়।[৬৯] কখনও কখনও আবার দৈবকে সকল ভূতের অমোঘ নিয়ন্তা (নিয়তি) রূপে দেখা হইয়াছে। তারার প্রতি শ্রীরামচন্দ্রের ভাষণে এইরূপ মতবাদ দেখিতে পাওয়া যায়।[৭০] "নিয়তি এই বিশ্বের কর্তা ; নিয়তি কৃতকার্যতার সহকারী ; বিশ্বের সর্ব-ভূতের কর্মই নিয়তির উপর নির্ভর করে। কাহারও কিছুই করিবার ক্ষমতা নাই ; নিজের কর্ম বিষয়েও নিজের কোন কর্তৃত্ব নাই ; জগৎ আপনি স্বাভাবিক গতিতে চলিতেছে ; এবং কাল ইহার চরম আশ্রয়স্থল। কাল নিজের স্বরূপ কখনও অতিক্রম করে না, কালকে কখনও পরিহার করাও যায় না ; কোন কিছুই স্বীয় নির্ধারিত স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া, তাহা কখনও অতিক্রম করে না। কালের সম্মুখে কোন সম্বন্ধ, কোন যুক্তি, কোন শক্তিরই মূল্য নাই ; কালের উপর বন্ধুত্ব বা আত্মীয় স্বজনের সহিত সম্বন্ধের কোন প্রভাব নাই ; ইহা মানুষের ক্ষমতার বাহিরে। কিন্তু যে যথার্থ দেখিতে পায়, সে কালের বিবর্তন লক্ষ্য করিতে পারে ; ধর্ম, অর্থ ও কাম কালক্রমেই লব্ধ হয়।" কিন্তু ভাগ্যকে প্রায়ই বর্তমান বা পূর্বজন্মের সঞ্চিত কর্মের পরিপক্ব অবস্থা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস অন্তর্নিহিত।[৭১] ইহা স্পষ্ট যে, নিয়তিবাদ ও কর্মবাদ দুইটি বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী হইতে উদ্ভূত হইয়াছে : একটি মতবাদে জীবকে এই বিশাল বিশ্বের অতি ক্ষুদ্র তুচ্ছ অংশরূপে দেখা হইয়াছে, এবং অপর মতবাদে প্রতি জীবই অপর জীব হইতে স্বতন্ত্র, সুতরাং তাহার ভাগ্যে যাহাই ঘটুক, সেই তাহার জন্য দায়ী, এখানে অন্যায় বা আকস্মিকতার কোন অবকাশ নাই।

দৈবের প্রতি রামায়ণে এই জাতীয় সম্মান প্রদর্শিত হইলেও মানুষের চেষ্টার মূল্যকে (পুরুষকার বা পৌরুষকে) কোথাও ছোট করা হয় নাই। আসলে কৃতকার্যতা অদৃষ্ট ও পুরুষকার উভয়ের[৭২] উপরই নির্ভর করে বলিয়া মানা হইয়াছে। পূর্বমতবাদদ্বয়ের দ্বিতীয়টিতে পুরুষকারের মূল্যও স্বীকৃত হইয়াছে। কারণ এই মতে দৈব পূর্বপুরুষকারেরই পরিণতাবস্থা।[৭৩] পুরুষকারের কোন কোন উগ্র সমর্থক মানুষের প্রচেষ্টার সম্মুখে দৈবকে দুর্বল বলিয়াছেন এবং উহাকে কৃপার চক্ষে দেখিয়া-

ছেন, এবং কালের শক্তির নিকট মস্তক নমিত না করা মানুষের একটি মহৎ গুণ বলিয়া মনে করিয়াছেন।[৭৪]

জড়বাদ: রামায়ণে নাস্তিক বলিয়া পুনঃপুনঃ নিন্দিত জড়বাদীদের মত যাহা শ্রীরামচন্দ্রের নিকট বালীর ভাষণে সংক্ষেপে পাওয়া যায়, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল:

জীব একাই জন্মগ্রহণ করে, এবং একাই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়; তাহার কোন আত্মীয় বা বন্ধু নাই। সুতরাং যদি কেহ ইনি আমার পিতা বা মাতা এইরূপ চিন্তার বশীভূত হয়, তাহা হইলে তাহাকে উন্মত্ত বলিয়া মনে করিতে হইবে। মানুষের পক্ষে 'পিতা', 'ভ্রাতা', 'গৃহ', 'ধন' সবই ভ্রাম্যমাণ পথিকের বিশ্রামাগারের তুল্য। কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এই সকলে আসক্ত হন না। জীবের জন্ম বিষয়ে পিতা শুধু সূত্রপাত করেন; প্রকৃতপক্ষে মাতৃগর্ভে বীর্য ও রজের মিশ্রণেই জীবের উৎপত্তি হয়। মৃত্যুতে জীব তাহার জীবনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি লাভ করে; ইহাই জগতের নিয়ম; আর ইহাতে কাহারও দুঃখ করিবার কিছু নাই। যাহারা আধ্যাত্মিক পুণ্যকে ঐশ্বর্য অপেক্ষা অধিক মূল্য দেয়, তাহারা সত্যই কৃপার পাত্র, অপরে নহে। কারণ, তাহারা এই জগতে দুঃখ ভোগ করে এবং পরিণামে মৃত্যুতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সাধারণ ব্যক্তিরা পিতৃপুরুষদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও শ্রাদ্ধাদির জন্য বিশেষ ব্যগ্রতা প্রদর্শন করিয়া থাকে; কিন্তু ইহা কেবলমাত্র খাদ্যাদির অপচয়। কারণ, মৃত ব্যক্তিরা কি খাইতে পারে? যদি একজনের দ্বারা ভুক্ত দ্রব্য অপরের দেহে সঞ্চালিত করা সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে যাহারা বিদেশে বাস করিতেছে তাহাদের জন্য খাদ্যাদি প্রেরণ না করিয়া গৃহেই তাহাদের উদ্দেশ্যে খাদ্যাদি নিবেদন করা সঙ্গত হইবে। 'আত্মত্যাগ', 'দান', 'দীক্ষাগ্রহণ', 'তপস্যা', 'সন্ন্যাস'—প্রভৃতি সম্বন্ধে যে-সব শাস্ত্রবাক্য আছে, সেইগুলি ধূর্তব্যক্তিদের দ্বারা রচিত হইয়াছে, সুতরাং বুদ্ধিমান ব্যক্তি এইরূপ জানিবে যে, এই জগতে অন্য কিছুই নাই; যাহা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য শুধু তাহাই বিশ্বাস করিয়া অন্য সব ধারণা পরিত্যাগ করিতে হইবে।[৭৫]

জাবালির এই সকল নাস্তিক ভাব ঠিক চার্বাকের মতবাদের ন্যায়। অবশ্য সেখানে কোথাও চার্বাকের নামের উল্লেখ নাই।

৫। উপসংহার

রামায়ণের পূর্ববর্তী আলোচনা হইতে বুঝা যাইবে যে, উহা একটি হৃদয়গ্রাহী মানবতার রসে পরিপূর্ণ কাব্য এবং উহাতে দর্শনের এমন একটি ব্যবহারিক মতবাদ

আছে, যাহাতে নীতি ও ধর্মের স্থান খুব গুরুত্বপূর্ণ। উচ্চ দার্শনিক তত্ত্বাদি ও নাস্তিক সম্প্রদায়ের মতবাদ শুধু প্রসঙ্গতঃই আলোচিত হইয়াছে। এবং উহা হইতে আমরা তৎকালীন সংস্কৃতির কিছু পরিচয় পাই। লোকায়ত-সম্মত 'আন্বীক্ষিকী' ব্যতীত নাম নির্দেশ করিয়া অন্য কোন দার্শনিক সম্প্রদায়ের উল্লেখ রামায়ণে নাই; এবং বিশেষ সম্প্রদায়ের কোন বিশেষ মতবাদের কথাও বলা হয় নাই। কিন্তু বহু পারিভাষিক শব্দ ও সাধারণ চিন্তাধারা হইতে স্পষ্ট ধারণা করা যায় যে, রামায়ণের যুগে বিভিন্ন ধারায় দার্শনিক চিন্তা যথেষ্ট অগ্রসর হইয়াছিল। সাম্প্রদায়িকতার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। অবশ্য বিভিন্ন দেব-দেবীর প্রতি ভক্তির বহু উল্লেখ আছে। মোটামুটি ভাবে বলা যাইতে পারে যে, রামায়ণের দর্শনে যুক্তিহীন মতাভিমানও নাই এবং সাম্প্রদায়িক বদ্ধমূল ধারণাও নাই। এইজন্য উহা চিরকাল বিশ্বমানবের কাছে আদর পাইবার যোগ্য।

দ্রষ্টব্য

১। Macdonell, History of Sanskrit Literature—পৃষ্ঠা ৩০৮

২। Jacobi, Das Ramayana—পৃষ্ঠা ১০০—১১১

৩। ২।১০৯।৯, ৭।৪৩।১৯

৪। ২।২১।৬৪, ১০৯।৩, ৩।৬৬।১৪, ৪।১৮।৫৯; ২৮।৬৫, ৬।২২।৩২, ৬৪।২, ৭।৫০।১৬, প্রভৃতি।

৫। ৬।৫০।৪০

৬। ৬।৬৪।৭৫

৭। ২।৭৭।২৩

বিভিন্ন ভাষ্যকারগণ কর্তৃক এই দ্বন্দ্বগুলির বিভিন্ন ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। যেমন—"ক্ষুৎ-তৃষ্ণা, দুঃখ এবং মোহ, বৃদ্ধ বয়স এবং মৃত্যু", বা "জন্ম এবং মৃত্যু, সুখ এবং দুঃখ, লাভ এবং ক্ষতি," বা "অস্তিত্ব, জন্ম, বৃদ্ধি, ক্ষয়, পরিবর্তন এবং ধ্বংস।"

৮। ৬।২২।২৩

৯। ৪।৩০।১৮; ৬।১১৮।১৭

১০। ৭।৩০।৯; অধিকন্তু ১০।১৭

১১। অনুপপন্ন (অযৌক্তিক), ৬।৬৪।১১; অনুমান, ৪।৬।৯; ১০।৩৪; ৬।১৮।৩৭; "অনুমিতি জন্য জ্ঞান"; ৫২।১৩; অব্যক্ত (অনভিব্যক্ত), ১।৭০।১৯; আকাশ (বস্তুশূন্য দেশ) > (সর্বব্যাপী সত্তারূপে ব্রহ্ম), ১।৩৪।৪; ২।১১০।৫; ৭।১১০।১০; ইন্দ্রিয় (প্রত্যক্ষের করণ), ৫।৯।২৯; ইন্দ্রিয়ার্থ (ইন্দ্রিয় বিষয়), ৫।৯।২৯; ৬।৯৩।২২; উপপত্তি (বিচার), ৫।৯।৩৯; উপপন্ন (যৌক্তিক),

২।১১৮।১৫ ; তত্ত্ব (চরম সত্তা), তত্ত্বজ্ঞ (চরম সত্তার জ্ঞাতা), ২।৭৭।২৪ ; তমস্ (গুণত্রয়ের একটি গুণ), ২।১০৯।১৭ ; তর্ক (যৌক্তিক বিশ্লেষণ), ৪।৩২।৯ ; ৬।২।৭ ; ত্রিবর্গ [তিনের, অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ এবং কামের সমষ্টি] ৪।৩৮।২৩ ; নিঃশ্রেয়স্ (সর্বোত্তম মঙ্গল), ৬।৬৪।৮ ; নিসর্গ (প্রকৃতি), ৪। ৫৮।৩০-৩১ ; ন্যায় (যুক্তি বা অনুমান বাক্য), ৩।৫০।২২ ; ৭।২২।২৪।৩০ ; পঞ্চত্ব (পঞ্চভূতে মিশিয়া যাওয়া) । ৪।১১।৪৬ ; ৫।১৩।২৩ ; পঞ্চবর্গ (পাঁচের, অর্থাৎ পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সমষ্টি), ২।১০৯। ২৭ ; পুরুষার্থ (মানুষের কর্মপ্রচেষ্টার লক্ষ্য), ৬।৬৪।১০ ; ৫।১৩।১৮ ; ব্রহ্মভূত (যে বা যাহা ব্রহ্ম হইয়াছে) ১।৩৩।১৬ ; ভাব (বস্তু), ২।৯৪।১৮ ; ভূত (সত্তা), ৩।৬৪।৭৫ ; ৭।৩৪।৩৯ ; (জীবন্ত সত্তা), ২।৭৭।২৩ ; (মৌলিক পদার্থ সকল) > (মনসহ ইন্দ্রিয়াদি), ৭।৯৬।২১ ; ভূতাত্মা (জীবাত্মা), ৬।৯৩।২২ , মর্যাদা (সীমা, প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা ; যথাযোগ্যতা), ২।৩৫।১১ ; ৩ । ৬৪ । ৬৪ ইত্যাদি ; মায়া (দুর্জ্ঞেয় ঐশ্বরিক শক্তি), ৫ । ৫৪ । ৩৭ ; ৭ । ১০৪ । ২ । ৪।৫ ; ১১০ । ১১ , মায়া-যোগ = (স্পষ্টতঃ যোগমায়া), যোগরূপী মায়া ১ । ২৯ । ৯ ; মোহ (ভ্রান্তি), ২ । ৫৪ । ৩০ ; এবং সম্মোহ (ভ্রান্তিমূলক), ৭ । ৮৪ । ৯ ; যোগ (আত্মনিবিষ্টতা), ২ । ২০ । ৪৮ ; ৩ । ৬ । ৬ ; রাগ (কামাদি হৃদয়াবেগ), ২ । ২ । ৪৪ , ৫ । ৫৫ । ১৬, রাজস (রজোজন্য, রজঃ হইতেছে প্রকৃতির একটি গুণ), ৫ । ৫৫ । ১৬ , রূপ (সত্তা), ৬ । ১১৬ । ৩০ , লক্ষণ (পদের অর্থনিধারক বচন, বা যথাযথ বর্ণনা), ৬ । ৬৪ । ৬ ; বাদ (বিতর্ক), ১ । ১৪ । ১৯ ; ৬ । ১৭ । ৫২ ; বিপাক (কর্মের পরিণতিলাভ) ৫ । ৬৪ । ৪ ; ব্যাবিদ্ধ ৩ । ৯ । ২৭, এবং ব্যাহত ২ । ১০৬ । ১৮ (স্ব-বিরোধী), সঙ্গ (আসক্তি), ২ । ৩৭ । ২ ; সত্ত্ব (গুণগুলির মধ্যে একটি) ৭ । ৫৮ । ৬ ; (মন) ২ । ৩৯ । ৩২ ; (আত্মা), ২ । ২১ । ৩৯ ; সমাধি (আত্মৈকাগ্রতা), ৪ । ৩০ । ১৬ । ১৭ ; ৭ । ৪৯ । ৮ ; স্বভাব (স্বীয় প্রকৃতি), ৬ । ২২ । ২৩ ; ৬৪ । ৬ ।

১২ । ৩ । ৫০ । ২২

১৩ । ২ । ১০০ । ৩৮-৩৯

১৪ । ৩ । ৬৬ । ৬

১৫ । ২ । ১৮ । ১৩

১৬ । ৫ । ৩৪ । ৬ ; ৬ । ১২৬ । ২

১৭ । ৩ । ২৯ । ৩

১৮ । ২ । ১০৫ । ১৬ = ৭ । ৫২ । ১১

১৯ । ২ । ১০৫ । ২৬—২৮

২০ । ২ । ১০৫ । ৩১, ৫ । ১৯—২১ এই ক্ষেত্রেও উল্লেখ আছে।

২১ । ২ । ৪ । ১৩—১৪ অন্য চারিটি হইতেছে দেবতা, ঋষি, পিতৃপুরুষ এবং ব্রাহ্মণদের প্রতি। যজ্ঞ, অধ্যয়ন, পুত্রোৎপাদন ও দানদ্বারা যথাক্রমে ইঁহাদের ঋণ পরিশোধ করিতে হয়। ইহার সহিত পঞ্চ মহাযজ্ঞ তুলনীয়।

২২ । ৩ । ৯ । ৩০—৩১

২৩ । ২ । ২১ । ৫৭—৫৮

২৪ । ২ । ১০০ । ৬২—৬৩

২৫ । ৪ । ৩৮ । ২০—২২ ; ২ । ৫৩ । ১৩ দ্রষ্টব্য।

২৬। ২। ২১। ৪১ ; ৭। ৩। ১০

২৭। ৩। ৯। ৩০

২৮। ২। ২৫। ৩

২৯। ৬। ৪৬। ৩২

৩০। ৫। ৫১। ২৮—২৯

৩১। ৪। ১৮। ১৫

৩২। ২। ৩৯। ১১ ; ৫২। ১৭ ; ৩ ৫২। ৩৯ ; ৬৪। ৫২ ; ৫। ২৮। ১২—১৩

৩৩। ৬। ৬৪। ৬—৯ ; ৮৩। ১৪—৪২ ; ১৩। ২—৫

৩৪। ২। ১০৯। ১৩ ; ৬। ১৩। ২

৩৫। ২। ১০০। ৩, ৫ ; ৬। ১১৭। ১৩—২৬ ; ৭। ৬। ২

৩৬। ১। ৭০। ১৯

৩৭। ২। ১১০। ৫ ; ৭। ১১০। ১০

৩৮। ৪। ১৮। ১৫ ; ৬। ১২৫। ৩২ ; ১১১। ১১ ; ৭। ৪১। ৭

৩৯। ৬। ৫৯। ৫৫ ; ৯৩। ২২

৪০। ৫। ১৩। ৪০

৪১। ১। ১৬। ১৫ , ২৯। ৯ ; ৫। ৫৪। ৩৭; ৭। ১০৪। ২, ৪, ৫ ; ১১০। ১১

৪২। ২। ১০৩। ৩০ , ১০৪। ১৫

৪৩। ২। ৯৯। ১৫

৪৪। ২। ৪। ৩৩ ; ৭। ৭। ৬

৪৫। ২। ৬। ৩

৪৬। ৩। ৬। ২—৬

৪৭। ১। ১৪। ১২ ; ৪। ১৮। ৩৩ ; ২। ২৯। ১৩ ; ২। ৩৮। ৪ ; ৩। ৭৪। ৭, ১০ ; ৪। ৫০। ৩৮—৩৯

৪৮। ২। ২৯। ১৩ ; ৪। ৩। ২, ২৩

৪৯। ২। ৯৯। ১৩—১৬ , ৩। ১৫। ২১ ; ৫। ২৬। ৪৫—৬

৫০। ১। ৩৩। ১৬ ; ৩৪। ৪ ; ২। ১৯। ৩৩, ২১। ৫৩ ; ৯৪। ১৯ ; ৩। ৫। ২৮, ৩১ , ৪১ ; ৭৪। ১৩, ৩৫

৫১। ২। ৬৭। ২৩

৫২। ২। ৩৩। ১২ ; ১০৯। ৩১ ; ৬। ১১৩। ৪৩ ; ১৮। ২৭—২৮ ; ২। ১০৯। ২১

৫৩। ২। ৬৪। ৪৩ ; ২৯। ১৬ ; ১১৭। ২৩—৯

৫৪। ১। ৩২। ২১ ; ২। ৬১। ২৪ ; ৪। ৩৩। ৩৬, ৩৯, ৬১ , ২। ৭৮। ২১

৫৫। ২। ৩৭। ২৪ . ৩। ১০। ২১ ; ৪। ২৪। ৩৭—৮ ; ৬৫। ২৩—৪

৫৬। ৬। ১১৪। ২৭

৫৭। ২। ১০২। ৪ ; ৩। ১। ১৮—২০ ; ৪। ১৮। ৪১—৩

৫৮। ৩। ৬। ১১,

৫৯। ৪। ১৮। ৬১

৬০। ২।৯৬।২৪; ৬।৯।১৪

৬১। ৬।৮০।৩৯; ৪।১১।৩৬

৬২। ২।৭৫।৩৭

৬৩। ২।১০৯।৪, ৬।১১৩।৪২—৪

৬৪। ৬।৮১।২৮

৬৫। ৬।২১।১৫—১৬

৬৬। ৬।২২।৪৫

৬৭। ২।১০৯।৩—৯, ১৬—১৯।২৪—২৫

৬৮। ২।২২।২০

৬৯। ২।২৪।৩৩; ৮৮।১১, ৩।৬৮।২১, ৭২।১৬, ৬।৩২।১৩, ৯৫।৪৮

৭০। ৪।২৫।৪—৮

৭১। ২।৩৯।৪, ৫৩।১৯, ১০৯।২৮, ৩।৪৯।২৭, ৬' ১১১, ২৫—৬; ১১৩।৩৭—৮

৭২। ১।১৮।৪৭; ৫।৩৬।১৯; ৬।৭৩।৬

৭৩। ২।২৩।৭, ১৬—২০

৭৪। ২।১।৩১

৭৫। ২।১০৮।৩—১৭

গ্রন্থবিবরণী

রামায়ণের বিভিন্ন সংস্করণ

বঙ্গদেশীয় পাঠ। জি গোরেসিও সম্পাদিত, পাঁচ খণ্ড, প্যারিস, ১৮৫০।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় পাঠ। বিশ্ববন্ধু শাস্ত্রী এবং ভগবদ্ দত্ত কর্তৃক সম্পাদিত। ১—৭ খণ্ড, লাহোর।

বোম্বাই দেশের পাঠ। তিলক টীকাসহ: ভি. এল. পন্‌সিকর সম্পাদিত। চতুর্থ সংশোধিত সংস্করণ। নির্ণয়সাগর প্রেস, বোম্বাই, ১৯৩০।

তিলক, শিরোমণি এবং ভূষণ টীকা সংবলিত, এম. কে. মুধোলকর সম্পাদিত, সপ্ত খণ্ড, বোম্বাই, ১৯১৩-২০

অনুবাদ

(ইংরাজী ভাষায় পদ্যাকারে)—আর. টি. এইচ. গ্রিফিথ, বেনারস্, ১৮৯৫। নূতন সংস্করণ, এম. এন. বেঙ্কটস্বামী সম্পাদিত। বোম্বাই, ১৯১৫

(ইংরাজী ভাষায় গদ্যাকারে)—মন্মথনাথ দত্ত, কলিকাতা ১৮৯২-৯৪

রামায়ণ সম্বন্ধে আলোচনা গ্রন্থ

Jacobi, H.: Das Ramayana. Bonn 1893.

Vaidya, C. V.: The Riddle of the Ramayana, Bombay and London, 1906.

Ruben, W.: Studien Zur Textgeschichte des Ramayana, Stuttgart, 1936.

Macdonell, A. A.: History of Sanskrit Literature (London, 1913), pp 302—17.

Winternitz, M.: History of Indian Literature, Vol. I (English translation by Mrs. S. Ketkar, Calcutta 1927) pp 475-517.

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মহাভারত ও ভগবদ্গীতা

১। গ্রন্থখানির সাধারণ প্রকৃতি

মহাকাব্যে বর্ণিত দর্শন প্রধানতঃ মহাভারতে লক্ষিত হয়।[১] বহু পৌরাণিক, ও উপদেশমূলক বিষয় উক্ত গ্রন্থে থাকায় ইহার আলোচনার ক্ষেত্র অধিকতর ব্যাপক হইয়াছে; এমন কি ইহাতে প্রত্যক্ষভাবে কতকগুলি ধর্ম ও দর্শনের মতও শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এই দিক হইতে গ্রন্থখানির সুসঙ্গত বিশ্লেষণ করা কঠিন। কারণ ইহার মধ্যে যে নানা পরস্পরবিরোধী কথা আছে, তাহাতে কোন শৃঙ্খলা বা সঙ্গতি কদাচিৎ দেখা যায়। ইহার কারণ এই যে, মহাভারত একজন গ্রন্থকার-কৃত বলা হইলেও ইহা একখানি বিশাল জটিল গ্রন্থ; ইহা বহু শতাব্দী ধরিয়া বিভিন্ন স্তরে বর্ধিত ও বিস্তৃত হইয়াছে। এই মহাকাব্যের মূল কাব্যাংশ পরিবর্ধিত ও অলঙ্কারমণ্ডিত করা হইলেও, গ্রন্থখানি পরিণামে মহাকাব্যরূপী এক ব্যাপক ধর্মশাস্ত্রের রূপ গ্রহণ করিয়াছিল এবং ইহার মধ্যে নীতি, ধর্ম ও দর্শনযুক্ত বহু উপাখ্যান ধর্ম-বিষয়ক আলোচনা ও উদ্ভট কল্পনা সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। কতকগুলি কল্পনা ও উপাখ্যান বৈদিকযুগের, কতকগুলি উপদেশমূলক গল্প এবং নৈতিক উপাখ্যান পরবর্তী যুগের; উহাতে দর্শন এবং ধর্মের ধারণাগুলি একদিকে যেমন প্রাচীন অপরদিকে তেমনি নূতন।

সমগ্র মহাকাব্যের ভিতরেই ধর্ম ও দর্শনের ভাবধারার এক বিস্ময়কর সংমিশ্রণ লক্ষিত হয়, কিন্তু বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ইহাতে দর্শন ও ধর্ম-সম্বন্ধীয় বহু পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা আছে। যেমন উদ্যোগপর্বে সনৎ-সুজাতীয়, ভীষ্মপর্বে ভগবদ্গীতা, শান্তিপর্বে মোক্ষধর্ম; ইহা ব্যতীত বিভিন্ন আলোচনাপ্রসঙ্গে প্রায় দ্বাদশখানি তথাকথিত গীতা, নারায়ণীয় অধ্যায় ও অশ্বমেধ পর্বে অনুগীতাও আছে। এইগুলি সবই অবশ্য প্রাসঙ্গিক, ধারাবাহিক আলোচনা নহে।

২। সাধারণ দার্শনিক চিন্তাধারা

এই মহাকাব্যে স্বভাবতঃই প্রাচীন চিন্তাধারার অস্পষ্ট স্বীকৃতি এবং বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড ও ঔপনিষদিক আত্মতত্ত্বের প্রতিধ্বনি লক্ষিত হয়। কিন্তু এই প্রতিধ্বনি সুসংবদ্ধ নহে, ইহা বরং বিভিন্ন ভাবধারার সংমিশ্রণ। কর্ম-মার্গ (যাগ-যজ্ঞাদি) অবশ্য অস্বীকৃত হয় নাই, কিন্তু যাগ-যজ্ঞ প্রতিষ্ঠিত ধর্ম সম্পর্কে মহাকাব্যের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ অস্পষ্ট। বিভিন্ন অনুচ্ছেদাংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখান যায় যে, বৈদিক ক্রিয়া-কাণ্ডকে অনেক ক্ষেত্রে মহিমান্বিত করা হইয়াছে, অপরদিকে অন্যান্য বহু অংশ আছে যেখানে স্পষ্টতঃ বিরূপ বা বিরোধী ভাব প্রকাশিত হইয়াছে। জ্ঞানমার্গ উপনিষদের মূলশিক্ষা এবং মহাকাব্যেও এই শিক্ষাই গ্রহণ করা হইয়াছে। যখন লোকে যুদ্ধবিগ্রহে রত থাকে, তখন তাহাদের পক্ষে উপনিষদের নিবৃত্তিমার্গ ব্যবহারিক জীবনে আচরণ করা সম্ভবপর নহে। কিন্তু বহু বাক্যে এইরূপ বলা হইয়াছে যে, যাঁহাদের বহু নাম-বিশিষ্ট সেই এক-এর পরিপূর্ণ উপলব্ধি হইয়াছে, তাঁহাদের পক্ষে যাগ-যজ্ঞাদি বা অন্য কোনপ্রকার কর্ম (প্রবৃত্তি) প্রয়োজনীয় নহে। বস্তুতঃ, মহাকাব্যের তত্ত্ববিষয়ক শিক্ষার ভিত্তি হইতেছে উপনিষদের ব্রহ্মবাদ। কিন্তু এই ব্রহ্মবাদের কোন্ বিশিষ্ট ভাব মহাকাব্যে গৃহীত হইয়াছিল তাহা নিরূপণ করা কঠিন। সপ্রপঞ্চ ও নিষ্প্রপঞ্চ উভয় মতবাদই মহাকাব্যে দেখিতে পাওয়া যায়।[২] কিন্তু মহাকাব্যের প্রচলিত মূল প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য করিলে মনে হয় যে, ইহার সাধারণ গতি অধিকতর বাস্তবমুখী সপ্রপঞ্চ মতবাদের দিকে ; এই মতবাদে জগতের তথাকথিত অন্যত্ব স্বীকৃত ব্যবহারিক দৃষ্টিতে এই সপ্রপঞ্চ মতবাদ নিষ্প্রপঞ্চ মতবাদ অপেক্ষা অধিক গ্রহণীয়। কারণ নিষ্প্রপঞ্চ মতবাদে ব্রহ্মই একমাত্র সদ্‌বস্তু ; ব্রহ্ম পরিদৃশ্যমান জগৎরূপে পরিণত হন না, কিন্তু শুধু জগৎরূপে প্রতিভাত হন (বিবর্তবাদ)। সুতরাং মহাকাব্যের দৃষ্টিভঙ্গী অদ্বৈতনিষ্ঠ হইয়াও ঈশ্বর ও জগৎ বিষয়ে দ্বৈতবাদী। কিন্তু মহাভারতে বৈদিক দেবমণ্ডলের সহিত মহাভারতে বর্ণিত দেবদেবীরাও সংযুক্ত হইলেন এবং দেবতাদের এই সংখ্যাবহুত্ব ব্যাখ্যা করিবার জন্য মহাভারতে ঈশ্বরের বিশ্বব্যাপিতা-বাদের আশ্রয় লওয়া হইল ; অর্থাৎ দেবতারা একই ঈশ্বর হইতে উদ্ভূত বিভিন্ন রূপ বা প্রকাশ এই মত গৃহীত হইল। প্রাচীন বহু দেবতাবাদে সাধারণ লোকের বিশ্বাস সহজে লুপ্ত হইবার নহে। কিন্তু উপনিষদের শিক্ষার প্রভাবে মহাভারতে মূলতঃ একেশ্বরবাদ গৃহীত হইয়াছে এবং এই উপাস্য এক ঈশ্বর বিষ্ণু-নারায়ণ বা কৃষ্ণ-বাসুদেব অথবা তাঁহাদের অসংখ্য অবতারগণের মধ্যে যে কেহ হইতে পারেন।

মহাকাব্যে ইহা স্বীকার করা হইয়াছে যে, নির্বিশেষ ব্রহ্ম তাঁহার এই সকল সবিশেষ প্রকাশ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এই নূতন সেশ্বর ধর্ম-বিশ্বাসের জন্য একটি প্রেম ও উপাসনার পাত্রের প্রয়োজন ছিল। সুতরাং উপনিষদের নৈর্ব্যক্তিক ব্রহ্মে বিশিষ্ট পুরুষের ধর্ম আরোপ করা হইল। এইভাবে নৈর্ব্যক্তিক ব্রহ্ম বিভিন্ন নামে ঈশ্বরে রূপান্তরিত হইলেন। কিন্তু প্রায়ই পরমেশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধার সহিত লোক-প্রচলিত ব্রহ্মা শিব প্রভৃতি অন্যান্য বহু দেবতার প্রতি শ্রদ্ধাও সংযুক্ত হইত।

মহাভারতে যে মীমাংসাদর্শনের মতবাদসমূহের কোন উল্লেখ দেখা যায় না তাহার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডে লোকের বিশ্বাস ক্রমেই কমিয়া যাইতেছিল, অথবা হয়ত তখন মীমাংসাদর্শনের উৎপত্তিই হয় নাই। 'বেদান্ত' শব্দটি উপনিষদ-আরণ্যক এই ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু অধুনা যে বেদান্তদর্শন আমরা দেখিতে পাই সম্ভবতঃ সে বেদান্ত অজ্ঞাত ছিল। প্রাচীন উপনিষদের ন্যায় মহাকাব্যে সুস্পষ্ট মায়াবাদের বিশেষ কোন চিহ্ন দেখা যায় না। এমন কি, মায়াকে যদি অনন্ত-ব্রহ্মকে সীমিত করিবার তত্ত্ব হিসাবে গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলেও মহাভারতের সৃষ্টিতত্ত্বের পরিকল্পনায় উক্ত মায়ার কোন স্থান নাই।[৩] তেমনি, ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের বিশিষ্ট মতবাদেরও মহাভারতে কোন উল্লেখ নাই। অবশ্য মহাভারতের সহিত সংযুক্ত "হরিবংশ" নামক গ্রন্থে ভিন্ন প্রসঙ্গে কণাদের ও গৌতমের নাম সর্বপ্রথম দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ন্যায়ের আচার্য হিসাবে গৌতমের নাম কোথাও দেখা যায় না। ন্যায় শব্দটি সাধারণতঃ যুক্তিবিদ্যা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু কোন বিশিষ্ট দর্শনের যুক্তি-পদ্ধতি হিসাবে নহে। এমন কি যেখানে যুক্তির পঞ্চ অবয়বের[৪] (১২ ৩২০. ৮০-৮৫) কথা আছে, সেখানেও উহাদের সহিত গৌতম-সম্মত অনুমানের অবয়ব সমূহের কোন সাদৃশ্য নাই। মহাভারতে শুধু প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম বা আম্নায়[৫] এই তিনটি প্রমাণ স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু মহাভারতকার ঈশ্বরে বিশ্বাসী হওয়ায় তাঁহার মতে শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরের কৃপাতেই সর্ববস্তুর জ্ঞান হয়।

বেদ, সাংখ্য, যোগ, পাশুপত ও পঞ্চরাত্র[৬] (১২ ৩৪৯. ৬৪) এই পাঁচটি প্রচলিত দর্শন সম্প্রদায়ের উল্লেখ সাক্ষাৎভাবে মহাভারতে পাওয়া যায়। এইগুলির মধ্যে বেদ সম্বন্ধে মহাকাব্যের দৃষ্টিভঙ্গীর কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি; কিন্তু ইহা উল্লেখযোগ্য যে, মহাভারতে অপান-তর-তম অথবা প্রাচীনগর্ভকে বৈদিক সম্প্রদায়ের মূল আচার্য বলা হইয়াছে। সাংখ্য, যোগ, পাশুপত ও পঞ্চরাত্র যথাক্রমে কপিল, হিরণ্যগর্ভ, শিব ও নারায়ণ কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া কথিত হইয়াছে। অন্যান্য আচার্যদের মধ্যে নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেষ্টা (১২. ১৩৭) আত্রেয় জনকের

শিক্ষাদাত্রী সুলভা (১২ ১৯০-৩) সনৎসুজাতীয়ে বর্ণিত ধৃতরাষ্ট্রের শিক্ষক সনৎকুমার, মহাভারতের নানাস্থলে বিক্ষিপ্ত বিভিন্ন গীতাগুলির বাসুদেব কৃষ্ণাদি প্রবক্তাগণ, সাংখ্যযোগের আচার্য কপিল ও তাঁহার শিষ্যদ্বয় আসুরি ও পঞ্চশিখ এবং পঞ্চবিংশ তত্ত্বের আচার্যরূপে বর্ণিত অসিত-দেবল, জৈগীষব্য, পরাশর, বার্ষগণ্য, ভৃগু, শুক, গৌতম, আর্ষ্টিষেণ, গর্গ, নারদ, পুলস্ত্য, শুক্র, কাশ্যপ ও সনৎকুমার—ইহাদের নাম দেওয়া আছে (১২. ৩১৮. ৫৯ইঃ)।

উক্ত আচার্যগণের মধ্যে সাংখ্য ও যোগের উপদেষ্টা হিসাবে কপিল ও তাঁহার সম্প্রদায়ের নাম সর্বপ্রধান বলিয়া মনে হয়। এই ব্যাপক দর্শনটি একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে; ইহা একমাত্র মহাভারতে বর্ণিত প্রচলিত ঈশ্বর তত্ত্বের সহিত তুলনীয়। সাংখ্যকার কপিল সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ঋষি এবং অগ্নি, শিব ও বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতাদিগের সহিত এক বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন; তাঁহার গ্রন্থ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া পুনঃ পুনঃ বর্ণিত হইয়াছে। ঋষি পতঞ্জলি মহাভারতে কথিত যোগদর্শনের প্রবর্তক নহেন। উহার প্রবর্তক হিরণ্যগর্ভ। অবশ্য শিব যোগেশ্বর ও শুক্র দৈত্যদিগের যোগগুরু বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। যোগকে সাংখ্য হইতে পৃথক বলিয়া ধরা হইয়াছে, কিন্তু উহাদের পার্থক্য কোথাও স্পষ্টভাবে প্রদর্শিত হয় নাই। সম্ভবতঃ মূলে তাহারা একই মতবাদের অঙ্গ ছিল এবং সেই কারণেই কখনও কখনও উহারা এক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে; অবশ্য সাংখ্যকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রধান পার্থক্য এই যে, যোগদর্শনে সাধনার উপর এবং সাংখ্যদর্শনে জ্ঞানের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। যোগদর্শন সম্ভবতঃ অধিকতর প্রাচীনপন্থী ছিল, কিন্তু সাংখ্য বিশেষ ভাবে জ্ঞাননিষ্ঠ-দর্শন হওয়ায় পরম্পরাগত মতবাদকে অন্ধভাবে স্বীকার করে নাই। উভয় সম্প্রদায়ই দ্বৈতবাদী এবং উভয়েরই চরম লক্ষ্য কৈবল্যপ্রাপ্তি। কিন্তু সাংখ্য নিরীশ্বরবাদী এবং যোগদর্শনের ন্যায় ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না। মহাভারতে বর্ণিত ধর্মের সারকথাও ঈশ্বরবাদ। তাই সাংখ্য ও যোগের মধ্যে সমন্বয়ের বাধা দূর করিবার জন্য চব্বিশতত্ত্বের সহিত ঈশ্বরতত্ত্বও সংযুক্ত করা হইল। পরাবিদ্যার কিয়দংশে ও বিশ্বতত্ত্ব এবং মনোবিজ্ঞানের ব্যাপারে মহাভারতে সাংখ্যমত গৃহীত হইয়াছে।' মহাকাব্যে বর্ণিত সাংখ্যে প্রাচীন সাংখ্যের সকল প্রধান বৈশিষ্ট্যই বিদ্যমান। গার্বের মতে এই সাংখ্যদর্শন মহাভারতের ভাষায় পুরাপুরি প্রাচীন সাংখ্যদর্শনই। কিন্তু মহাভারতে বর্ণিত সাংখ্য ও যোগকে প্রচলিত পূর্ণাঙ্গ সাংখ্য ও যোগের প্রারম্ভ বলাই অধিক সঙ্গত হইবে।

৩। নাস্তিক (শাস্ত্রবিরোধী) সম্প্রদায় সকল

প্রাচীন আস্তিকতার ন্যায় প্রাচীন নাস্তিকতাও স্ব স্ব পথে অগ্রসর হইতেছিল। মহাভারতে নাস্তিকতাবাদের অসংখ্য উল্লেখ পাওয়া যায়। মহাভারতে সাধারণতঃ 'নাস্তিক' শব্দটির অর্থ—যে ব্যক্তি পারমার্থিকতত্ত্ব সম্বন্ধে অথবা পবিত্র প্রাচীন পরম্পরার প্রামাণ্য সম্বন্ধে পূর্বপুরুষদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত মত প্রত্যাখ্যান করে (১২. ১৩৩. ১৪ = গীতা ৪. ৪০; ১২. ১২৫; ১২. ২৬৯ ৬৭; ১২. ১৮০. ৪৯)। ইহা ভিন্নও লোকায়তিক (স্বভাব-বাদী)[৮], হেতুমৎ (যুক্তিবাদী)[৯] ও পাষণ্ড (বেদ বিরোধী)[১০] প্রভৃতি সম্প্রদায়েরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাদের সম্বন্ধে উল্লেখ এত কম যে তাহা হইতে উহাদের মত ঠিক ঠিক কি তাহা নির্ধারণ করা কঠিন। মহাকাব্যে প্রায়ই নাস্তিক মতবাদগুলিকে আসুর আখ্যা দিয়া নিন্দা করা হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থের নানা স্থল পুনঃ পুনঃ পরিবর্তিত হওয়ায় ইহা সম্ভবপর যে, এই সকল মতের বিরোধী লোকের হাতে পড়িয়া এইগুলি বিকৃতরূপ ধারণ করিয়াছিল এবং পরিত্যক্তও হইয়াছিল। সে যাহাই হউক, উক্ত মতবাদ সকল যে একটি গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাধারার প্রতিনিধি স্বরূপ ইহাতে সন্দেহ নাই। এই ধরণের ছয়টি মতের উল্লেখ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে পূর্বেই দেখিতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন নাস্তিক মতবাদ সকলের মধ্যে দুইটি মতবাদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং অন্যান্য দর্শন হইতে ইহাদের পার্থক্য সুস্পষ্ট। পরবর্তী যুগের ভারতীয় চিন্তার ইতিহাসেও উহারা সুপরিচিত। এই দুইটি হইতেছে—যদৃচ্ছাবাদ (অনিমিত্তবাদও বলা হয়) এবং স্বভাববাদ। দানবকুলের প্রহ্লাদকে দ্বিতীয় মতটির প্রবর্তক বলা হইয়াছে (১২. ২২২)। বেদের অতিপ্রাকৃতবাদ ও উপনিষদের বিশ্বাতীতসত্তাবাদের তুলনায় উক্ত মত দুইটি হইতেছে প্রত্যক্ষবাদী। ঐ দুইটি মতে কোন অতিপ্রাকৃত প্রমাণ গৃহীত হয় নাই এবং এই জগতের পশ্চাতে যে কোন অলৌকিক শক্তি আছে (অদৃষ্টবাদ) তাহা স্বীকার করা হয় নাই। প্রথম মতে কার্যকারণবাদ ও জগতের সর্বপ্রকার নিয়মশৃঙ্খলা প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে। দ্বিতীয় মতে জগতে যেটুকু শৃঙ্খলা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা আকস্মিক বলিয়া মনে করা হইয়াছে। এবং এই শৃঙ্খলা বস্তুরই স্বভাবধর্ম, কোন বাহ্যশক্তি দ্বারা বস্তুতে উহা আরোপিত হয় নাই। উক্ত অর্থে এই মতবাদগুলিকে লোকায়ত অর্থাৎ সংসারসর্বস্ব নাস্তিকবাদ বলা যাইতে পারে এবং ইহারা আস্তিক অধ্যাত্মবাদের বিরোধী। সম্ভবতঃ এই সব মত মৃত্যুকাল পর্যন্ত স্থায়ী আত্মার

অস্তিত্বে বিশ্বাস করিত। কিন্তু তাহারা আত্মার অবিনশ্বরতাকে অবশ্যই অস্বীকার করিত এবং উহার আনুষঙ্গিক কর্ম ও জন্মান্তরবাদকেও প্রত্যাখ্যান করিত।

৪। বিভিন্ন মতবাদের সংমিশ্রণ

সুতরাং তাত্ত্বিক শিক্ষার দিক দিয়া এই মহাকাব্যে বিভিন্ন মতবাদ সকলের এক অসঙ্গতিপূর্ণ সংমিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়। এইস্থলে সংক্ষিপ্তাকারে প্রধান দার্শনিক ভাবধারার উল্লেখ উপযোগী হইবে। মহাকাব্যে বর্ণিত তত্ত্ববিত্তায় বিভিন্ন ভাবধারার পারস্পরিক প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। একদিকে আমরা বেদ ও ব্রাহ্মণে স্বীকৃত বহু ঈশ্বরবাদী যাগ-যজ্ঞাদি ও ঔপনিষদিক অদ্বৈতবাদ লক্ষ্য করি। কিন্তু এই সকলই প্রাথমিক সাংখ্যের স্বভাববাদী দ্বৈতমত ও প্রাথমিক যোগ-দর্শনের সাধনার অঙ্গস্বরূপ ঈশ্বরবাদের দ্বারা প্রভাবিত; যদিও ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে ইহার অধিকাংশ সাংখ্যও নহে, যোগও নহে। অপরদিকে আমরা পাশুপত, বৈষ্ণব, নারায়ণ ও প্রধান প্রধান ভাগবত-সম্প্রদায় সকলের একেশ্বরবাদী ভক্তিবাদ দেখিতে পাই। এইগুলি বিভিন্ন উৎস হইতে তাহাদের ভাবধারাসকল সংগ্রহ করিয়াছিল। বিশ্বতত্ত্ব ব্যাপারেও কমবেশী বিভিন্ন বিরোধী মতবাদের সংমিশ্রণ দেখা যায়। মহাভারতে যদিও ব্রহ্মাণ্ড ও স্রষ্টা প্রজাপতি সম্বন্ধে বৈদিক ধারণা প্রচলিত ছিল, তথাপি উপনিষদের উপদেশের মধ্যে যে অংশে জগৎসৃষ্টি ব্যাপারকে কেবলমাত্র মিথ্যা বা মায়িক হিসাবে না দেখিয়া চরম সৎ-এর পরিণাম হিসাবে দেখা হইয়াছে তাহা মহাভারত সমর্থন করে বলিয়া মনে হয়। পরব্রহ্মে বিচিত্র দৃশ্যমান জগতের যথার্থ সত্তা আছে। ধর্মের ভাষায় উক্ত পরব্রহ্মকে ঈশ্বর বলিয়া অভিহিত করা হয়। অন্যদিকে সাধারণভাবে সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ে সাংখ্যের মত সাধারণতঃ গৃহীত হইয়াছে দেখা যায়। অবশ্য এই অংশেও মহাভারতের মতের ভিতর কোন সঙ্গতি নাই। সক্রিয় প্রকৃতি, নিষ্ক্রিয় পুরুষ, গুণ ও ভূততত্ত্ব প্রভৃতি সাংখ্যের চতুর্বিংশতি তত্ত্ব ইহাতে স্বীকৃত হইয়াছে। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, পঞ্চবিংশতিতম এমন কি ষড়বিংশতিতমতত্ত্বকেও স্বীকার করা হইয়াছে। পুরুষ প্রকৃতি সংযোগে যে সৃষ্টি হইয়াছে তাহার সম্বন্ধে বিভিন্ন মত ব্যতীত মহাভারতে পর্যায় বা ব্যূহতত্ত্বের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ব্যূহতত্ত্ব পৌরাণিক উপাখ্যান ও দার্শনিক চিন্তার এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ। আমরা মহাভারতের এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মত সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিব।

মহাভারতের মনস্তাত্ত্বিক ভাবগুলিও প্রারম্ভিক সাংখ্যচিন্তা দ্বারা প্রভাবিত। মহাভারতে প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বীকৃত হইয়াছে। চক্ষু, ত্বক্‌, শ্রোত্র, জিহ্বা, ঘ্রাণ—এই পঞ্চেন্দ্রিয়কে যথাক্রমে তেজ, ক্ষিতি, ব্যোম, অপ্‌ ও বায়ুর সহিত সংযুক্ত করা হইয়াছে। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়সন্নিকর্ষজনিত প্রত্যক্ষের প্রেরককর্তা হইতেছে মন, এবং সংকল্প হইতেছে বুদ্ধির কার্য। সংবেদন, প্রত্যক্ষ, চিন্তা, ভাবাবেগ ও ইচ্ছা এইগুলি প্রকৃতিচালিত জড়ক্রিয়া। ঔপনিষদিক আত্মা বদ্ধ অবস্থায় জীবাত্মা এবং মুক্ত অবস্থায় পরমাত্মা বলিয়াও অভিহিত হয়। যে প্রকৃতি সংবেদন, চিন্তা এবং ক্রিয়ার মূল তাহার বন্ধনদশাগ্রস্ত, নিষ্ক্রিয় দ্রষ্টা পুরুষের সহিতও এই জীবাত্মার সাদৃশ্য আছে। মহাভারতের ঈশ্বরবাদে বহু জীবাত্মা অথবা পুরুষ ব্যতীত পরমাত্মা ও উত্তম পুরুষের অস্তিত্বও স্বীকার করা হইয়াছে। বাত, পিত্ত এবং কফ এই তিন ধাতুর দ্বারা শরীর সংগঠিত; কিন্তু চেতন জীবাত্মা প্রধানতঃ সত্ত্ব, রজ, তম—এই তিন গুণদ্বারা রচিত। তমের ধর্ম জড়ত্ব এবং অজ্ঞান তাহার কার্য; রজের ধর্ম ক্রিয়া ও উহার কার্য কাম; সত্ত্বের ধর্ম ভারসাম্য এবং স্থৈর্য ইহার কার্য। 'গুণ'—শব্দটির মূল অর্থ হইতে বুঝা যায় যে, গুণগুলি একদিকে যেমন ধর্ম অন্যদিকে তেমন উহারা বন্ধনশৃঙ্খল। সাম্য, ক্রিয়া ও জড়ত্বের ঘাত-প্রতিঘাতের দ্বারা মনুষ্যক্রিয়ার এবং প্রাকৃতিক ঘটনার বৈচিত্র্য নির্ধারিত হয়।

মহাভারতের নীতিতত্ত্ব এইরূপ: ব্যক্তির স্বভাব ত্রিগুণদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়—এই সাংখ্যমতের নৈতিক ব্যাখ্যা দিতে গিয়া মহাভারতে বলা হইয়াছে যে, সত্ত্ব হইতেছে মানুষের সদ্‌গুণ, রজ কাম ক্রোধাদি রিপু এবং তম অজ্ঞান মোহ প্রভৃতি দোষ।[১১] অবশ্য মহাভারতীয় নীতিতত্ত্বে প্রাচীনতর যুগের চিন্তাধারার প্রভাবও দেখা যায়। কিন্তু প্রাচীন চিন্তাধারার তাৎপর্য সকল এই ক্ষেত্রে লক্ষ্য করিতে হইবে। বেদ-বিহিত ক্রিয়াকর্মাদি কর্তব্য বলিয়া কিয়দংশে স্বীকৃত হইয়াছে; তেমনি বর্ণধর্মও বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনের উপায়রূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। অন্যদিকে উপনিষদের এই মূল নীতি-তত্ত্বও গৃহীত হইয়াছে যে, নির্ভুলভাবে যজ্ঞাদি সম্পাদনে পরম পুরুষার্থ লাভ হয় না, কিন্তু অহংকার কিংবা আত্মাকে সসীম বলিয়া বিশ্বাস করা কিংবা পরমাত্মার একত্বের পরিবর্তে নানাত্বের ভ্রান্ত দৃষ্টি পোষণ করা—ইহাই প্রকৃত অনর্থ। কিন্তু পরম্পরানুযায়ী চতুর্বর্গ বা চারিটি পুরুষার্থের মধ্যে শুধু মোক্ষই নহে কিন্তু ধর্ম, অর্থ এবং কামকে ও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অর্থ ও কাম বলিতে বৈষয়িক লাভ ও সুখ বুঝায়, কিন্তু ইহাদের উৎপত্তি ধর্ম হইতে। ধর্ম মনুষ্যপ্রচেষ্টার চরম লক্ষ্য; ন্যায়পরায়ণতা ইহার স্বরূপ এবং ইহা মুক্তির উপায়। অর্থ ও কামকে বৈধ বলিয়া

মানিতে হইবে কারণ সাংসারিক কাজকর্মকে অবজ্ঞা করা উচিত নহে, তথাপি ধর্মই জীবনের লক্ষ্য। ধর্মাচরণে যে সুখ লাভ হয় তাহা কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়সুখ নহে, ইহা কেবলমাত্র কামনা-বাসনার চরিতার্থতা নহে, ইহা এই প্রকার প্রযত্ন যাহার মধ্যে প্রচেষ্টা ও দুঃখও রহিয়াছে। ধর্মসাধনের জন্য অগ্রে দেহ ও মনের শুদ্ধি আবশ্যক। এই প্রসঙ্গে অনেক নৈতিক কর্তব্যের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, এবং যে সকল দোষ বহুকাল যাবৎ নৈতিক বিচ্যুতি বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে তাহাদেরও নিন্দা করা হইয়াছে। সাধারণতঃ যেরূপ আচরণ সঙ্গত নয়, তাহাও বিশেষ প্রয়োজনে অথবা আপৎকালে অনুমোদন করা হইয়াছে। এইরূপ আপৎধর্ম অথবা সুবিধাবাদের বিধান হইতে বুঝা যায় যে, ধর্ম ও অধর্ম অবস্থাবিশেষের উপর নির্ভর করে এবং এইজন্য উহারা আপেক্ষিক। কিন্তু ধর্মের সাধারণ পরম্পরা অনুসারে কতকগুলি মৌলিক পাপ ও পুণ্যের ধারণা মহাভারতে স্বীকৃত হইয়াছে; আসুরিক সংগ্রাম ক্ষেত্রে সৈনিকদের আচরণ যাহাই হউক্ না কেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, মহাভারতে মোটামুটিভাবে তত্ত্ব ও ব্যবহার উভয় ক্ষেত্রেই নীতিমত্তার উচ্চ ভাবগত ও আচারগত উচ্চস্তরের নীতিবোধের আদর্শ স্থাপিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে ইহাও অবশ্য সম্পূর্ণরূপে স্বীকৃত হইয়াছে যে, কেবলমাত্র ব্যক্তির জীবনেই নহে কিন্তু সামাজিক জীবনেও নৈতিক শুদ্ধি আবশ্যক। ধর্ম সামাজিক জীবনের সহিত জড়িত। অধিকার সংরক্ষণ অপেক্ষা কর্তব্যপালনই ধর্মের মূলতত্ত্ব। কর্তব্যের ক্ষেত্র শুধু মনুষ্য সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে, কিন্তু ইহা সমগ্র প্রাণীজগতেই বিস্তৃত। প্রাণীমাত্রকেই বিশ্বপ্রেমের দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে।

এইরূপ সামাজিক ও মানবিক দৃষ্টিতে স্বভাবতঃই সন্ন্যাসের আদর্শকে অনুমোদন করা হইত না এবং ধর্মকে নিবৃত্তিমূলক মনে না করিয়া বরং প্রবৃত্তিমূলক বলিয়া মনে করা হইত; কিন্তু এই ক্ষেত্রেও মতৈক্য দেখা যায় না। বিশেষতঃ নাস্তিক সম্প্রদায়গুলির মধ্যে তপস্যা ও সন্ন্যাসের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইত। কিন্তু ন্যায্য কর্তব্যকর্ম সম্পাদনের পূর্বে সংসারত্যাগও নিন্দিত হইত। এই উভয় মতবাদই জনৈক পিতা ও পুত্রের কথোপকথনের আখ্যানের মধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে (১২. ২৭৭)। উক্ত কাহিনীতে পিতার বক্তব্য এই যে, যাহার প্রথমে সমাজের প্রতি অনুরাগ নাই তাহার পক্ষে অনাসক্তি সম্ভবপর নহে। কিন্তু পুত্রের বক্তব্য এই যে, অনাসক্তি সম্পাদন করিতে হইলে সংসারে নিরাশ হইয়া তাহা একেবারেই অচিরাৎ সম্পাদন করিতে হইবে; কারণ বিলম্বিত সাধনা ধর্মপথে অন্তরায়—ধর্মপথে বাধাস্বরূপ। সে যাহাই হউক সাধারণ মানুষের জীবনে সন্ন্যাস সকলের জন্য উপদিষ্ট

হয় নাই এবং বৈয়ক্তিক ও সামাজিক কর্তব্যের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপিত হইত বলিয়া মনে হয়। নিষ্কাম কর্মের উপদেশদ্বারা ত্যাগধর্মের শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে বটে, কিন্তু কর্মমার্গকে অন্যান্য মার্গ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে।

মহাভারতে অমোঘ কর্মবাদের সহিত জড়িত সর্বপ্রকার বিশ্বাস স্বীকৃত হইয়াছে। মানুষের কর্ম যেমন একদিকে দৈবনিয়ন্ত্রিত বলিয়া মনে করা হইয়াছে, তেমনি দৈবকেও ঈশ্বর-নিয়ন্ত্রিত বলিয়া মনে করা হইয়াছে। কিন্তু ইহাও বলা হইয়াছে যে, ক্লীবরাই দৈবে বিশ্বাসী এবং কর্মফল পুরুষকারের দ্বারা পরিবর্তিত হইতে পারে। অবশ্য কর্ম বলিতে অন্ধ যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ বুঝায় না, ইহা বিশ্বের ঈশ্বর-নিয়ন্ত্রিত ন্যায়-পরায়ণতার নিয়ম। সুতরাং মহাভারতে ভগবানের প্রতি ভক্তি এবং তাঁহার কৃপা অপরিহার্য কর্মফল রোধ করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম বলিয়া মনে করা হইয়াছে। সেইজন্য মহাভারতের নীতিতত্ত্ব ধর্মতত্ত্ব হইতে বিচ্ছিন্ন নহে। নীতি ধর্মসঙ্গত হইতে এবং ধর্ম নীতিসঙ্গত হইতে বাধ্য। নীতি ও ভক্তি অবিচ্ছেদ্য। ঈশ্বরানুমোদিত বলিয়াই ন্যায়কে ন্যায় বলা হয়। কোন্ শক্তি আমাদিগকে নৈতিক নিয়ম মানিতে বাধ্য করে—এই প্রশ্নের উত্তর নীতিমত্তার মূল কারণের (ঈশ্বর) সাহায্যে দেওয়া হইয়াছে।

মহাভারত কেবলমাত্র বুদ্ধিবাদ কিংবা নীতিবাদে বিশ্বাস করে না। ইহার মূল শিক্ষা ব্যক্তিক ঈশ্বরের প্রতি প্রেমপূর্ণ ভক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ফলে উক্ত ক্ষেত্রে নীতি ধর্মসম্মত ও ধর্ম নীতিগত। নীতি ও ভক্তি অবিচ্ছেদ্য; দৈব বলিয়া ন্যায় ন্যায়—এই তত্ত্বের দিক দিয়া স্বীকৃতির প্রশ্ন সমাধান করা হয়।

তদ্রূপ মৃত্যুর পরে মানুষের কি অবস্থা হয় এই প্রশ্নেরও সঙ্গতিপূর্ণ উত্তর মহাভারতে পাওয়া যায় না। অবিশ্বাসী নাস্তিকেরা স্বভাবতঃ মৃত্যুর পরে কোন ভবিষ্যৎ জীবনের প্রত্যাশা করে না, কিন্তু এই মতবাদের বিশেষ প্রাধান্য ছিল না। ইহা বলা যায় না যে, লোকের মৃত্যু সম্বন্ধে কোন ভীতি ছিল না। কারণ, সর্বসাধারণ লোকের মধ্যে কেহ কেহ যেমন নরক, শাস্তি, স্বর্গ, পুরস্কারে বিশ্বাস করিত, তেমনই কেহ কেহ মৃত্যুতে জীবের সম্পূর্ণ ধ্বংস হয় বলিয়াও বিশ্বাস করিত। বহুজন-স্বীকৃত কর্মবাদের সহিত একটি সুনির্দিষ্ট পারলৌকিক ধারণাও জড়িত ছিল। মৃত্যু ও প্রজাপতির (১২. ২৫৬-৮) সুবিদিত উপাখ্যানে মৃত্যু-দেবতাকে ন্যায়ের দেবতারূপে কল্পনা করা হইয়াছে, কারণ শাস্তি কোন বাহ্যশক্তি হইতে আসে না, কর্মের প্রতিক্রিয়া স্বয়ং কর্মকর্তাকে আঘাত করে। সংগে সংগে আমরা ইহাও লক্ষ্য করি

যে, ভগবানের কৃপায় জীবের উদ্ধার হইতে পারে এইরূপ ধর্মবিশ্বাসের দ্বারা কর্মবাদের কঠোরতা হ্রাস করার চেষ্টা করা হইয়াছে। মোক্ষের অর্থাৎ কর্ম ও সংসারের বন্ধন (পুনর্জন্ম) হইতে মুক্তির সাধনাই অবিসংবাদিতভাবে চরম আদর্শ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু মুক্তির স্বরূপ ও উপায় সম্পর্কে যথেষ্ট অনিশ্চয়তা দেখিতে পাওয়া যায়। উপনিষদে বর্ণিত ব্রহ্মের উপলব্ধি দ্বারা ইহলোকে অথবা পরলোকে সর্বকামনারহিত প্রশান্তি লাভে যেমন লোকের বিশ্বাস ছিল, তেমন বেদে স্বর্গ ও ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধি সম্বন্ধে যে প্রতিশ্রুতি আছে, তাহাতেও লোকের বিশ্বাস ছিল। কিন্তু প্রকৃতি হইতে পুরুষের পার্থক্য উপলব্ধি করিয়া পুরুষ যে সংসার হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে এই দ্বৈতবাদী সাংখ্যমতের উল্লেখ এবং কঠোর আত্মসংযম দ্বারা কৈবল্যলাভ করা যায় এই ঈশ্বরবাদী যোগমতের উল্লেখও আমরা মহাভারতে দেখিতে পাই। ইহা ভিন্ন স্পষ্টভাবে পরমেশ্বর এবং মুক্তির বিভিন্ন স্তরেও লোকের বিশ্বাস ছিল এবং এই সকল স্তরের সকলের ঊর্ধ্বে ছিল পাশুপত, পঞ্চরাত্র অথবা ভাগবত সম্প্রদায়সম্মত একটি ঐশ্বর্যময় স্বর্গ। কিন্তু পরলোক সম্বন্ধে যত ভিন্ন ভিন্ন মতই থাকুক না কেন সাধারণ চিন্তার মধ্যে এই বিশ্বাস ছিল যে, মুক্তি (মোক্ষ) এমন এক অবস্থা যাহা কেবলমাত্র পরলোকে নহে পরন্তু ইচ্ছা করিলে ইহলোকেও লাভ করা যায় (জীবন্মুক্তি)। মুক্তির অর্থ নূতন কিছু হওয়া নহে, পরন্তু নিজের স্বরূপেই থাকা ; এবং ইহার জন্য বর্তমান জীবনই পর্যাপ্ত বলিয়া মনে করা হইত।

৫। ধর্ম-সম্পর্কীয় চিন্তার ধারা

দার্শনিক মতের বিভ্রান্তিকর বিভিন্নতা সত্ত্বেও মহাভারতের ধর্ম-সম্বন্ধীয় প্রধান চিন্তাধারাটি নিঃসন্দিগ্ধভাবে সুস্পষ্ট। ইহা প্রধানতঃ ঈশ্বরনিষ্ঠ ও স্পষ্টতঃ দ্বৈতবাদী। এই ধর্মের এইরূপ বিশ্বাস যে প্রতীক, প্রকাশ অথবা প্রাদুর্ভাব এবং অবতারের মধ্য দিয়া এবং জীবন্ত ভক্তি ও ভগবৎ কৃপায় (প্রসাদ) সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ (প্রপত্তি) দ্বারা জীবচৈতন্যে ঈশ্বরের প্রগাঢ় উপলব্ধি সম্ভবপর। এইরূপ অতীন্দ্রিয়ানুভূতি ও হৃদয়াবেগকে ভক্তি আখ্যা দেওয়া হয়, এবং ইহাকে কেবলমাত্র নৈতিক উৎকর্ষ অথবা বৌদ্ধিক প্রত্যয়ের উপরে স্থান দেওয়া হইয়াছে। মহাভারতে বর্ণিত ধর্ম মূলতঃ একেশ্বরবাদী, কিন্তু উহাতে প্রাচীন ও নূতন অসংখ্য দেব-দেবীর অস্তিত্বে বিশ্বাস ও সমর্থন করারও স্পষ্টভাবে চেষ্টা করা হইয়াছে। প্রাচীন বৈদিক দেবতারাও রহিয়া

গেলেন কিন্তু ইন্দ্র ও বরুণ প্রভৃতি কাহারও কাহারও মাহাত্ম্য কমিয়া গেল। যম প্রভৃতি কাহারও কাহারও স্বরূপ বদলাইয়া গেল। প্রজাপতি প্রভৃতি কয়েকটি দেবতার কোন পরিবর্তন হইল না ; আবার বিষ্ণু ও রুদ্র প্রভৃতি কয়েকজন দেবতা নূতন গৌরব ও উচ্চতর মর্যাদা লাভ করিলেন।

ত্রিমূর্তির (যদিও ত্রিমূর্তি শব্দটির উল্লেখ মহাভারতে নাই) ধারণার বিকাশ ধীরে ধীরে হইয়াছিল ; কিন্তু মহাভারতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব—এই ত্রিদেবতা ফলতঃ সর্বপ্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছেন। কখনও কখনও ইঁহাদের মধ্যে পর্যায়ক্রমে প্রত্যেকেই প্রধান দেবতা হইয়া আছেন। আবার কখনও কখনও ইঁহারা পরস্পরের সমান ক্ষমতাশালী দেবতা ; আবার কখনও কখনও ইঁহারা একই পরমেশ্বরের বিভিন্ন রূপ। এই স্থলে সকল দেবতাদিগের বিবর্তনের ইতিহাস খুঁজিয়া বাহির করা কিংবা মহাভারতীয় ঈশ্বরবাদের ক্রমিক পরিবর্তনের আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। এই সকল দেব-দেবী সম্বন্ধে মহাভারতের সাধারণ ধারণা কিরূপ ছিল সে সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে।

পিতামহ ব্রহ্মা বেদোক্ত দেব-দেবী গোষ্ঠীর মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ কিন্তু মহাকাব্যে বর্ণিত দেবতাগণের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ। ব্রহ্মার ধারণার ভিত্তি সূর্য ও চন্দ্রাদির স্থায় কোনও প্রকৃতির বস্তু নহে, কিন্তু উহা শুদ্ধ চিন্তা বা বিচারপ্রসূত। এই দেবতার পূর্ণ বিকাশ বৈদিক যুগের শেষ দিকেই হইয়াছিল। বাস্তবিক পক্ষে ব্রহ্মার খুব বেশী মর্যাদা ছিল না এবং কালক্রমে তাঁহার মূল্য হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছিল। ব্রহ্ম-সম্প্রদায় বলিয়া কোন সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব আছে কিনা ইহা বিশেষ সন্দেহজনক। বিষ্ণু ও শিবই যথাক্রমে প্রধান হইয়াছিলেন। কিন্তু উগ্রতপা, ভয়ঙ্কর শিব অপেক্ষা কারুণিক মঙ্গলময় বিষ্ণু মহাকাব্যর ধর্মের প্রধান দেবতা। হপ্‌কিন্‌স যথার্থই উক্তি করিয়াছেন যে,[১২] মহাকাব্যে ত্র্যম্বক বা বৈচিত্র্যের উপর পরিণামে জোর দেওয়া হয় নাই, জোর দেওয়া হইয়াছে একত্বের উপর এবং এই একত্বের মূর্ত প্রতীক বিষ্ণু। কিন্তু অন্যান্য উৎস হইতে গৃহীত নারায়ণ ও ভগবত (কৃষ্ণ বাসুদেব) চরম বিষ্ণুর সহিত একাত্ম হইয়া গিয়াছিলেন, ফলে মহাকাব্যে বর্ণিত মূল কিন্তু ভ্রান্ত বিষ্ণুবাদ যথাক্রমে নারায়ণ ও ভাগবত সম্প্রদায়ে স্পষ্ট রূপ গ্রহণ করিয়াছিল। এই সম্প্রদায় সকল একাত্ম সম্বন্ধ বিশিষ্ট হইতে পারে, কিন্তু তত্ত্ব ও আচার ব্যবহারের উৎপত্তি ও বৃদ্ধির দিক দিয়া একটি সম্প্রদায়কে অপরটি হইতে ভিন্ন করিয়া দেখা যায়।

৬। সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব ও ইহার প্রকৃতি

প্রত্যক্ষ তথ্যের অভাবে কি ভাবে বেদোত্তর যুগে সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব ও বিকাশ সম্ভব হইয়াছিল—ইহার মূল আবিষ্কার করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য।

যদিও সাম্প্রদায়িক মতবাদগুলি অধিকসংখ্যক জনসাধারণের জীবনের উপর জীবন্ত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তথাপি যে সকল লোকের মধ্যে এই সব সাম্প্রদায়িক মত প্রচলিত ছিল, তাহারা পুরোহিত-নিয়ন্ত্রিত সংরক্ষণশীল সম্প্রদায়ের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল বলিয়া তাহাদের নিজস্ব কোন তথ্যাদি পাওয়া যায় না। কিন্তু যদি কেহ তৎকালীন সাধারণ চিন্তাধারা ও আচার-ব্যবহার (তাহা যতই অস্পষ্ট হউক না কেন) বিচার করিয়া দেখে তাহা হইলে মনে হইবে যে, বৈদিক যুগ ও মহাভারতীয় যুগের মধ্যবর্তী উপনিষদ্ যুগে বেদের ব্রাহ্মণাংশে বর্ণিত আনুষ্ঠানিক যাগ-যজ্ঞের পরিবর্তে ক্রমশঃ বৌদ্ধিক ব্রহ্মবিদ্যা প্রবর্তিত হইয়াছিল; আবার এই ব্রহ্মবিদ্যার মধ্যেই কেবলমাত্র ঈশ্বর সম্বন্ধীয় নহে, ভক্তিমূলক ভাবধারাও ধীরে ধীরে বিকাশলাভ করিয়াছিল। ইহা বিশেষ-ভাবে প্রধান[১৩] উপনিষদগুলির মধ্যে যেগুলি পরবর্তীকালে রচিত হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে সুস্পষ্ট। উদাহরণ স্বরূপ, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে ভক্তি শব্দটি ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ অর্থে স্পষ্টভাবেই ব্যবহৃত হইয়াছে, এবং প্রায় ভক্তিবাদের ন্যায় একটি ঈশ্বরবাদের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত ঈশ্বরবাদ একটি অপরিণত সাম্প্রদায়িকতাকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল; ইহা নৈর্ব্যক্তিক ব্রহ্মের ধারণাকে বর্জন করে নাই বটে, কিন্তু নূতন এক মহাদেব অথবা রুদ্র শিব রূপে কল্পনা করার দিকে ইহার প্রবণতা ছিল। উক্ত রুদ্র-শিবের ধারণা অংশতঃ আস্তিক্য-ধর্মসম্বন্ধীয় উপাখ্যান হইতে গৃহীত ও অংশতঃ সাধারণের বিশ্বাসে পুনর্বার সৃষ্ট হইয়াছিল। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, উপনিষদের যে উচ্চ চিন্তাধারা কখনও অবজ্ঞাত হয় নাই, তাহার সহিত প্রচলিত তৎকালীন বিশ্বাসের সমন্বয়ের চেষ্টা হইয়াছিল। সাধারণ আর্যদের নিজস্ব বিশ্বাস ও আচার-ব্যবহার অবশ্যই ছিল, কিন্তু এইগুলি গঙ্গা-উপত্যকার অনার্য সাংস্কৃতিক ভাবধারায় বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল (রুদ্র-শিবের ধারণাতেই ইহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়)। সংস্পর্শ-জনিত অনার্য সংস্কৃতি কিভাবে-ও কতখানি আর্যদের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিল তাহার প্রকৃতি সঠিক নির্ধারণ করিবার কোন উপায় নাই। কিন্তু ইহা

সাধারণভাবে স্বীকৃত যে, বিভিন্ন জাতি ও সংস্কৃতির যে সংমিশ্রণ সম্ভবতঃ বৈদিক যুগেই আরম্ভ হইয়াছিল—তাহা বেদোত্তর যুগেও ধর্ম ও দর্শনের ক্রমবিকাশের সহায়তা করিয়াছিল। কালক্রমে উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিয়াছিল, এবং উভয়ের অন্তবর্তী প্রাচীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল[১৪]; সে প্রাচীর সম্ভবতঃ কখনও দৃঢ় ছিল না। বিশিষ্ট ক্রিয়াকাণ্ডের পদ্ধতি এবং উচ্চ দার্শনিক মতের কঠোরতাকে উহাদের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্যই কিছু হ্রাস করিতে হইয়াছিল, এবং এইরূপ করাতে বেদবিরোধী লোকপ্রচলিত ধর্মসম্মত দেব-দেবী ও আচার গ্রহণ করা সম্ভবপর হইয়াছিল। অপর দিকে সর্বসাধারণ লোকের খুঁটিনাটি ক্রিয়াকাণ্ড এবং সূক্ষ্ম দার্শনিক বিচারে রুচি কিংবা তাহা করিবার সময়ও ছিল না। কিন্তু শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান্ অভিজাত সম্প্রদায় কর্তৃক জনসাধারণের ব্যাপকতর হৃদয়াবেগের মূল্য স্বীকৃত হইল এবং উহাদের নূতন ব্যাখ্যা দিয়া বৈদিক ধর্মের মধ্যেই উহাদিগকে সন্নিবিষ্ট করা হইল।

এইভাবে নাস্তিক মতগুলি বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মে পরিণতি লাভ করিয়া একটি বিশিষ্ট আকার ধারণ করার পর যখন উহারা শ্রৌতধর্মের মর্মস্থলে আঘাত করিতেছিল তখন বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড ও ধর্মমতকে তাহার তুল্য অপর একটি কঠিন কাজেরও সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। এই কঠিন কাজ হইল নূতন পরিবেশে লোকপ্রচলিত বিশ্বাস এবং আচারগুলিকে প্রয়োজনানুরূপ পরিবর্তন করিয়া আত্মসাৎ করা। রুদ্র-শিব, বিষ্ণু-নারায়ণ অথবা কৃষ্ণ-বাসুদেবের উপাসনাকে কেন্দ্র করিয়া যে সকল লোকপ্রচলিত মত গড়িয়া উঠিয়াছিল, সেইগুলির আবেগপ্রধান ভক্তিবাদের দিকে বিশেষ প্রবণতা ছিল। ইহাতে প্রাচীন ক্রিয়াকাণ্ড এবং ব্রহ্মমূলক ধর্মমত নিশ্চয়ই অনেকটা শিথিল হইয়া আসিতেছিল। বৈদিক ও অবৈদিক মতের সংঘর্ষের ফলে একদিকে শ্রৌত গৃহ্যসূত্র ও ধর্মসূত্রগুলিতে প্রাচীন পরম্পরাকে ব্যবহারের উপযোগী করিয়া বিধিবদ্ধ করা হইল এবং দৈনন্দিন জীবন আচার ব্যবহারের নিয়মাদিকে কঠোরতর করা হইল; অপরদিকে ইহাতে নূতন করিয়া প্রণালীবদ্ধভাবে দার্শনিক চিন্তা আরম্ভ হইল—এই দার্শনিক চিন্তা কখনও কখনও উপনিষদের প্রাচীন ধারার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া চলিয়াছে (বেদান্ত), আবার কখনও কখনও ভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া উক্ত ভাবধারা হইতে দূরে চলিয়া গিয়াছে (সাংখ্য)। কিন্তু এই সংঘর্ষের পরিণাম এইখানেই শেষ হয় নাই, কিন্তু প্রাচীন ধর্মের সম্পূর্ণ পুনর্গঠন ধীরে ধীরে আরম্ভ হইল। উদার বৈদিক-দর্শনের চৈতন্যবাদে বহু নূতন দেব-দেবীকে নিম্নস্তরের সত্যরূপে স্থান দেওয়া হইল। এবং

যে প্রাচীন সেশ্বরধর্ম অব্যাহতভাবে চলিতেছিল, উহাতে এই সকল সাম্প্রদায়িক দেব-দেবীর আবির্ভাবে বিক্ষোভ দেখা দিল এবং প্রাচীন দেবতাদিগকে প্রেম ও করুণার আধাররূপে নূতনভাবে কল্পনা করা হইল। হয়ত ধর্মের এই পরিবর্তনের জন্য সজ্ঞানে চেষ্টা করা হয় নাই, কিন্তু এই সমন্বয় ধীরে ধীরে ক্রমশঃ ঘটিয়াছিল। এই সমন্বয়ের ফল সাধারণভাবে মহাভারতে পূর্ণ বিকশিত সাম্প্রদায়িক ধর্মে (যাহা নূতন ও পুরাতনের মিশ্রণ) দেখিতে পাওয়া যায়; অধিকন্তু ও বিশেষভাবে ভগবদ্গীতার সমন্বয়ী সেশ্বর ধর্মমতেও দেখিতে পাওয়া যায়। ভগবদ্গীতার এই ধর্মমতকে অন্যান্য মত হইতে পৃথক ও বিচ্ছিন্ন করিয়া ব্যাখ্যা করা সঙ্গত হইবে না। যেহেতু উপনিষদ্গুলির মধ্যেই অল্পবিস্তর বিকশিতরূপে একটি ঈশ্বরবাদের ধারা ছিল, অতএব উহা লৌকিক ধর্মের ঈশ্বরবাদের সহিত, সম্পূর্ণভাবে না হইলেও সহজেই মিশিতে পারিয়াছিল। যদিও বৈদিক ধর্ম প্রধানতঃ বিচারমূলক এবং লৌকিক ধর্ম মূলতঃ আবেগপ্রধান ছিল, তথাপি ঈশ্বরবাদের উভয় ধারাই মানব অন্তঃকরণের একই আশা ও আকাঙ্ক্ষা হইতে উদ্ভূত হওয়ায়, এই দুই মতবাদের অদ্ভুত মিলনের অসঙ্গতি সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত না হইলেও উহার মধ্যে কিছু সামঞ্জস্য আনা সম্ভবপর হইয়াছিল।

৭। ভগবদ্গীতা

ভগবদ্গীতা (সাধারণতঃ যাহাকে গীতা বলা হয়) মহাভারতের একটি অংশ। চিন্তাশীল পণ্ডিতগণ ইহার মূল্য সম্বন্ধে বিভিন্ন মত পোষণ করিলেও ইহা যে সত্যই প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থগুলির মধ্যে অন্যতম এবং ইহা ধর্মজীবনে একটি বিশিষ্টস্থান অধিকার করিয়া আছে তাহা কেহই অস্বীকার করেন নাই। অতীতের বহু বিভিন্ন মতবাদের প্রতিধ্বনি যে ইহাতে স্থান পাইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহার বলিষ্ঠ ও সুস্পষ্ট ধর্মভাবই এই বিভিন্ন মতবাদের সমন্বয়ের প্রেরণা দিয়াছে। দর্শনকে ব্যবহারিক ধর্মে পরিণত করিবার জন্য এবং এক প্রাণবন্ত ঈশ্বরের সহিত জীব ও জগতের ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপনের জন্য গীতায় যেরূপ ঐকান্তিক চেষ্টা করা হইয়াছে, তাহা আর অন্য কোথাও করা হয় নাই। যেসকল প্রাচীন দার্শনিক চিন্তাধারা কোন বিশিষ্ট রূপ ধারণ করে নাই, এই গ্রন্থে তাহাদের সন্নিবেশ হওয়ার ফলে ইহার প্রকৃত দার্শনিক মতবাদ কি সে সম্বন্ধে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হইয়াছে, সেইজন্য একদিকে যেমন এই মতবাদের বহু সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা দিবার সুবিধা হইয়াছে, সেইরূপ অপরদিকে ইহা সঙ্গতিপূর্ণ কিনা সে সম্বন্ধেও সন্দেহের অবকাশ

রহিয়াছে। কিন্তু বিভিন্ন মতবাদের এই অপূর্ব সন্নিবেশের ফলেই যে এই গ্রন্থ বিভিন্ন শ্রেণীর মনের উপর জীবন্ত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা বুঝা যায়। একদিকে যেমন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দার্শনিকেরা নিজ নিজ ধারণা অনুযায়ী ইহার ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন এবং চিন্তাশীল পণ্ডিতেরা ইহার আভ্যন্তরীণ সঙ্গতি সম্বন্ধে বিবাদ করিয়া থাকেন, তেমনই অন্যদিকে নীতি ও ধর্ম-সম্বন্ধে ইহার উদ্দীপনাপূর্ণ উপদেশ ইহাকে সাম্প্রদায়িক এবং পাণ্ডিত্যমূলক আলোচনার ঊর্ধ্বে স্থাপিত করিয়াছে এবং ভক্তদের মনে মোক্ষশাস্ত্ররূপে প্রেরণা যোগাইয়াছে।

এই গ্রন্থের আদিম আকার এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, ইহাতে বহু পরিবর্তন ঘটিয়াছে ; কিন্তু এই প্রশ্ন সম্বন্ধে চিন্তাশীল পণ্ডিতেরা একমত হন নাই। হোল্‌জ্‌মান বলেন যে, গীতা পূর্বে একটি সর্বেশ্বরবাদী অথবা বৈদান্তিক কাব্য ছিল, পরে বৈষ্ণবেরা ইহাকে নূতন রূপ দান করিয়াছেন। হপ্‌কিন্স মনে করেন যে, কোন কৃষ্ণোপাসক একটি পূর্ববর্তী বৈষ্ণবকাব্যকে গীতার আকারে রূপান্তরিত করিয়াছেন এবং এই কাব্যটিও আবার প্রথমে একটি অর্বাচীন সাম্প্রদায়িক উপনিষদ ছিল। গার্বে-এর মতে গীতা পূর্বে ভাগবত সম্প্রদায়ের একটি জনপ্রিয় ভক্তিমূলক কাব্যগ্রন্থ ছিল, পরে ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বিগণ ইহাকে বৈদান্তিক মতানুসারে সংশোধন করিয়াছেন। ডয়সেন-এর মতে ঔপনিষদিক চিন্তার শক্তি যখন ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল, সেই পরবর্তী যুগে গীতার উৎপত্তি। বার্নেট-এর বিশ্বাস যে ইহা বাসুদেবসম্প্রদায়েরই গ্রন্থ, তবে গ্রন্থকারের মনে প্রাচীন পরম্পরার বিভিন্ন ধারা বিশৃঙ্খলভাবে মিশিয়া গিয়াছিল। কীথ-এর মতে ইহা শ্বেতাশ্বতর জাতীয় একটি উপনিষদ্, পরে ইহাকে কৃষ্ণোপাসনার উপযোগী করিয়া পরিবর্তিত করা হইয়াছে ; এবং বেল্‌ভালকার-এর মতে লোকপ্রচলিত ধর্মের বিঘাতক প্রভাব হইতে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ্যধর্মকে রক্ষা করিবার জন্য শ্রুতিপ্রামাণ্যবাদীরা ব্যাপকভাবে যে শেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহারই পরিচয় এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। এই সকল কল্পিত মতগুলির মধ্যে কোনওটিকে গ্রহণ করিবার প্রয়োজন নাই ; কিন্তু ইহা বলিতেই হইবে যে, এই সকল বা এতদনুরূপ অপরীক্ষিত মতের ভিত্তিতে এই গ্রন্থের কোন কোন অংশ আদিম এবং কোন কোন অংশ পরবর্তীকালের যোজনা তাহা নির্ণয় করা বিজ্ঞানসম্মত এবং সন্তোষজনক হইবে না। ইহা অস্বীকার করা যায় না যে, মহাভারতের অন্য অনেকস্থলের মত এবং কোন কোন উপনিষদের মত গীতাতেও মাঝে মাঝে প্রক্ষিপ্তাংশ যোগ করা হইয়াছিল অথবা গীতার বিভিন্ন পাঠ প্রচলিত ছিল, কিন্তু ইহা একটি নিকৃষ্ট শ্রেণীর সংগ্রহপুস্তক মাত্র এই কথা বলিলে অথবা ইহা একটি বিশিষ্ট

ধর্মের সমন্বয়াত্মক চিন্তাধারার জীবন্ত প্রকাশ ইহা অস্বীকার করিলে এই গ্রন্থের মূল তাৎপর্যই আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব না ; ইহা ছাড়া বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে হইলেও এই সমগ্র গ্রন্থটির একটি সমন্বয়মূলক ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে— এই যে ভারতীয় ঐতিহ্য ইহার বিরুদ্ধেও যাইতে হয়।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, উপনিষদ্গুলির মধ্যে ভক্তিমূলক ভাবধারা অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহাদের বুদ্ধিপ্রধান ব্রহ্মবিদ্যার মধ্যে স্পষ্টতঃ একেশ্বরবাদী ভক্তিপ্রধান ভাবধারা ধীরে ধীরে পুষ্টিলাভ করিতেছিল। ইহা কতকটা উপনিষদ্গুলির মধ্যেই অন্তর্নিহিত একেশ্বরবাদী চিন্তাধারার জন্য এবং কতকটা কোন কোন সত্যদ্রষ্টা ঋষির ব্যক্তিগত অনুপ্রেরণার জন্য সম্ভব হইয়াছিল, কিন্তু ইহাও নিশ্চিত যে, নির্গুণ ব্রহ্ম সম্বন্ধে উচ্চশ্রেণীর দার্শনিক তত্ত্বজিজ্ঞাসা এবং যে সকল লোকপ্রচলিত সজীব ধর্মমত দেব-দেবীগণের নিষ্ঠাপূর্ণ উপাসনাকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিতেছিল এই উভয়ের অনিবার্য সংমিশ্রণও ইহার অপর একটি কারণ। যখন নির্গুণ ব্রহ্মে ক্রমে ক্রমে অধিকতর ব্যক্তিত্ব আরোপ করিয়া তাঁহাকে সাধারণ বুদ্ধিগম্য করা হইতেছিল তখন তাহার সঙ্গে সঙ্গে পৌরোহিত্যমূলক ব্রাহ্মণ্যধর্মের দর্শন এবং আচার জনসাধারণের ভক্তিপ্রধান ধর্মবিশ্বাসকে সমর্থন করিতে ও নূতনভাবে ব্যাখ্যা করিতে থাকিল। আমরা গীতাকে যে আকারে পাই তাহা কেবলমাত্র পুরোহিতদের সৃষ্ট নয়, অথবা জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত কোন ধর্মসংক্রান্ত ভক্তিমূলক গ্রন্থও নয়। কোন কোন পণ্ডিত গীতাকে ঈশ্বরতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতদের প্রযত্নকৃত কৃত্রিম রচনা বলিয়া মনে করেন, কিন্তু এইরূপ কৃত্রিম রচনা-দ্বারা ধর্মজীবনকে নিয়ন্ত্রণ করা প্রায় অসম্ভব। এইরূপ প্রযত্নদ্বারা একটি বিস্ময়কর সুসংহত ঈশ্বরতত্ত্বসম্বন্ধীয় গ্রন্থ রচিত হইতে পারে, কিন্তু ইহার দ্বারা যে ভগবদ্গীতার মত একটি প্রকৃত ধর্মপুস্তকের সৃষ্টি হইবে তাহা বিশ্বাস করা কঠিন। এই সকল কথা বিবেচনা করিলে এইরূপ অনুমান করাই অধিকতর সমীচীন এবং ইতিহাসসম্মত হইবে যে, কোন একটি বিশিষ্ট ধর্মসম্বন্ধীয় চিন্তা বা ভাবধারা পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হইয়া যে আকার ধারণ করিয়াছে তাহাই গীতায় নিবদ্ধ হইয়াছে এবং সেইজন্য প্রাচীন পুরোহিততন্ত্র হইতে প্রাপ্ত কতকগুলি ধারণা ও বিশ্বাস এবং জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত কতকগুলি ধারণা ও বিশ্বাস অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশিয়া গিয়াছে।

বুদ্ধিজীবী অভিজাত শ্রেণীর উচ্চ দার্শনিক চিন্তা ও জনসাধারণের সুকুমার বৃত্তির সজীব আবেগ এই দুইয়ের মধ্যে এত অধিক অসঙ্গতি বর্তমান যে সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিতেরা এই গ্রন্থে এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যসাধন হইয়াছে কিনা তাহা স্থির করিতে বহু

পরিশ্রম করিবেন ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু এই সকল অসঙ্গতিকে বাহ্যিক এবং কৃত্রিম উপায়ে সংযুক্ত মনে করা ঠিক্ হইবে না, তাহারা এই গ্রন্থের বিশিষ্ট ঈশ্বরবাদের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং সেগুলিকে গ্রন্থের অন্যান্য অংশ হইতে পৃথক করিলে অথবা পরিহার করিলে ইহার ধর্মসম্বন্ধীয় এবং ঐতিহাসিক তাৎপর্যের হানি হইবে। আমরা এইসকল বিভিন্ন চিন্তাধারা ও ভাবাবেগগুলির মধ্যে এক বিস্ময়কর সংমিশ্রণ দেখিতে পাই, কিন্তু গীতার উচ্চ চিন্তাধারার দিক যেমন প্রয়োজনীয় তেমনি যে ধর্মাবেগ ঐসকল চিন্তাধারাকে সজীবতা দান করে, তাহাও ততখানি প্রয়োজনীয়। এই অসঙ্গতিগুলি যেভাবে বিদ্যমান ঐভাবেই উহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে এবং সম্ভবতঃ যে অবস্থার মধ্যে গ্রন্থখানি জন্মলাভ করিয়াছিল তাহাদ্বারা উহাদের ব্যাখ্যা করিতে হইবে। গীতায় বিভিন্নজাতীয় অতিশয়োক্তি এবং পুনরুক্তি আছে ইহা মানিয়া লইলেও ইহাদ্বারা প্রমাণিত হয় না যে গীতাকে এক বা একাধিকবার সংশোধন করা হইয়াছে। গীতাকে যে বারবার সংশোধন করা হইয়াছে এই মত গ্রন্থখানি যে বিভিন্ন বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গীকে সমন্বয় করিবার চেষ্টা করিয়াছে প্রধানতঃ তাহার উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু যে যুগে বাস্তবিকই আধ্যাত্মিক অনিশ্চয়তা ছিল, সেই যুগে এই জাতীয় সমন্বয়ের দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা খুব অস্বাভাবিক নহে। এই জাতীয় একখানি শক্তিশালী গ্রন্থকে কতকগুলি আদিম অপরিণত দার্শনিক মতের অসংলগ্ন সংগ্রহ[১১] বলিয়া নিন্দা করিলে অত্যন্ত পল্লবগ্রাহী সমালোচনার পরিচয় দেওয়া হয়। ইহার শুদ্ধ দার্শনিক মতবাদ তেমন বিচারসহ না হইতে পারে, কিন্তু ইহার লক্ষ্য দর্শন অপেক্ষা ধর্মের দিকে অধিক বলিয়া মনে হয়। গীতায় কতকগুলি মত বিশেষ বিবেচনা না করিয়া একত্র রাখা হইয়াছে, কিংবা কতকগুলি মতের সামঞ্জস্যবিহীন সংগ্রহকে এলোমেলোভাবে সংশোধন করা হইয়াছে, এইরূপ মনে করা অপেক্ষা প্রচলিত মত এবং চিন্তাকে কতকগুলি সক্রিয় ও জীবন্ত ধর্মভাবের সাহায্যে পরস্পরের সহিত সমন্বয় করা হইয়াছে, এইরূপ মনে করাই অধিক যুক্তিযুক্ত। সম্ভবতঃ কতকগুলি বিরোধীমতের সংঘর্ষের ফলে দেশে এক নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল। ইহাতে তৎকালে যে নূতন ভাবধারা দেখা দিয়াছিল উহাকে ব্যক্ত করাই গীতার বিশিষ্ট উদ্দেশ্য ছিল। গ্রন্থখানিকে উহার সমগ্র তাৎপর্যসহ গ্রহণ করিতে হইবে। সমগ্র গ্রন্থে একটি সাধারণ ধর্মভাব নিহিত এবং ইহাতেই উহার ঐক্য সম্পাদিত হইয়াছে। কোন গ্রন্থে শুধু বিভিন্নজাতীয় ধারণার অস্তিত্ব অথবা অস্পষ্ট ভাষার প্রয়োগ সুসংবদ্ধ দার্শনিক মতের সহিত বিসংবাদী হইতে পারে বটে, কিন্তু উহারা সামঞ্জস্যপূর্ণ ধর্মোপদেশের সহিত বিসংবাদী নহে।

এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে গীতায় বিভিন্ন চিন্তাধারা মিলিত হইয়াছিল, কিন্তু ইহাতে সমন্বয়ের স্বেচ্ছাকৃত চেষ্টা করা হইয়াছিল এরূপ মনে করিলে ভুল হইবে। কারণ এই যে, এই মতগুলি তখন এমন পরিস্ফুট আকার ধারণ করে নাই যে উহাদের বিরোধ সুস্পষ্টরূপে লক্ষিত হইতে পারে। এই কথা গীতা-গ্রন্থে এবং মহাভারতের ধর্ম এবং দর্শনবিষয়ক লেখাগুলিতে সূচিত হইয়াছে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, গীতা-গ্রন্থে বিভিন্নতার মধ্যে যে একত্ব সম্পাদিত হইয়াছে, তাহা ধর্মভাবের সাহায্যেই হইয়াছে এবং এইজন্য অধিকাংশ অনুরূপ অন্যান্য গ্রন্থ হইতে ইহার সমন্বয়প্রচেষ্টা অধিক সফল হইয়াছে। নীতি ও ধর্মসম্বন্ধীয় যে সকল প্রাচীন গ্রন্থে স্পষ্টভাবে মূলতঃ ভক্তিতত্ত্বের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, গীতা উহাদের মধ্যে অন্যতম—বর্তমান প্রবন্ধে গীতাকে আমরা এইভাবেই আলোচনা করিব। গ্রন্থখানির দার্শনিক পটভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ এবং ইহাকে অবহেলা করিলে চলিবে না। কিন্তু একটি প্রাচীন ভক্তিমূলক ধর্মের কয়েকটি দিক যেরূপ গভীর ঐকান্তিক ভাবাবেগের সহিত ব্যক্ত করা হইয়াছে, উহারই মূল্য অধিক।

যোগ্যতাসম্পন্ন পণ্ডিতগণ ইতঃপূর্বেই প্রচুর প্রমাণের সহিত দেখাইয়াছেন যে, গীতার রচয়িতা তৎপূর্ববর্তী দার্শনিক ও ধর্মবিষয়ক সাহিত্যের সহিত সুপরিচিত ছিলেন। ব্রহ্মণ্যধর্মের যে সকল ক্রিয়াকলাপ ও মতবাদের শক্তি সেই সময়ে প্রায় নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল, সেগুলিকে এই গ্রন্থের নানাস্থলে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে[১৬], কিন্তু সেগুলিকে নূতনভাবে ব্যাখ্যা করিয়া আপনার বিশিষ্ট উপদেশগুলির সহিত তাহাদের সামঞ্জস্যসাধনের আগ্রহও দেখা যায়। ক্রিয়াকাণ্ডে বিশ্বাসী যে সকল ব্যক্তি বৈদিক যজ্ঞাদি নির্ভুলভাবে সম্পাদন করিলে উপকার হয় এরূপ মনে করিতেন, তাঁহাদের বিধিপরায়ণতাকে নিন্দা করা হইয়াছে, কিন্তু ক্রিয়াকাণ্ডকেও সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করা হয় নাই। জগতের পক্ষে বৈদিক যাগ-যজ্ঞাদির যে উপকারিতা আছে তাহা স্বীকার করা হইয়াছে, কিন্তু ইহাও বেশ জোরের সহিত বলা হইয়াছে যে, কেবলমাত্র কতকগুলি বিশেষ সুফললাভের সঙ্কীর্ণ উদ্দেশ্যে অথবা পুণ্যার্জনের মানসে বেদ-বিহিত কর্মাদি করা উচিত নয়। যাহারা নিম্নতর ফলের কামনা করে তাহারা অবশ্যই সেইগুলি লাভ করে, কিন্তু ইহাতে তাহাদের খুব বেশী লাভ হয় না। এইভাবে অর্জিত পুণ্য কিছুকাল পরে নিঃশেষ হইয়া যায় এবং জীব সংসারচক্র হইতে চিরকালের জন্য মুক্তিলাভ করিতে পারে না। অপর পক্ষে যাঁহারা সকল ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করেন এবং সমস্ত কর্মফল ঈশ্বরে অর্পণ করেন, তাঁহারা মানসিক শান্তি ভোগ করেন এবং কর্মে নির্লিপ্ত হন ; ইহার ফলে তাঁহাদের প্রকৃত ভক্তি

এবং চরম মোক্ষলাভ হয়। বৈদিক যজ্ঞকে এক ব্যাপকতর ও অধিকতর আধ্যাত্মিক অর্থে গ্রহণ করিয়া যুক্তির ভিত্তিতে স্থাপিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এইরকম চিন্তাধারা ঔপনিষদিক যুগেও দেখা গিয়াছিল, কিন্তু গীতায় ইহা অধিক উৎকর্ষলাভ করিয়াছে। গীতায় বলা হইয়াছে যে, যাগ্ যজ্ঞ বহুপ্রকারে করা যায় এবং যজ্ঞকে অন্ততঃ দুইটি পৃথক অর্থে বুঝা যাইতে পারে, প্রথমতঃ বেদে বর্ণিত বিধানানুযায়ী ক্রিয়াসম্পাদন এবং দ্বিতীয়তঃ ঐ ক্রিয়াগুলিকে রূপকরূপে গ্রহণ। ইন্দ্রিয়সংযম, জ্ঞানার্জন এবং বস্তুতঃ সকল কর্তব্য কর্ম ও তপশ্চর্যাকে রূপকের অর্থে যজ্ঞ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে এইগুলি করা হইলে ইহারা সাত্বিক কর্ম; স্বার্থবুদ্ধিতে করা হইলে রাজসিক এবং মোহাচ্ছন্ন হইয়া করা হইলে ইহারা তামসিক। যজ্ঞের মূল অর্থ হইতেছে উচ্চতর কল্যাণের জন্য নিম্নতর কল্যাণকে বিসর্জন দেওয়া। এই ধারণাকে ভিত্তি করিয়া ব্যাপক অর্থে বলা যায় যে, ঈশ্বরের বেদীতে সকল সাংসারিক আসক্তি ও বাসনা নিবেদন করাই সর্বশ্রেষ্ঠ যজ্ঞ। এইভাবে ব্রহ্মণ্যধর্মের যাগ-যজ্ঞবিধির প্রামাণ্য এবং বর্ণাশ্রমধর্মে বিহিত কর্মগুলির যথাযথ অনুষ্ঠানের ঔচিত্য স্বীকার করা হইয়াছে, কিন্তু ভক্তিমার্গের সহিত ক্রিয়াকাণ্ডের সম্বন্ধ বিষয়ে গীতার যে বিশিষ্ট মত আছে, তাহার তুলনায় এইগুলিকে গৌণ স্থান দেওয়া হইয়াছে।

এইভাবে উপনিষদের বিভিন্ন উপদেশের সহিতও গীতাকারের সম্পূর্ণ পরিচয় দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু এই উপদেশগুলিকে তিনি নিজস্ব ভাবধারার সাহায্যে কিয়দংশে পরিবর্তন করিয়া লইয়াছেন। উপনিষদে বর্ণিত ব্রহ্মাত্মৈক্যবাদ, পুরুষের ধারণা এবং কিছু পরবর্তী যুগের ঈশ্বরের ধারণা—এইগুলি স্পষ্টভাবে গীতায় উল্লিখিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া আত্মোপলব্ধির যোগশাস্ত্রসম্মত প্রণালী, যজ্ঞকে ব্রহ্মের রূপ বলিয়া বর্ণনা এবং যজ্ঞের রহস্যাত্মক ব্যাখ্যা, দেবযান ও পিতৃযান সম্বন্ধীয় মত এবং উপনিষদে যে সকল অপ্রধান বিশিষ্ট শব্দ ও চিন্তা প্রচলিত হইয়াছিল—সেই সকলেরও গীতায় উল্লেখ আছে। ব্রহ্মবিদ্যাও স্বীকৃত হইয়াছে এবং ইহার সহিত যে সকল ধর্মসম্বন্ধীয় ভাব জড়িত আছে, সেগুলিকেও সম্পূর্ণভাবে পরিস্ফুট করা হইয়াছে; কিন্তু নির্গুণ ব্রহ্মকে সম্পূর্ণভাবে পুরুষরূপ সগুণ ব্রহ্মে পরিণত করা হইয়াছে এবং মুক্তির জন্য বিশুদ্ধ জ্ঞানের এবং উপনিষদ্গুলিতে বর্ণিত আত্মসমাহিত হইবার পদ্ধতিগুলির উপযোগিতা কিছু পরিমাণে স্বীকার করা হইয়াছে। গীতায় এইগুলিকে সাংখ্য মতবাদ বলা হইয়াছে, কিন্তু বস্তুতঃ এইগুলি উপনিষদীয় মতবাদ এবং পরবর্তীযুগের সাংখ্য মতবাদের সহিত ইহাদের সাদৃশ্য নাই। কিন্তু মহাভারতে যোগের বিরোধী হিসাবে 'সাংখ্য'-এই পারিভাষিক শব্দের উল্লেখ

করা হইয়াছে। গীতাতেও সম্ভবতঃ যাহারা মুক্তির জন্ম জ্ঞানের প্রয়োজন এবং চিন্তা ও ধ্যানের সাহায্যে সেই জ্ঞান লাভ করা যায় এইরূপ মনে করেন, তাঁহাদের পদ্ধতিকেই 'সাংখ্য' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হইয়াছে, আর শাস্ত্রবিহিত কর্মের নিঃস্বার্থ সম্পাদনদ্বারা আত্মসংযম ও শান্তিলাভ করার প্রক্রিয়াকেই 'যোগ' বলা হইয়াছে।

গীতাতে পরমেশ্বরের ত্রিবিধ রূপের কথা আছে এবং প্রকৃতি অর্থাৎ মূল জড়বস্তু ও জীবাত্মা পরমেশ্বরের এই দুইটি পরস্পর সমকক্ষ অভিব্যক্তিও স্বীকৃত হইয়াছে, উহাদিগকে একই বিশ্বাত্মা বা ব্রহ্মের বিভিন্নরূপ বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। অবশ্য এখানে ব্রহ্ম ও সগুণ ঈশ্বর এক। গীতার এই মত কিয়দংশে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের অনুরূপ। এই মতটি সুপ্রসিদ্ধ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের রূপকের সাহায্যে বর্ণিত হইয়াছে। এখানে সম্ভবতঃ ক্ষেত্র বলিতে (সাংখ্যদর্শনে বর্ণিত প্রকারে) প্রকৃতির সেই অবিরাম ক্রিয়া-ভূমি বুঝায়—যাহা পরিচ্ছিন্ন আত্মা বা ক্ষেত্রজ্ঞের অধিষ্ঠান। এই ক্ষেত্রজ্ঞ হইতেছে সর্বক্ষেত্র-নিবাসী পরম ক্ষেত্রজ্ঞ ঈশ্বরের একটি রূপ। গীতায় সাংখ্যের ন্যায় পুরুষকে নিষ্ক্রিয় বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই, এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নীরবতাও অবলম্বন করা হয় নাই একথা সত্য ; তথাপি পরিচ্ছিন্ন জড়জগৎ ও আধ্যাত্মিক জগতের সহিত পরমাত্মার যে সম্বন্ধ তাহা বিশদ করিবার জন্ম বিভিন্ন তত্ত্বের নাম নির্দেশক সাংখ্যদর্শনসম্মত প্রাচীন পরিভাষা ব্যবহার করা হইয়াছে। গীতায় পঞ্চ মহাভূত, বুদ্ধি, অহঙ্কার প্রভৃতিতে প্রকৃতির অভিব্যক্তি আরোপ করা হইয়াছে—এইগুলি সাংখ্যদর্শনবর্ণিত ক্রিয়াশীল জড়প্রকৃতিরই বিভিন্ন অবস্থা অথবা চতুর্বিংশতি তত্ত্ব। আবার বিশ্বের সৃষ্টি ও ক্রিয়ার ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য সত্ত্ব প্রভৃতি ত্রিগুণও স্বীকৃত হইয়াছে। তাহা ছাড়া ক্ষর ও অক্ষর অর্থাৎ নশ্বর ও অবিনশ্বর নামে দুইটি পুরুষ এবং পুরুষোত্তম নামে ক্ষর ও অক্ষরের উর্ধ্বে তৃতীয় এক পুরুষের কথাও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে স্পষ্ট মনে হয় যে, এই তিনটি পুরুষ একই পুরুষের তিন অবস্থা বা রূপ। ইহা স্পষ্ট যে এই ঈশ্বররূপ পুরুষের ধারণা উপনিষদীয় চিন্তার পরিণতি, সাংখ্যমতের নহে, কারণ সাংখ্যদর্শনে পরমপুরুষ অথবা ঈশ্বর স্বীকৃত হন নাই এবং পরস্পর হইতে পৃথক অনন্তসংখ্যক পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়। সুতরাং প্রতীয়মান হইবে যে, যদিও গীতাতে সাংখ্যদর্শনের কতকগুলি পারিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তথাপি সাংখ্যদর্শনে এই সকল শব্দের যে অর্থ গীতায় উহারা সর্বদা সেই অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই, এবং প্রচলিত সাংখ্যদর্শনের পরাবিদ্যার সহিত জড়িত সর্বমতও গীতায় গৃহীত হয় নাই। গীতা স্পষ্টতঃ ঈশ্বরবাদী, কিন্তু সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বরের প্রসঙ্গই নাই। গীতা-গ্রন্থের পুরুষ ও প্রকৃতির ধারণায় সাংখ্যপ্রভাব অবশ্য

স্বীকার্য ; কিন্তু উত্তমপুরুষের ধারণাদ্বারা গীতা এই দুই তত্ত্বের মিলন ঘটাইয়াছে। সুতরাং প্রতীয়মান হইবে যে, যখন গীতা-গ্রন্থ রচিত হইয়াছে তখন সাংখ্যদর্শনের কয়েকটি মত অপরিণত অবস্থায় বিদ্যমান ছিল, কিন্তু সম্ভবতঃ পরবর্তী যুগের প্রসিদ্ধ সাংখ্যদর্শনের সহিত গীতাকারের পরিচয় ছিল না। এই কথা সাধারণতঃ মহাভারতের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য।

সর্ব জড়বস্তু মিথ্যা—বেদান্তের এই বিশিষ্ট মত গীতায় গ্রহণ করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না, বরং এই ব্যাপারে সাংখ্যমতই দৃঢ়ভাবে গৃহীত হইয়াছে। মায়া শব্দের প্রয়োগ আছে বটে, কিন্তু তাহা জড়সত্তার বাচক নহে। কিন্তু জড়বস্তুকে বুদ্ধি যে বিশিষ্ট প্রকারে জানে মায়াশব্দদ্বারা তাহাই ব্যক্ত করা হইয়াছে এবং বুদ্ধিতত্ত্ব ও জড়তত্ত্ব উভয়ই গীতার মতে শাশ্বত তত্ত্ব। গীতা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের সহিত এই ব্যাপারে একমত বলিয়া মনে হয় যে ঈশ্বর মায়ার স্রষ্টা। অবশ্য এই মায়া প্রকৃতি অথবা অবিদ্যার সহিত অভিন্ন নহে। ইহা হইতেছে ঈশ্বরের সেই বিশ্বভ্রান্তিকর শক্তি যাহা দ্বারা তিনি প্রকৃতি ও গুণসমূহের মাধ্যমে নিজের স্বরূপ আবৃত করিয়া রাখেন[১৭]।

পরস্পরবিরোধী বিভিন্ন দার্শনিক মতের সমন্বয় ও একীকরণের এই সকল ও অন্যান্য উদাহরণ হইতে বুঝা যায় যে, যদি কেহ গীতাতে এমন একটি সম্পূর্ণ ও যৌক্তিক দর্শনের সন্ধান করেন, যাহা পণ্ডিতসুলভ অভ্রান্ত ও যথাযোগ্য ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি ব্যর্থকাম হইবেন। মহাভারতের বিমিশ্র ও বিশৃঙ্খল দর্শন এবং তাহার কিয়ৎ পরিমাণে অনির্দিষ্ট পরিভাষার সর্ব দোষ ও গুণ গীতোক্ত দার্শনিক মতেও বিদ্যমান। গীতার যে দৃষ্টি স্পষ্টতঃ ঈশ্বরবাদী ও ভক্তিমূলক তাহার সহিত কতকগুলি প্রাচীনতর তত্ত্বজ্ঞানীয় মতের কিছু অসম্বদ্ধভাবে যেরূপ সমন্বয় করা হইয়াছে, তাহা হইতেও স্পষ্ট হয় যে, গীতাকে দর্শনগ্রন্থ মনে করা অপেক্ষা ধর্মগ্রন্থ মনে করাই অধিক সঙ্গত। ইহার ভক্তি ও রহস্যবাদমূলক সমন্বয় বহুস্থলে বাস্তবিকই অপূর্ব, কিন্তু সূক্ষ্ম তর্কের দৃষ্টিতে যে কিভাবে পরস্পরবিরোধী ধারণাগুলিকে যুক্তি-সম্মত নিয়মে মিলান সম্ভবপর, তাহা এইরূপ সমন্বয় হইতে বুঝা যায় না। উদাহরণ স্বরূপ, নির্গুণ ব্রহ্ম যে কি করিয়া সগুণ ঈশ্বরে পরিণত হয়, এই সমস্যার সমাধানে বলা হইল যে, ইহা মায়া অথবা বিশ্বভ্রান্তি বশতঃই ঘটে, অর্থাৎ ইহা একটি দুর্জ্ঞেয় রহস্য। ব্রহ্মের সহিত জগতের সম্বন্ধও একইভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সাংখ্যমতে পরমতত্ত্বের সহিত জীবাত্মার চিরমিলনের উপায় হইতেছে বিশুদ্ধ বুদ্ধি ; কিন্তু গীতার মতে এই উপায় হইতেছে ভগবৎকৃপা এবং এই কৃপা ভগবানের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা ও প্রেমের স্বাভাবিক প্রতিদান।

গীতায় ঔপনিষদিক ব্রহ্মবাদকে স্পষ্টতঃ না হইলেও কিছু পরিবর্তিত আকারে গ্রহণ করা হইয়াছে, কিন্তু জ্ঞানের দ্বারা নিষ্ক্রিয়তা অথবা মোক্ষলাভ সম্বন্ধে উপনিষদের যে সকল মতবাদ তাহা অনুমোদন করা হয় নাই বলিলেই চলে। পরমতসহিষ্ণুতা ও বিভিন্ন মতের সমন্বয়সাধনের চেষ্টাই গীতার বৈশিষ্ট্য; তদনুযায়ী সাংখ্যযোগ বলিয়া কথিত যে জ্ঞানমার্গ সর্বকর্মসন্ন্যাস দ্বারা এবং আত্মা ও অনাত্মার ভেদ সম্বন্ধে ধ্যানের দ্বারা ব্রহ্মের বৌদ্ধিক অনুভূতিলাভ করিতে শিক্ষা দেয়, গীতায় তাহাকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করা হয় নাই। প্রাচীন উপনিষদসমূহ ও সাংখ্যে বর্ণিত বুদ্ধিমার্গকে স্বীকার করা হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহার দুরূহতা এবং অব্যর্থতা সম্বন্ধে অনিশ্চয়তার জন্য ইহাকে সমর্থন করা হয় নাই। নিঃস্বার্থভাবে ভক্তির সহিত সকল সামাজিক ও ধর্মসম্বন্ধীয় কর্তব্য সম্পাদন করাই কর্মযোগ, এবং এই কর্মযোগ জ্ঞানযোগ অপেক্ষা অধিক সহজ। কোন বিশেষ দার্শনিক মতবাদ প্রতিপাদন অপেক্ষা জীবনযাত্রার নিয়ম সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়াই গীতার উদ্দেশ্য, সুতরাং সাংখ্য অর্থাৎ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত দর্শনশাস্ত্রকে পরিহার না করিলেও যোগ অর্থাৎ কর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত দর্শনকেই বিশেষভাবে সমর্থন করা হইয়াছে। প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত কর্মবাদকে গ্রহণ করা হইলেও ইহাতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন করা হইয়াছে। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, যাহারা ফলকামনায় কর্ম করে গীতা তাহাদের মতের নিন্দা করিয়াছে, কিন্তু যাহারা কর্মবাদকে কেবল যুক্তিদ্বারা ভ্রান্তভাবে ব্যাখ্যা করিয়া বলে যে, যেহেতু কর্ম জীবকে সংসারে বদ্ধ করে সেই হেতু সম্পূর্ণভাবে কর্মত্যাগ করিলেই মোক্ষলাভ হয়—তাহাদের মতকেও গ্রহণ করে না।

কিন্তু গীতায় ইহাও বলা হইয়াছে যে, জ্ঞানমার্গের জন্য যেমন, কর্মমার্গের জন্যও তেমনই ধ্যান-সাধনার প্রয়োজন। যাহাতে কর্মের নিয়মানুযায়ী কর্ম করিয়া পরিশেষে উহা অ-কর্মে পরিণত হয় এবং জীবকে বদ্ধ না করিতে পারে, তাহার জন্য নিরাসক্তি ও সমত্বভাবের প্রয়োজন। এই অবস্থা পাইতে হইলে নানারূপ যৌগিক প্রক্রিয়া ব্যতীত প্রথমতঃ নিষ্ঠার সহিত স্বধর্ম পালন করিতে হইবে, দ্বিতীয়তঃ সকল আসক্তি অর্থাৎ কর্তৃত্বাভিমান এবং ফলাশা ত্যাগ করিতে হইবে, এবং সকল কর্ম এবং তাহাদের ফল এমনভাবে ঈশ্বরে সমর্পণ করিতে হইবে যাহাতে প্রত্যেক কর্মটি ভক্তি ও প্রেমের অর্ঘ্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে। কর্তৃত্বাভিমান এবং স্বার্থপরতা সম্পূর্ণভাবে বর্জন করিলে কর্মের যে শক্তি জীবকে জড়জগতে বদ্ধ করে এবং তাহার পুনর্জন্মের কারণ হয় তাহা নষ্ট হইয়া যায়, কারণ এইরূপ মনোভাব লইয়া যে কর্ম করা হয় তাহা অ-কর্ম। যে ব্যক্তি কর্মে স্পৃহা এবং কর্মফল পরিত্যাগ করিয়াছে

সেই প্রকৃতপক্ষে কর্মত্যাগ করিয়াছে। ইহাই যথার্থ সন্ন্যাস এবং যথার্থ যোগ। ইহাদ্বারা নিশ্চিতভাবে ঈশ্বরের প্রসাদ এবং মোক্ষলাভের পথ প্রস্তুত হয়। এই মার্গ অবলম্বন করিলে দায়িত্বহীনভাবে শাস্ত্রবিহিত কর্মত্যাগ করিবার প্রয়োজন হয় না, বরং ইহা মানব-প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ বৃত্তিগুলিকে সক্রিয় করিয়া তুলে। কোন কোন দার্শনিক যে কর্মত্যাগ করিয়া ধ্যানমগ্ন হইবার শিক্ষা দিয়াছেন ইহা তাহা নহে, কারণ ইহাতে বিহিত-কর্ম সম্পাদন করিয়াই নৈষ্কর্ম্যাবস্থা লাভ হয়।

গীতায় উপদিষ্ট সাধনা শুধু নীতির নহে ধর্মেরও। নিয়মশৃঙ্খলাবদ্ধ জগতের অংশ বলিয়া জীবকে কর্ম করিতেই হইবে, কিন্তু নিষ্কামভাবে কর্মসম্পাদন করিলে 'কর্তব্য কর্ম কর্তব্য বলিয়াই করা উচিত' এই অবশ্যপালনীয় নৈতিক নিয়মানুযায়ী আচরণ করা হয়। কিন্তু ঈশ্বরকে সকল কর্ম এবং কর্মফল অর্পণ করিয়া যিনি কর্তব্যকর্ম করেন, তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ীও কাজ করেন। সাধক এইভাবে ইন্দ্রিয়সংযম ও বুদ্ধিসংযম অভ্যাস করিয়া যথার্থই যোগী এবং সন্ন্যাসী হইয়া যান, কিন্তু তাঁহার অবিচলিত প্রেম ও সেবার মনোভাব তাঁহার যে সকল কার্য কেবল-মাত্র নৈতিক দৃষ্টিতে সৎ সেগুলিকেও আধ্যাত্মিক মর্যাদা দান করে। সুতরাং গীতা যে কর্মবাদ শিক্ষা দেয়, তাহাতে নির্দিষ্ট নিয়মানুসারে কতকগুলি বিধি প্রতিপালন করাকেই বুঝায় না, কিন্তু তাহা কর্মসম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞান এবং প্রবল ধর্ম-ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই কর্মবাদ অনুসারে আমাদের জীবনের প্রত্যেক কর্মই যজ্ঞের রূপ ধারণ করে, ইহা অভ্যাস করিলে আমাদের আত্মা আসক্তি এবং মোহ হইতে মুক্ত হয় এবং কর্মের কুফল হইতে রক্ষা পায়। ভগবান স্বয়ং সকল জীবের প্রতি করুণা করিয়া আপনাকে উৎসৃষ্ট করেন এবং জগতের হিতের জন্য মাঝে মাঝে অবতীর্ণ হইয়া কর্মের শ্রেষ্ঠ আদর্শ স্থাপন করেন। বিশ্বের জন্য কৃত তাঁহার এই কর্ম অ-কর্ম, কারণ এই কর্মের প্রেরণা দিব্য আত্মত্যাগে এবং ইহা তাঁহাকে কর্মবন্ধনে আবদ্ধ করে না। ভক্ত তাঁহার সকল কর্ম ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া যেন তাঁহার আপন ক্রিয়াকে ঈশ্বরের বিশ্বক্রিয়ার সহিত এবং তাঁহার নিজের ব্যক্তিত্বকে ঈশ্বরের বিশ্বজীবনের সহিত এক করিয়া দেন। এই নীতিমূলক ও ঈশ্বরবাদমূলক মত প্রাচীন অদৃষ্টবাদমূলক কর্মতত্ত্বের সহিত করুণা ও প্রেমময় সগুণ ঈশ্বরে বিশ্বাসের এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটাইয়াছে। ইহা কর্মের অলঙ্ঘনীয় নিয়ম স্বীকার করিয়াছে বটে, কিন্তু ঈশ্বরের বিশ্বক্রিয়া এবং করুণার ধারণার সাহায্যে ইহার কঠোরতা হ্রাস করিয়াছে, ইহার নৈতিক মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছে এবং ইহাকে পবিত্রতামণ্ডিত করিয়াছে।

গীতার উপদেশ অনুসারে কাজ করিলে মানবের আচরণ কর্মের নিয়মকে লঙ্ঘন করে না অথচ ঈশ্বরের আচরণের ন্যায় কর্ম নিয়মের ঊর্ধ্বে চলিয়া যায়।

এই প্রসঙ্গে গীতার যে বিশিষ্ট উপদেশ ভক্তিযোগ তাহার কথা আসিয়া পড়ে। ভক্তিযোগের অর্থ ভগবানের প্রতি প্রেম ও সেবার ভাব। গীতা এই ভক্তিযোগের ঐক্যসূত্রের সাহায্যেই জ্ঞান ও কর্ম, বৈরাগ্য ও অনুরাগের সমন্বয়সাধনের চেষ্টা করিয়াছে। প্রাচীন দার্শনিক চিন্তার উপদেশ এই ছিল যে, একমাত্র জ্ঞানই মুক্তির পথ, কিন্তু গীতার মতে যদিও এই জ্ঞান অংশতঃ বুদ্ধিবিচার এবং অংশতঃ বিশিষ্ট একপ্রকার কর্মদ্বারা লাভ করা যায়, তথাপি এই জ্ঞান কোন নিগুর্ণ বস্তুবিষয়ক নহে; পরন্তু অশেষ কল্যাণগুণযুক্ত এবং অপারকরুণাময় এক পরমতত্ত্ববিষয়ক। ইহাই আত্মা, ব্রহ্ম, ঈশ্বর, পুরুষ অথবা পুরুষোত্তম; কিন্তু তিনি বস্তুতঃ সর্বপ্রকার সম্ভাব্য অনন্ত সদ্‌গুণের অধিকারী। তাঁহারই সত্তায় জড়প্রকৃতি ও জীব এই দুই শাশ্বত কিন্তু পরিচ্ছিন্ন তত্ত্ব সত্তাবান্ হয় এবং যুগে যুগে তাঁহা হইতেই নিঃসৃত হইয়া অভিব্যক্তিলাভ করে। যে শক্তিদ্বারা তিনি নিজেকে পরিচ্ছিন্ন সত্তায় পরিণত করেন, তাহা তাঁহারই বিশ্বভ্রান্তিকর শক্তি অথবা মায়া, যাহা তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ আবৃত করে। জ্ঞান অথবা তপশ্চর্যা তাঁহাকে পাইবার উপায় হইতে পারে; কিন্তু তাঁহাকে পাইবার সর্বপ্রচেষ্টায় ঐকান্তিক প্রেমানুরাগ ও সেবার ভাব থাকা অত্যাবশ্যক—শুধু উহা দ্বারাই জ্ঞানী অথবা যোগীর নিকটও যাহা লুক্কায়িত তাহা পাওয়া সম্ভবপর।

ইহার পূর্বে উপনিষদ্ সমূহে ইন্দ্রিয়গুলিকে অন্তর্মুখীন করিবার জন্য এবং পরম-বস্তুর অতীন্দ্রিয় সাক্ষাৎ উপলব্ধির জন্য কয়েকটি প্রতীক উপাসনার প্রণালী উপদিষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু ইহার সঙ্গে উপনিষদের ঋষিরা ক্রমশঃ এমন একটি সর্বানুস্যূত ও সর্বাতীগ ব্রহ্মের ধারণায় উপনীত হইয়াছিলেন, যাহাকে পুরুষগুণসম্পন্ন ঈশ্বরের ধারণা বলা যাইতে পারে। শুধু বুদ্ধির সাহায্যে অপরিচ্ছিন্ন অব্যক্ত তত্ত্বের ধ্যানকে গীতায় 'অব্যক্ত-উপাসনা' এই আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। গীতার মতে ইহা উপাসনার এক প্রণালী বটে, কিন্তু ইহা দীর্ঘ এবং কঠোর সাধনসাপেক্ষ বলিয়া অতি অল্পসংখ্যক সাধকের উপযোগী। ইহা অপেক্ষা মূর্ত উপাস্য বস্তুতে মন স্থির করা সহজ। ব্যক্ত-উপাসনার অর্থ ব্রহ্মকেই প্রকট ও মূর্ত পুরুষরূপে ধ্যান করা, সুতরাং এই উপাসনা যে সকলের পক্ষেই উপযুক্ত শুধু তাহাই নহে, অধিকন্তু ইহাতে পরমতত্ত্বের সহিত প্রেম ও সেবার সাক্ষাৎ ব্যক্তিগত সম্বন্ধও স্থাপন করার অবকাশ আছে।

গীতোক্ত ধর্মসাধনায় ভক্তিরূপ এই জীবন্ত ও প্রাণপ্রদ অংশটি থাকায় জ্ঞানমার্গ

অপেক্ষা কর্মমার্গের উপর অধিক গুরুত্ব অর্পিত হইল, এবং এই ভক্তির উল্লেখ না থাকিলে যাহা শুধু একটি দার্শনিক প্রবন্ধের আকার ধারণ করিত, তাহাই ভক্তির সমাবেশদ্বারা একখানি প্রভাবশালী ধর্মবিষয়ক প্রামাণ্য গ্রন্থে পরিণত হইল। সম্ভবতঃ যে যুগে বিচারমূলক বিভিন্ন চিন্তার ফলে লোকে ঈশ্বরের কথা ভুলিয়া যাইতেছিল, সেই যুগেই গীতা প্রেম ও করুণাময় ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ও সেবার উপদেশ দিয়াছিল। ইহাতে পূর্বতন বুদ্ধিবাদী ও ক্রিয়াকাণ্ডবাদীদের পরস্পরবিরোধী মত এবং লোক-প্রচলিত ঈশ্বরোপাসনার সমন্বয় সাধিত হইয়াছে। গীতা উপাসকের সম্মুখে এমন একটি প্রত্যক্ষ ভক্তির পাত্র স্থাপন করিল, যাঁহার সমীপে যে কোন স্থলে এবং যে কোন কালে যাওয়া সম্ভবপর, এবং ধর্মজীবনে যে জ্ঞান, সাধনা এবং সেবা এই তিনের সম্মিলনের একটি বিশেষ মূল্য আছে, তাহাও শিক্ষা দিল। এই শিক্ষা একদিকে আত্যন্তিক বুদ্ধিবাদকে বাধা দিল এবং অপরদিকে সাম্প্রদায়িক অন্ধ ধর্মবিশ্বাসকে জ্ঞান ও সাধনার দৃঢ়ভূমিতে স্থাপিত করিয়া এবং উপাসনার বিভিন্ন প্রণালীগুলিকে একই পরমেশ্বরের উপসনার রূপ বলিয়া উহাদের প্রতি উদার দৃষ্টি পোষণ করা কর্তব্য এইরূপ প্রচার করিয়া সাম্প্রদায়িক ধর্মবিশ্বাসকে যুক্তিসম্মত করিল। গীতায় পরম্পরাগত বিভিন্ন দর্শন ও ধর্মমতের যে সমন্বয়সাধন করা হইয়াছে, তাহার মূল্য যাহাই হউক না কেন, এই কথা নিঃসন্দিগ্ধ যে গীতায় ভক্তির বাণী অতিশয় স্পষ্ট এবং এ গ্রন্থে যে সমন্বয় ও যেটুকু ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়, ভক্তি হইতেই তাহাদের প্রেরণা আসিয়াছে।

গ্রন্থটিতে ভক্তি ও কৃপা (প্রসাদ) সম্বন্ধে সাক্ষাৎভাবে কোন ব্যাখ্যা অথবা উহাদের সমর্থনে কোন দার্শনিক বিচার দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার কারণ হয়ত এই যে, ভক্ত ও ভগবানের সম্বন্ধটি উপলব্ধির বিষয়, বর্ণনা অথবা আলোচনার বিষয় নহে। তথাপি ভক্তিবাদের প্রধান প্রধান কথাগুলি স্পষ্টভাবেই দেওয়া হইয়াছে। শ্রদ্ধা হইতে ভক্তির উৎপত্তি হইতে পারে এবং শ্রদ্ধার সহিত একটি ভক্তিযোগ্য সত্যতত্ত্বের স্বীকৃতিও জড়িত থাকে, কিন্তু আসলে ভক্তির মূল স্বরূপ ইহা হইতে ভিন্ন। পরম তত্ত্ব অথবা আদর্শপ্রাপ্তি দ্বারা অহম্-এর সীমাবদ্ধ জীবন হইতে মুক্তিলাভ হয়; সে কারণ উহার দিকে মানুষের একটি স্বাভাবিক প্রেরণা আছে, এবং মানুষের হৃদয়াবেগে এই প্রেরণা চরিতার্থ করার সম্ভাবনা বা শক্তিও রহিয়াছে। ভক্তি হইতেছে এই শক্তিরই যথাযোগ্য ব্যবহার অথবা সুনিয়ন্ত্রিত ক্রিয়া। যেহেতু ভক্তি স্বরূপতঃ একটি হৃদয়াবেগ অতএব উহার সহিত দ্বৈতভাব এবং ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে একটি ব্যক্তিগত সম্বন্ধও জড়িত থাকে। সুতরাং উক্ত পরমতত্ত্ব বা

আদর্শটিকে মনোজাত একটি অসার নিকৃষ্ট* পদার্থ কিংবা আভাস বলা ঠিক হইবে না। উঁহার এমন একটি পরিপূর্ণ ব্যক্তিসত্তা স্বীকার করিতে হইবে, যাহাতে উঁহার সহিত প্রেমের আদানপ্রদান সম্ভবপর হয়। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্বীকার করা দরকার যে, এই পরমতত্ত্ব এবং উপাসক সম্পূর্ণ ভিন্ন অথবা সম্পূর্ণ অভিন্ন নহে। কারণ এইরূপ না হইলে উহা উপাসকের লক্ষ্য অথবা প্রাপ্তির বিষয় হইতে পারে না। এইভাবে দেখা যায় যে, বুদ্ধি, প্রবৃত্তি ও হৃদয়াবেগের সম্মিলিত ও অবিরাম প্রযত্ন, পরমতত্ত্বের প্রতি ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধা এবং তজ্জনিত নম্রতা ও আত্মসমর্পণ—এই সকলের বিশেষ আবশ্যকতা রহিয়াছে। তথাপি, এই প্রযত্নের প্রতি মুহূর্তেই সাধক তাহার অভীষ্ট আদর্শের স্পর্শলাভে সমর্থ হয়; কারণ পরমতত্ত্বের অক্ষয় ও অনন্ত প্রেম জীবের আত্মনিবেদনসহকৃত পূর্ণপ্রেমের আহ্বানে অবশ্যই সাড়া দেয়। অবশ্য গীতায় উপদিষ্ট ভক্তি হইতেছে উপাসনার সেই আবেগময় চিত্তাবস্থা, যাহা প্রত্যেক খাঁটি ধর্মই স্বীকার করিতে বাধ্য। কিন্তু উপরে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, অন্ধ হৃদয়াবেগ তীব্র হইলেই উহা ভক্তিপদবাচ্য হয় না, অথবা উহা জ্ঞান ও ব্যবহারিক জীবনের কর্তব্য কর্ম হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন একটি অযৌক্তিক আনন্দোন্মাদও নহে। মনের যে সাম্যাবস্থায় বুদ্ধি, কর্মপ্রবৃত্তি এবং হৃদয়াবেগ নিজ নিজ যথাযোগ্য কাজ করিতে সমর্থ হয়, সেই সাম্যাবস্থার কারণ সামগ্রীর মধ্যে গীতায় ভক্তিকে সর্বাধিক ফলপ্রদ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, কারণ ভক্তির উদ্রেক হইলে সর্বকর্ম ঈশ্বরের নিঃস্বার্থ সেবায় উৎসর্গীকৃত হয়। আদর্শমানবের যে বিভিন্ন বর্ণনা গীতায় দেখিতে পাওয়া যায়,—যথা জ্ঞানী, স্থিতপ্রজ্ঞ, যোগারূঢ়, ব্রহ্মভূত, গুণাতীত অথবা ভক্ত, মোটামুটিভাবে বলা যায় যে ইহাদের সকলগুলিই জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির বিভিন্ন দৃষ্টিতে একই ব্যক্তির বর্ণনা।[১৮] গীতায় যে জ্ঞানযুক্ত ও নীতিসম্মত ভক্তি উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা এই বিষয়ে মধ্যযুগীয় ভারতের ভাবপরবশ সাধকদের ভক্তি হইতে ভিন্ন; কারণ ইঁহারা ভক্তি-সাধনায় জ্ঞান এমন কি কর্মকেও বর্জন করিতে চাহিতেন এবং মনে করিতেন যে, গূঢ় শৃঙ্গাররসমূলক ভাবোন্মাদ ভক্তির একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। মানুষের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে ব্যাপকতর দৃষ্টি, ইহাই গীতোক্ত মতের বৈশিষ্ট্য; তাই এই মতে ধর্মের তীব্র-ভাবাবেগকে গম্ভীর বিচার ও নৈতিক কর্ম হইতে পৃথক করা হয় নাই।

ধর্মবিষয়ক প্রাচীন মত ও আচারানুষ্ঠানের যেটুকু মূল্য ছিল, গীতা যে তাহা স্বীকার করিয়াছে ইহাতেও উহার একই উদার দৃষ্টি লক্ষিত হয়, অন্যান্য ধর্মের দেব-

* Abstract

দেবী ও উপাসনা পদ্ধতি সম্বন্ধে গীতা যে মত পোষণ করে, তাহাতে পরমতের প্রতি সহিষ্ণুতা ও বুঝাপড়ার মনোভাবও বিশেষভাবে লক্ষণীয়।[১৯] ভগবান যখন অর্জুনকে সবকিছু পরিত্যাগ করিয়া কেবল তাঁহাকেই অনুসরণ করিতে কহিলেন (১৮. ৬৫-৬), তখন তিনি সম্প্রদায়বিশেষেরই উপাসনাপদ্ধতি প্রচার করিলেন বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু চিন্তা ও উপাসনার স্বাধীনতা সম্পর্কে গীতা যে দার্শনিক সমদৃষ্টি ও উদার মনোভাব পোষণ করে তাহার ফলে উহা সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার অনেক উর্ধ্বে উঠিয়া গিয়াছে এবং ভাগবত সম্প্রদায়ের ব্যাখ্যা ছাড়াও যে গীতার অন্য অনেক ব্যাখ্যা সম্ভবপর, ও শঙ্করের জ্ঞানাদ্বৈতের ন্যায় চরম মতবাদকেও যে উহার উপদেশ বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, ইহাই এই ব্যাপারে গীতার কৃতিত্বের উচ্চ প্রশংসাবাদ। নানাপ্রকার মানুষ ও নানাপ্রকার মনের নিকট পরমেশ্বর অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখা দিতে পারেন এবং আদৌ উপাসনা না করা অপেক্ষা কোন এক প্রকার উপাসনা শ্রেয়স্কর—গীতার এই স্বীকৃতিতেই ধর্মবিষয়ে গীতার এই উদার দৃষ্টির সমর্থন পাওয়া যায়। গীতায় বলা হইয়াছে যে, অন্যান্য দেবতার পূজা দোষযুক্ত হইলেও গৌণভাবে স্বয়ং ভগবানেরই পূজা। ভিন্ন ভিন্ন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য দ্বারা কার্যে প্রণোদিত হইয়া থাকে; মানুষের ইচ্ছা ও চিন্তা যদ্রূপ সেও তদ্রূপ এবং সে যাহা চায় তাহাই পায়। যাহারা নিম্নতর উদ্দেশ্য-সম্পাদনের ইচ্ছা করে এবং ঈশ্বরের নিম্নতর রূপের উপাসনা করে, তাহারা তদনুযায়ী অভীষ্ট বস্তু ও উপাসনার ফল লাভ করে, কারণ মানুষ যেভাবে তাঁহাকে আরাধনা করে ভগবান তাহাকে সেইভাবেই আশ্রয় করেন। নিম্নতর উপাস্য রূপগুলি আসলে উচ্চতর রূপে যাওয়ার সোপান। কারণ ভক্তিসহকারে যে দেবতারই পূজা করা হউক না কেন, তাহারও যথাযোগ্য ফল আছে এবং উহা অন্তঃকরণকে চৈতন্যের উচ্চতর ভূমির জন্য প্রস্তুত করে। অন্য দেবতার ভক্তেরা যে ফল লাভ করে তাহা সান্ত (finite), কিন্তু পরমেশ্বরের ভক্তেরা তাঁহাকেই প্রাপ্ত হয়।

ভিন্ন সম্প্রদায় কর্তৃক উপাসিত দেবতারা প্রকৃতপক্ষে পরমেশ্বরেরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ; এবং মহাভারতোক্ত অবতারবাদ এই সব অন্যান্য দেবতাকে ভগবানেরই রূপ বলিয়া অথবা তাঁহার সহিত অভিন্ন বলিয়া গ্রহণ করিতে সাহায্য করিয়াছে।[২০] গীতা ভক্তদের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ও স্তর স্বীকার করিয়াছে (৭।১৬-১৮; ১২।৯-১২); কারণ, মানুষের শ্রদ্ধা তাহার সত্ত্ব, রজ ও তম গুণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে (৭।২ ইঃ; ১৫। ৬ ইঃ)। বিদ্রূপকারী ও অবিশ্বাসী ছাড়া সর্বজাতি ও অবস্থার লোকের জন্য গীতা ভক্তিমার্গ খুলিয়া দিতে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়াছে; যদিও প্রাচীন

ব্রাহ্মণ্য মতে স্ত্রী ও শূদ্ররা ধর্মকৃত্যের অনধিকারী ; তথাপি গীতায় তাহাদের, এমন কি সর্বাপেক্ষা দুর্বল ও পাপাচারী সাধকদের জন্য, এবং যে সব অজ্ঞ লোক অন্ধভাবে শুধু শাস্ত্রের বিধান মানিয়া চলে ও অন্য কোন উচ্চতত্ত্বের খবর রাখে না, তাহাদের জন্যও ভক্তির দ্বার উন্মুক্ত করা হইয়াছে (১৬।১৯ ইঃ ; ৩।২৫-২৬)। গীতায় তৎকালে প্রচলিত সমাজব্যবস্থাকে স্বীকার করিয়া বর্ণ ও আশ্রম অনুযায়ী শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ-গুলিকেও অনুমোদন করা হইয়াছে (১৮ ৪১-৪৫ ; ১৬. ২৩-২৪) ; কিন্তু গীতা নিষ্কাম ও ভক্তিমূলক কর্মের যে পবিত্র উপদেশ দিয়াছে, তাহাতে জাতি ও অবস্থাকে মুক্তির প্রতিবন্ধক মনে না করিয়া মুক্তির পথ বলিয়াই গণ্য করা হইয়াছে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, গীতায় ভক্তিবাদের একটি সরল ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে এবং মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রেই ইহার প্রয়োগ কিভাবে হইতে পারে তাহা দেখান হইয়াছে। মধ্যযুগের লেখকগণ ভক্তিবাদের ব্যাখ্যান করিতে গিয়া যেরূপ চিত্তবিভ্রমকারী, নীরস বাক্যবিন্যাস ও বিশ্লেষণ শক্তি দেখাইয়া আনন্দ পাইতেন সে সকল কিছুই গীতায় দেখিতে পাওয়া যায় না। মানুষের মনে ভক্তিভাব আনিতে সক্ষম এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন উপায়ের কথা ইহাতে বলা হইয়াছে বটে, তথাপি এজন্য কোন নির্দিষ্ট নিয়ম করা যায় না ইহাও স্বীকার করা হইয়াছে। জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মকাণ্ডানুসরণকারীদের ন্যায় ভক্তের পক্ষে একাকী অথবা নির্জনে ভক্তিসাধনা করার আবশ্যকতা নাই, কিংবা ক্রিয়াবহুল যাগ-যজ্ঞাদিতে রত হইবারও প্রয়োজন নাই ; তিনি অন্য ভক্তদের সহিত মিলিত হইয়া পরস্পরকে ধর্মালোচনা দ্বারা উদ্বুদ্ধ করিতে পারেন (১০।৯)। কিন্তু মানুষের মন এবং অভ্যাসানুযায়ী তাহার ভক্তিভাব গড়িয়া তুলিতে হইবে। ইন্দ্রিয়জ বাসনাত্যাগ, প্রতীকোপাসনা এবং আত্মসংযমদ্বারা মনকে অন্তর্মুখী করা, যোগাভ্যাস, জগতে এবং আত্মায় পরমেশ্বরের উপলব্ধি, ঈশ্বরের গুণাবলী চিন্তা করা, ঈশ্বর সম্বন্ধে নিরন্তর স্মরণ, আলোচনা এবং বাক্যালাপ, ঈশ্বরের উপাসনা এবং বাহ্যপূজা, কর্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া নিঃস্বার্থভাবে সকল কর্ম সম্পাদন করা—আধ্যাত্মিক অনুভূতি এবং উপাসনার এই সকল এবং অন্যান্য উপায়ের উল্লেখ করিয়া গীতায় ইহাই বলা হইতেছে যে, যে পরমেশ্বর আপনাকে নানাভাবে প্রকাশ করেন তাঁহার নিকট উপনীত হইবার অথবা তাঁহার উপাসনা করিবার কোন নির্দিষ্ট নিয়ম বা পদ্ধতি নাই। ভগবান সকলের প্রতিই সমভাবাপন্ন, তিনি তাঁহার অসীম করুণাবশতঃ সকলের মঙ্গলকামনা করেন এবং মনুষ্যেরা যেভাবে তাঁহাকে ভজনা করে, তিনি সেইভাবেই তাহাদের নিকট উপস্থিত হন। সকলেই তাঁহাকে ভজনা করিতে পারে এবং

এইগুলি ইহার কয়েকটি উপায়মাত্র। শেষ পর্যন্ত পরাভক্তির অর্থ ঈশ্বরে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ—কিন্তু এই আত্মসমর্পণ সাধিত হয় নিষ্ক্রিয়তার ভিতর দিয়া নয়, নিঃস্বার্থ কর্মের ভিতর দিয়া ; অজ্ঞানে নয়, পরন্তু পূর্ণজ্ঞানে। ঈশ্বরে যিনি আত্মসমর্পণ করেন, তিনি নিজের জীবনকে বিশ্বে প্রকাশিত ভাগবত জীবনের সহিত মিলিত করিয়া দেন এবং তাঁহার সর্বচিন্তা, কর্ম এবং হৃদয়াবেগ ভগবানে সমর্পণ করেন।

এই মতবাদের লক্ষ্য হইতেছে ভগবান এবং ভক্তের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্বন্ধ স্থাপন করা। সে কারণ ইহা যে কেবলমাত্র ভগবানে ব্যক্তিত্ব এবং অসংখ্য সদ্‌গুণ আরোপ করিয়াছে তাহা নয়, ইহা একদিকে যেমন ভগবানের করুণার উপর জোর দিয়াছে তেমনই অপরদিকে মানুষের পক্ষেও যে প্রেমপূর্ণ ভক্তির প্রয়োজন তাহাও বলিয়াছে। ভগবান্ যে স্বয়ং জন্মরহিত হইয়াও জগতের প্রয়োজনকালে তাঁহার মায়াশক্তিদ্বারা তাঁহার স্বরূপ আবৃত করিয়া জগতে অবতীর্ণ হন—ইহাই জগতের প্রতি তাঁহার করুণার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। গীতায় যে অবতারবাদ ভগবানের যুগে যুগে আবির্ভাবের কথা বলে, তাহা সাধারণতঃ মহাভারতেও স্বীকৃত হইয়াছে, কিন্তু এই অবতারবাদ ব্যূহবাদ হইতে পৃথক। গীতায় ব্যূহবাদের কোন উল্লেখ দেখা যায় না, কিন্তু সম্ভবতঃ এই অবতারবাদ কৃষ্ণবাসুদেবকে ভগবানের সহিত অভিন্ন মনে করারই অবশ্যম্ভাবী ফল। তাঁহাকে প্রাচীন পৌরাণিক কাহিনী ও উপকথার সহিত সংযুক্ত করিবার জন্যও এই বহু অবতারবাদের প্রয়োজন হইয়াছিল। কৃষ্ণবাসুদেবকে কেবলমাত্র মহাভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা বিষ্ণু এবং তাঁহার বিভিন্ন রূপ এবং অবতারের সহিত অভিন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন করা হয় নাই, অধিকন্তু অন্যান্য সম্প্রদায়ের শিব, ব্রহ্মা প্রভৃতি অন্যান্য যেসব দেবতাকে একই পরমদেবতার রূপ বলিয়া ধরা হইয়াছে তাঁহাদের সহিতও অভিন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। এইভাবে এই মতবাদ পরমেশ্বরের একত্ব প্রতিপাদন করিতে এবং উদার পরমতসহিষ্ণুতা দ্বারা অন্ধ সাম্প্রদায়িক মনোভাব দমন করিতে চেষ্টা করিয়াছে। ঈশ্বর যে জগতের নৈতিক শৃঙ্খলার ধারক এবং জগতের ত্রুটী সংশোধন করিবার জন্য তাঁহাকে যে বারবার অবতীর্ণ হইতে হয়, ইহাই অবতারবাদের মূলভিত্তি। আর একদিক হইতে দেখিলে বলিতে হয় যে, এই মতবাদে বিশ্বাস করার অর্থই হইতেছে মানবকে ঈশ্বরের পর্যায়ে উন্নীত করা অথবা কয়েকটি শ্রেষ্ঠ জীব যে ঐশ-গুণাবলীর মূর্তিমান বিগ্রহ এইরূপ বিশ্বাস করা। সুতরাং অপূর্ণ মরণশীল জীব যে সকল প্রত্যক্ষগ্রাহ্য এবং ফলপ্রদ ঐশ-আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আধ্যাত্মিক জগতে অগ্রসর হইতে পারে গীতা সেই সকল আদর্শ আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছে।

দ্রষ্টব্য

১। অন্য কিছু বলা না থাকিলে আমাদের উদ্ধৃত অংশগুলিতে মূল গ্রন্থের বোম্বাই সংস্করণকে লক্ষ্য করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এক অর্থে মহাভারত সম্বন্ধে মহাকাব্যের দর্শনের কথা বলা সঙ্গত হইবে না। রামায়ণের ন্যায় আদি মহাভারতেরও সম্ভবতঃ দর্শনের সহিত কোনও সম্পর্ক ছিল না, পরবর্তী মহাভারতেই দার্শনিক তত্ত্বের মিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আদি মহাকাব্য হইতে পরবর্তী মহাকাব্যকে পৃথক করা কঠিন বলিয়া আমরা বর্তমান কালের পরিবর্ধিত গ্রন্থকেই গ্রহণ করিব, তবে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, এই গ্রন্থের পরিবর্ধনের একটি বিশেষ স্তরের দর্শনই ইহাতে পাওয়া যাইবে।

২। হিরিয়ান্না, **Outlines of Indian Philosophy,** লণ্ডন, ১৯৩২ পৃঃ ৯৪-৯৫

৩। **Hopkins (Great Epic of India, New Haven,** ১৯২০, পৃঃ ১৩৮) হয়ত ঠিকই বলিয়াছেন যে, মহাভারতে যে মায়ার উল্লেখ আছে, তাহা কেবলমাত্র দেবতাদের (বিশেষতঃ মায়াবী দেবতাদের মধ্যে যিনি প্রধান সেই কৃষ্ণের) শত্রু দমন করিবার জন্য ইন্দ্রজালকেই বুঝায়। গীতায় (৭।১৪) বলা হইয়াছে যে, মায়া ঈশ্বরের বিভ্রমকারী শক্তি এবং ইহা গুণত্রয়ের কার্য ; কিন্তু গুণত্রয় হইতে উৎপন্ন বিভ্রমকারী শক্তি সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন বিভ্রমকারী শক্তির সমতুল্য ; ইহা যদি আবার আত্ম-মায়া হয়, তাহা হইলে ইহা সেই মানসিক বিভ্রমকে বুঝাইবে, যাহার ফলে যে দেবতার জন্ম নাই তাঁহাকেও প্রকৃতির মাধ্যমে জন্মগ্রহণকারী বলিয়া মনে হয়।

৪। যথা সাংখ্য (বৈধ এবং দুর্বল যুক্তিসমূহের মূল্য নিরূপণ) সৌক্ষ্ম্য (জ্ঞানের বিষয় সমূহকে পরস্পর হইতে পৃথক করিবার সূক্ষ্ম বুদ্ধি), ক্রম (যুক্তির বিভিন্ন অবয়বগুলিকে যথাযথভাবে একটির পর অপর একটির সমাবেশকরণ), নির্ণয় (প্রভেদসমূহ স্বীকার করিয়া সিদ্ধান্তস্থাপন) এবং প্রয়োজন (একটি বিশেষ যুক্তিধারাকে অনুসরণ করিবার অভিপ্রায়) **Hopkins**-এর পূর্বোক্ত গ্রন্থ (পৃঃ ৯৫-৯৬) দ্রষ্টব্য।

৫। এই শব্দটি কেবলমাত্র বেদ, ধর্মশাস্ত্র এবং আচারকেই বুঝায় না, পরন্তু ভগবদ্‌গীতা এবং ভাগবতের ন্যায় সাম্প্রদায়িক শাস্ত্রগুলিকেও বুঝায়।

৬। ইহার অব্যবহিত পূর্ববর্তী অংশে (১২।৩৪৯।১) পাশুপতকে বাদ দিয়া কেবলমাত্র চারিটি সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে।

৭। মহাভারতে বর্ণিত সাংখ্য-যোগ মতের শ্রম-সাধ্য আলোচনার জন্য **Hopkins**-এর পূর্বোক্ত গ্রন্থের পৃঃ ৯৭-১১৪, ১১৬-১৩৮, ১৪২-১৮২ দ্রষ্টব্য।

৮। নীলকণ্ঠের টীকা (১।৭০।৪৬) হইতে বুঝা যায় যে, এই উল্লেখ অনিশ্চয়তাপূর্ণ। রামায়ণে (২।১০০। ৩৮-৩৯) এ সম্বন্ধে নিন্দাপূর্ণ উল্লেখ আছে।

৯। ১২।১৯।২৩-২৪, ১৮০।৪৭-৪৯ ; ১৩।৩৭।১২-১৫ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

১০। উদাহরণস্বরূপ—১৩।২৩।৬৭ রামায়ণে (২।১০৮) রামকে জাবালি যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহাকে টীকাকারগণ নাস্তিক মত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহা নিঃসন্দেহে প্রচলিত ধর্ম-মতের বিরোধী ছিল। **Jacobi (*Das Ramayana*** পৃঃ ৮৮ প্রঃ) এই ব্যাপারটিকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে করেন কিন্তু **Hillebrandt (*Festschrift Kuhn,*** পৃঃ ২৩) এই মত গ্রহণ করেন না।

১১। *J Mckenzie* তাঁহার *Hindu Ethics* (অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯২০, পৃঃ ১১২) গ্রন্থে এই সুবিধাজনক ইংরাজী অনুবাদগুলি দিয়াছেন।

১২। *Religions of India*, বোষ্টন, ১৮৯৫, পৃঃ ৪১৩

১৩। সাধারণভাবে উপনিষদ্ গুলিতে এবং বিশেষ করিয়া কঠ, মুণ্ডক, শ্বেতাশ্বতর প্রভৃতি পরবর্তীকালের উপনিষদ্ গুলিতে আদিম এবং অন্য ধর্মসম্প্রদায় হইতে প্রাপ্ত একেশ্বরবাদমূলক চিন্তাসমূহ সম্বন্ধে আলোচনার জন্য *Indian Historical Quarterly*, VI, ১৯৩০, পৃঃ ৪৯৩-৫১২ দ্রষ্টব্য।

১৪। অথর্ববেদের বিষয়বস্তু এবং ঋগ্বেদের কোন কোন অংশ হইতে ইহা বুঝা যায়।

১৫। Hopkins—*Religions of India*, পৃঃ ৩৯৯। আধুনিক কালে Barnett তাঁহার পূর্বোদ্ধৃত গীতার ইংরাজী অনুবাদে এই মতের পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন।

১৬। ২।৪২-৪৬ ; ৩।৯-১৬ ; ৪।২৩-৩৩ ; ৯।২০-২১ ; ১৬ (২২-২৩) ; ১৭ (১১-১৩) ; ১৮ (৩-৮)

১৭। এই সম্পর্কে গীতা মায়াসম্বন্ধীয় নারায়ণীয় ধারণার সহিত আংশিকভাবে এক মত।

১৮। ২।৫৬-৭২ ; ৬।৪-৩২ ; ১০।৯-১০ ; ১২।১৩-২০ ; ১৩।৭-১১ ; ১৪।২১-৩৫ ; ১৬।১-৩ ; ১৮।৫০-৬০

১৯। ৪।১১ , ৭।২১-২৩ ; ৯।২৩-২৫

২০। ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে যে, এই মহাকাব্যে যে সকল অবতারের কথা বলা হইয়াছে তাঁহারা সকলেই বিশেষভাবে প্রায় কেবলমাত্র বিষ্ণুর কিংবা কৃষ্ণের অবতার, অন্য দেবতাদের অবতার সম্বন্ধে প্রায় কিছুই বলা হয় নাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মনু ও কৌটিল্য

১। সাধারণ ভূমিকা

মনুষ্যের আয়াসসাধ্য চারিটি প্রধান লক্ষ্য হইল—ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। শাস্ত্রের সাহায্যে ইহাদের প্রতিটির সাধন করিতে হয়। শাস্ত্রে ইহাদের স্বরূপ বর্ণনা এবং লাভ করিবার উপায়ের নির্দেশ দেওয়া আছে। প্রাচীন ভারতবর্ষের ধর্মশাস্ত্র বিষয়ে মনুস্মৃতি প্রধান গ্রন্থ এবং রাষ্ট্রনীতি বিষয়ক গ্রন্থাদির মধ্যে কৌটিল্যের অর্থ-শাস্ত্র সমজাতীয়। প্রথমখানি (মনুস্মৃতি) ২৬৮৫টি ছন্দোবদ্ধ শ্লোকে গঠিত, কোন কোন পাঠের শ্লোক-সংখ্যা আরও কিছু অধিক হইতে পারে। কয়েকজন ঋষি মনুকে (স্বায়ম্ভুব) সর্ববর্ণের ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিতে অনুরোধ করিলে, তিনি তাঁহাদিগকে যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, সেইগুলিই এই গ্রন্থে তাঁহার নির্দেশানুযায়ী শিষ্য ভৃগু কর্তৃক ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ভারতীয় ঐতিহ্যে মনুর নাম অতি প্রাচীন, এবং ভৃগুর নামও সমান পৌরাণিক। বর্তমান গ্রন্থ সম্ভবতঃ মনুর নামে প্রচলিত পুরাতন রচনা হইতে সঙ্কলিত হইয়াছিল এবং পরবর্তীকালে নীতিধর্মের উপযোগী করিয়া অবশ্যই অন্ততঃ একবার সংশোধিত হইয়াছে। এই পরিশুদ্ধি সম্ভবতঃ খৃষ্টপূর্ব ও পর দ্বিতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি কোন সময়ে ঘটিয়াছিল।[১] মনুস্মৃতির আড়াই শতের অধিক শ্লোক মহাভারতের বিভিন্ন অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যায় এবং উভয় গ্রন্থেই একই ধরণের কতকগুলি উপাখ্যান আছে। সুতরাং বহুদিন যাবৎ এই ধরণের ধারণা প্রচলিত ছিল যে, এই স্মৃতিতে উক্ত শ্লোকগুলি মহাভারত হইতে গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু পণ্ডিত কানে (Kane) বর্তমানে বিরোধী মতবাদ অধিকতর জোরের সহিত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, এই স্মৃতির মূলগ্রন্থ সম্ভবতঃ প্রচলিত মহাকাব্যের পূর্বের। অন্যদিকে গোতম, বোধায়ন ও আপস্তম্বের প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রগুলি, মনুস্মৃতির কয়েক শতাব্দী পূর্বে স্মৃতি হিসাবে বিশেষ প্রচলিত ছিল। সমাজতত্ত্বের মৌলিক বিষয়ে মনু ও কৌটিল্যের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে কিন্তু নিয়োগ ও বিবাহবিচ্ছেদ প্রভৃতির বিস্তৃত আলোচনায় ভিন্ন মত লক্ষিত হয়। ইহা হইতে স্পষ্ট অনুমান করা যায় যে, মনু স্মৃতির অধিকতর সংরক্ষণশীল শুদ্ধ মতবাদ অর্থশাস্ত্র[২]

অপেক্ষা কিঞ্চিৎ পরবর্তী যুগের। প্রচলিত স্মৃতি কৌটিল্য বর্ণিত 'মানব সম্প্রদায়'-এর প্রতিনিধি নহে।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র গদ্যে লিখিত, ইহা পঞ্চদশখণ্ডে বিভক্ত ও ছয় হাজার শ্লোক বিশিষ্ট এবং প্রতিটি শ্লোক দৈর্ঘ্যে বত্রিশটি অক্ষরযুক্ত। এই গ্রন্থখানি বহুকাল অবলুপ্ত ছিল এবং ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ইহার পুনরুদ্ধার হইয়াছে। ইহার রচনার প্রকৃত তারিখ ও প্রামাণ্য লইয়া নানা প্রকার তর্ক-বিতর্ক চলিয়াছিল। কিন্তু উক্ত গ্রন্থখানি ৩০০ শত বৎসর খৃষ্টপূর্বে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের প্রধান মন্ত্রী বিরচিত, ইহা ভিন্ন অন্য কোন সিদ্ধান্তের হেতু পাওয়া যায় নাই। গ্রন্থখানি প্রণয়নকালে গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, উক্ত বিষয়সংক্রান্ত পূর্ব-প্রচলিত সকল গ্রন্থই তিনি বিচার করিয়াছেন, এবং সমসাময়িক বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রয়োগ-কৌশলও তিনি আলোচনা করিয়াছেন (প্রয়োগান উপলভ্য চ, ২. ১০)। এই গ্রন্থের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যসকল অন্যান্য সমজাতীয় গ্রন্থ হইতে ইহাকে পৃথক্ করিয়াছে। এই গ্রন্থে হেলেনীয় রাষ্ট্রগুলির এবং বিশেষভাবে সিরিয়া ও মিশরের[৩] পরিচালনাপদ্ধতি বিষয়ে কৌটিল্যের যে বিশেষ জ্ঞান ছিল তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। কৌটিল্যের মতে 'অর্থ' হইল 'মানুষের অবস্থা বা পৃথিবীর বসতি অংশ, এবং যে শাস্ত্র এই সকল বসতি-বহুল দেশকে অধিকার ও রক্ষা করিবার বিষয়ে সাহায্য করে তাহাই অর্থশাস্ত্র'।[৪]

কৌটিল্যের লিখিবার পূর্ব হইতেই অর্থশাস্ত্রের অনুশাসন সমাজে প্রচলিত ছিল। তিনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে কম পক্ষে পাঁচটি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা ছাড়াও সম্ভবতঃ নিজের গুরুর গৌরববৃদ্ধির জন্য তিনি নামোল্লেখ না করিয়া 'বহু আচার্য' এই শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। অধিকন্তু তিনি দ্বাদশজন গ্রন্থকারের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে অর্ধেকের নাম একবার এবং অর্ধেকের নাম একাধিকবার।[৫] কিন্তু এই সকল সম্প্রদায় ও বিভিন্ন লেখকদের গ্রন্থসকল জৈমিনি, পাণিনি, বাদরায়ণ প্রভৃতি কর্তৃক উল্লেখিত অপরাপর প্রাচীন গ্রন্থকারদের গ্রন্থের ন্যায়ই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। শিক্ষাকে যখন পবিত্র এবং জ্ঞানকে যখন একমাত্র বিশ্বাসী ও উপযুক্ত শিষ্যদের নিকট প্রকাশযোগ্য বলিয়া মনে করা হইত, এবং গ্রন্থের সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য যখন কোন লিখিবার রীতি প্রচলিত ছিল না, তখন প্রচলিত যুগের অনুপযোগী গ্রন্থের অস্তিত্ব বজায় থাকিবার সম্ভাবনাও খুব অল্প ছিল। ইহা লক্ষ্য করা যায় যে, কৌটিল্য তাঁহার গ্রন্থে ধর্মসূত্রের লেখকদের নামোল্লেখ করেন নাই, যদিও তাঁহাদের কয়েকজন অতি অবশ্যই কৌটিল্যের পূর্বে বর্তমান ছিলেন।

ধর্মশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্র উভয় গ্রন্থই সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের আলোচনা করে। প্রথমটি ধর্ম ও নীতির দৃষ্টিকোণ হইতে সমাজ-জীবনের আলোচনা করে এবং দ্বিতীয়টি প্রয়োজনীয়তা, কার্যকারিতা ও কৌশলের দৃষ্টিকোণ হইতে সমাজ-জীবনের বিচার করে। মনু প্রভৃতি লিখিত ধর্মশাস্ত্রে উক্ত ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য কর্মের বিস্তৃত আলোচনার মধ্যে বস্তুতঃ অর্থশাস্ত্রের সকল দিকের আলোচনা হইয়া যায়। অন্য দিকে কৌটিল্যের ন্যায় অর্থশাস্ত্রের একজন লেখকের পক্ষে রাষ্ট্র যে সমাজ-ব্যবস্থাকে রক্ষা করিবে তাহার বিস্তারিত বর্ণনা করা প্রয়োজন, এবং তাহা করিতে গেলে তাঁহাকে এমন সব কথা আলোচনা করিতে হইবে যাহা বস্তুতঃ সহকারী শাস্ত্রের বিষয়। যাহা হউক ধর্মশাস্ত্রের ক্ষেত্র অধিকতর বিস্তৃত, ইহা সূক্ষ্মতর ও জীবনের অধিকতর মৌলিক পুরুষার্থগুলির উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং মানুষের জীবনে ইহার আবেদন ব্যাপক ও গভীরতর। মনুস্মৃতির প্রারম্ভে ও পরিশেষে সৃষ্টিতত্ত্ব ও পরলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে যে আলোচনা আছে, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে সেইরূপ কিছু পাওয়া যায় না। মনুর মতে কোন সামাজিক নীতি ভঙ্গ করা কেবলমাত্র আদালতে বিচারসাপেক্ষ অপরাধ নহে, ইহা নৈতিক পাপ বা অন্যায়, যাহার ক্ষালনের জন্য প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন। পরবর্তী যুগের সাহিত্যে অর্থশাস্ত্রে ব্যাখ্যাত বৈষয়িক মূল্যের উপর প্রতিষ্ঠিত যুক্তিকে, বিশেষভাবে কৌটিল্যের মতবাদকে নিন্দা করা হইয়াছিল, ফলে ব্যাপক রাজনৈতিক সাহিত্যসৃষ্টির পথ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল।[৬]

ভৌগোলিক দৃষ্টিভঙ্গী : নূতন অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রাচীন ঐতিহ্যের ভিত্তিতে মনু উত্তর-ভারত কে (আর্যাবর্ত) সামাজিক সংস্কৃতির উৎকর্ষানুযায়ী বিভিন্ন স্তরে অবস্থিত কতকগুলি অঞ্চলে বিভক্ত করিয়াছেন। দিব্য স্রোতস্বিনী সরস্বতী ও দৃষদ্বতীর মধ্যবর্তী ভূখণ্ড ব্রহ্মাবর্তের প্রাচীন আচার-ব্যবহার সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক। অন্য দিকে কৌটিল্যের ভৌগোলিক দৃষ্টিভঙ্গী তাঁহার প্রবল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যদ্বারা প্রভাবিত ছিল। তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন এবং ইহাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার সৃষ্ট সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির দিকে তাঁহার লক্ষ্য থাকায় এবং সম্ভবতঃ পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্য সম্পর্কে চিরপ্রচলিতপরম্পরার উপর ভিত্তি করিয়া তিনি হিমালয় পর্বত হইতে দক্ষিণ সমুদ্র পর্যন্ত সহস্র যোজন বিস্তৃত দেশকে, অর্থাৎ যাহা ১৯৪৭[৭] সালে ভারত বিভাগের পূর্বে অখণ্ড ভারতবর্ষের ভৌগোলিক আয়তন ছিল, তাহাকে চক্রবর্তী-ক্ষেত্র বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

২। সমাজ-বিজ্ঞান

বর্ণ : মনু ও কৌটিল্যবর্ণিত সমাজ চারিবর্ণে বিভক্ত ছিল এবং প্রতি বর্ণের কর্তব্য ও অধিকার সুনির্দিষ্ট ছিল। এই বর্ণবিভাগ স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী সামাজিক শ্রমবিভাগ হইতে উদ্ভূত। সুতরাং "প্রাচীন বর্ণ-বিদ্বেষ যুক্তিশুদ্ধ হইয়া এক দৈব-সৃষ্ট সমাজ-ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হইয়াছিল"[৮] এইরূপ উক্তি সম্পূর্ণ সত্য নহে। এই বিভাগের মূল লক্ষ্য ছিল, সমাজের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের জন্য সমান মর্যাদা বিশিষ্ট বিভিন্ন শ্রেণীর সহযোগিতা। কিন্তু কার্যতঃ উচ্চবর্ণ ও নীচবর্ণের ধারণা গড়িয়া উঠিল এবং যখন নূতন নূতন দেশের সহিত সেই সকল দেশের অধিবাসিগণ সমাজের অন্তর্ভূক্ত হইতে লাগিল, তখন অবৈধ সহবাসের ফলে মিশ্রজাতি বা বর্ণ-সংকরের উৎপত্তি সম্বন্ধে মতবাদ গড়িয়া উঠিল।[৯] মনু জন্মের উপর ভিত্তি করিয়া ব্রাহ্মণদের অধিকার সম্বন্ধে অনেক অত্যুক্তি করিয়াছেন,[১০] কিন্তু কৌটিল্য তাহা করেন নাই। কিন্তু ব্রাহ্মণ সৎ ও সুপণ্ডিত না হইলে বিশেষ শ্রদ্ধা পাওয়ার যোগ্য নহেন এই অধিকতর যুক্তিসম্মত মতবাদ প্রাচীন ধর্মসূত্রগুলিতে বিশেষ জোরের সহিত স্বীকৃত হইয়াছিল, এবং মনুতেও[১১] অস্বীকৃত হয় নাই এবং বর্ণের ধারণা যে শ্রম-বিভাগের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা সর্বদাই জোরের সহিত বলা হইয়াছে। প্লেটোর মতে সমাজকে শাসক, সহকারী ও কারিগর এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিলে তবেই সমগ্র সমাজের সর্বাধিক সম্ভাব্য সুখলাভ হইতে পারে। এই তিন শ্রেণীকে যথাক্রমে হিন্দু সমাজের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। হিয়ার্ড (Heard), ষ্টিনার (Steiner) ও ওয়াটারম্যান (Waterman) প্রভৃতি আধুনিক চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ পাশ্চাত্য সভ্যতার অধঃপতনের কারণ হিসাবে মানুষের জীবনে সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক লক্ষ্য করিবার সুনির্দিষ্ট তিনটি শ্রেণীর স্বীকৃতির অভাব বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

স্বাভাবিক অবস্থায় প্রতি শ্রেণী স্ব স্ব বিশেষ কর্তব্য বা স্বধর্মে নিযুক্ত থাকিবে—যেমন ব্রাহ্মণ বিদ্যাচর্চা বুদ্ধিগত ও অধ্যাত্ম সাধনায় নিযুক্ত থাকিবে; ক্ষত্রিয় যুদ্ধ করিবে এবং আভ্যন্তরিক ও বহিঃশত্রু হইতে সমাজকে রক্ষা করিবে, বৈশ্য-সম্প্রদায় কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যে নিযুক্ত থাকিবে, এবং শূদ্র সর্বসাধারণের সেবা করিবে। কিন্তু আপৎকালে বা বিশেষ বিপদের সময়ে উক্ত অনুশাসনের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য আশা করা যায় না।[১৩] "প্রত্যেকেই তাহার প্রকৃতি বা উপযুক্ততা অনুসারে সমাজের কোন না কোন কর্তব্য অবশ্যই পালন করিবে। উক্ত কর্ম বা তদ্‌জাতীয় কর্মই যথার্থ নীতি।"[১৪]

আশ্রমঃ আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা যাহা সমাজ-জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিত, তাহা হইতেছে জীবনের বিভিন্ন ভাগ বা আশ্রম সম্বন্ধীয়। এইরূপ চারিটি আশ্রম বিহিত হইয়াছে, যেমন—ব্রহ্মচর্য (ছাত্র), গার্হস্থ্য (সংসারী), বাণপ্রস্থ (বনবাসী) ও সন্ন্যাস (সংসার ত্যাগ)। কার্যক্ষেত্রে আশ্রম সম্বন্ধীয় বিধি প্রায়ই লঙ্ঘিত হইত এবং কোন সময়েই সমাজের অধিকাংশ জনসাধারণ শেষের দুই আশ্রমের (বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস) অনুমোদিত বিধি সকল পালন করে নাই, যদিও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সর্বদাই উক্ত নীতি অনুসরণ করিতে এবং নিরাসক্তভাবে হিতকর্ম করিয়া সমাজের শ্রদ্ধা অর্জন করিতে প্রস্তুত ছিলেন।

হিন্দু সমাজ ইহলোক সম্পর্কে উদাসীন এবং পারলৌকিক মনোভাবাপন্ন, ইহা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই আপনার মোক্ষের বিষয় চিন্তা করিবার পূর্বে জন্মগত ঋণত্রয় পরিশোধ করিতে হইবে। যেমন প্রথমতঃ নিজেকে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া আচার্য-ঋণ বা জাতির আচার্যদিগের প্রতি ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে, দ্বিতীয়তঃ সন্তান উৎপাদন করিয়া পিতৃ-ঋণ বা পিতৃ-পিতামহদের ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে, তৃতীয়তঃ দেব-ঋণ অর্থাৎ সাধ্যমত যাগ-যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া দেবতাদের ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে। সংসার ত্যাগ করিবার পূর্বে প্রত্যেককে উক্ত ঋণত্রয় পরিশোধ করিতে হইবে। জীবনের সকল ভাল জিনিস ভোগ করিয়া যখন কাহারও জীবনে চরম পরিতৃপ্তি আসিয়াছে,[১৫] অর্থাৎ জীবনকে সে পরিপূর্ণ ভোগ করিয়াছে, কেবল তখনই সে সন্ন্যাসীজীবন গ্রহণ করিতে পারে। অন্য দিক দিয়া পরিবারের[১৬] ভরণপোষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা না করিয়া কেহ যদি সন্ন্যাস গ্রহণ করে, কৌটিল্য তাহার শাস্তির নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন। গৃহস্থ সমাজের মধ্যমণি এবং অন্যান্য সকলের আশ্রয়স্থল; আশ্রমের প্রাণকেন্দ্র হিসাবে গৃহস্থাশ্রম অন্যান্য আশ্রম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যাহারা নিজেরা রন্ধন করে না—যেমন সন্ন্যাসী, ছাত্র ও অপর সকলে,[১৭] গৃহস্থ তাহাদের আহারের সংস্থান করিবেন। অতিথি-সৎকার গৃহস্থদের বিভিন্ন কর্তব্যের মধ্যে প্রধান কর্তব্য হিসাবে গণ্য করিতে হয়। গৃহস্থ স্বয়ং ও তাঁহার স্ত্রী সকলের, এমন কি দাস-দাসীদের পরিতৃপ্তির পর আহারাদি করিবেন। এমন কি আতিথ্যের তথাকথিত একটি ধর্মসম্মত ভিত্তিও এই বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, আহার প্রস্তুত করিবার সময়ে প্রস্তর, হামানদিস্তা ও অন্যান্য যন্ত্র প্রয়োগের জন্য যে পাপ সঞ্চিত হয়, প্রতিদিন পঞ্চ-মহাযজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া ইহার স্খালন করিতে হয়, এই পঞ্চ-মহাযজ্ঞের মধ্যে অতিথি-সৎকার প্রধান।[১৮]

বিবাহ-নারী : মনু ও কৌটিল্য উভয়েই প্রচলিত অষ্ট প্রকার বিবাহপ্রথার বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে কোন কোন প্রথা বিবাহ নামের যোগ্য নহে। কিন্তু তাঁহাদের উক্তি এবং অন্যান্য প্রমাণ হইতে নিঃসন্দেহে বলা যায় তাঁহারা একই বর্ণের যুবক-যুবতীর মধ্যে শাস্ত্রসম্মত আনুষ্ঠানিক মিলনকেই যথার্থ বিবাহ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং একদার গ্রহণের নির্দেশ দিয়াছেন। কিন্তু জাতির প্রবলতম প্রবৃত্তি যেক্ষেত্রে সক্রিয় থাকে, সেখানে বিধি বা অনুশাসনের প্রভাব সীমাবদ্ধ হইতে বাধ্য। সুতরাং কেবলমাত্র উপরে বর্ণিত বর্ণসংকরের অস্তিত্ব অনুমোদন করিয়া নয়, পরন্তু বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে বিবাহ[১৯] ও উক্ত মিলন-উদ্ভূত সন্তানাদির উত্তরাধিকার সম্পর্কে নির্দেশ দিয়াও জীবনে যে সকল ঘটনা অবশ্যম্ভাবী, তাহাদিগকে স্বীকার করিয়া লইবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। কৌটিল্যের মতে নিয়োগ-প্রথা চলিতে পারে, কিন্তু মনু ইহাকে বৈধ আচার হিসাবে স্বীকার করিয়াও পরে ইহাকে দূষণীয় বলিয়াও বর্ণনা করিয়াছেন। কোন কোন ভাষ্যকার ইহাকে কলিযুগে প্রযোজ্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, কৌটিল্য যখন লিখিয়াছিলেন এবং মনুস্মৃতি যখন বর্তমান আকারে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, ইহার অন্তর্বর্তী সময়ে নীতি সম্বন্ধে অধিকতর কঠোর মতবাদ গড়িয়া উঠিয়াছিল।[২০]

মনু নারীদের সংসার ও সমাজে অতি উচ্চস্থান দিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "যেখানে স্ত্রীলোক সম্মানিত হইয়া থাকেন, সেখানে দেবতারা সন্তুষ্ট থাকেন; আর যেখানে স্ত্রীলোকের সম্মান নাই, সেইখানে কোন পুণ্যকর্মই ফলপ্রসূ হয় না।" "সুখ সেই সংসারে নিশ্চিত স্থায়ী হয়, যে সংসারে স্বামী তাহার স্ত্রীর প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন এবং স্ত্রী স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধাশীলা।"[২১] নারীদের উপযুক্ত স্বামী লাভের ব্যাপারে মনুর এত আগ্রহ ছিল যে, উপযুক্ত পাত্রের অভাবে অনুপযুক্ত গুণহীন পাত্রের হস্তে কন্যা সম্প্রদান অপেক্ষা কন্যার পক্ষে সারাজীবন পিতৃগৃহে অনূঢ়া থাকাও তিনি শ্রেয় মনে করিতেন।[২২] নারীদের সকল ব্যাপারে পুরুষ আত্মীয়দের সহিত পরামর্শ করিতে নিষেধ থাকা সত্ত্বেও, এবং কৃচ্ছ্রসাধনে-রত পুরুষদের পক্ষে স্ত্রীলোকের সংস্পর্শ বিপদের কথা[২৩] উল্লেখ থাকিলেও, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে স্ত্রীলোকদিগের প্রতি যে সুস্থ ও সবল দৃষ্টিভঙ্গী মনুস্মৃতির প্রায় সর্বত্রই লক্ষিত হয় তাহার কোন হানি হয় নাই।

দাস-প্রথা : গ্রীক লেখকেরা স্পষ্ট উক্তি করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে মৌর্যযুগে দাস-প্রথা অজ্ঞাত ছিল। গ্রীকদের এই উক্তি বুঝিবার সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপায় হিসাবে এইরূপ অনুমান করা যায় যে, ভারতবর্ষে গ্রীক-জাতীয় দাস-প্রথা অর্থাৎ

'জন্মগত দাস' বলিয়া কিছু ছিল না। ভারতবর্ষে দাস-সম্প্রদায় বা সমাজের সেবকেরা অর্ধ-দাসত্বের অবস্থায় ছিল। অবশ্য তাহাদের কোন অধিকার ছিল না এইরূপ নহে। কৌটিল্য স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, একজন আর্য কখনও অপর কর্তৃক দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতে পারে না, এবং পূর্বোক্ত চারিবর্ণের আর্য সন্তান বিক্রয়ের জন্য শাস্তি-ভোগের নির্দেশও দেওয়া আছে। প্রাপ্তবয়স্ক আর্যের পক্ষে আর্থিক দুরবস্থা দূরীকরণ-কল্পে স্বেচ্ছায় কাহারও দাসত্বগ্রহণ সম্বন্ধে কোন বাঁধন ছিল না, কিন্তু পরে সে ঋণ পরিশোধ করিয়া বা অন্য কোন পরিকল্পিত[২৪] উপায়ে স্বাধীনতার পুনরুদ্ধার করিতে পারিত। মনু অবশ্য ক্রীতদাস ও অ-ক্রীতদাসের মধ্যে পার্থক্য করিয়াছেন, ইহাতে এ্যারিষ্টটলের স্বাভাবিক দাসের কথা মনে উদিত হয়; তিনি একথাও স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, শূদ্রেরা অপরের[২৫] সেবা করিবার জন্য ব্রহ্মা কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছিল। মনু বিভিন্ন শ্রেণীর দাসের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। কৌটিল্যের যুগ হইতে মনুর যুগে শেষ বর্ণের অর্থাৎ শূদ্রের অবস্থার অবনতি ঘটিয়াছে ইহা স্পষ্টই দেখা যায়।

৩। রাষ্ট্রনীতি

কৌটিল্য যদিও তাঁহার গ্রন্থের এক অধ্যায় (একাদশ অধ্যায়) সাধারণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের (সংঘের) আলোচনায় নিয়োগ করিয়াছেন, তিনি অ-রাজতন্ত্রী রাষ্ট্র সমর্থন করিতেন না, সেই কারণেই তিনি উক্ত রাষ্ট্রগুলির কার্যাবলীর দিকে বেশী লক্ষ্য না করিয়া কি উপায়ে এইগুলির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া ইহাদের রাজ-অধীনে আনয়ন করা যায় তাহার বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। সুতরাং মনু ও কৌটিল্য-বর্ণিত রাষ্ট্র রাজতান্ত্রিক। কৌটিল্য চতুর্দশ লুই-এর আবির্ভাবের কয়েক শতাব্দী পূর্বে উক্ত নৃপতির মত পরিষ্কার বলিয়াছিলেন, রাজাই রাষ্ট্র (রাজা রাজ্যম্)।[২৬]

রাষ্ট্রের উৎপত্তি: কৌটিল্য কেবলমাত্র পরোক্ষভাবে রাষ্টের উৎপত্তির বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন এবং প্রচলিত মত অনুসরণ করিয়া বলিয়াছেন যে, মনুষ্যসমাজ মৎস্যধর্মে (Fish-law) বিব্রত হইয়া (বৃহৎ মৎস্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্যকে গিলিয়া খায়) বৈবস্বত মনুকে রাজা হিসাবে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলে, তিনি প্রজাদিগের ফসলের এক ষষ্ঠাংশ এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের[২৭] এক দশমাংশ গ্রহণ করিবেন এবং পরিবর্তে তিনি তাঁহাদের অন্যায় অবিচারের হস্ত হইতে রক্ষা করিবেন, এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। অপর ক্ষেত্রে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে, রাজার (দণ্ডধর) অভাবে সবল দুর্বলকে গ্রাস করিয়া ফেলিবার চেষ্টা করে, কিন্তু রাজশক্তি পশ্চাতে থাকিলে দুর্বল

ব্যক্তিরা সবলের কবল হইতে নিজেদের রক্ষা করিতে পারে।[২৮] রাষ্ট্রের উৎপত্তি বিষয়ে কৌটিল্যের এই মতবাদের হব্‌স্ (Hobbes) কর্তৃক ব্যাখ্যাত সমাজ চুক্তি-বাদের সহিত বহুলাংশে সাদৃশ্য আছে, কিন্তু হবস্‌-এর পক্ষে তাঁহার মতবাদকে ইহার যৌক্তিক পরিণতির দিকে লইয়া যাইতে কোন বাধা না থাকায় তিনি নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের কথা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ভারতে যে পরিবেশে কৌটিল্য লিখিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার পক্ষে এরূপ করা সম্ভবপর ছিল না। ইহা সত্ত্বেও রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে ভারতীয় লেখকগণের মধ্যে হব্‌স্‌-এর সহিত কৌটিল্যের নৈকট্য সর্বাপেক্ষা অধিক এবং কৌটিল্য পূর্বাপর সকল গ্রন্থকারের অপেক্ষা রাজশক্তিকে অধিক মহিমান্বিত করিয়া গিয়াছেন।

দণ্ড: পূর্বোক্ত বিশেষ ক্ষেত্রে কৌটিল্য রাজাকে যে দণ্ডধর আখ্যা দিয়াছেন তাহার পূর্ণ তাৎপর্য বুঝিতে হইলে মনু কি বলিয়াছেন তাহা দেখিতে হইবে।[২৯] পৃথিবীতে যখন রাজশক্তি ছিল না এবং চতুর্দিকে ভীতিজনিত ত্রস্ত ভাব ছিল, জগতের রক্ষাকল্পে এবং সাধুদিগকে পরিত্রাণ ও দুষ্কৃতকারিদিগকে দমন করিবার জন্য ভগবান ব্রহ্মা তখন রাজাকে সৃষ্টি করিলেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, রাজার সাহায্যার্থে সকল জীবের রক্ষকরূপে তিনি নিজ পুত্র দণ্ডকে সৃষ্টি করিলেন। দণ্ড ব্রহ্মার তেজে পরিপূর্ণ; দণ্ডের ভয়ে সকল সৃষ্ট প্রাণী তাহাদের স্বাভাবিক প্রকৃতি অনুসারে কার্য করে। দণ্ড নায়ক ও শাসনকর্তা, তাঁহার ভয়ে চতুরাশ্রমের ব্যক্তিগণ স্বকীয় ধর্ম পালন করে; সকল প্রাণীর নিদ্রিতাবস্থায় দণ্ড জাগ্রৎ থাকেন, এবং দণ্ড স্বয়ং ধর্মের মূর্তরূপ। বিজ্ঞ রাজা কর্তৃক যথার্থ পরিচালিত হইলে দণ্ড প্রজাদিগকে আনন্দদান করেন এবং এই দণ্ডের সাহায্যেই দেবতারা ও অন্যান্য মহাপুরুষেরা সর্ব জীবের মঙ্গলসাধন করিয়া থাকেন। মূর্খ (অকৃতাত্মা) রাজার হস্তে কেবলমাত্র যন্ত্র হিসাবে অবস্থান করিতে দণ্ড রাজী নহেন, ইনি অধার্মিক শাসকদের বিরুদ্ধে যাইয়া আত্মীয়পরিজনসহ তাহাদিগকে বিনষ্ট করেন, ফলে রাজ্য মধ্যে সকল বস্তু ও জীবই কেবলমাত্র দুঃখকষ্ট ভোগ করে তাহাই নহে, ঋষিরা এবং স্বর্গে দেবতারাও কষ্ট ভোগ করিয়া থাকেন।

দণ্ড শব্দটিকে প্রায়ই শাস্তি অর্থে গ্রহণ করা হইয়া থাকে। শাস্তি যদিও দণ্ডের বিভিন্ন অর্থের মধ্যে একটি অর্থ, কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে যেখানে দণ্ড বিশ্বের নিয়ম ও শৃঙ্খলার প্রতিমূর্তি এবং বৈদিক ঋতের পরবর্তী রূপ হিসাবে গৃহীত হইয়াছে, সেই ক্ষেত্রে শাস্তি হিসাবে দণ্ডের ব্যাখ্যা যথেষ্ট নহে। রাজা কালের কারণ (রাজা কালস্য কারণম্) এই প্রচলিত উক্তি এই অর্থে, সত্য যে একজন ন্যায়পরায়ণ রাজা

দণ্ডের সাহায্যে সর্বসাধারণের সুখ ও সমৃদ্ধি আনয়ন করিতে পারেন। কিন্তু একজন অসৎ রাজা এই কার্য করিতে অক্ষম হন এবং তাঁহার নিজের ও রাজ্যের সর্বনাশ সাধন করেন। এই জাতীয় মত প্রাচীন আর্যজগতে বিশেষ বিস্তার লাভ করিয়াছিল। হোমার[৩০] (Homer) বলিয়াছেন, "যখন কোন ভগবদ্‌বিশ্বাসী নির্দোষ নরপতি ন্যায়-বিচার করেন, তখন অন্ধকার পৃথিবীর বুকে গম ও বার্লি উৎপন্ন হয়, বৃক্ষসকল ফলে পরিপূর্ণ হয়, শিশুরা সবল হয় এবং সমুদ্রে প্রচুর মৎস্য পাওয়া যায়"—ভারতীয় সাহিত্যেও অনুরূপ উক্তি প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়। এই মতানুসারে রাজার চূড়ান্ত ক্ষমতা নাই। যে নীতির অস্তিত্ব রাজার পূর্বে ছিল, যাহা স্বয়ং রাজাকে অনুসরণ করিতে হয় এবং ঠিক ভাবে অপরের উপর প্রয়োগ করিতে হয়, সেই নীতিই সমস্ত শক্তির আধার। রাজা নিজের অপরাধে নিজে শাস্তিভোগ করিবেন এবং সে শাস্তি প্রজাদের[৩১] শাস্তি অপেক্ষাও কঠোরতর হইবে, মনু এই ধরণের চিন্তার বিরোধী ছিলেন না। দণ্ড অসৎ রাজাকে সবংশে ধ্বংস করেন। মহাভারতে সেন রাজার উপাখ্যানে দেখিতে পাওয়া যায় যে, শেষ পর্যন্ত প্রজারা বিদ্রোহী হইয়া অত্যাচারী রাজাকে হত্যা করিয়াছিল এবং তাঁহার স্বৈরশাসনের অবসান ঘটাইয়াছিল। পূর্বোল্লিখিত উক্তির সহিত এই উপাখ্যানের সংযোগ-সূত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এই ধরণের বিপ্লবের বীজবহনকারী রহস্যপূর্ণ মতবাদের কোন আবেদন ব্যবহারিক শাসনকার্যে ব্যাপৃত এবং সাম্রাজ্য গঠনকারী কৌটিল্যের কাছে ছিল না; অর্থশাস্ত্রে এই জাতীয় কোন কিছুর উল্লেখ পাওয়া যায় না।

রাজতন্ত্র যদিও দৈব-নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠান, কিন্তু রাজা স্বয়ং কোন মতেই দেবতা নহেন। কোন ভারতীয় রাজাই নিজেকে দেবতা আখ্যা দেন নাই, এবং কেহই তাঁহার জীবদ্দশায় দেবতা হিসাব পূজিতও হন নাই। ইহা যথার্থই উক্ত[৩২] হইয়াছে যে, "এশিয়ায় শাসনকর্তাদের দেবত্বরূপ বীজের অঙ্কুরিত হইবার ক্ষেত্র অতি স্বল্প," এই জাতীয় ধারণা গ্রীস দেশের স্থানীয় সৃষ্টি; "নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নিয়মতন্ত্রের বহির্ভূত কোনও শাসকের বৈধতা স্থাপনের জন্য ইহা উদ্ভূত হইয়াছিল।" মনু অবশ্য এক জায়গায় বলিয়াছেন যে, একজন শিশু রাজাকেও মরণশীল জীব বলিয়া অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখা উচিত নহে, কারণ, তিনি মনুষ্যদেহধারী[৩৩] দেবতা, কিন্তু যে বৃহৎ অনুচ্ছেদটি আমাদের শেষাংশের আলোচনার ভিত্তি, এই শ্লোকটি তাহারই একটি অতি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, যে উপলক্ষ্যে উক্ত মন্তব্যটি করা হইয়াছে, উহাকে মীমাংসা-কথিত অর্থবাদ বলা যায়, কারণ রাজতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষকতা করাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য।

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় : ক্ষত্রিয় রাজার গুরুত্বপূর্ণ কার্যে সাহায্য ও উপদেশ দেওয়ার জন্য সর্বদাই তাঁহার পার্শ্বে ব্রাহ্মণ পুরোহিতরূপে (পুরোধায় অধিষ্ঠিত) অধিষ্ঠিত থাকেন। মনু প্রাচীন বৈদিকযুগের ক্রমানুসরণ করিয়া কেবলমাত্র ইহার পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, "সৃষ্টির পর প্রজাপতি গো-ধনকে বৈশ্যের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন, এবং ব্রাহ্মণ ও রাজার উপর সমস্ত সৃষ্ট জীবের দায়িত্ব ন্যস্ত করিলেন।" পুনরায় তিনি বলিয়াছেন, "ব্রাহ্মণ ভিন্ন ক্ষত্রিয়ের উন্নতি হইতে পারে না, আবার ক্ষত্রিয় ছাড়া ব্রাহ্মণেরও অভ্যুদয় হয় না। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত হইলে পারস্পরিক সহযোগিতায় ইহজগতে ও পরলোকে[৩৫] উন্নতিলাভ করিয়া থাকেন।" হিন্দুধর্মের একজন বিচক্ষণ সমালোচক বলিয়াছেন রাজনীতিতে ব্রাহ্মণদের রাজা না হইয়া মন্ত্রী হইবার, সেবার মধ্য দিয়া শাসন করিবার বিচক্ষণতা ছিল তত্ত্বগতভাবে, এবং বহুলাংশে কার্যতঃ ব্রাহ্মণ ও তাঁহার দেবতারা সাম্রাজ্যের মধ্যে সার্বভৌম নহে (imperium in imperio) সাম্রাজ্য-উর্ধ্বে সার্বভৌম (imperium super. imperium)[৩৬]। রাজার আনুষ্ঠানিক রাজ্যাভিষেকের সময়ে ব্রাহ্মণদিগকে ভিন্ন গোষ্ঠীতে রাখিয়া পুরোহিত রাজাকে প্রজাদের নিকট এইরূপ বলিয়া পরিচয় করাইয়া দিতেন, "হে সাধারণ প্রজাবৃন্দ, ইনি তোমাদের রাজা, আমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের রাজা সোম। মনুতে অবশ্য কতকগুলি শ্লোকে ব্রাহ্মণদের পক্ষে অত্যাচারী রাজাকে বাধা প্রদান করিবার কর্তব্যের কথা উল্লেখ আছে।" যেমন : "যখন ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের নিকট যে কোন ভাবেই হোক অসহনীয় হইয়া উঠিবে, ব্রাহ্মণ স্বয়ং তখন তাহাকে বাধা প্রদান করিবেন, কারণ ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি ব্রাহ্মণ হইতে", অগ্নি যেমন জলের[৩৭] বিরুদ্ধে যাইতে পারে না, তদ্রূপ কোন কিছুই, তাহা যাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহার উপর আধিপত্য করিতে পারে না। মনুতে অবশ্য পুরোহিতের কার্য খুব বেশী মূল্যবান্ ছিল না, তিনি রাজ-পরিবারের পুরোহিত ভিন্ন আর কিছুই নহেন। তাঁহার কার্য ছিল প্রথানুযায়ী আনুষ্ঠানিক পূজা-অর্চনাদি সম্পাদন করা ; কিন্তু বিশেষ ক্ষেত্রে যেমন যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নবিজড়িত রাষ্ট্রনীতির কোন জটিল সমস্যা সমাধানের পূর্বে রাজাকে অবশ্যই নিয়মানুযায়ী অন্যান্য মন্ত্রীদের সহিত আলাপ-আলোচনা ভিন্নও একজন চরিত্রবান দক্ষ ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর সহিত আলোচনা করিবার নির্দেশ স্পষ্ট দেওয়া আছে। কৌটিল্য পুরোহিতের পদকে প্রাধান্য দিয়াছেন। যিনি পুরোহিত হইবেন তাঁহাকে বিদ্যা, চরিত্র, প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ গুণগুলির অধিকারী হইতে হইবে, ইহাও বলিয়াছেন। এই পদের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি মনোনয়ন করিয়া ছাত্র যেমন তাহার আচার্যকে অনুসরণ করে, পুত্র

যেমন পিতাকে বা ভৃত্য যেমন প্রভুকে অনুসরণ করে, রাজাও তদ্রূপ পুরোহিতকে অনুসরণ করিবেন। কৌটিল্য বলিয়াছেন, "ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণের তেজে বলীয়ান হইয়া মন্ত্রীদের মন্ত্রণায় শুদ্ধিলাভ করিয়া ও শাস্ত্রের অনুশাসন অনুসরণ করিয়া অপরাজেয় হইয়া থাকেন এবং অস্ত্র ব্যবহার না করিয়াও সর্বক্ষেত্রে জয়ী হইতে পারেন।"[৪০] ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, দেব ও রাজশক্তির মধ্যে পারস্পরিক আলোচনার মধ্য দিয়া সর্বদা সহযোগিতা মনু ও কৌটিল্যের মতে সমৃদ্ধিশালী বিজয়ী রাষ্ট্রের প্রকৃত ভিত্তি।

রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গ: কোন রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গ বা প্রকৃতি (বিভিন্ন অংশ) সকল সংখ্যায় সাতটি। মনু উহাদিগকে এইভাবে গণনা করিয়াছেন (১) রাজা (স্বামিন্) (২) মন্ত্রী (অমাত্য) (৩) রাজধানী (পুর) (৪) দেশ (রাষ্ট্র) (৫) ধনভাণ্ডার (কোষ) ( ) সৈন্যদল (দণ্ড) (৭) বন্ধু (সুহৃৎ বা কৌটিল্যের মতে মিত্র)। যে ক্রমানুযায়ী ইহাদের নাম করা হইয়াছে, গুরুত্বের দিক দিয়া ইহাদের ক্রম তদ্রূপ। ইহাদের মধ্যে পরবর্তী অঙ্গগুলির বিপদ অপেক্ষা পূর্ববর্তী অঙ্গগুলির বিপদ ঘটিলে, রাষ্ট্র অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইহার অর্থ অবশ্য এইরূপ নহে যে, রাষ্ট্রের সাধারণ পরিচালনা ব্যাপারে একটি অঙ্গ অপর একটি অঙ্গ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। প্রত্যেকেরই স্ব স্ব ক্ষেত্রে উপযোগিতা আছে, যেমন কোন সন্ন্যাসীর ত্রিশূলের কোন একটি বিশেষ অংশ সমগ্র বস্তুটির[৪১] কার্যকারিতার পক্ষে অপর একটি অংশ অপেক্ষা কম মূল্যবান নহে। কৌটিল্য রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গের ক্রম প্রায় মনুর ন্যায়ই নির্ধারণ করিয়াছেন, তবে মনুর সঙ্গে তাঁহার এই অংশে পার্থক্য দেখা যায় যে, তিনি দেশকে (জনপদ বা মনুর রাষ্ট্র) রাজধানীর (দুর্গ বা মনুর পুর) পূর্বে বসাইয়াছেন। তিনি তাঁহার আচার্যের মত উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, গণনা তালিকার প্রতি পূর্ববর্তী অঙ্গ পরবর্তী অঙ্গ অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ এবং অস্বাভাবিক সময়ে অধিকতর যত্ন লাভ করিবার যোগ্য। তিনি বিভিন্ন অঙ্গের আপেক্ষিক মূল্য সম্বন্ধে বিরোধী মতবাদের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। তিনি এই সকল তথাকথিত পাণ্ডিত্যপূর্ণ অভিজ্ঞতানিরপেক্ষ যুক্তির সহিত একমত নহেন এবং সহজ জ্ঞানের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, বিপদকালে পাঠ্যপুস্তকের কোন ধরা-বাঁধা নিয়ম দ্বারা চালিত কর্মপন্থা অবলম্বন না করিয়া বিপদের প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে হইবে এবং লক্ষ্য রাখিতে হইবে রাষ্ট্রের কোন অংশের সহিত এই বিপদ সংশ্লিষ্ট এবং ইহার প্রতিক্রিয়া অবশিষ্ট অংশের[৪২] উপর কিরূপ হইতে পারে।

রাজা: ইহা সর্বজনসুবিদিত যে রাষ্ট্রের মঙ্গল রাজার ব্যক্তিগত সদ্গুণ ও ব্যবহারের উপর নির্ভর করে, সুতরাং সিংহাসন আরোহণ করিবার পূর্বে রাজা

কিভাবে বিদ্যার্জন ও শিক্ষালাভ করিবেন, এবং রাজ্য গ্রহণের পরে কিভাবে তিনি তাঁহার ব্যক্তিগত কার্য ও সাধারণের প্রতি কর্তব্যপালনের জন্য তাঁহার সময় ও মনোযোগের বিভাগ করিবেন সে সম্বন্ধে বিস্তারিত নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। কৌটিল্য মনে করেন যে, রাজার সময় থাকিতে উত্তরাধিকারের বিষয় চিন্তা করা উচিত এবং তিনি উপযুক্ত উত্তরাধিকারীর নির্বাচন ও শিক্ষা সম্বন্ধে বহু নিয়ম প্রণয়ন করিয়াছেন।

অন্যান্য অংশ : রাজা সর্বদাই প্রজাদের হিতসাধনে তৎপর থাকিবেন। তাঁহার নিকট সকলের যাইবার অধিকার থাকিবে ; যে সকল আশু প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার অবহেলা করিলে জটিলতা উদ্ভবের সম্ভবনা আছে, তিনি সেগুলির দিকে সত্বর মনোযোগ দিবেন। প্রচেষ্টা কৃতকার্যতার মূল। কৌটিল্য বলিয়াছেন, "প্রজাদের সুখ রাজার সুখ, প্রজাদের মঙ্গল রাজাদের মঙ্গল ; রাজার ব্যক্তিগত সুখ তাঁহার মঙ্গলকর নহে, প্রজাদের সুখ তাঁহার পক্ষে মঙ্গলকর"।[৪৩] মনু বলিয়াছেন, রাজা অবশ্যই তাঁহার রাজকার্যের সুবিধার জন্য সাত বা আটজনের দ্বারা গঠিত মন্ত্রীসভা নিয়োগ করিবেন এবং মন্ত্রিগণ সদ্‌বংশভূত, বিদ্বান ও সাহসী হইবেন, তাঁহাদের চরিত্র ও দক্ষতা বিষয়ে দীর্ঘদিনের সুনাম থাকিবে[৪৪], কৌটিল্য শাসননীতি, বিভিন্ন পদের মন্ত্রী নির্বাচন, দেশের বৈষয়িক উন্নতি, শুল্কনীতি, এবং সৈন্যদের নিয়মানুবর্তিতা ও নীতি-রক্ষার বিষয় বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন।

আন্ত-রাষ্ট্রিক সম্বন্ধ : "যে মুদ্গর হইতে পারিবে না তাহাকে অবশ্যই নেহাই হইতে হইবে", এই ধারণাদ্বারা মনু ও কৌটিল্যের আন্ত-রাষ্ট্রিক সম্বন্ধ বিষয়ক মতবাদ বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল। আদর্শ রাজা হইবেন একজন বিজিগীষু অর্থাৎ তাঁহার নূতন দেশ বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা থাকিবে। ইহার অর্থ এই যে, রাজা কর্মতৎপর এবং রাজ্যবিস্তারকামী হইবেন, তাঁহাকে যে যুদ্ধ করিতেই হইবে এমন নহে, কারণ যুদ্ধ একমাত্র শেষ[৪৫] উপায় রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। আমরা এই প্রসঙ্গে মণ্ডল বা কূটনৈতিক চক্র, চতুর্বিধ উপায় ও ষড়বিধ কার্য বিষয়ে বিস্তৃত পাণ্ডিত্যপূর্ণ যে সকল আলোচনা মনু অপেক্ষা কৌটিল্যে স্বভাবতঃই অধিক বিস্তৃত, সেগুলিকে কেবলমাত্র উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিব। কৌটিল্য ত্রিবিধ বিজয়ীর মধ্যে পার্থক্য করিয়াছেন—যেমন ধর্ম-বিজয়ী অর্থাৎ ধার্মিক বিজয়ী, পরাজিত রাষ্ট্র আনুগত্য স্বীকার করিলেই যিনি সন্তুষ্ট থাকেন। লোভ বিজয়ী, অর্থাৎ যিনি পরাজিতের ভূমি ও অর্থ উভয়ই আকাঙ্ক্ষা করেন এবং অসুর-বিজয়ী বা দুষ্ট-বিজেতা, অর্থাৎ যিনি বিজিত রাজার সব কিছুই গ্রাস করিতে চাহেন,—তাহার স্ত্রী, পুত্র কন্যাদি এমন কি তাহাকে হত্যা করিতেও পারেন।[৪৬] কি উপায়ে বিজিত রাষ্ট্রে শান্তিস্থাপন করিতে হয় এবং

সেখানে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা পুনঃপ্রতিষ্ঠা[৪৭] করিতে হয়, তাহা বিস্তৃতভাবে কৌটিল্য বলিয়া গিয়াছেন। অপর দিকে মনু স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন যে, রাজ্য জয় সমাপ্তির পর পূর্বের ন্যায় বিজিত দেশের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার ধর্ম, সামাজিক প্রতিষ্ঠান এমন কি পুরাতন রাজ-পরিবারকেও[৪৮] প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বাভাবিক জীবন-যাত্রাকে ফিরাইয়া আনিতে হইবে।

শাসন-ব্যবস্থা: আভ্যন্তরিক শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা ক্ষেত্রে কৌটিল্যের দান অতুলনীয়। অধ্যক্ষ-প্রচারে (দ্বিতীয় খণ্ড) নগর-নির্মাণ পদ্ধতি রাষ্ট্র সুদৃঢ়ীকরণ এবং অর্থনৈতিক পরিচালনা সম্বন্ধে এবং তৎসহ আজকাল যাহাদিগকে বিভাগীয় অধিকর্তা বলা যাইতে পারে, এমন ত্রিশজন অধ্যক্ষের কর্তব্য বিষয়ে যে বিস্তৃত আলোচনা আছে, তাহা প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক-সাহিত্যে অপূর্ব এবং ইহাকে বর্তমান যুগের যে কোন শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কীয় পুস্তকের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। যে রাষ্ট্রে বিপুল সংখ্যক রাজপুরুষ জাতির সামাজিক অর্থনৈতিক প্রভৃতি সকলপ্রকার ক্রিয়ার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সেগুলিকে পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণ করিবে, এইরূপ একটি রাষ্ট্রের কথাই কৌটিল্য চিন্তা করিতেন। এই ধরণের কেন্দ্রীভূত শাসন পরবর্তী যুগে ভারতে বৃটিশ শাসনের পূর্বে অজ্ঞাত ছিল। কৌটিল্যের উপদেশ পালিত হইলে, রাষ্ট্রের অধীনস্থ প্রতি নগর ও গ্রামের লোকসংখ্যা, তাহাদের জীবিকা, গরু ও ভূ-সম্পত্তি প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রভূত পরিমাণে প্রামাণ্য ও আধুনিক তথ্যাদি রাষ্ট্রের ব্যবহারের জন্য পাওয়া যাইত, এইরূপ অনুমান করা যায়। এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, মৌর্যসাম্রাজ্যে অন্ততঃ অশোকের রাজত্বকালের শেষ পর্যন্ত কৌটিল্যের এই নীতি অনুসৃত হইত। ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, হেলেনীয় Hellenistic রাষ্ট্রই কৌটিল্যের আদর্শ ছিল এবং হেলেনীয় রাষ্ট্র আবার অচিমেনিড Achemenid বংশীয় পারস্যরাজগণেরও তাহাদের প্রতিনিধিদের ধারা অনুসরণ করিয়াছিল। প্রজাদের দৈনন্দিন কার্যকলাপকে সক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত না করিয়া তাহারা যাহাতে বিনা বাধায় বৈধভাবে জীবন কাটাইতে পারে সেই দিকে লক্ষ্য রাখাই ভারতের অন্যান্য রাষ্ট্রের নীতি ছিল, কিন্তু মৌর্যরাষ্ট্রে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল।

বিচার: বিচারকার্য পরিচালনা ক্ষেত্রে, কৌটিল্য দুই ধরণের আদালতের উল্লেখ করিয়াছেন, যেমন—ধর্মস্থীয় (তৃতীয় খণ্ড), ব্যবহার অর্থাৎ দেওয়ানী-মকদ্দমা বিষয়ক আদালত, ইহার কার্যাবলী সুবিধার জন্য সাধারণতঃ আঠার ভাগে আলোচিত হইয়াছে; এবং কণ্টকশোধন (চতুর্থ খণ্ড) রাজকর্মচারীদের সরকারী কার্যে অবহেলা প্রভৃতি সমাজবিরোধী দুষ্কর্ম সম্পর্কে বিচার করিবার আদালত। প্রথমোক্তটি (ধর্মস্থীয়)

নিয়মিত আদালত ; এইখানে বিধিবদ্ধ পদ্ধতি অনুযায়ী ধর্মশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণদের সহায়তায় রাজকর্মচারিগণ কর্তৃক বিচারকার্য সাধিত হইত। শেষোক্তটি শাসনসম্পর্কীয় আদালত। ইহা সংক্ষেপে বিচারকার্য সমাধা করিত এবং সমাজের কণ্টকগুলিকে দূর করিবার চেষ্টা করিত। জটিল মকদ্দমা সকল কখনও কখনও সাধারণ আদালত হইতে এই সকল আদালতে প্রেরিত হইত। উক্ত আদালতসকল অপরাধ তদন্ত করিবার জন্য ও অত্যাচারের ভীতিপ্রদর্শন করিয়া স্বীকারোক্তি আদায় করিবার জন্য গুপ্তচর ও প্রতিনিধি (agents provocateurs) নিয়োগ করিত।

এই উভয়প্রকার আদালতের পার্থক্যের ভিত্তি কোথায়ও ভাষায় বর্ণিত হয় নাই, তবে এইরূপ অনুমান করা যায় যে, কৌটিল্য ক্রম-বর্ধমান জটিল অর্থনীতির নূতন নূতন চাহিদা মিটাইবার জন্য, সমাজবিরোধী লোকের দুষ্কর্ম হইতে রাষ্ট্র ও জনসাধারণকে রক্ষা করিবার জন্য এবং বহুসংখ্যক রাজকর্মচারী কিভাবে নূতন নূতন বিধান অনুযায়ী শাসনকার্য চালাইতেছে তাহা নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য এবং যাহাতে সরকারের মধ্যে যুক্তিসম্মত তৎপরতা রক্ষিত হয় এবং জনসাধারণ অত্যাচার ও পক্ষপাতিত্বের হাত হইতে মুক্ত হইতে পারে, সেইজন্য এই নূতন ধরণের আদালতগুলির পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। কৌটিল্যের এই নূতন ধরণের আদালত তাঁহার পরিকল্পিত ব্যাপক আমলাতন্ত্রের মূল স্তম্ভস্বরূপ। রাষ্ট্রনীতিতে অন্যান্য লেখকদের তুলনায় মনুর সহিত কৌটিল্যের মিল সর্বাপেক্ষা অধিক। মনু যদিও তাঁহার গ্রন্থে বিশেষ আদালতের বিষয় উল্লেখ করেন নাই, কণ্টকশোধনের বিষয় তিনি কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছেন[১১] এবং বিশেষভাবে গুপ্তচর ও রাজকর্মচারী ও অপর সকলের বিভিন্ন অপরাধ ও অন্যায়কর্ম সম্বন্ধে যে সকল উক্তি করিয়াছেন, তাহাদের সহিত কৌটিল্যের উক্তির যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে।

অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে কৌটিল্যকে নূতন স্রষ্টা বলা যায়। এই ক্ষেত্রেও তাঁহার প্রেরণার মূল উৎস ছিল পারসীক রাজতন্ত্র ও পরবর্তী অনুগামী হেলেনীয় রাষ্ট্রসমূহ। তিনি বলিয়াছেন, "ধর্ম, চুক্তি, আচার-ব্যবহার ও রাজানুশাসন, আইনের চারিটি পদ (আদালতে বিচারের নির্ণায়ক)।" এইগুলির মধ্যে প্রতি পরবর্তী অঙ্গ প্রতি পূর্ববর্তী অঙ্গ অপেক্ষা অধিকতর বলবান। হেলেনীয় রাজতন্ত্র বিষয়ে রোষ্টাভ্‌জেফ-এর উক্তি এই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তিনি বলিয়াছেন, "ইহা সুস্পষ্ট যে রাজানুশাসন, নির্দেশ বা বিধি যদি অন্যান্য আইনের বিরোধী হয়, তাহা হইলে রাজানুশাসন অন্যান্য বিধির তুলনায় শক্তিশালী এবং বিচারক্ষেত্রে চরম বলিয়া গণ্য হইবে।" একমাত্র নারদের গ্রন্থ ভিন্ন পরবর্তী যুগের সকল স্মৃতিগ্রন্থেই এই অ-ভারতীয়

রাজ-মহিমা বিস্মৃতির তলে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। সাধারণ নিয়মানুসারে রাজাকে ধর্মের আনুগত্য স্বীকার করিতে হইত এবং ধর্ম শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইত। ইহা শাস্ত্রোক্ত বিধি, স্থানীয় আচার-ব্যবহার, গোষ্ঠীর রীতিনীতি ও চিরাচরিত রীতি-নীতি এ সমস্তই বুঝাইত, কিন্তু রাজানুশাসনকে নহে। ধর্মের উৎস হিসাবে মনু সমগ্র বেদ, বেদজ্ঞ ব্যক্তিদের আচার-ব্যবহার ঐতিহ্য, পুণ্যবান ব্যক্তিদের জীবন-যাত্রা এবং অবশেষে আত্মতৃপ্তির[৫০] কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

৪। নীতিশাস্ত্র

মনুর নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী যুগ যুগ ধরিয়া মানুষের আচার-ব্যবহার ও সাহিত্যের উপর অপরিমেয় প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিতেছে। এই নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর আলোচনা করিয়া আমরা আমাদের বক্তব্যের উপসংহার করিব। মনুর মতে ধর্মের (নৈতিক বিধি) বিধিসমূহ চিরকালের জন্য নির্দিষ্ট থাকে না।[৫১] প্রতিযুগেই যে সকল বিদ্বান্ ব্যক্তি সচ্চরিত্র এবং বিদ্বেষ ও অতিরিক্ত মমতা হইতে মুক্ত, তাঁহাদের আচরণ ও নির্দেশ হইতে ধর্মশিক্ষা করিতে হইবে। প্রত্যেক ব্রাহ্মণের দশটি সদ্‌গুণ থাকা উচিত। যথা—তুষ্টি, ক্ষমা, আত্ম-সংযম, অ-স্তেয়, চিত্ত-শুদ্ধি, ইন্দ্রিয়-সংযম, জ্ঞান, বিদ্যা, সত্যবাদিতা ও ক্রোধশূন্যতা।[৫২] নির্বোধ ও লোভী ব্রাহ্মণকে স্পষ্ট-ভাষায় নিন্দা করা হইয়াছে, এবং তাহাকে যে দান[৫৩] করে তাহারই ক্ষতি হয় এই বলিয়া এরূপ ব্যক্তিকে দানের নিন্দা করা হইয়াছে।

মাংসভক্ষণ ও মদ্যপান মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক বলিয়া গণ্য হইত, কিন্তু এই সকল হইতে বিরত থাকা অতি পুণ্যকর্ম বলিয়া বিবেচিত হইত।

আচার-ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে ব্রাহ্মণদের আচার-ব্যবহারের পক্ষে, ইহা স্পষ্টভাবেই পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়।[৫৪] যদি কেহ অপরের মঙ্গলের জন্য তাহাদিগকে উপদেশ দিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাঁহার অহিংস-নীতি (কাহাকেও দুঃখ না দেওয়া) অনুসরণ করা উচিত এবং তাহাদের প্রতি ভদ্র ও মিষ্টবাক্য ব্যবহার করা উচিত। ভাষ্যকারগণ শিষ্য[৫৫] ও আচার্যের মধ্যে সম্বন্ধক্ষেত্রে এই উপদেশ বিশেষভাবে প্রযোজ্য বলিয়াছেন। ধন-সম্পত্তি, আত্মীয়তা, বয়স, কৃতিত্ব ও পাণ্ডিত্য বিশেষভাবে ক্রমানুসারে সামাজিক সম্মান লাভ করিবার যোগ্য। এই ক্ষেত্রে ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, ধন-সম্পত্তির স্থান ছিল সর্বনিম্নে এবং পাণ্ডিত্যের স্থান ছিল সর্বোচ্চে।[৫৬] ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে প্রকৃত সুখের উৎস হিসাবে অতি উচ্চ মূল্য

দেওয়া হইয়াছে এবং প্রত্যেকের পক্ষে সেই ধরণের কার্য গ্রহণের উপদেশ দেওয়া আছে—যে কার্য সে নিজে সম্পন্ন করিতে পারিবে এবং সম্পন্ন করিয়া তৃপ্তিলাভ করিবে। অন্যত্র চাতুরীকে কুকুরের জীবন[৫৭] বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছে। ইহা অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হইলেও, সামাজিক শান্তিরক্ষার্থে[৫৮] প্রত্যেক বৈশ্য ও শূদ্রের জন্য কর্মের সংস্থান করিতে হইবে, মনু এই বিধান দিয়াছেন। অন্য ক্ষেত্রে তিনি কোন উপবাসী ব্যক্তিকে যে-কোন স্থান হইতে আহার সংগ্রহ করিবার নির্দেশ দিয়াছেন, অবশ্য তাহার জমাইবার কোন ইচ্ছা থাকিতে পারিবে না। মনু স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, যদি কেহ দুষ্ট ব্যক্তির নিকট হইতে অর্থ লইয়া সৎ ও অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেয়, তাহা হইলে তাহার সাহায্যে উভয়েরই পাপ-মুক্তি[৫৯] হয়। সত্য অপেক্ষা কোন ধর্ম শ্রেষ্ঠ নহে ; সত্য মনকে পবিত্র করে, এবং সত্য কথা নীরবতা অপেক্ষা শ্রেয়। আবার একই সঙ্গে এই জাতীয় উক্তিও দেখা যায়—"সত্য বলিবে, প্রিয় বলিবে, অপ্রিয় সত্য বা মনোহারী মিথ্যা কথা উচ্চারণ করিবে না, ইহাই সনাতন নিয়ম।"[৬০] যেখানে অবশ্য জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন বিজড়িত এমন ক্ষেত্রে আদালতে অনৃতভাষণ ক্ষমার্হ।[৬১] সর্বক্ষেত্রেই সাধারণ লোক অপেক্ষা উচ্চশ্রেণীর লোকেদের পক্ষে সদাচার পালনের বাধ্যতা অধিকতর ছিল এবং ইহা হইতে বিচ্যুত হইলে তাহাদের অধিকতর কষ্ট স্বীকার করিতে হইত এবং দণ্ড দিতে হইত, কারণ তাহাদের জ্ঞান[৬২] ও মর্যাদার উপরেই সমাজে তাহাদের দায়িত্ব নির্ভর করিত। অপরাধ স্বীকার ও অনুতাপ কোন ব্যক্তির মানসিক শান্তি ফিরাইয়া আনিবার পক্ষে এবং ভ্রান্তির পুনরাবৃত্তি ব্যাহত করিবার পক্ষে প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইত।[৬৩]

দ্রষ্টব্য

১। **Sacred Books of the East**-এর পঞ্চবিংশ খণ্ডের **Buhler**-লিখিত ভূমিকার পরেই মনুস্মৃতি-সম্বন্ধীয় সমস্যাগুলির সর্বাপেক্ষা ব্যাপক আলোচনার জন্য কাণের "ধর্মশাস্ত্রের ইতিহাস" প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৩৩—১৫৩ দ্রষ্টব্য।

২। কাণে তাঁহার ঐ পুস্তকের ৯৫—৯৬ পৃষ্ঠায় এই দুই গ্রন্থের প্রভেদ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন এবং ১৪০ পৃষ্ঠার টীকায় ইহাদের মধ্যে সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন।

৩। **Breloer, Kautilya Studien ; ABROI, XXVIII,** পৃঃ ৮৪—৯৫

৪। ১৫।১

৫। বাণে, ১।৯৯
৬। বাণের কাদম্বরীতে রাজপুত্র চন্দ্রাপীড়ের প্রতি শুকনাসের উপদেশ দ্রষ্টব্য।
৭। মনু, ২।১৭—২৩ ; কা, ৯।১, কে. ডি. রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার স্মারক গ্রন্থে চক্রবর্তিক্ষেত্র (পৃঃ ৮১—৮৬)
৮। **Kenneth Saunders, Pageant of Asia**, পৃঃ ৯
৯। মনু, ১০।৮ ইঃ
১০। ঐ, ৮।৩৮০ , ৯।৩১৩—৩১৭ ; ১০।৩ ; ১১।৩১—৩২
১১। উদাহরণস্বরূপ, ২।১৫৭ ; ৩।৯৭
১২। **Cornford, The Republic of Plato,** পৃঃ ১০০, ১০৪, ১০৬ ; **Charles Waterman, The Three Spheres of Society :** পৃঃ ১০ , **Gerald Heard, Man the Master.**
১৩। মনু, ৮।৩৪৮—৩৪৯ ; ১০ ৬২
১৪। **Cornford**—পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১২৪
১৫। মনু, ৬।৩৪—৪১
১৬। কা, ২।১
১৭। মনু, ৩।৭৭—৭৮ ; ৪।৩২ , ৬।৮৯—৯০
১৮। ঐ, ৩।৬৮—৭০ ; ৭৭—৭৮ , ১১৬—১১৭ ; ৪।৩২ , ৬।৮৯—৯০
১৯। ঐ, ৬।৪৪
২০। কা, ৩, শেষ ছয়টি শ্লোক ; মনু, ৯।৫৭—৬৩ এবং ৬৪—৬৮
২১। মনু, ৩।৫৬, ৬০
২২। ঐ, ৯।৮৯
২৩। ৫।১৪৭ ইঃ ; ২।২১৩ ইঃ
২৪। ৩।১৩
২৫। ৪।৪১৩
২৬। ৮।২
২৭। ১।১৩
২৮। ১।৪
২৯। ৭।৩—৩১
৩০। **The Republic of Plato (Ed. Cornford),** পৃঃ ৪৭
৩১। ৮।৩৩৬
৩২। **W. S. Fergusson** দ্বারা, **CAH** সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ১৫
৩৩। ৮।৮
৩৪। মেধাতিথি ভাষ্য, মনু ৮।২৯
৩৫। ৯।৩২২, ৩২৭
৩৬। **Eliot : Hinduism and Buddhism, Introduction.**
৩৭। ৯।৩২০—৩২১

৩৮। ৭।৭৮

৩৯। ৭।৫৮

৪০। ১।৯

৪১। ৯।২৯৪—২৯৭

৪২। ৬।১ ; ৮।১

৪৩। ১।১৯

৪৪। মনু, ৭।১৯৯

৪৫। কা ১২।১

৪৬। ঐ ১৩।৫

৪৭। ৭।২০১—২০৩

৪৮। মনু ৮।১১

৪৯। ৯।২৫২—২৯৩ এবং ৭।১২৩

৫০। ২।৬

৫১। ২।১

৫২। ৬।৯১—৯২

৫৩। ৪।১৯০—১৯৩

৫৪। ৫।৫২—৫৬

৫৫। ২।১৫৯

৫৬। ২।১৩৬

৫৭। ৪।১৫৯—১৬১ , ৬

৫৮। ৮।৪১৮

৫৯। ১১।১৬—১৯

৬০। ৫।১০৯ ; ২।৮৩ ; ৪।১৩৮

৬১। ৮।১০৪

৬২। ৮।৩৩৬—৩৩৭

৬৩। ১১।২২৭—২৩৩

গ্রন্থবিবরণী

মূল গ্রন্থ

মানব-ধর্ম-শাস্ত্র—ছয়টি ভাষ্য এবং একটি অতিরিক্ত পরিচ্ছেদ সমেত, সম্পাদক—ডি এন্ মাণ্ডলিক (বোম্বাই, ১৮৮৬)

মনু-স্মৃতি, কুল্লুক-ভাষ্য সমেত (বোম্বাই, ১৯২৫)

অর্থশাস্ত্র : সম্পাদক শ্যাম শাস্ত্রী (মহীশূর, ১৯০৯)

অর্থশাস্ত্র : সম্পাদক গণপতি শাস্ত্রী (ত্রিবান্দ্রম, ১৯২৪-২৫)

অনুবাদ

Buhler, G ; The Laws of Manu (Sacred Books of the East, XXV, Oxford, 1886)

Shama Sastri, R : Kautilya's Artha-sastra (Bangalore, 1915)

Uber das Wesen der Altindischen Rechtsschriften und ihr Verhaltnis zu einander und zu Kautilya von Johann Jakob Meyer (Leipzig, 1927)

আধুনিক গ্রন্থ

Kautilya Studien I-III, Breloer (Bonn, 1927—34)

History of Dharma-sastra, Vols I-III, Kane, MM. P. V. (Poona, 1930—46)

Cornford, F. M. : The Republic of Plato (Oxford, 1942)

Waterman C : The Three Spheres of Society (London, 1946)

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতপুরাণ

১। পুরাণের ঐতিহাসিক গুরুত্ব

সংস্কৃত-সাহিত্যে পুরাণ নামে পরিচিত ধর্ম ও দর্শনবিষয়ক যে কতকগুলি বিশিষ্ট ধরণের কাব্যগ্রন্থ আছে তাহাদের মধ্যে বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবত এই দুইখানি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। এই সব পুরাণ এবং রামায়ণ ও মহাভারত এই দুইটি মহাকাব্য প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতি, গোষ্ঠী, উপগোষ্ঠী ও ধর্মসম্প্রদায়কে সম্মিলিত করার কাজে ও সকল শ্রেণীর লোকেদের দৃষ্টিভঙ্গী আধ্যাত্মিক করার কাজে এক অনন্যসাধারণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। পারজিটার (Pargitar) যথার্থই বলিয়াছেন, "সমষ্টিগতভাবে বিচার করিলে এইগুলি (পুরাণগুলি) প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় হিন্দুধর্মের ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস, ব্যক্তি, সমাজ ও রাজনীতির একটি সর্বসাধারণের উপযোগী বিশ্বকোষ।"[১]

পুরাণে কোন বিশিষ্ট দর্শন অথবা ধর্মসম্প্রদায়ের পক্ষ গ্রহণ করা হয় নাই। বেদ ও উপনিষদের ঋষি অথবা পরবর্তী যুগের জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তিমার্গের সাধুসন্ত, সর্ব সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ সাধু-মহাপুরুষদের আধ্যাত্মিক অনুভূতিই পুরাণগুলির প্রধান উপজীব্য। ইহা ছাড়া, পুরাণে অদ্বৈত, দ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত এমন কি সাংখ্য, যোগ ও ন্যায় প্রভৃতি বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদেরও সমন্বয়সাধন করিবার চেষ্টা আছে।

পুরাণের মধ্যে ভক্তির প্রাধান্য দেখা যায়, এইজন্য পুরাণগুলি সর্বসাধারণের হৃদয় ও মন বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। কোন বিশেষ তাত্ত্বিক মতবাদ প্রতিষ্ঠা করা অপেক্ষা মানুষের জীবন ভগবদ্ভাবে অনুপ্রাণিত করাই ইহাদের উদ্দেশ্য।

২। বিষ্ণুপুরাণের দার্শনিক মতবাদ

বিষ্ণুপুরাণ ভাগবত অপেক্ষা বেশী সহজবোধ্য ও প্রাচীন গ্রন্থ। ইহাকে অন্যান্য পুরাণের প্রতিনিধিস্থানীয় বলিয়াও মনে করা যাইতে পারে। উইণ্টারনিজ

(Winternitz) বলিয়াছেন, "এই পুরাণখানির বিষয়বস্তু সংক্ষেপে কিন্তু কিছু খুঁটিনাটিসহ সংগ্রহ করিলে, তাহা হইতে পাঠক মিলিতভাবে সব পুরাণের বিষয়বস্তু ও তাৎপর্য সম্বন্ধে একটি ধারণা পাইতে পারেন।"[২]

বিষ্ণুপুরাণ গ্রন্থটি মৈত্রেয় ও তাঁহার গুরুদেব পরাশরের মধ্যে কথোপকথনের আকারে রচিত হইয়াছে। এই পরাশর ব্যাসদেবের পিতা।

দৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, পালন ও ধ্বংস সম্বন্ধে চরম সত্য কি, শিষ্যের এই প্রশ্নের উত্তরে পরাশর সোজাসুজি বলিলেন, "এই জগৎ বিষ্ণু হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, বিষ্ণুতেই জগৎ সংস্থিত, বিষ্ণুই এই জগতের একমাত্র পালনকর্তা ও পরিচালক, বস্তুতঃ জগৎই বিষ্ণু।"[৩] ইহাই বিষ্ণুপুরাণের, বস্তুতঃ সমুদয় পুরাণেরই, সার কথা। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, উপনিষদ্ ও ব্রহ্মসূত্রে যে অদ্বয় চরম আধ্যাত্মিক তত্ত্বকে ব্রহ্ম ও পরমাত্মা বলা হইয়াছে, তাহার সহিত বিষ্ণু অভিন্ন। পরাশর তাঁহার একটি বিষ্ণু-স্তোত্রে এই কথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। উহাতে বিষ্ণুকে এক, অনন্ত, নিত্য, অপরিণামী, পরিপূর্ণ, সর্বব্যাপী ও সর্বাতীত পরম-আত্মা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে ;[৪] এবং ঘোষণা করা হইয়াছে যে, হিরণ্যগর্ভ, হরি, শঙ্কর, বাসুদেব, তার, অচ্যুত, পুরুষোত্তম, নারায়ণ, ব্রহ্মা, শিব প্রভৃতি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ নামগুলি একমাত্র বিষ্ণুতেই প্রযোজ্য। সম্ভবতঃ, সর্বসম্প্রদায়ের মূল ঐক্য প্রদর্শনের জন্যই এই সকল নামের উল্লেখ করা হইয়াছে।[৫] এখানে এবং অন্যত্র পরাশর বলিতে চাহিয়াছেন যে, বেদ-বাদী, বেদান্তবাদী, বৈষ্ণব, শৈব, পঞ্চরাত্রী, একান্তী, ভাগবত, পাশুপত, যোগী, শব্দব্রহ্মবাদী এবং অন্যান্য সম্প্রদায় সকলও একই পরম আত্মার উপাসনা করে। বিভিন্ন নাম ও রূপে তিনিই বিশ্বের চরম অধিষ্ঠান, প্রভু ও আত্মা এবং সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক ধর্মান্ধতা ও সঙ্কীর্ণতা অজ্ঞান হইতে উদ্ভূত।

মহাকালে যে সংসারপ্রবাহের আদি নাই, অন্ত নাই, যাহা সৃষ্টি, বিকাশ ও ধ্বংসের অসংখ্য কল্পের মধ্য দিয়া চলিয়াছে, তাহা ব্যাখ্যা করিবার জন্য পরাশর বেদান্তের চরম আধ্যাত্মিক অদ্বৈতবাদ হইতে আরম্ভ করিয়াছেন। পরাশর বলেন যে, এই বিশ্বসৃষ্টির মূল অধিষ্ঠান যে পরম চেতনতত্ত্ব, তাহা স্বরূপে মনুষ্যবুদ্ধির সর্বোচ্চ ধারণারও উর্ধ্বে (পরঃ পরাণাং পরমঃ)। উক্ত চরম তত্ত্ব নাম, রূপ বা যে কোন প্রকার বিকল্প বিবর্জিত ; এমন কোন বিশেষ বিধেয় নাই, যাহার দ্বারা ইহার ভাবাত্মক ধারণা হইতে পারে ; উহার জন্ম, বৃদ্ধি, পরিবর্তন, ক্ষয় ও ধ্বংস প্রভৃতি কোন কালিক ধর্ম নাই ; "ইহা সদাই অস্তিত্বশীল"[৬] ইহা ছাড়া, উহার সম্বন্ধে আর কিছুই বলা যায় না।

ইহা যে নির্গুণ ব্রহ্মের ধারণা তাহা সুস্পষ্ট। পরাশরের মতে, ইহাই বিষ্ণুর মূল স্বরূপ। পরাশর আরও বলিয়াছেন যে, এই অসীম, অনন্ত, অবিকারী, নিষ্ক্রিয়, নির্গুণ চরম চেতনতত্ত্বই এই সসীম, কালিক, নিয়ত পরিবর্তনশীল আকস্মিক ও কাদাচিৎক বস্তুর জগতে নিজেকে প্রকট করে। উহা এই জগতের সর্বত্র সর্ববস্তুর অভ্যন্তরে অবস্থান করে এবং উহা এই বিশ্বের সকল বস্তুর অধিষ্ঠান। এইজন্য, যে সব জ্ঞানী জগতের সারতত্ত্বের অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা উহাকে বাসুদেব নামে অভিহিত করেন।[৭] বাসুদেব চিরকাল বিশ্বাতীত, আবার চিরকাল বিশ্বে অনুস্যূত। যদিও তিনি সদাই এক ও অদ্বিতীয়, তথাপি তিনি সর্বদাই 'পুরুষ', 'প্রকৃতি', 'ব্যক্ত' ও 'কাল'রূপে নিজেকে প্রকাশ করেন। এখানে পুরুষ বলিতে বিশ্বাত্মা ও জীবাত্মা দুইই বুঝায়, প্রধান বা প্রকৃতি বলিতে সেই অব্যক্ত মূল শক্তি বুঝায়, যাহা সকল প্রকার ভেদযুক্ত সূক্ষ্ম ও স্থূল ব্যক্ত বস্তুর মূল উপাদান-কারণ এবং ব্যক্ত শব্দের অর্থ ভেদযুক্ত ব্যক্ত বস্তুর জগৎ। বিষ্ণুর মূল স্বরূপ (বিষ্ণোঃ পরমং পদম্) সর্বদাই বিশ্বাতীত। পুরুষ, প্রধান, ব্যক্ত ও কালরূপ তাঁহার যে বিভিন্ন প্রকাশ আছে, তাহা দ্বারা তাঁহার এই বিশ্বাতীত স্বরূপ ব্যাহত হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া বিষ্ণুর এই বিভিন্ন আত্মপ্রকাশ অ-সৎ নহে। যে সব পরিচ্ছিন্ন কার্যবস্তুদ্বারা জগৎ গঠিত, তাহদের উৎপত্তি, সুব্যবস্থিত ক্রিয়া, প্রণালীবদ্ধ পরিবর্তন, বিকাশ ও ধ্বংসের কারণ হইতেছে বিষ্ণুর এই রূপচতুষ্টয়। বিষ্ণুর এই সকল বিভিন্নরূপে আত্মপ্রকাশের সঙ্গে ক্রীড়ারত বালকের স্বাধীন উদ্দেশ্যবিহীন ও আনন্দপূর্ণ গতি বা আত্মপ্রকাশের তুলনা করা যাইতে পারে। ইহাই লীলাবাদ বলিয়া কথিত হয় এবং ইহা সমুদয় পুরাণ কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে।[৮] তাহার পর পরাশর সাংখ্যদর্শনের প্রণালী অবলম্বন করিয়া জগতের অভিব্যক্তি বা ক্রমবিকাশ এবং কালে ইহার বিলোপ কি ভাবে হয়, তাহা দেখাইয়াছেন। এইভাবে, তিনি এই সুবিন্যস্ত জগতের ব্যাখ্যা দিতে গিয়া বেদান্তের অদ্বৈতবাদের সহিত সাংখ্যের দ্বৈতবাদ যুক্ত করিয়াছেন। পরাশরের মতবাদ প্রাচীন সাংখ্য-মতবাদ হইতে পৃথক। কারণ তিনি কালকে জগতের অভিব্যক্তি ও বিলয়ের একটি সক্রিয় কারণ বলিয়া গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন।

মৈত্রেয় এই জটিল প্রশ্নটি উত্থাপন করিয়াছেন—নির্গুণ-এর পক্ষে কি করিয়া সগুণ হওয়া সম্ভবপর, অর্থাৎ কিভাবে ইহা ধারণা করা যায় যে, অসীম, অনন্ত, নির্গুণ, অপরিণামী, নিষ্ক্রিয় ও শুদ্ধ চেতন ব্রহ্ম এই জড় জগতের সক্রিয় স্রষ্টা, শাসক ও ধ্বংসকর্তা হন অথবা অসংখ্যশ্রেণীর সসীম, পরিবর্তনশীল ও সাপেক্ষ পদার্থ-

সমূহের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করেন? এই প্রশ্নই বৈদান্তিকদিগকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত করিয়াছে। পরাশর এই ক্ষেত্রে কোন বিশেষ বেদান্ত সম্প্রদায়ের পক্ষ গ্রহণ করেন নাই, কারণ তাঁহার মতে এই প্রশ্নের উত্তর মনুষ্যবুদ্ধির বাহিরে। দ্বিধাহীনভাবে তিনি উত্তর দিয়াছেন যে, যাহা সখণ্ড পরোক্ষজ্ঞানে যুক্তির দৃষ্টিতে অসম্ভব বলিয়া মনে হয়, তাহা পরম আত্মার স্বরূপনিষ্ঠ অনির্বচনীয় বিচিত্র শক্তির প্রভাবেই সম্ভবপর হয়[১], তাঁহার উক্তির অন্তর্নিহিত যুক্তিটি এইরূপ: বস্তুর অন্তর্নিহিত শক্তিসকল সর্বদাই রহস্যপূর্ণ বা দুর্জ্ঞেয়। এই শক্তিগুলিকে কেবলমাত্র সাক্ষাৎ অনুভূতি দ্বারা জানা যাইতে পারে, অথবা উৎপন্ন কার্য দেখিয়া কল্পনা করা যাইতে পারে—কার্যের উল্লেখ ভিন্ন এই শক্তি সম্বন্ধে কোন প্রকার ধারণা করাই সম্ভবপর নহে। চরম সৎ ব্রহ্মকেও এইরূপ একটি অসাধারণ শক্তির আধার বলিয়া মনে করিতে হইবে, যাহা তাহার বিশ্বাতীত স্বরূপ কিছুমাত্র ব্যাহত না করিয়া এই সকল কার্যবস্তুর সৃষ্টি, স্থিতি, পরিচালনা ও ধ্বংস সংসাধন করিতে পারে।

এই বিচিত্র শক্তির জন্যই পরাশরের মতে ব্রহ্ম সদাই অস্তিত্ববান্ ও জায়মান (অস্তি-জায়তে), এক হইয়াও বহু (একানেক), অব্যক্ত ও ব্যক্ত (ব্যক্তাব্যক্ত), নির্গুণ ও অসংখ্য বিভূতিযুক্ত (নির্গুণানন্তগুণ) নিষ্ক্রিয় ও সতত ক্রিয়াশীল (নিষ্-ক্রিয়-সতত-ক্রিয়), প্রভৃতি। চরম সৎ এর এই অনন্যসাধারণ শক্তি মায়া-শক্তি বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। যেহেতু মায়ার ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, সুতরাং কোন অবস্থায়ই ব্রহ্মের অদ্বৈত স্বভাব ব্যাহত হয় না। কিন্তু ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইলেও, মায়া ব্রহ্মের অনুপম শক্তি বলিয়া, উহা দ্বারা বিশ্বের পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। ইহাই সদ্‌বস্তু সম্বন্ধে পুরাণগুলির মোটামুটি ধারণা।

জগতের ঈশ্বরনির্মিত শৃঙ্খলা সম্পর্কে সত্য-সন্ধানীর অধিক হইতে অধিকতর জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার জন্য পরাশর নিম্নোক্ত বিষয়গুলির পৌরাণিক মতানুসারে বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিয়াছেন: জড় প্রকৃতির ক্রমবিস্তৃতি ও বৈচিত্র্য সম্পাদন; বিভিন্ন শ্রেণীর মনুষ্যেতর প্রাণীর ক্রমবিকাশ; মনুষ্যজাতির উন্নতি; মানবজাতির বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বৌদ্ধিক, নৈতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির প্রসার; জগতে পর্যায়ক্রমে আসুরিক ও দৈবশক্তির উত্থান ও পতন; জগতের সুশৃঙ্খল ব্যবস্থায় নৈতিক নিয়মের অর্থাৎ কর্মফলের রাজত্ব; মনুষ্যসমাজে অসাধারণ ব্যক্তিগণের (অসাধারণ গুণসম্পন্ন সাধু, জ্ঞানী ও বীরপুরুষগণের) নৈমিত্তিক আবির্ভাব, অর্থাৎ জগতের সঙ্কটকালে দৈবশক্তি, জ্ঞান ও প্রেমের বিশেষ প্রকাশ, ইত্যাদি। এই সকল আলোচনা একটি মূল সত্যকে কেন্দ্র করিয়া করা হইয়াছে এবং

বার বার এই সত্যের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে। এই সত্যটি হইতেছে এই যে, বিশ্বের সর্ব নৈসর্গিক, ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক কার্যপ্রবাহের প্রারম্ভে, প্রত্যেক ধাপে ও অন্তে পরমাত্মা বিরাজমান। বহু মনোরঞ্জক উপাখ্যানের উদাহরণ দ্বারা ইহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে যে, ঈশ্বরের ব্যবস্থায়, জগতে প্রাকৃতিক নিয়ম অপেক্ষা নৈতিক নিয়ম উচ্চতর এবং নৈতিক বিধি অপেক্ষাও প্রেম ও করুণা উচ্চতর। ঈশ্বরের অবতারগণের বা বিভূতিদের মধ্যে কৃষ্ণকে নরদেহে পরমাত্মার পরিপূর্ণ আত্মপ্রকাশ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার জীবনী খুব বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।[১০]

ইহাই সংক্ষেপে বিষ্ণুপুরাণের দার্শনিক মত; এবং ইহাকে সাধারণভাবে যে-কোন পুরাণের আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিনিধিস্থানীয় বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

৩। ভাগবতের দর্শন

ভাগবতের তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী বিষ্ণুপুরাণের দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত এক। ভাগবতে পরিষ্কার বলা হইয়াছে যে, "চরম তত্ত্ব হইতেছে এক, অনন্ত ও অদ্বৈত চিৎস্বরূপ (জ্ঞানম্ অদ্বয়ম্) এবং ইহা সেই একই চরম তত্ত্ব যাহা ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ বলিয়া কথিত যইয়া থাকে।"[১১] বিষ্ণুপুরাণের ন্যায় ভাগবতও পরমাত্মার নির্গুণ ও সগুণ এই উভয় স্বরূপই স্বীকার করে। একটি বিখ্যাত শ্লোকে, ভগবান্ তাঁহার স্বরূপ ব্রহ্মার নিকট এইভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, "সৃষ্টির আদিতে (বিশ্বে আমার আত্মপ্রকাশের পূর্বে) আমি আমার মধ্যে একাই ছিলাম, এবং আমার অতিরিক্ত অব্যক্ত বা ব্যক্ত অন্য কিছুই ছিল না। এই বিচিত্র জগৎসৃষ্টির পরেও একমাত্র আমারই অস্তিত্ব আছে, (কারণ এই সকল আমারই আত্মপ্রকাশ, আমি হইতে ভিন্ন কোন কিছুর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই)। আবার এই সকল বৈচিত্র্যের ধ্বংসের পরেও একমাত্র আমিই বর্তমান থাকিব। (কারণ আমার কালিক আত্মপ্রকাশসকল কালক্রমে আমাতেই বিলীন হইবে)।"[১২]

তিনি তাঁহার সর্বাতীত নির্গুণরূপে ব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত; আবার নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা, রক্ষক, পরিচালক ও ক্রিয়াশীল আত্মারূপে তিনি পরমাত্মা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন; কিন্তু যখন তাঁহাকে তাঁহার সর্ব ঐশ্বর্যময় ক্ষমতা ও বিভূতির সহিত ভাবা হয়, তখন তিনি ভগবান্ বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। ভগবান্ রূপে

তিনি সর্বমানবের প্রশংসা, শ্রদ্ধা, ভক্তি, ধ্যান ও প্রেম লাভ করিবার যোগ্য। ভগবানের সুবিন্যস্ত বিশ্বে মানুষ তাঁহারই সসীম আত্মপ্রকাশ, এবং অন্যান্য জীবের তুলনায় সে নিজের নিয়ামক, স্ব-চেতনাযুক্ত ও বুদ্ধিমান্। ভগবানের আত্মপ্রকাশ-গুলির বিবিধ স্তরে তাঁহার যে বিভিন্ন ঐশ্বর্যসমূহ অভিব্যক্ত হইয়াছে, সেই সব ঐশ্বর্যের মহিমা-কীর্তনে ভাগবতের বিশেষ অভিরুচি লক্ষিত হয়। তাঁহার ধারণাতীত শক্তি, জ্ঞান ও ঐশ্বর্য এই জগৎসজ্ঘাতের শৃঙ্খলা, সঙ্গতি ও জটিলতার মধ্যে প্রকাশিত হয় বটে, কিন্তু তাঁহার প্রেম ও অনুকম্পা, সৌন্দর্য ও মাধুর্য প্রভৃতি উচ্চতর আধ্যাত্মিক গুণ সকল তাঁহার আত্মপ্রকাশের উচ্চতর স্তরগুলির মধ্যেই প্রকাশিত হয়, এবং তাঁহার সর্বোচ্চ গুণসকল তাঁহার সর্বোচ্চ স্তরের ভক্তদের মধ্যে অভিব্যক্ত হয়।

ভগবানের পরিপূর্ণ স্বভাবে আপাতদৃষ্টিতে যে-সব যৌক্তিক বিরোধ প্রতীয়-মান হয়, সেগুলি অপনোদন করার জন্য ভাগবত বিষ্ণুপুরাণের অনুসরণ করিয়া ভগবানের মায়াশক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। (সেয়ম্ ভগবতো মায়া যন্ন্যায়েন বিরুধ্যতে)।[১৩]

সাংখ্যের মত এই যে, জগৎ প্রকৃতি হইতে অভিব্যক্ত এবং প্রকৃতিতেই লীন হয়। কিন্তু ভাগবতের মতে ভগবানই সকল বৈচিত্র্যের নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ। তথাপি, বিষ্ণুপুরাণের ন্যায়, ভাগবতও এই নিজস্ব মতের সহিত উক্ত সাংখ্যমতের সমন্বয় সাধন করিয়াছে; প্রকৃতপক্ষে, এই সমন্বয়ের ব্যাপারে ভাগবত আরও এক ধাপ বেশি অগ্রসর হইয়াছে। উহা যে শুধু সাংখ্যদর্শনকে একটি যুক্তিসঙ্গত সেশ্বরবাদ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছে, তাহা নহে, অধিকন্তু উহা কপিলকে ভগবানের এক অবতার এবং ভক্তিযোগের একজন শ্রেষ্ঠ আচার্য বলিয়াও স্বীকার করিয়াছে।[১৪] (স্ক-৩ অধ্যায় ২৫-২৯) ইহা ভিন্ন, মায়া পরমতত্ত্বের অনুপম শক্তি হওয়ায়, শৈব সম্প্রদায়ের শক্তিবাদও ইহাতে সমন্বিত হইয়াছে। কর্মের অলঙ্ঘ্য নিয়ম এই দুর্জ্ঞেয় অনুপম শক্তির অধীন এবং উহারই কাজ করিবার একটি প্রণালী মাত্র।

ভাগবতের দর্শনে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, ইহাতে পুরাণসমূহের ঐশ্বরিক লীলাবাদের সহিত (অর্থাৎ প্রপঞ্চ পরমাত্মার ক্রীড়াত্মক আত্মপ্রকাশ, এই মতের সহিত) বেদান্ত দর্শনের মায়াবাদ, সাংখ্যের প্রকৃতিবাদ, শৈবসম্প্রদায়ের শক্তিবাদ এবং মীমাংসা ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের কর্মবাদের সমন্বয়সাধনের জন্য একটি সাতিশয় কলাকুশল প্রযত্ন করা হইয়াছে। লীলার ধারণা সমস্ত গ্রন্থখানির মধ্যে বহু দৃষ্টান্তসহ বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই ধারণা বিশ্বের বস্তুনিচয় সম্বন্ধে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীর এক আমূল পরিবর্তন সাধন করে। পরমার্থতঃ, এই বিশ্ব কোন

মূল জড় শক্তির স্বাভাবিক ক্রমবিকাশ নহে, কিংবা কোন নিষ্ক্রিয় সচ্চিৎ তত্ত্বের অনির্বাচ্য মায়াজনিত ভ্রান্তিবিবর্তনও নহে, অথবা কোন সক্রিয় পুরুষের উদ্দেশ্য বা ইচ্ছার, কিংবা তাহার স্বেচ্ছাকৃত কার্য বা অনিচ্ছাকৃত ক্রিয়ার ফল নহে, অথবা জীবাত্মাসকলের কর্মফলপ্রসূত নহে। ভাগবতের মতে, ক্রীড়ার উপমাই জগতের সহিত ভগবানের কার্যকারণ সম্বন্ধ বুঝিবার শ্রেষ্ঠ উপায়। ক্রীড়া বা খেলা যখন কোন উদ্দেশ্য বা বাধ্যবাধকতা দ্বারা কলুষিত না হয়, তখন উহা ক্রীড়কের নিজ পূর্ণতা, আনন্দ ও মাধুর্যের আভ্যন্তরিক প্রেরণাত্মক চেতনার স্বতঃস্ফূর্ত আত্মপ্রকাশ। ক্রীড়ার ধারণাদ্বারাই পরমাত্মার অনুপম শক্তি মায়ার ধারণার সর্বাপেক্ষা অধিক নিকটে পৌছান যায়। সমস্ত বিশ্ব-সৃষ্টিই পরমাত্মার লীলা (দৈবলীলা)—উহা হইতেছে দেশকালাবচ্ছিন্ন জগতে পরমাত্মার দেশ-কালাতীত পরিপূর্ণ আত্মতৃপ্তির স্বাধীন ও অহৈতুক আত্মপ্রকাশ।

যদি লীলাবাদের এই দৃষ্টিভঙ্গী পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করা যায়, তাহা হইলে এই প্রতীয়মান জগৎ তাহার সর্ব বৈচিত্র্যসহ একটি সুন্দর ও চমৎকার শিল্পসৃষ্টি বলিয়া প্রতিভাত হয়। তখন বুঝিতে পারা যায় যে জগৎ ভগবৎস্বরূপের পরিপূর্ণ সৌন্দর্য, বৈভব ও আনন্দের মূর্তরূপ। উপনিষদের ঋষি বলিয়াছেন, ব্রহ্ম হইতেছে সত্য, জ্ঞান, মঙ্গল, সৌন্দর্য ও আনন্দ। সুতরাং এই জগতের সব কিছুই সত্য ও জ্ঞান, মঙ্গল ও সৌন্দর্য, পরিপূর্ণতা ও আনন্দের মুক্ত উদ্দেশ্যবিহীন ক্রীড়াময় আত্মপ্রকাশ। যাহা অসীম ও অনন্ত তাহাই সর্বত্র সসীম ও ক্ষণস্থায়িরূপে ক্রীড়া করে। আমাদের খণ্ডবুদ্ধিতে যে সকল ঘটনা অসত্য বা অজ্ঞতাপ্রসূত, কু বা বিশ্রী, বন্ধন বা দুঃখের কারণ বলিয়া প্রতিভাত হয়, সেই সকল ঘটনারও এই বিরাট শিল্পসৃষ্টিতে উপযুক্ত স্থান আছে, এবং এইগুলিও প্রণালীবদ্ধ সমগ্রের সৌন্দর্যসৃষ্টিতে সাহায্য করে, এবং এইগুলি পরমনিপুণ ক্রীড়কের স্বতঃস্ফূর্ত আত্মাভিব্যক্তি। অজ্ঞান ও অসম্পূর্ণ জ্ঞান, আপাতপ্রতীয়মান কু-প্রবৃত্তি, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ঘৃণা ও শত্রুত্ব মনুষ্যসমাজে বিদ্যমান। অত্যাচার ও হতাশা যখন পরমাত্মার লীলাময় আত্মপ্রকাশরূপে বিবেচিত হয়, তখন উহারা নবরূপে প্রতিভাত হয়, যে জ্ঞানী ব্যক্তি সব কিছুকেই ঐশ্বরিক লীলার দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া দেখিতে শিক্ষা করিয়াছেন, তিনি জগতের বাস্তব ঘটনা দেখিয়া ভীত হন না, সংসার হইতে দূরে পলায়ন করিতে চান না, অথবা পরমাত্মার ভেদহীন অদ্বৈতস্বরূপের মধ্যে নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়া মুক্তির সন্ধান করেন না। তিনি বিশ্বের সর্বত্র পরমাত্মাকেই দেখিতে পান। সে কারণ তিনি যাহা আপাতদৃষ্টিতে কুৎসিত ও ঘৃণার্হ, তাহাকেও অসীম, অনন্ত পরম প্রেমাস্পদের লীলাময় প্রকাশ মনে

করিয়া ভালবাসেন, আলিঙ্গন করেন এবং সাহসের সহিত গ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার নিজের মধ্যে, সর্ব মনুষ্য ও প্রাণীর মধ্যে এবং এই জগতের সকল বস্তু ও শক্তির মধ্যে পরমাত্মাকে দেখেন, ভালবাসেন এবং সেবা করেন।

লীলাবাদ অবতারবাদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ; এবং ভাগবতে এই অবতারবাদের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে।[১৫] অবতারের শব্দানুযায়ী অর্থ অবতরণ বা নামিয়া আসা। পরমাত্মা তাঁহার অপূর্ব শক্তি মায়ার সাহায্যে ক্রীড়াচ্ছলে পরম একত্বের ভূমি হইতে সাপেক্ষ বহুর ভূমিতে নামিয়া আসেন, অসীম ও অনন্তের ভূমি হইতে দেশ-কালের ভূমিতে, অ-দ্বৈত অপরিণামী সৎ-চিৎ আনন্দের ভূমি হইতে এই বৈচিত্র্যময় পরিবর্তনশীল, চেতনাচেতন অপূর্ণ বস্তুর জগতে অবতরণ করেন; কিন্তু কোন অবস্থাতেই ইঁহার বিশ্বাতীত স্বরূপ নষ্ট হয় না। একদিকে তিনি বিশ্বের উর্ধ্বে অবস্থান করিয়া স্বীয় অদ্বয়স্বরূপের পরিপূর্ণতা অনন্ত কাল ধরিয়া উপভোগ করেন। আবার অপরদিকে তিনি একই সময়ে তাঁহার বিশ্বাতীত পরিপূর্ণতাকে দেশ ও কালে বিদ্যমান সাপেক্ষ জগতে স্বাধীনভাবে প্রকাশ করেন এবং বিশ্বের সর্ব-অংশে উহাদের প্রকৃত আত্মারূপে প্রবিষ্ট হইয়া তিনি তাহাদের মধ্যে নিজের অসীম মহিমা উপভোগ করেন।

পরমাত্মাই যে এই বিশ্ব ও বিশ্ববৈচিত্র্যের অধিষ্ঠান ও আত্মা, এই ধারণা উপনিষদের ঋষি এবং সকল যুগের সাধুসন্তদের আধ্যাত্মিক অনুভবে প্রকাশিত হইয়াছে। আর অবতারের ধারণা অর্থাৎ এই পরিবর্তনশীল সসীম সাপেক্ষ জগতে পরমাত্মার অবতরণের ধারণা উক্ত অধিষ্ঠানের ধারণার মধ্যেই অন্তর্নিহিত আছে। ভাগবতে উদাহরণের সাহায্যে এই অবতারের ধারণা বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ভাগবতে বলা হইয়াছে যে, ভগবানের প্রথম অবতরণ হইতেছে তাঁহার পুরুষরূপে আবির্ভাব; এই পুরুষ বিশ্বের আত্মা, অর্থাৎ সমগ্র জগতে অনুস্যূত পরমাত্মা।[১৬] এই পুরুষাবতারকে নারায়ণের সহিত অভিন্ন মনে করা হইয়াছে। (আর নারায়ণ শব্দটির অর্থও সকল নর বা পরিচ্ছিন্ন জীবের আত্মা এবং আশ্রয়, অর্থাৎ বিশ্বাত্মা)। এবং ইহাও বলা হইয়াছে যে, তিনি বিভিন্ন অবতারগণের অক্ষয় বীজ ও আশ্রয়স্থল।[১৭]

এই দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করিলে, জগতের বিভিন্ন স্তরের জীবদিগকে, সাধারণ অর্থে, পরমতত্ত্বের অবতার বলিয়া অভিহিত করা যায়, কিন্তু সচরাচর অবতার শব্দটি বিশেষ অর্থেই ব্যবহৃত হয়। ইহা নিঃসন্দিগ্ধ যে, বিশ্বের সর্ব আপাতপরিচ্ছিন্ন জীব পরমাত্মারই আত্মপ্রকাশ এবং ইহাদিগকে পরমতত্ত্ব হইতে ভিন্ন ও পৃথক্

সত্তাবান্ বলিয়া দেখা অবিদ্যা বা অজ্ঞান।[১৮] তথাপি ইহা সত্য যে পরমাত্মার মায়াশক্তি ইহাদিগকে পরমাত্মার সহিত বিভিন্ন প্রকারের সম্বন্ধযুক্ত করিয়া প্রদর্শন করে। এই সব আত্মপ্রকাশের অনেকগুলি এরূপ যে, উহাদের মধ্যে অনুস্যূত বিশ্বাত্মার আধ্যাত্মিক স্বরূপ পূর্ণভাবে আবৃত থাকে। ইহারা সম্পূর্ণ জড়বস্তু বা জড়শক্তি বলিয়া প্রতিভাত হয়। সর্বনিম্নস্তরের প্রাণিসকলের মধ্যেও পরমাত্মার আধ্যাত্মিক স্বরূপ খুবই অল্প পরিমাণে অনাবৃত হয়। কারণ সেখানে উহা শুধু অচেতন প্রাণশক্তি-রূপে দেখা দেয়। উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরের জীবগণের মধ্যে আত্মার আধ্যাত্মিক স্বরূপ ক্রমান্বয়ে অধিক অধিক অনাবৃত হয় এবং উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরের সচেতন ও আত্মনিয়ন্ত্রিত জীবন অভিব্যক্ত হয়। বিশ্বে ভগবানের যে সব আত্মপ্রকাশ আছে তাহাদের মধ্যে মানুষের ভিতর তাঁহার আধ্যাত্মিক স্বভাব সর্বাপেক্ষা অধিক প্রকাশিত হইয়াছে। মানুষের মধ্যে অন্যান্য প্রাণীদের তুলনায় কিয়ৎপরিমাণে চিন্তা, হৃদয়াবেগ ও ইচ্ছার স্বাধীনতা প্রকাশ পাইয়াছে এবং সসীম ও কালিক বস্তুর মধ্যে অসীম ও অনন্তকে, জড়ের মধ্যে আত্মাকে এবং এই বন্ধনের জগতে পরিপূর্ণ মুক্তির আনন্দকে উপলব্ধি করার সম্ভাবনা উৎপন্ন হইয়াছে। ভাগবতে মনুষ্যজন্মের বিশেষভাবে প্রশংসা করা হইয়াছে এবং মানুষকে সর্বদিক দিয়া তাহার অসীম সম্ভাবনার বিষয়ে সচেতন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এমনকি, মনুষ্যজীবনকে দেব দেবী প্রভৃতি স্বর্গের জীবদের জীবন অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রশংসা করা হইয়াছে।[১৯] মনুষ্যশ্রেণীর মধ্যে আবার শ্রেষ্ঠ সাধু ও জ্ঞানী, শ্রেষ্ঠ বীর ও লোকহিতৈষীদের (শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, ভক্ত, কর্মী ও প্রেমিকদের) অসামান্য জীবনে ঐশ্বরিক গুণগুলি সমধিক প্রকট হইয়াছে। এইগুলি পরমাত্মার বিশেষ ঐশ্বর্য বা বিভূতির মূর্তরূপ বলিয়া কথিত হয়।[২০] ভাগবত সত্যসন্ধানীদিগকে এই জগতে সর্বস্তরের বস্তুকেই শ্রদ্ধা করিতে শিক্ষা দেয় ; কারণ এইগুলি পরমাত্মার প্রকাশ বা মূর্তরূপ। তথাপি ইহা পরমাত্মার এমন কয়েকটি বিশেষ স্তরের প্রকাশের দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করে, যেগুলি মাঝে মাঝে এই জগতে বিশেষ কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য, বিশেষতঃ মনুষ্যসমাজের জাগতিক মঙ্গল, এবং সৃষ্ট প্রাণীদের অধ্যাত্ম-উন্মেষের জন্য (ভূতানাং ক্ষেমায় চ, ভবায় চ), এই জগতে আবির্ভূত হইয়া থাকে।[২১] ভগবান সঙ্কটকালে নরদেহে, কিন্তু অসাধারণ দৈবশক্তিতে শক্তিমান হইয়া, এমন কোন কোন বিশেষ কার্য সম্পাদন করিবার জন্য অবতরণ করেন, যাহাতে জগতের, বিশেষভাবে মনুষ্যসমাজের প্রভূত নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সংসাধিত হয়—লোকের এইরূপ বিশ্বাস। জগতে অতিমানবীয় কার্য সম্পাদনের

জন্ত, পরিচ্ছিন্ন আকারে ভগবানের এইসকল বিশেষ আবির্ভাবকেই বিশেষ অর্থে অবতার বলা হইয়া থাকে।

এখন প্রশ্ন করা যাইতে পারে, ভগবান বিনাশ্রমে শুধু স্বীয় ইচ্ছাদ্বারা, অথবা বিশ্বের মূল সংগঠনের পরিবর্তন দ্বারা তাঁহার যে উদ্দেশ্য সম্পাদন করিতে পারিতেন, সেই উদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্য তাঁহাকে নিম্নে আগমন এবং দেহ ধারণ করিতে হয় কেন? কিন্তু এই প্রশ্ন অবান্তর, কারণ ভগবান কোন কার্যসাধনের জন্য এই পথ কি সেই পথ অবলম্বন করিবেন, এই ব্যাপারে তাঁহার কোন বাধ্যবাধকতা নাই। একই ধরনের অপর একটি নিষ্ফল প্রশ্ন হইতেছে, জগতের ধরনটি যে রকম, ঠিক ঐরকম কেন, অথবা কেন সেই শাশ্বত বিশ্বাতীত পরমাত্মা এই দেশ, কাল ও সাপেক্ষতার স্তরে নামিয়া আসিলেন, এবং নিজেকে এক জটিল বিশ্বের ধারায় প্রকট করিলেন। এই সবই ভগবানের লীলা, তাঁহার নিত্য স্ব-রমমাণ অধ্যাত্ম-স্বরূপের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। আমাদের কর্তব্য হইতেছে, বিশ্বে তাঁহার লীলাময় আত্মপ্রকাশের বিভিন্ন প্রকার সম্বন্ধে প্রশংসা, শ্রদ্ধা ও প্রেমের সহিত আলোচনা ও চিন্তা করা, তৎসম্বন্ধে অবান্তর ও নিরর্থক প্রশ্ন উত্থাপন করা নহে।

ভগবান্ তাঁহার অবতার-লীলার উদ্দেশ্য সম্পর্কে গীতায় যাহা বলিয়াছেন, তাহা গ্রহণ করিয়া ভাগবতে আরও বলা হইয়াছে যে, স্বীয় সৃষ্টজীবের প্রতি (বিশেষতঃ তাঁহার মানবরূপী আত্মাভিব্যক্তির প্রতি) তাঁহার যে প্রেম ও করুণা, তাহাই তাঁহাকে নিম্নে অবতরণ এবং বিভিন্ন দেহ (বিশেষভাবে মানবীয় দেহ) ধারণ করায়। এই সকল বিভিন্ন রূপে তিনি এমন সব কার্য সম্পাদন করেন, যাহা সাধারণ লোকের মন ও হৃদয় হরণ করে। এমনকি, এইগুলির বর্ণনা শুনিয়াও সাধারণ লোক তাঁহার প্রতি ভক্তিভাবাপন্ন হয়।[২২] তাঁহার প্রতি কার্যে, তাঁহার সৌন্দর্য ও কল্যাণময়ত্ব, প্রেম ও করুণা, বিশুদ্ধি ও ক্রীড়াশীলতার প্রত্যক্ষপ্রকাশ বিদ্যমান। তিনি তাঁহার অবতারলীলায় ভক্তদিগের নিকট চাক্ষুষ প্রমাণদ্বারা প্রতিপাদন করেন যে, জীবের পক্ষে চৈতন্যের এমন এক উচ্চ অবস্থা লাভ করা সম্ভবপর, যাহাতে জীব একই সঙ্গে দেবতা ও মানুষ দুইই হইতে পারে, যাহাতে স্বীয় অন্তরতম অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণতার আনন্দ না হারাইয়াও পরিচ্ছিন্ন জীবরূপে মানুষ কর্ম করিতে পারে, যাহাতে মানুষ এই জগতের সর্বপ্রকার জটিল ব্যাপারের সহিত সংযুক্ত থাকিয়াও একই সঙ্গে ইহাদের প্রতি অনাসক্তও থাকিতে পারে এবং সব কিছু মধুর ক্রীড়ারূপে উপভোগ করিতে পারে। পরমাত্মা স্বীয় অবতারগণকে অবলম্বন করিয়া নিজেকে মনুষ্যরূপে পরিবর্তিত করেন এবং মানুষের মন ও হৃদয়ের অতি সন্নিকটে আসেন। আর এইভাবে

তিনি মানুষকে স্বীয় দিব্য স্বভাবের দিকে আকর্ষণ করিয়া তাহাকে দেবত্বে উন্নীত করিতে চাহেন। মনুষ্যত্ব ও দেবত্বের ব্যবধান অবতাররূপ সেতুদ্বারা দূরীভূত হয়। মানুষের অধ্যাত্ম আকাঙ্ক্ষার চরিতার্থতা এইরূপ ঐশী লীলার সাহায্যে সহজ হয়।

ভাগবতের মতে অবতারদের সংখ্যা অগণিত। যেমন, সহস্র সহস্র স্রোতস্বিনী কোন নিত্য পরিপূর্ণ হ্রদ হইতে বাহির হইয়া বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত হয়, তদ্রূপ সকল বস্তুর অনন্ত উৎস হরি হইতে অসংখ্য অবতার এই ধরায় অবতরণ করেন।[২৩] ভাগবতে দেবত্ব-প্রকাশের তারতম্যের ভিত্তিতে অবতারদিগের মধ্যে বিভিন্নতা স্বীকৃত হইয়াছে। যে অবতারগণের মধ্যে দেবত্ব উজ্জ্বলতমভাবে প্রকাশিত, তাঁহাদিগকে পূর্ণাবতার আখ্যা দেওয়া হয়, যাঁহাদের মধ্যে এই দেবত্বের কোন কোন বিশেষ অংশ প্রকাশিত হয়, তাঁহাদিগকে অংশাবতার আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে, এবং যাঁহাদের মধ্যে দেবত্বের প্রকাশ অংশাবতার অপেক্ষাও কম, তাঁহাদিগকে কলাবতার বলা হইয়া থাকে ইত্যাদি। ভাগবতে বেশ কিছু সংখ্যক অবতারের উল্লেখ আছে। অবতারের তালিকায় অন্যান্য অবতারগণের সহিত নারদ, কপিল, দত্তাত্রেয়, পৃথু (একজন আদর্শ নরপতি), ব্যাস, বুদ্ধ ইঁহারাও অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন। অবতারদিগের মধ্যে কৃষ্ণকে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করা হইয়াছে এবং তিনি পরমাত্মা বলিয়াই অভিহিত হইয়াছেন (ভগবান্ স্বয়ম্)।[২৪]

ভাগবত গ্রন্থখানির সর্বত্রই পাঠকবর্গকে বিশ্বলীলায় বিভিন্ন স্তরের ঘটনাবলীতে প্রকাশিত পরমাত্মার বিভিন্ন মহিমান্বিত গুণ ও শক্তিসম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ ও চিত্তাকর্ষক ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হইয়াছে ঃ যথা, ভূতসৃষ্টি, প্রাণীদের বংশবৃদ্ধি, বিশ্বে শৃঙ্খলা সংরক্ষণ, বিভিন্ন জাতীয় প্রাণীর ক্রমোন্নতি, ন্যায় ও সুবিচারের ব্যবস্থা, মানবেতিহাসের চক্রবৎ পরিবর্তন, ভক্ত ও ঈশ্বরের অনুকম্পাপ্রার্থীদের জীবনী, বীর ও সাধু-মহাপুরুষদের জীবনী, প্রলয়কালে জগতের পরমাত্মায় বিলয়, অধ্যাত্ম-জ্ঞানদ্বারা সাংসারিক বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ প্রভৃতি। বিশেষ বিশেষ স্তরের ঘটনায় ঈশ্বরের দুরধিগম্য মহিমা ও শক্তির বিশেষ বিশেষ অংশগুলি প্রদর্শিত হইয়া থাকে। যাহারা জ্ঞান, ভক্তি ও মুক্তিলাভের জন্য এবং দুঃখপরিহারের জন্য আন্তরিকতা ও ব্যগ্রতার সহিত চেষ্টা করে, শুধু তাহাদের জীবনেই সেই সর্বশ্রেষ্ঠ ক্রীড়ক নিজেকে প্রকৃত জ্ঞান, প্রেম ও মাধুর্য, শান্তি ও আনন্দের দাতারূপে এবং দুঃখ ও বন্ধন হইতে ত্রাতারূপে নিজেকে প্রকাশ করেন; এবং শুধু এই প্রকৃতির লোকেদের অনুভবেই ভগবান্ নিজেকে অসীম কারুণিক, প্রেমিক, উদার, কল্যাণময় ও সুন্দর বলিয়া ধরা দেন।

জ্ঞানী লোকেরা ভাগবতস্বভাবের এইসব নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও সৌন্দর্যব্যঞ্জক গুণগুলিকে তাঁহার স্রষ্টৃত্ব, পরিপালকত্ব ও সংহারকর্তৃত্ব অপেক্ষা উন্নত বলিয়া মনে করেন। তাই ভাগবতে ভাগবত-প্রকৃতির এই সকল উচ্চতর অভিব্যক্তি-সম্বন্ধে অধিকতর বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে।

কৃষ্ণের জীবনচরিত এই পুরাণখানির সর্বাপেক্ষা মূল্যবান অংশ, নব্বই অধ্যায় সংবলিত সমগ্র দশম স্কন্ধটি বিশেষভাবে ইহাতে নিয়োজিত হইয়াছে। বহু সাধুতুল্য দার্শনিক ভাগবতগ্রন্থের কেবলমাত্র এই অংশের উপর ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থে কৃষ্ণজীবনের যে বর্ণনা আছে তাহা কাব্যের দিক দিয়া যেমন চিত্তাকর্ষক, দর্শনের দিক দিয়া তেমনি জ্ঞানোন্মেষক। কৃষ্ণের জীবনচরিত আঁকিতে গিয়া ভাগবত কোন অসাধারণ মানুষকে দেবতার রূপ দেয় নাই, কিন্তু পরমাত্মাকেই মানুষের রূপ দিয়াছে। কৃষ্ণ স্বয়ং সেই পরমাত্মা (ভগবান্ স্বয়ম্); এই ধারণা হইতে ইহার আরম্ভ। তাহার পর কিভাবে মানুষের ভিতর দেবত্বের সুন্দর অভিব্যক্তি হইতে পারে, তাহা কৃষ্ণের লীলাময় সাংসারিক জীবনের নানা ঘটনার দৃষ্টান্তদ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। তিনি অতিসুষ্ঠুভাবে শিশু, বালক, কিশোর, যুবক, পুত্র, খেলার সাথী, আবেগপ্রবণ প্রেমিক, যোদ্ধা, আসুরী শক্তির দমনকারী, বৈদিক দেবদেবীদের দর্প-হরণকারী, রাজনীতিবিদ, সমাজ ও ধর্মসংস্কারক, ও অন্য বহু প্রকার পাত্রের অভিনয় করিয়াছেন। তাঁহার অক্ষমতাগুলি স্ব-জনিত এবং যখন ইচ্ছা তখনই তিনি সেইগুলি অতিক্রম করিতেন। কৃষ্ণের জীবনে পরমাত্মার সা'সারিক ও সংসারাতীত এই উভয় রূপই দৃষ্টিগোচর হয়।

পূতনা মাতৃবেশে শিশুকৃষ্ণকে হত্যা করিতে আসিয়াছিল ; কিন্তু কৃষ্ণ তাহার স্তন্য পান করিতে করিতে ক্রীড়াচ্ছলে তাহার প্রাণবায়ু শুষিয়া লইলেন। আবার তিনি মায়ের তাড়নায় ভীত হইয়া মুখব্যাদান করিলে বিরাট বিশ্বসৃষ্টি তাঁহার মুখগহ্বরে দেখা গিয়াছিল। বালক কৃষ্ণ মুখের ক্ষুদ্র গহ্বরের মধ্যে অনন্ত দেশ ও তদন্তর্ভুক্ত সর্বপদার্থ দেখাইয়াছিলেন। কিশোর কৃষ্ণ তাঁহার পিতাকে ইন্দ্রযজ্ঞ নামক প্রাচীন ধর্ম-কৃত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে প্ররোচিত করিয়াছিলেন। ইন্দ্র শাস্তি প্রদান করিতে আসিলে কৃষ্ণ তাঁহার ক্ষুদ্র অঙ্গুলির অগ্রভাগে গোবর্ধন পর্বত তুলিয়া তাহা বৃন্দাবনের অধিবাসীদের মাথার উপর ছাতার মত ধরিয়া রাখিলেন এবং এই ভাবে তাহাদিগকে ইন্দ্রের রোষ হইতে রক্ষা করিলেন। মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম তাঁহার লীলাময় ইচ্ছার নিকট হার মানিল এবং বেদের বিরাট দেবতা ইন্দ্র এই লীলাময় মনুষ্যদেহধারী দেবতার নিকট মস্তক নত করিলেন। অপর একদিন বৃন্দাবনের সরল বালক-বালিকাদের সহিত

ক্রীড়া করিবার সময়ে যখন দাবাগ্নি তাহাদের সকলকে পুড়াইয়া ভস্মে পরিণত করিতে যাইতেছিল, তখন কৃষ্ণ দাবাগ্নিকেই গ্রাস করিয়াছিলেন। মাঝে মাঝে শক্তিশালী দৈত্যেরা তাঁহার খেলাধূলায় বিঘ্ন সৃষ্টি করিত ; তখন কৃষ্ণ তাহাদিগকে বিবিধ ক্রীড়াচ্ছলে হত্যা করিয়া সঙ্গীদের আনন্দ বৃদ্ধি করিতেন। কৃষ্ণের জীবনে যে সব অতিমানবীয় শক্তি ও চাতুর্য প্রদর্শিত হইয়াছে, সে সবই তাঁহার আনন্দময় ভাবের আত্মপ্রকাশ ও সুমধুর লীলার অঙ্গ। যে বৃন্দাবনে তিনি তাঁহার শিশুসুলভ ও অতিমানবীয় ক্রীড়াসকল খেলিয়াছিলেন, তাহা একই সঙ্গে জড় ও অধ্যাত্মজগৎ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

বৃন্দাবনের বালক-বালিকারা অতি উচ্চস্তরের প্রেমিক ভক্তরূপে বর্ণিত হইয়া থাকে। তাহারা কৃষ্ণের জন্য জীবনধারণ করে, কৃষ্ণের জন্য কর্ম করে, কৃষ্ণের সহিত অনন্ত মিলনের আকাঙ্ক্ষা করে। কৃষ্ণের অতিমানবীয় বিশ্বব্যাপী শক্তি ও ক্রিয়ার দিকে তাহাদের লক্ষ্য ছিল না, কিন্তু তাহারা কৃষ্ণকে সৌন্দর্য, মাধুর্য ও প্রেমের নিত্য পূর্ণ মূর্ত রূপ বলিয়া মনে করিত। ভাগবতে দেখান হইয়াছে যে, এই সকল প্রেমিক ভক্তের সহিত আচরণে ভগবচ্চরিত্রের সর্বাপেক্ষা অধিক গৌরবময় গুণগুলি প্রকট হইয়াছে, এবং কৃষ্ণের প্রতি যে ধরনের প্রেম তাহারা অনুশীলন করিত, তাহার আধ্যাত্মিক মূল্য জীব-ব্রহ্মের অভেদ জ্ঞান দ্বারা মুক্তিলাভ অপেক্ষাও বেশী। ভাগবতের মতে গাঢ়তম ঐকান্তিক প্রেম দ্বারা পরমাত্মার সহিত অনন্ত মিলনই মনুষ্যজ্ঞানের চরম পুরুষার্থ। কেবলমাত্র মন ও হৃদয় নহে, কিন্তু সমস্ত ইন্দ্রিয়, এমন কি দেহের সর্ব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পর্যন্ত ঈশ্বরের জন্য আবেগময় বিশুদ্ধপ্রেমে পরিপ্লুত করিয়া দিতে হইবে ; পরমাত্মার অসীম সৌন্দর্য কেবল সাধকের আন্তর চেতনায় নহে, কিন্তু তাঁহার সাংসারিক ও সংসারাতীত লীলার সর্ব বিচিত্র অভিব্যক্তির মধ্যেও অনুভব ও উপভোগ করিতে হইবে ; এবং এইভাবে ভক্তের সমগ্র সত্তা আধ্যাত্মিক, প্রেমপূর্ণ ও সৌন্দর্যময় করিয়া লইতে হইবে।

দ্রষ্টব্য

১। এনসাইক্লোপিডিয়া অব রিলিজিন্ অ্যাণ্ড এথিক্স, পুরাণের উপর প্রবন্ধ

২। হিস্টরি অব্ ইণ্ডিয়ান লিটারেচার, পৃঃ ৫৪৫

৩। বিষ্ণুপুরাণ ১ ; ১ ; ৩৫

। বিষ্ণুপুরাণ ১ ; ২ ; ১
৫। " ১ ; ২ ; ২-১৩ যত্র তত্র
৬। " ১ ; ২ , ১০-১১
৭। " ১ ; ২ ; ১২
৮। " ১ , ২ ; ১৪-১৮
৯। " ১ ; ৩ , ১-২
১০। " ৫
১১। ভাগবত ১ ; ২ ; ১১
১২। " ২ , ৯ , ৩২
১৩। " ৩ , ৭ , ৯
১৪। " ৩ , ২৫-২৯
১৫। " ১ ; ১ , ১৮
১৬। " ১ , ৩ ; ১-৩
১৭। " ১ ; ৩; ৫
১৮। " ১ ; ৩ , ৩৩
১৯। " ১১ , ২০ , ১২
২০। " ১১ , ২ ; ৪১
২১। " ১ , ১ , ১৩
২২। " ১০ , ৩৩ , ৩৬
২৩। " ১ , ৩ ; ২৬
২৪। " ১ ; ৩ , ২৮

গ্রন্থবিবরণী

শ্রীধরের ভাষ্য সম্বলিত বিষ্ণুপুরাণ, বোম্বাই , উইল্‌সন কর্তৃক ইংরেজী ভাষায় অনূদিত, লণ্ডন।
শ্রীধরের ভাষ্য সম্বলিত ভাগবত পুরাণ, বোম্বাই , বিজ্ঞানানন্দ কর্তৃক ইংরেজী ভাষায় অনূদিত এস বি এইচ, এলাহাবাদ ; ফরাসী ভাষায় বার্ণফ্‌ কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত, প্যারিস।
দাশগুপ্ত, এস্ এন ঃ হিস্টরি অফ্‌ ইণ্ডিয়ান ফিলসফি, তৃতীয় খণ্ড।
উইণ্টারনিজ—দি হিস্টরি অব্‌ ইণ্ডিয়ান লিটারেচার, ১ম খণ্ড।
এনসাইক্লোপিডিয়া অব রিলিজিন্ অ্যাণ্ড এথিক্স, 'পুরাণ' প্রকরণ।

দ্বিতীয় খণ্ড

ভারতীয় দর্শনের পরম্পরাগত সম্প্রদায়সমূহ

*

চার্বাক দর্শন (জড়বাদ)

লেখক : দক্ষিণারঞ্জন ভট্টাচার্য এম্. এ, কাব্যতীর্থ, শাস্ত্রী, পি এচ ডি (কলিকাতা)
অধ্যাপক, কৃষ্ণনগর কলেজ, নদীয়া

জৈন দর্শন

লেখক : এ. চক্রবর্তী এম. এ
অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, গবর্ণমেণ্ট কলেজ, কুম্ভকোণম্

বৌদ্ধ দর্শন

ক। প্রাচীন বৌদ্ধ দর্শন

লেখক : হরিদাস ভট্টাচার্য এম. এ, বি. এল্, পি আর এস্, দর্শন-সাগর
দর্শনবিভাগের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

খ। ভারতীয় বৌদ্ধ দর্শনের সম্প্রদায়সমূহের ঐতিহাসিক ভূমিকা

লেখক : বিধুশেখর ভট্টাচার্য, শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায়
অবসরপ্রাপ্ত প্রধান অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

গ। বৌদ্ধ ধর্মের দার্শনিক সম্প্রদায়সমূহ

লেখক : টি. আর. ভি মূর্তি
দর্শনের অধ্যাপক, সিংহল বিশ্ববিদ্যালয়, কলম্বো

ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন

ক। প্রাচীন ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন

লেখক : সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম. এ, পি এচ্ ডি, পি. আর. এস (কলিকাতা)
লেক্‌চারার, দর্শন বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

খ। পরবর্তী ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন

লেখক : পণ্ডিত বিভূতিভূষণ ভট্টাচার্য, ন্যায়াচার্য

সহকারী গ্রন্থাগারিক, গবর্ণমেন্ট সংস্কৃত কলেজ, বারাণসী

এবং

অরবিন্দ বসু এম এ

সাংখ্য-যোগ

লেখক : সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়, এম. এ, পি এচ্. ডি

সংস্কৃত-সাহিত্যের অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

পূর্ব-মীমাংসা

লেখক : ভি এ রামস্বামী আয়ার, এম এ, বেদ-মীমাংসা-শিরোমণি, মীমাংসা-বিশারদ

সংস্কৃত-সাহিত্যের অধ্যাপক, ত্রিবাঙ্কুর বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিবান্দ্রম্

বেদান্ত—অদ্বৈতবাদ

ক। শঙ্কর

লেখক : অধ্যাপক এস্. রাধাকৃষ্ণন্

ভারতীয় রাজদূত, মস্কো

খ। শঙ্করোত্তর অদ্বৈতবাদ

লেখক : পি. টি. রাজু, এম. এ, পি এচ্ ডি

দর্শনের অধ্যাপক, রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়, যোধপুর

বেদান্ত—বৈষ্ণব (ঈশ্বরবাদী) সম্প্রদায় সমূহ

ক। রামানুজ (বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ)

লেখক : পি. এন. শ্রীনিবাসাচারী এম. এ

দর্শনের অধ্যাপক (অবসরপ্রাপ্ত) পচয়িপ্পা কলেজ, মাদ্রাজ

খ। মধ্ব (দ্বৈত)

লেখক : এইচ্. এন্. রাঘবেন্দ্রাচার এম. এ

দর্শনের সহকারী অধ্যাপক, মহারাজার কলেজ, মহীশূর

গ। নিম্বার্ক (দ্বৈতাদ্বৈত)

লেখিকা : রমা চৌধুরী এম. এ, ডি. ফিল্ (অক্সন)

দর্শনের অধ্যাপিকা, লেডী ব্রাবোর্ণ কলেজ, কলিকাতা

ঘ। বল্লভ (শুদ্ধাদ্বৈত)

লেখক : গোবিন্দলাল হরগোবিন্দ ভাট এম. এ

রীডার, সংস্কৃত সাহিত্য, এম, এস্ বিশ্ববিদ্যালয়, বরোদা

ঙ। চৈতন্য (অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ)

লেখক : সুশীলকুমার মৈত্র এম. এ, পি এচ্. ডি (কলিকাতা)

দর্শনের অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

শৈব ও শাক্ত সম্প্রদায়

ক। শৈব-সিদ্ধান্ত

লেখক : টি. এম্. পি মহাদেবন্

খ। কাশ্মীর শৈব-দর্শন

লেখক : কে. সি. পাণ্ডে এম. এ, পি এচ্. ডি, ডি লিট্, এম্. ও. এল্,

রীডার, সংস্কৃত সাহিত্য, লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়

গ। বীর শৈব-দর্শন

লেখক : শ্রী কুমারস্বামীজি. বি. এ

অধ্যক্ষ, নব-কল্যাণ মঠ, ধারওয়ার (বোম্বাই)

ঘ। শাক্ত দর্শন

লেখক : গোপীনাথ কবিরাজ এম. এ, ডি. লিট্, মহামহোপাধ্যায়

অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজ, বারাণসী

অষ্টম পরিচ্ছেদ

চার্বাক দর্শন

সূচনা : যাঁহাদের ধারণা ভারতবর্ষ কেবলমাত্র আধ্যাত্মিকতার পীঠস্থান, এই দেশের সহিত তাঁহাদের পরিচয় অসম্পূর্ণ। বর্তমান পৃথিবীতে বস্তুবাদ যেমন প্রবল ও সর্বাত্মক আকার ধারণ করিয়াছে, একদা ভারতভূমিতেও এই চিন্তাধারা সমভাবে পুষ্টিলাভ করিয়াছিল। ভারতের চিন্তারাজ্যে যদিও আধ্যাত্মিকতার প্রভুত্ব অব্যাহত ছিল, তথাপি ইহাও স্মরণীয় যে, এই সনাতনভূমিতে এমন সব চিন্তানায়কের আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছিল যাঁহাদের মতামত ছিল প্রচলিত বিশ্বাস ও দর্শনাদির বিপরীতধর্মী। এইভাবে এক পৃথক ধারার চিন্তাপদ্ধতির সৃষ্টি হয়, যাহা সাধারণভাবে চার্বাক দর্শন বলিয়া অভিহিত।

চার্বাক সম্প্রদায়ের মূল পুঁথিগুলি আজ আমাদের কাছে লুপ্তপ্রায়। তাঁহাদের মতামত বা উক্তিবিশেষের ভগ্নাংশ হিন্দু বৌদ্ধ বা জৈন শাস্ত্রাদির মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আকারে পাওয়া যায়। বলিতে গেলে এই অবিন্যস্ত উদ্ধৃতিগুলিই বর্তমানে চার্বাক দর্শনের পরিচয়-সম্বল।

বৃহস্পতি লৌক্য বা ঋগ্বেদের ব্রহ্মণস্পতি সর্বপ্রথম বস্তুকে চরম সত্য বলিয়া ঘোষণা করেন। ভাবিলে ভুল হইবে না যে, ভারতীয় বস্তুবাদ প্রাথমিক স্তরে সংশয়বাদ ও নেতিবাদের সহিত মিশ্র অবস্থায় ছিল। ইহার সুস্পষ্ট আকার দেন বৃহস্পতি। ঋগ্বেদে বৃহস্পতি 'গণপতি' বলিয়া অভিহিত—এক সাংগীতিক গোষ্ঠীর অধিনায়ক—কবীনাং কবিঃ। চার্বাকরা ছিলেন বৃহস্পতির মতানুসারী। এই কারণে তাহা-দিগকে বার্হস্পত্য বা লোকায়তিক বিশেষণে উল্লেখ করা হয়। বৃহস্পতি আজ বিস্মৃতির নেপথ্যে অদৃশ্য। চার্বাকরা কিন্তু এখনও আলোচনার বিষয়।

ভারতের ইতিহাসের প্রায় প্রত্যেকটি অধ্যায়ে চার্বাক মতবাদের প্রতিভূদের সন্ধান পাওয়া যায়। রামায়ণের জাবালিমুনি ছিলেন বস্তুবাদের আচার্যবিশেষ। রামের উদ্দেশে তাঁহার উপদেশাবলী চার্বাক মতবাদের সঙ্গে তুলনীয়। মর্ত্যভূমির অধীশ্বর অপেক্ষা ঊর্ধ্বতন কোন সত্তার অস্তিত্ব নাই—ভাষান্তরে ইহা চার্বাকের উক্তি। হরিবংশের রাজা বেণ এই মতবাদের সমর্থক ছিলেন। তিনি ছিলেন বেদবিরোধী। ব্যাস তাঁহাকে বিধর্মী আখ্যা দিয়াছেন। প্রাচীন বৌদ্ধ ও জৈন শাস্ত্রের মতে

অজিতকেশকম্বলী ছিলেন বুদ্ধদেবের সমসাময়িক। তাঁহার উপদেশাত্মক উক্তি-গুলির সঙ্গে চার্বাক সম্প্রদায়ের মতবাদের বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। অজিতের অনুবর্তী পায়াসি গুরুর মতেরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। পতঞ্জলির মহাভাষ্য হইতে জানা যায় যে, ভাগুরি ছিলেন চার্বাক-মতের একজন প্রখ্যাত উদ্গাতা। শান্তিরক্ষিতের তত্ত্বসংগ্রহে উল্লিখিত পুরন্দর ছিলেন সুশিক্ষিত চার্বাক সম্প্রদায়ের গোষ্ঠীভুক্ত। প্রাত্যহিক জীবনে অপরিহার্য বলিয়া তিনি অনুমানকে সত্যজ্ঞানের মাধ্যম হিসাবে আংশিকভাবে স্বীকার করিয়াছিলেন। হরিভদ্রসুরি-প্রণীত ষড়দর্শন-সমুচ্চয়ের টীকাকার গুণরত্ন বলেন, কোন কোন চার্বাক আকাশকেও ভূত হিসাবে স্বীকার করিয়া থাকেন, সদানন্দ তাঁহার অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, ইন্দ্রিয়াত্মবাদ, প্রাণাত্মবাদ ও সর্বশেষ মনশ্চৈতন্যবাদের প্রবর্তন করেন চার্বাক সম্প্রদায়ের উত্তরসুরিরা। প্রাচীন নাস্তিক্যবাদের প্রবল শত্রু বুদ্ধোত্তর যুগের ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের বিরোধিতার ফলে এই সকল নূতন মতবাদ প্রবর্তনের প্রয়োজন হইয়াছিল। 'কামসূত্রে'র লেখক বাৎস্যায়নও সম্ভবতঃ এই যুগেই প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। যদিও তিনি নিজে বস্তুবাদী ছিলেন না, তথাপি ইন্দ্রিয়োপভোগের বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ-পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁহার মতামত সুশিক্ষিত চার্বাক সম্প্রদায়ের উপর সবিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

জ্ঞানতত্ত্ব: চার্বাকদের দার্শনিক চিন্তা তাঁহাদের বিশিষ্ট জ্ঞানতত্ত্বের উপর ভিত্তি করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাঁহাদের মতে প্রত্যক্ষ ব্যতীত সত্য জ্ঞানলাভের দ্বিতীয় উপায় নাই। যাহা কিছু ইন্দ্রিয়গোচর তাহাই সত্য, যাহা কিছু প্রত্যক্ষের অতীত তাহাই সংশয়িত। ব্যাপ্তিজ্ঞান সাপেক্ষ বলিয়া অনুমানকে তাঁহারা সত্যজ্ঞানের মাধ্যম বলিয়া স্বীকার করিতে রাজী নহেন। কারণ ব্যাপ্তিজ্ঞান প্রত্যক্ষগ্রাহ্য নয়। প্রত্যক্ষজ্ঞানের সাহায্যে আমরা এই পর্যন্ত বলিতে পারি যে, কোন এক বিশেষ 'ক' কোন এক বিশেষ 'খ'-এর সঙ্গে সম্পর্কিত। তাহা হইতে অপ্রত্যক্ষে উপনীত হইয়া কেমন করিয়া এইরূপ একটি সিদ্ধান্ত নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারি যে, সব 'ক'-এর সঙ্গে সব 'খ' সম্পর্কিত? এই ধরনের জ্ঞান এই কারণে প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার্য নহে।

আপ্তবাক্যও নির্ভরযোগ্য নয়। কেন না আপ্তবাক্যের যাথার্থ্য অনুমানের সাহায্যে নিরূপিত হয়। পরন্তু প্রায়শই দেখা যায় যে, এই ধরনের আপ্তবাক্যগুলি যুক্তিবিবর্জিত ও স্বকপোলকল্পিত। এমন কি বেদাদিও নির্ভরযোগ্য নয়। বেদগুলি দ্ব্যর্থক[১] অবাস্তব ও পরস্পরবিরোধী উক্তিতে পরিপূর্ণ। একটি বিধিবাক্যে যে ক্রিয়া-

পদ্ধতি বিহিত বলিয়া নির্দিষ্ট, অপর বিধিবাক্যে তাহাই নিন্দার্হ বলিয়া বর্ণিত। বৈদিক গ্রন্থগুলিতে যে সকল ফলশ্রুতির আশ্বাস দেওয়া আছে, তাহা কস্মিন্‌কালেও সার্থক হয় না।

কিন্তু অনুমানকে সর্বতোভাবে বর্জন করিলে প্রাত্যহিক জীবনে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। এই কারণে সুশিক্ষিত চার্বাকরা অনুমানকে জ্ঞানলাভের উপায় বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন; তবে ইহার ক্ষেত্র পরিদৃশ্যমান বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা অনুমানকে দ্বিবিধভাগে ভাগ করিয়াছেন—অতীতসম্পর্কিত ও ভবিষ্যৎ-নির্দেশক। তাঁহারা প্রথমোক্ত অনুমান স্বীকার করিয়া দ্বিতীয়োক্ত অনুমান অগ্রাহ্য করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, যাহা কোনকালে প্রত্যক্ষগোচর নয় তাঁহারা এমন অনুমানকে বর্জন করিয়াছেন। কাহারও কাহারও মতে লোকযাত্রা নির্বাহের জন্য 'সম্ভাব্য জ্ঞান' স্বীকার করিয়া লইলেই যথেষ্ট। ধূম হইতে আমরা বহ্নির সম্ভাবনা সম্বন্ধে অবহিত হইতে পারি, সুনিশ্চিত হইতে পারি না। দৈনন্দিন জীবনে এই সম্ভাবনাই যথেষ্ট কার্যকরী।

কার্যকারণসম্বন্ধ: চার্বাকপন্থীরা ঘটনাবিশেষের অবশ্যম্ভাবী কার্যকারণিক সম্বন্ধে বিশ্বাসী নহেন। দুইটি বিষয়ের প্রত্যক্ষগোচরতা হইতে তাহাদের মধ্যে কার্য-কারণিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় না। আমরা দুইটি বিষয় দেখিতেছি: বহ্নি ও ধূম। কি করিয়া বলা যায় বহ্নি ধূমের কারণ—অথবা ইহা কিরূপে নিশ্চিত করিয়া বলা যাইতে পারে যে আমাদের জন্মের পূর্বে ও মৃত্যুর পরেও ধূম থাকিলেই বহ্নির অস্তিত্ব নিরুপাধিক ও অনিবার্যরূপে বর্তমান ছিল ও থাকিবে? ব্যাপারটি অনুমানের বিষয়; সুতরাং অনিশ্চয়তাদোষে গ্রহণের যোগ্য নহে।

ঘটনাবিশেষের হেতুসম্পর্কে চার্বাকরা বলিয়া থাকেন যে সকল ঘটনাই স্বতঃস্ফূর্ত বা আকস্মিক। কণ্টকের তীক্ষ্ণতা, পশুপক্ষীর প্রবৃত্তিবৈচিত্র্য, ইক্ষুর মধুরতা বা নিম্বের তিক্ততা—সকলই আকস্মিক পরিণাম বা স্বতই সম্ভব হইয়াছে, ইহা ঈশ্বর-নামক কোন অতীন্দ্রিয় সত্তার সৃষ্টি-কৌশল নয়। এই বিপুলা পৃথ্বী আকস্মিকভাবেই সৃষ্ট হইয়াছে। বস্তুর মৌলিক উপাদানগুলির আকস্মিক সম্মেলনের ফলে ইহা উৎসারিত হইয়াছে। এই ধরনের ব্যাখ্যাকে বলা হইয়া থাকে যদৃচ্ছাবাদ। মধ্যপন্থী চার্বাকরা স্বভাবকে পরিদৃশ্যমান বিষয়সকলের নিয়ামক বলিয়া মনে করেন, অতি-প্রাকৃত চেতন কোন সত্তাকে সবকিছুর নিয়ন্তা বলিয়া ধারণা করা এইজন্য অবান্তর। এই ধারণা-পদ্ধতিকে স্বভাববাদ বলা হয়।

জড়: চার্বাকরা চারিটি উপাদানকে প্রাথমিক ও শাশ্বত বলিয়া স্বীকার করেন,

যথা : ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও মরুৎ। প্রশ্নোপনিষদের ঋষি কবন্ধী কাত্যায়ন অনুরূপ মত পোষণ করিতেন। ব্যোম প্রত্যক্ষগোচর নহে বলিয়া প্রাচীন চার্বাকরা ইহাকে ভূত বলিয়া স্বীকার করেন নাই। জড় ও জীব সকল সত্তাই এই ভূতচতুষ্টয় হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। 'অসতঃ সদজায়ত'—বৃহস্পতির এই উক্তির নিহিতার্থ হইতেছে যে বস্তুই চরম সত্য। ঋগ্বেদের পরমেষ্ঠীর সংশয়াত্মক মতবাদ সম্ভবতঃ এই উক্তির ভিত্তি-মূলে বর্তমান।

চৈতন্য : চৈতন্য মানবদেহের গুণবিশেষ। চৈতন্য সেই সকল জড় পদার্থ হইতে উদ্ভূত যাহাদের আকস্মিক মিশ্রণে মানুষের শারীরযন্ত্র গঠিত। চার্বাকরা মনোগঠন প্রক্রিয়াকে সুরার উপমা দিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সুরা এমন কতকগুলি উপাদানের সংমিশ্রণে তৈয়ারী হয় পৃথগ্‌ভাবে যাহাদের নিজস্ব কোন মাদকতা-শক্তি নাই। মনোজগতের বিচিত্র অনুভূতির মাধ্যম আত্মা বলিয়া কোন আধ্যাত্মিক সত্তা নাই। দেহই আত্মা, 'আমি কৃশ' বা 'আমি স্থূল' প্রভৃতি অভিব্যক্তির 'আমি' বলিতে নিশ্চয়ই দেহ ছাড়া অন্য কোন কিছুকে বুঝায় না। দেহের বিনাশে চৈতন্য লুপ্ত হয়, সঙ্গে সঙ্গে সাংগঠনিক উপাদানগুলি নিজ নিজ বিভাগীয় ভূতে মিশ্রিত হয়। সুতরাং কর্মফলভোগ, আত্মার জন্মান্তরগ্রহণ ইত্যাদি অর্থহীন। জড় পদার্থ হইতে চৈতন্যের উৎপত্তি—এই মত বৃহদারণ্যক উপনিষদেও পাওয়া যায়। দেহাত্মবাদের অনুকূলে ইঙ্গিত পাওয়া যায় ছান্দোগ্য উপনিষদের ইন্দ্র-বিরোচন উপাখ্যানে।

চৈতন্যের কারণ অনুসন্ধানে এই সম্প্রদায়ের পরবর্তী শিষ্যেরা আরও তিনটি মতের প্রবর্তন করেন : ইন্দ্রিয়াত্মবাদ, প্রাণাত্মবাদ ও মনশ্চৈতন্যবাদ। যদিও প্রাণ এবং মনকে দেহ হইতে পৃথক সত্তা বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে তথাপি তাহাদের দেহ-নিরপেক্ষ স্বাধীন অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই।

ধর্ম : চার্বাকের জ্ঞানতত্ত্ব নূতন বিশ্বাসের পথ প্রশস্ত করিয়াছে। ধর্ম গড়িয়া উঠিয়াছে অনুমানসাপেক্ষ অতি-প্রাকৃত সত্তার উপর ভিত্তি করিয়া। অনুমান অসিদ্ধ বলিয়া অতিপ্রাকৃত সত্তাও অসিদ্ধ। জগতের বিষয়-বৈচিত্র্য বস্তুনিচয়ের স্বভাবের তাড়নায় সংঘটিত হইতেছে ; ঈশ্বর বলিয়া অতিপ্রাকৃত কোন সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব নাই। সর্বশক্তিমান্ সর্বজ্ঞ ও দয়াময় ঈশ্বর বলিয়া যদি কেহ থাকেন তিনি জ্ঞানার্থীদের সকল সংশয় দূর করিয়া নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করেন না কেন ? ঈশ্বরকে আমাদের সুকৃতি ও দুষ্কৃতির বিচারকও বলা যায় না ; তাহা হইলে তিনি পক্ষপাতিত্ব ও নিষ্ঠুরতা দোষে দুষ্ট হইয়া পড়েন। আমাদের পাপের জন্য যদি ঈশ্বর আমাদের শাস্তিবিধান করেন তবে তিনি আমাদের শত্রুবিশেষ। সুতরাং নিষ্ঠুর ঈশ্বর থাকা অপেক্ষা ঈশ্বর

না থাকাই ভাল। বস্তুতঃ বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা বা শাসনকর্তা-রূপে ঈশ্বর বলিয়া কাহারও অস্তিত্ব নাই। রাজাই পরমেশ্বর—রাজ্যের একমাত্র শাসক, সামাজিক হিতাহিতের নিয়ন্ত্রণকারী ও চূড়ান্ত বিচারক।

মোক্ষ : সনাতনপন্থীরা মোক্ষ অর্থে সর্ববিধ জাগতিক সম্পর্ক হইতে আত্মার বন্ধনমুক্তি অথবা 'দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ' এমন এক মানসিক অবস্থা বলিয়া মনে করেন। কিন্তু চার্বাকরা বাস্তববাদী বলিয়া দেহাতীত আত্মার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী। মানুষ সুখদুঃখের অতীতাবস্থা আয়ত্ত করিতে পারে বলিয়াও তাঁহারা বিশ্বাস করেন না। মোক্ষ বলিতে তাঁহারা বুঝেন স্বাধীনতা, অপ্রতিহত শক্তি অথবা দেহের বিলয়। তাঁহারা মনে করেন যে, যাহারা জনসাধারণের মনে অপ্রাকৃত সত্তায় বিশ্বাস জন্মাইয়া নিজেদের জীবিকাসংস্থানের সুযোগ করিয়া থাকে স্বর্গ-নরক তাহাদেরই কল্পনা মাত্র। জাগতিক সীমার বাহিরে স্বর্গ-নরক বলিয়া কিছুর অস্তিত্ব নাই। সুখই স্বর্গ, দুঃখভোগই নরকবাস। স্বর্গলাভের প্রত্যাশায় ধর্মীয় ব্রতাদি অনুষ্ঠান, দেবতাদের প্রসন্ন করার প্রয়াস, তাঁহাদের সন্তোষ-বিধানের জন্য প্রার্থনা বা উপচারের আয়োজন—সকলই অর্থহীন। মানুষের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত সুখভোগ।

জীবনের লক্ষ্য : ভারতের আধ্যাত্মিক চিন্তা-নায়কদের এই অর্থে দুঃখবাদী বলা যায় যে, তাঁহারা স্বর্গ ও মোক্ষের পশ্চাতে ধাবমান এবং পার্থিব জীবনের দুঃখ-দুর্দশা হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য সচেষ্ট। কিন্তু জড়বাদীরা সর্বদাই আশাবাদী। তাঁহারা জগৎকে দুঃখময় বলিয়া মনে করেন না। তাঁহাদের মতে ইহ জগতে সুখই একমাত্র বস্তু যাহা সত্য এবং কাম্য, বুদ্ধিমান মানুষের একমাত্র পুরুষার্থ হইতেছে ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতা অর্থাৎ সুখভোগ—'কাম এবৈকঃ পুরুষার্থঃ'।

ইহা সত্য যে দুর্ভোগমুক্ত অবিমিশ্র সুখ সম্ভব নয়। রাজার সুরম্য প্রাসাদে ও দরিদ্রের পর্ণকুটীরে সর্বত্রই দুঃখ আছে। তথাপি আমাদের এই সাধের জগৎ দুঃখের দ্বারা আকীর্ণ নয়। সুখের ভাগ দুঃখ অপেক্ষা অধিক, তাহা যদি না হইত তবে মানুষ এমন ঐকান্তিকভাবে বাঁচিতে চাহিত না, মৃত্যুর নামমাত্র শুনিয়া সশঙ্ক হইয়া উঠিত না। বুদ্ধিমানের কাজ হইতেছে, যতটা পারা যায় সুখভোগ করিয়া লওয়া এবং অনিবার্য দুঃখ যথাসম্ভব বরণ করিয়া লওয়া। দুঃখের ভয়ে সুখভোগের সুযোগ অবহেলা করা মূর্খতা। শল্ক ও কণ্টকের আশঙ্কায় কি আমরা মৎস্যগ্রহণে পরাঙ্মুখ হইব, কণ্টকের ভয়ে কমলসংগ্রহে নিবৃত্ত হইব, তুষাদির জন্য পুষ্টিকর তণ্ডুল গ্রহণ করিব না? দুঃখে অশ্রু পাত করিব, এই জগতে যেমন অভিভূত হইবার মত মৃত্যুশোক বা রোগভোগ আছে,

তেমনি সুখ-সহোদর শিশু পুত্রের হাস্যোজ্জ্বল মুখ আছে, হ্লাদিনী কন্যার লাবণ্যচ্ছটা আছে। মনোরমা ভার্যার আসঙ্গ যদি মর্ত্যকে নন্দনলোকে পরিণত করিতে পারে তবে তাহার বিচ্ছেদ যে গভীর দুঃখের কারণ হইবে, তাহা ত জানা কথা। এই জগতে যদি কোনওরূপ স্নেহের বন্ধন নাও থাকে তবুও দুঃখের হাত হইতে পরিত্রাণ নাই, ইহজগতে যাহার আপনার জন বলিতে কেহ নাই তাহার হৃদয় নিরন্তর বেদনাময় ও মরুভূমির মত বিশুষ্ক।

আবার ইহাও ভাবিবার বিষয় যে সুখভোগ তখনই চরমে উঠে যখন দুঃখের বৈপরীত্যে তাহার অনুভব ঘটে। এই কারণে দুর্ভোগ সর্বথা মন্দ নয়। খাদ্যগ্রহণের আনন্দ ভালভাবে আস্বাদ করিতে হইলে ক্ষুধাজনিত কষ্টভোগ করা দরকার। তৃষ্ণার আর্তি যতই তীব্র হইবে শীতল জলপানের আনন্দ ততই বৃদ্ধি পাইবে। যখন সুদীর্ঘ বিরহভোগের অবসানে প্রণয়িযুগল মিলিত হয় তখন একই ব্যাপার ঘটে। বিরামবিহীন সুখভোগ বিরক্তিকর। আজ যাহা রমণীয় বলিয়া প্রতীত হইতেছে মুহুর্মুহুঃ আস্বাদনে তাহাই বিরক্তিজনক হইয়া পড়ে। প্রতিদিনের ব্যবহারে সুস্বাদু খাদ্যও অপ্রীতির কারণ হয়। সুতরাং অবিরাম সুখের জন্য কাতর হওয়া মূর্খতা। এই জীবনে বাঁচিয়া থাকার সার্থকতা আছে। যতদিন আয় আছে সুখভোগের মধ্যে বাঁচিয়া থাকা সমীচীন। এমন কি 'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ,' কেন না 'ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ ?'

ধারণা হয়, এই সম্প্রদায়ের মতামতগুলি নিন্দক ও বিরোধী পক্ষের হস্তে পড়িয়া কিছুটা বিকৃত হইয়াছে। কখনও কখনও কতকগুলি অশোভন মতামত বৃহস্পতির স্কন্ধে আরোপিত হইয়াছে। অস্বাভাবিক মনে হয় এইজন্য যে, যে ব্যক্তি সমাজে গভীর শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত তিনি কি করিয়া উচ্ছৃঙ্খলতা ও অসামাজিক ক্রিয়াকলাপে উৎসাহ দান করেন! বৃহস্পতির সুশিক্ষিত শিষ্যেরা বলাৎকারের প্রবল বিরোধিতা করিয়াছেন। সামাজিক শৃঙ্খলার আবশ্যকতা সম্পর্কে তাঁহারা সর্বদাই অবহিত ছিলেন। বৃহস্পতিকে গণপতি আখ্যাদান, এই চিন্তাধারাকে লোকায়ত নামকরণ এবং 'লোকসিদ্ধো ভবেৎ রাজা'র মত অনুশাসন-বাক্যে এই ধারণার অনুকূলে প্রমাণ পাওয়া যায়।

চার্বাকেরা মানসিক সাম্যের পক্ষপাতিত্ব করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল-নির্বিশেষে সকলের ধমনীতে যখন একই লোহিত রক্ত প্রবাহিত তখন তাঁহাদের মতে জীবনের পরমলোভ্য সুখভোগের সুযোগে সকলেরই সমানাধিকার।

এপিকিউরাস্ অ্যারিষ্টিপ্পাসের সহিত তুলনা : লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এপিকিউরীয় দর্শনের সহিত চার্বাক চিন্তাপদ্ধতির ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য বর্তমান। উভয় দর্শনই দেহ ও

আত্মাকে অভিন্ন সত্তা বলিয়া মনে করে। এপিকিউরাসের মতে আত্মা হইতেছে একপ্রকার শারীর বস্তু—চারিটি মূল পদার্থের পরমাণু-সংমিশ্রণে গঠিত হইয়া সমগ্র দেহ-সংস্থায় পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে। তবে হৃদয়ের অংশে ইহা অধিকতর ঘনীভূত। চার্বাকরা প্রায় একই কথা বলিয়া থাকেন—ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও মরুৎ এই ভূতচতুষ্টয়ের পরমাণুর সংমিশ্রণে মনুষ্যশরীর গঠিত এবং তাহা হইতেই চৈতন্যের উৎপত্তি হয় অথবা তাহারাই চৈতন্যে পরিণত হয়।

এপিকিউরীয় সম্প্রদায় চার্বাকদের সহিত সমস্বরে বলিয়া থাকেন যে, সর্ববিধ মানসিক সুখ শারীরিক ইন্দ্রিয়াদির সহিত সম্পর্কিত ও তাহা হইতে উৎসারিত। জীবনের লক্ষ্যসম্বন্ধে দুইটি সম্প্রদায়ের বহুলাংশে ঐকমত্য লক্ষণীয়। এপিকিউরাসের মতে আমাদের যাবতীয় ক্রিয়া-কর্মের মূলীভূত উদ্দেশ্য : সুখলাভ ও দুঃখ-পরিহার। দুঃখকে পরিহার করিতে হইবে সুখকে অন্বেষণ করিতে হইবে—অগ্নি যেমন উষ্ণ ও বরফ যেমন শীতল ইহাও সেইরূপ সহজ সত্য। প্রত্যেক জীবই স্বভাবতঃ বা প্রবৃত্তির প্রেরণায় সুখের অনুসন্ধান করিতে ও যন্ত্রণা হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করে, যদি এইভাবে আমাদের সকল উৎসাহ, ইচ্ছা ও ক্রিয়া সুখদুঃখের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হয় তাহা হইলে আমরা সুখকেই পরম লভ্য ও দুঃখকে চরম ত্যাজ্য বলিতে পারি। এই বিষয়ে চার্বাকরা একই কথা বলিয়া থাকেন—সুখই পরম পুরুষার্থ, তাহার বিপরীতই নরকবাস।

সাইরেনের অ্যারিষ্টিপ্পাসের সহিতও চার্বাক দর্শনের সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। অ্যারিষ্টি-প্পাসের মতে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইতেছে ব্যক্তিগত সুখাস্বাদন। ভবিষ্যৎ সুখের আশায় বর্তমানের সুযোগ কখনই অবহেলা করা উচিত নয়; কেন না ভবিষ্যৎ সর্বদাই অনিশ্চিত। বর্তমান আমাদের আয়ত্তে বলিয়া ইহার চূড়ান্ত সদ্ব্যবহার করা উচিত। 'খাও দাও নৃত্য ক'রো মনের আনন্দে, আগামী কাল আমাদের অস্তিত্ব নাও থাকিতে পারে।' চার্বাকেরা একই মত পোষণ করেন, 'আজকের কপোত আগামী কালের ময়ূর অপেক্ষা মূল্যবান' "বরমদ্যকপোতঃ শ্বোময়ূরাৎ"। "যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ, ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ ?" চার্বাক-মতের সহিত সমভাবাপন্ন ওমর খৈয়ামের একটি চরণও এইখানে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে—

ঢালো সুরা ভরি' পাত্র, সদানন্দ অহোরাত্র, যতকাল আছে এই দেহ;
কেন না এ প্রাণ-পাখী, উড়ে গেলে সব ফাঁকি, ফিরে হেথা আসে নাকো কেহ।

(ফিটজেরাল্ড-অনুসরণে)

উপসংহার : স্বাধীন চিন্তার স্রোতকে নিরুদ্ধ করিয়া যুগ যুগ ধরিয়া যে কুসংস্কারের আবর্জনা পুঞ্জীভূত হইয়াছিল, চার্বাক সম্প্রদায় তাহারই বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বন্যা আনিয়াছিলেন। ঈশ্বর-চিন্তা বা স্বর্গ-নরকের কল্পনার দ্বারা ব্যাহত না হইয়া এই চিন্তাধারা জীবনের মাধুর্যকে নিঃশেষে আস্বাদন করিবার আহ্বান জানাইয়াছিল। দর্শনের ক্ষেত্রে চার্বাকদের বৈতণ্ডিক কথা বা তত্ত্বোপপ্লববাদ অন্য সম্প্রদায়ের চিন্তা-শীলদের সমস্যার কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। ইহার ফলে তাঁহাদের চিন্তাপ্রণালী অধিকতর সংযত সতর্ক ও যুক্তিযুক্ত হইবার সুযোগ পায়। ভারতের প্রত্যেক দার্শনিককে আপন মত প্রতিষ্ঠা করিবার পূর্বে তত্ত্বোপপ্লববাদী চার্বাক সম্প্রদায়ের যুক্তি-গুলিকে খণ্ডন করিতে হইয়াছিল। কারণ উক্ত সম্প্রদায় প্রচলিত সকল তত্ত্ব-প্রমাণেরই প্রামাণ্য-খণ্ডনে প্রয়াস করিয়াছিল। এইভাবে দেখা যায় ভারতীয় দর্শনের উন্নয়নে এই সম্প্রদায়ের অবদান সত্যই মহৎ।

গ্রন্থবিবরণী

কৌটিল্য—অর্থশাস্ত্র

বৃহস্পতি—অর্থশাস্ত্র

টুচি—এ স্কেচ্ অব্ ইণ্ডিয়ান্ মেটিরিয়ালিজম্

ডি শাস্ত্রী—চার্বাক-ষষ্টি, শর্ট হিস্টরি অব্ ইণ্ডিয়ান্ মেটিরিয়ালিজম্।

গুণরত্ন—তর্করহস্য-দীপিকা

বাৎস্যায়ন—কামসূত্র

হরিভদ্রসূরি—ষড়্দর্শনসমুচ্চয়

মাধবাচার্য—সর্বদর্শনসংগ্রহ

শান্তিরক্ষিত—তত্ত্বসংগ্রহ

নবম পরিচ্ছেদ

জৈন দর্শন

১। জৈন ইতিহাস

ভারতীয় অন্যান্য দর্শনের ন্যায় জৈন দর্শনেও ধর্ম ও তত্ত্বের দিক বিদ্যমান। উক্ত মতবাদে মূল ধর্মনীতি অহিংসা, এবং তাত্ত্বিক আদর্শ বা লক্ষ্য অনেকান্তবাদ—অর্থাৎ চরম সৎকে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করা বা দেখা। অহিংসা বলিতে হিংসার অভাবরূপ কেবলমাত্র এক নেতিমূলক ধর্ম বুঝায় না। যে বিশ্বপ্রেম সর্বজীবের মধ্যে আত্মীয়তা-স্বীকৃতির ফল, ইহা সেই বিশ্বপ্রেমরূপ ভাবপদার্থের উপর প্রতিষ্ঠিত। যে ব্যক্তি এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছে, সে অন্য কাহারও দুঃখে উদাসীন থাকিতে পারে না।

অহিংসার প্রাচীনতা ঃ বৈদিক সাহিত্যের ক্রমবিকাশ বা উন্নতির বিভিন্ন স্তরের নিরপেক্ষ আলোচনায় প্রতিভাত হয় যে, বেদে দুইটি বিরোধী চিন্তাধারার বিকাশ সমান্তরালভাবে চলিয়াছিল। একটি ধারায় বিশেষভাবে অহিংসানীতির উপর জোর দেওয়া হইয়াছে ও অপরটিতে যাগ-যজ্ঞাদির উপর। ইহা বিস্ময়কর যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্ষত্রিয়েরা বা রাজারা অহিংসা-নীতির সমর্থক ছিলেন এবং ব্রাহ্মণ পুরোহিতেরা বৈদিকক্রিয়াকাণ্ডাদি এমন কি পশুবলি প্রভৃতি সমর্থন করিতেন। পুরোহিতসম্প্রদায় ও রাজাদের মধ্যে এইরূপ বিরোধের কথা বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠের মধ্যে সজ্ঘর্ষের পৌরাণিক কাহিনী হইতে জানা যায়।

ঋষভের মত ঃ প্রচলিত জৈন ঐতিহ্যানুসারে চতুর্বিংশতি তীর্থঙ্করদিগের মধ্যে ঋষভ ছিলেন সর্বপ্রথম। তিনি অহিংসা ধর্ম প্রথম প্রকাশ করিয়াছিলেন। সর্বশেষ তীর্থঙ্কর ছিলেন মহাবীর। তিনি বুদ্ধের সমসাময়িক মহাপুরুষদিগের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। অধুনা ইহা স্বীকৃত হয় যে, জৈনধর্ম বৌদ্ধধর্ম অপেক্ষা প্রাচীন ; মহাবীর জৈনধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন না ; তিনি ৫৯৯ খৃঃ পূঃ হইতে ৫২৭ খৃঃ পূঃ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। মহাবীরের পূর্বাচার্য পার্শ্ব তাঁহারও ২৫০ বৎসর পূর্বে জীবিত ছিলেন। এবং তিনিও একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি। ঋষভ কর্তৃক প্রচারিত অহিংসা-মতবাদ সম্ভবতঃ আর্যদের ভারতবর্ষে আগমনের এবং তৎকালীন সভ্যতার পূর্বে প্রচলিত ছিল।

২। তত্ত্ববিদ্যা

অনেকান্তবাদ : জৈন-দর্শনের মত এই যে অন্যান্য সকল দর্শন একান্তবাদী, কিন্তু জৈন-দর্শন অনেকান্তবাদী বলিয়া ঐগুলি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। জৈন-দর্শনে এইরূপ বলা হয় যে চরম সদ্বস্তুর স্বরূপ অতি জটিল এবং উহা সম্যগ্‌রূপে বুঝিতে হইলে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে ইহাকে পরীক্ষা করা প্রয়োজন। এ কথা সত্য যে, কোন বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্য চরম সত্তার অন্যান্য দিক পরিত্যাগ করিয়া একটি বিশেষ দিকের প্রতি মনোযোগ সম্ভবপর। কোন উদ্দেশ্যের জন্য সদ্বস্তুর কোন একটি বিশেষ রূপকে উহার সমগ্র রূপ হইতে বিশ্লিষ্ট করিয়া বিচার করার একটা নিজস্ব মূল্য থাকিতে পারে, কিন্তু কোন অবস্থায় এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা মনে না রাখিয়া এইরূপ বিচারকে দার্শনিক মর্যাদা দিলে ইহা দার্শনিক ভ্রান্তিতে পরিণত হয়। সদ্বস্তুর কোন বিশেষ রূপকে অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান করিলে এবং উক্ত রূপকে সদ্বস্তুর একান্ত স্বরূপ হিসাবে গ্রহণ করিলে উহাদের সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা জন্মায় তাহা আংশিক এবং অসম্পূর্ণ। জৈন দার্শনিকরা সদ্বস্তুর এইরূপ ধারণাকে অসম্পূর্ণ বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। কারণ সদ্বস্তুর অন্যান্য যে সকল বৈশিষ্ট্য একেবারে অবহেলা করা চলে না সেগুলিকে কেবল একটি বিশেষ রূপের উপর (একান্ত) অহেতুক গুরুত্ব প্রদান করে। এই জাতীয় আংশিক দৃষ্টিভঙ্গীকে একান্তবাদ বলে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ভারতীয় একটি বিশেষ দার্শনিক সম্প্রদায় অন্যান্য বৈশিষ্ট্যকে অগ্রাহ্য করিয়া 'অদ্বৈত' ও 'একত্বে'র উপর অহেতুক গুরুত্ব দিয়া থাকেন। আবার উহার বিরোধী সম্প্রদায় পরিবর্তনশীলতার উপর অধিক জোর দিয়া সৎ কেবলমাত্র এক অখণ্ড গতিপ্রবাহ ভিন্ন আর কিছুই নহে এইরূপ বলিয়া থাকেন। ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়-সকলের মধ্যে অদ্বৈত-বেদান্ত প্রথম শ্রেণীর, কারণ ইহা ব্রহ্মের একত্বের উপর অধিক গুরুত্ব দিয়া থাকে এবং বৌদ্ধ সম্প্রদায় শেষোক্ত শ্রেণীর, কারণ উহাতে একত্বকে অগ্রাহ্য করিয়া কেবলমাত্র পরিবর্তনকেই স্বীকার করা হইয়াছে। জৈনরা প্রথম মতবাদকে (অদ্বৈত-বেদান্ত) ব্রহ্ম-একান্তবাদ এবং শেষোক্ত মতবাদকে ক্ষণিক একান্তবাদ বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন।

গ্রীসীয় চিন্তাধারায়ও একই ধরনের একদেশদেশী মতবাদ দেখিতে পাওয়া যায়, যেমন পারমেনাইডিস-এর মতে চরম সৎ সর্বপ্রকার পরিবর্তনরহিত, অপরদিকে হেরাক্লাইটাস্ ভিন্ন মতের সমর্থক ছিলেন, তাঁহার মতে চরম সৎ নিয়ত পরিবর্তনশীল এক অনন্তপ্রবাহ। জৈনদের মতে উভয় মতবাদই একদেশদর্শী মতবাদ বা একান্তবাদ।

জৈনরা বলেন চরম সৎ-এর বিভিন্ন রূপকে অগ্রাহ্য করিয়া কেবলমাত্র বিশেষ রূপকে অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়ার সহিত অন্ধ ব্যক্তিদের হস্তিদর্শন উপাখ্যানের যথেষ্ট মিল আছে। উক্ত উপাখ্যানে কথিত আছে যে, প্রতি অন্ধ ব্যক্তি হস্তীর যে অংশকে স্পর্শ করিয়াছিল সেই অংশকেই পূর্ণ হস্তীর অবয়ব বলিয়া অভিহিত করিয়াছিল।

সুতরাং চরম সৎ-এর জটিল স্বরূপ স্বীকার করিতে হইবে এবং বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী (অনেকান্ত) হইতে বিচার করিয়া পরিপূর্ণ সৎ-এর স্বরূপ বর্ণনা করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। এই জাতীয় দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীই অনেকান্তবাদ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

জৈনদের মতে চরম সৎ পরিবর্তনশীলতার মধ্যে, নিত্য বিভিন্ন বৈচিত্র্যের মধ্যে অপরিবর্তনীয়, এবং বহুর মধ্যে এক। জৈন-দর্শনে চরম সৎ-এর সংজ্ঞা উৎপত্তি, বিলয় ও স্থায়িত্বরূপ বৈশিষ্ট্যের সংযোজনা হিসাবে নিরূপিত হইয়াছে। উমাস্বামী বলিয়াছেন, "উৎপাদ-ব্যয়-ধ্রৌব্য-লক্ষণম্ সৎ"[১] অর্থাৎ চরম সৎ উৎপত্তি, ধ্বংস ও স্থায়িত্ববিশিষ্ট। প্রকৃতির মধ্যে সকল বস্তুই উক্ত ত্রিবিধ বৈশিষ্ট্যবিশিষ্ট। প্রাণি-জগতে ইহা বিশেষভাবে প্রকাশিত। একটি চারাগাছের বৃদ্ধি এই ত্রিবিধ গুণের উদাহরণস্বরূপ লওয়া যাইতে পারে। চারা গাছটির প্রথম পত্তন আরম্ভ হয় বীজের অন্তরে। বীজটি যদি কেবলমাত্র বীজ হিসাবে স্থায়ী থাকিত এবং কোনপ্রকার পরিবর্তন বা ধ্বংস হইতে না পারিত, তাহা হইলে চারা গাছটি ইহার বর্ধিষ্ণু জীবনী-শক্তি হারাইয়া ফেলিত এবং শীঘ্রই মরিয়া যাইত। কিন্তু বৃক্ষটির বৃদ্ধিপ্রাপ্তির বিভিন্ন স্তরে অন্তর্নিহিত থাকে অভিন্নতা। একটা নিম্ব বীজের চারা বৃদ্ধিপ্রাপ্তির মধ্যাবস্থায় আমের চারায় পরিবর্তিত হইতে পারে না। সুতরাং বর্ধিষ্ণু প্রাণীর পক্ষে অন্তর্নিহিত অভিন্নতা প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য। এই অভিন্নতা ব্যতীত বৃদ্ধি শব্দটি এক-প্রকার অর্থহীন ধাঁধায় পরিণত হইত। আমরা আমাদের বাগানের কোন বৃক্ষ সম্বন্ধে নিশ্চিত হইতে পারিতাম না যে ইহা নিম্ব বৃক্ষ থাকিবে, না রাত্রির মধ্যেই আম্রবৃক্ষে পরিবর্তিত হইয়া যাইবে। সুতরাং চরম সৎ-এর বিশ্বস্ত ও স্বাভাবিক বর্ণনায় অবশ্যই উৎপত্তি, ধ্বংস ও অন্তর্নিহিত অভিন্নতা বা স্থায়িত্বরূপ ত্রিবিধ প্রকৃতিকে স্বীকার করিতে হইবে। চরম সৎ-এর এই ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গী হেগেলীয় "পারমার্থিক-নয়" এর অনুরূপ। বাস্তব অভিজ্ঞতায় বস্তুসকল ত্রিবিধ প্রকৃতিবিশিষ্ট-রূপে প্রতিভাত হয়, হেগেল যাহাকে সমত্ব (thesis), বৈপরীত্য (antithesis) ও সমন্বয় (synthesis)—ইতি, নেতি ও অভিন্নতা আখ্যা দিয়াছেন। জৈন-দার্শনিকেরা চরম সৎ-এর এই বিশেষ প্রকৃতি বহুকাল পূর্বেই লক্ষ্য করিয়াছিলেন

এবং উৎপত্তি ও বিলয়ের মধ্যে স্থায়ী চরম সৎ-এর সংজ্ঞানিরূপণে ইহার জটিল প্রকৃতির উপর বিশেষ জোর দিয়াছিলেন।

দ্রব্য (Substance): দ্রব্য জৈন-দর্শনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। ইহা একটি স্থায়ী পদার্থকে বুঝায়। উমাস্বামী সূত্র করিতেছেন, "গুণপর্যায়বৎ দ্রব্যম্" ২— ইহার অর্থ—দ্রব্য হইতেছে গুণ ও পর্যায়বিশিষ্ট সৎপদার্থ। জগতে যে কোন সৎপদার্থ স্ব স্ব গুণবিশিষ্ট এবং পরিবর্তনশীল। সুতরাং গুণ ও পর্যায়সকল দ্রব্য হইতে ভিন্ন নহে। আমরা দ্রব্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া 'দ্রব্যের গুণ' সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারি, কিন্তু বস্তুতঃ গুণ দ্রব্যাশ্রিত এবং দ্রব্য ও গুণ অভিন্ন। তদ্রূপ গুণ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আমরা দ্রব্যের কথা বলিতে পারি, কিন্তু বস্তুতঃ গুণবিহীন দ্রব্যের কোন অস্তিত্ব নাই। সুতরাং গুণবিহীন দ্রব্য এবং দ্রব্যবিহীন গুণ—কেবলমাত্র বুদ্ধিকল্পিত ধারণা।

দ্রব্য পরিবর্তিত হইয়া যে সকল আকার বা রূপধারণ করে সেগুলি স্বাভাবিক বা কৃত্রিম উপায়ে উৎপন্ন হইতে পারে। একটি জীবন্ত প্রাণিদেহ বর্ধিত হইবার সময়ে বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়া পরিবর্তিত হয়, যেমন শৈশবাবস্থা, যৌবন ও বার্ধক্য। এই পরিবর্তনসকল একটি জীবন্ত প্রাণিদেহের স্বাভাবিক পরিণতি।

এই জাতীয় পরিবর্তন প্রাণহীন দ্রব্যেও কৃত্রিম উপায়ে সাধিত হইতে পারে। মৃত্তিকা কুম্ভকার কর্তৃক নানা আকারে রূপান্তরিত হয়—তদ্রূপ স্বর্ণকার স্বর্ণদ্বারা নানাবিধ অলঙ্কার প্রস্তুত করিতে পারে। দ্রব্যের এই রূপান্তর সকল শিল্পী কর্তৃক কৃত্রিম উপায়ে সাধিত হয়। স্বাভাবিক হোক বা কৃত্রিম হোক দ্রব্যের যে কোন রূপান্তরকেই জৈন-দার্শনিকেরা পর্যায় আখ্যা দিয়া থাকেন। এই পরিবর্তন বা পর্যায়সকল দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে। দ্রব্য নিশ্চয়ই কোন না কোন আকার-বিশিষ্ট হইয়া থাকিবে। মৃত্তিকা যদি কুম্ভকার কর্তৃক বিভিন্ন পাত্রে রূপান্তরিত না হয়, তাহা হইলে মৃত্তিকা কেবলমাত্র মৃৎপিণ্ডরূপে অবস্থান করিবে। তদ্রূপ স্বর্ণ বিভিন্ন অলঙ্কারে রূপান্তরিত হইবার পূর্বে এক রূপহীন পিণ্ড ভিন্ন আর কিছুই নহে। কোন বস্তুতে স্বাভাবিক অথবা কৃত্রিম যে কোন উপায়েই পরিবর্তন ঘটুক না কেন উহার অন্তরালস্থিত স্থায়ী পদার্থ একই থাকিয়া যায়। সুতরাং দ্রব্য অপরিবর্তনীয় স্থায়ী অভিন্ন সত্তা। ইহার বিভিন্ন পর্যায়সকল পরিবর্তনশীল ও অস্থায়ী। সুতরাং দ্রব্য বিভিন্ন পরিবর্তনসকলের অন্তর্নিহিত অপরিবর্তনীয় অভিন্নতা আর পরিবর্তন-সকল অন্তর্নিহিত দ্রব্যের অবশ্যম্ভাবী প্রকাশ। আমরা যদি কোন বস্তুর স্থায়িত্বের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করি, তাহা হইলে ইহার অন্তর্নিহিত দ্রব্য বা স্থায়ী পদার্থের

কথা চিন্তা করি। আবার যখন আমরা পরিবর্তনসকল বা পর্যায়ের উপর জোর দেই, তখন বস্তুর পরিবর্তনের দিক লক্ষ্য করি। বিষয়ের দিকে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী চালিত করিবার উক্ত দৃষ্টিভঙ্গী "দ্রব্যার্থিক-নয়" ও "পর্যায়ার্থিক-নয়" বলিয়া কথিত হইয়া থাকে দ্রব্যের দৃষ্টিভঙ্গী ও পর্যায়ের দৃষ্টিভঙ্গী। যে কোন দ্রব্যকে উহার অন্তর্নিহিত দ্রব্যত্ব বা সত্তার দিক দিয়া বর্ণনা করিলে স্থায়ী বা নিত্য বলা যায় ; আবার প্রতি বিষয় পর্যায়ের দিক দিয়া বিচার করিলে অ-স্থায়ী বা অ-নিত্য বলা যায়। সুতরাং একই বস্তুকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে বিচার করিলে নিত্য ও অ-নিত্য বলিয়া অভিহিত করা যায়।

বহু দৃষ্টিভঙ্গীর সম্ভাবনা : ইহা হইতেই জৈন-দর্শনের নৈয়ায়িক সমস্যাপূর্ণ মতবাদ—অস্তি-নাস্তিবাদ—আসিয়াছে। এই মতবাদানুসারে একই পদার্থসম্পর্কে দুইটি বিরোধী উক্তি করা যাইতে পারে। ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাধারায় এই মতবাদ বহু অ-জৈন দার্শনিককে দ্বিধাগ্রস্ত করিয়াছে। এমন কি আচার্য শঙ্করের ন্যায় প্রখ্যাত চিন্তাশীল ব্যক্তিও উক্ত ন্যায়সঙ্গত নিয়মের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।

অস্তি-নাস্তিবাদের মতে একই সত্তায় 'অস্তি' ও 'নাস্তি' রূপ দুইটি বিরোধী ভাব আরোপ করা যাইতে পারে। জৈন-দার্শনিকেরা অবশ্য এই কথা বলেন না যে, একই পদার্থে অবারিতভাবে দুইটি বিরোধী ভাব আরোপ করা যায়। জৈন-মতবাদের তাৎপর্য এই যে, কোন এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বলিতে পারা যায় যে ইহা অস্তিত্ববান্, আবার অন্য এক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বলিতে পারা যায় যে ইহার অস্তিত্ব নাই। কিন্তু একই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে কোন পদার্থ আছে এবং নাই এরূপ বলা যায় না। জৈন দার্শনিকেরা জটিল তত্ত্বসম্পর্কীয় সমস্যার ক্ষেত্রেও ব্যবহার সাপেক্ষ (Practical) দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করিয়াছেন। একখণ্ড আস্‌বাবের উদাহরণ লওয়া যাইতে পারে। ইহা সাধারণ বন্যকাষ্ঠনির্মিত হইতে পারে। কিন্তু ইহাকে এমনভাবে অঙ্কিত করা যায় যে ইহা গোলাপ কাষ্ঠের ন্যায় প্রতিভাত হইতে পারে। এখন আকারের দিক দিয়া দেখিলে ইহা গোলাপ কাষ্ঠ, আবার অন্তর্নিহিত উপাদানের দিক দিয়া দেখিলে ইহা গোলাপ কাষ্ঠ নহে। সুতরাং একই পদার্থ সম্পর্কে একটি অস্ত্যর্থক ও একটি নঞর্থক—দুইটি উক্তি করা যাইতে পারে এবং উভয় উক্তিই নিশ্চয়ই সত্য। এই বিষয়টি জৈন দার্শনিকেরা বস্তুর চারিটি দিক্—যথা ইহার দ্রব্যত্ব, দেশ, কাল ও রূপ এইগুলির উল্লেখ করিয়া পরিভাষার সাহায্যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। দ্রব্যের দিক দিয়া দেখিলে কোন পদার্থ আপন দ্রব্য সম্পর্কে 'আছে' এবং অপর দ্রব্য

সম্পর্কে 'নাই'। পূর্বোল্লিখিত উদাহরণে আসবাবখানি বন্য কাষ্ঠ নির্মিত, অর্থাৎ বন্য কাষ্ঠ হিসাবে ইহার অস্তিত্ব আছে কিন্তু গোলাপ কাষ্ঠ হিসাবে ইহার অস্তিত্ব নাই। তদ্রূপ দেশ হিসাবে একটি বস্তু স্ব-দেশে অবস্থান করে, একই কালে অপর কোন দেশে অবস্থান করিতে পারে না। গরুটি যখন গোয়ালে থাকে তখন সে মাঠে থাকিতে পারে না। কালের দিক দিয়াও একটি বস্তু ইহার স্বকীয় কালে অবস্থান করে, অপর কালে নহে। সক্রেতিস যীশুখৃষ্টের পূর্বে অবস্থান করিতেন, সুতরাং যীশুখৃষ্টের পরে তিনি অবস্থান করিতে পারেন না। সেইরূপ রূপের দিক দিয়া একটি বস্তু যখন স্বরূপে অবস্থান করে তখন অন্যরূপে অবস্থান করিতে পারে না। জল জমিয়া যাইবার পর-অবস্থায় কঠিন এবং সেই সময় একই সঙ্গে তরল হইতে পারে না।

উক্ত চারিটি দৃষ্টিভঙ্গীই অস্তি-নাস্তিবাদের ভিত্তি। এইভাবেই কোন পদার্থকে ইহার স্বকীয় দ্রব্য দেশ, কাল ও রূপের দিক হইতে 'ইহা আছে' এইরূপে বর্ণনা করা যাইতে পারে, এবং অপর পদার্থের ও দ্রব্য প্রভৃতির দিক হইতে 'ইহা নাই' এইরূপও বর্ণনা হইতে পারে। এই ভাবে বিষয়টি অনুধাবন করিলে বুঝা যাইবে কিভাবে জগতের একই বস্তু সম্পর্কে অস্ত্যর্থক এবং নঞর্থক উভয়েই সত্য হইতে পারে। এই ক্ষেত্রে অস্পষ্টতার কোন অবকাশ নাই বা কোন তাত্ত্বিক রহস্যও আবিষ্কারের প্রশ্ন নাই।

বিশ্ব প্রকৃতি: এখন আমরা জৈন দার্শনিকদিগের মতে বিশ্ব-প্রকৃতি বর্ণনা করিবার চেষ্টা করিব। জৈনদের মতে বাস্তব জগতে দুই শ্রেণীর বস্তু আছে—চেতন বস্তু ও অ-চেতন বস্তু। অন্য ভাবে ইহাকে জীব ও অ-জীব, জীবন্ত ও প্রাণহীন বা আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষায় সকরণ জীব (Organic) ও নিষ্করণ (in-organic) বলা যাইতে পারে। অ-জীব বা অচেতন পদার্থসকল আবার কতকগুলি বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। জৈন-দর্শনে এই গোষ্ঠীগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় পুদ্গল দ্রব্য; ইহা আধুনিক বিজ্ঞানের জড় পদার্থের সহিত সম্পূর্ণভাবে এক। আধুনিক বিজ্ঞানের ন্যায় জৈন-দর্শনেও পুদ্গল-দ্রব্য বা জড় পদার্থ সকল পরমাণু-সৃষ্ট বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। বিভিন্ন ধরনের পরমাণু সকল পদার্থ সৃষ্টি করে, সুতরাং পদার্থসকল অণু-পরমাণুর সমষ্টি বা স্কন্ধ। সমগ্র পদার্থজগৎ এক বিরাট সমষ্টি বা মহাস্কন্ধ। পুদ্গল বা জড-পদার্থসকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, ইহাদের রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি ঐন্দ্রিয় গুণ-সকল বিদ্যমান। জড় পদার্থ ভিন্নও জৈন-দর্শনে দেশ বা আকাশের সত্তা স্বীকৃত। দেশ-নিরপেক্ষ জড়পদার্থ-সমূহ অচিন্তনীয়। সুতরাং জৈন দার্শনিকেরা দেশকে বহির্জগতে একটি অপরিহার্য তত্ত্ব হিসাবে স্বীকার করিয়াছেন। দেশে জড়-সংশ্লিষ্ট

কোন গুণ নাই, কারণ দেশ রূপ-রস-শব্দ-বিবর্জিত। ইহা অচেতনও বটে। এই দেশের একাংশ জড় পদার্থের আশ্রয়স্থল—এই খণ্ডাংশ লোক-আকাশ বলিয়া কথিত হয়। ইহার পরে এক অখণ্ড অনন্ত আকাশ পরিব্যাপ্ত, যেখানে কোন জড় পদার্থের স্থান নাই।

পুদ্গল ও আকাশ ভিন্নও জৈন দার্শনিকেরা ধর্ম ও অধর্ম নামে আরও দুইটি দ্রব্য স্বীকার করেন। জৈন সাহিত্যে[৩] এই দুইটি শব্দের বিশেষ পারিভাষিক অর্থ বা তাৎপর্য আছে। এই ধর্ম ও অধর্ম শব্দকে ভারতীয় নীতিশাস্ত্রের ধর্ম (অর্থাৎ, পুণ্য) এবং অধর্মের (অর্থাৎ পাপ) সহিত এক বলিয়া মনে করিলে ভুল করা হইবে। ধর্ম ও অ-ধর্ম এই ক্ষেত্রে যথাক্রমে গতি ও স্থিতির নির্দেশক। এই দুইটি সমস্ত লোকাকাশে পরিব্যাপ্ত। ইহারা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে সত্য, কিন্তু জগতে প্রত্যক্ষ গতি ও স্থিতির সম্ভাবনাকে ব্যাখ্যা করিবার জন্য ইহাদের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। জৈন-দার্শনিকেরা বলেন যে, এই পদার্থজগৎ যখন অণু-পরমাণু-সৃষ্ট, তখন অণু-পরমাণুগুলি সারা দেশে এমন কি জগতের বাহিরে মহাকাশেও বিক্ষিপ্ত হইয়া ছড়াইয়া যাইতে পারে। এই ভাবে জগতের উপাদানগুলি ছড়াইয়া পড়িলে বস্তুজগৎ ধ্বংস হইয়া যাইবে, কিন্তু বস্তুতঃ জগৎ বিলুপ্ত হয় না, সুতরাং কোন ধারয়িত্রী শক্তি জগতের বিভিন্ন বস্তুসকলকে সংহত হইয়া থাকিতে সাহায্য করিতেছে এইরূপ মনে করিতে হইবে। ইহাই অধর্ম বলিয়া কথিত হয়। অপরদিকে যাহা হইতে গতি উদ্ভূত হইতে পারে এমন কোন শক্তি স্বীকার না করিলে সজীব ও নির্জীব বস্তুর চলাচল ব্যাখ্যা করা যাইবে না। সুতরাং একটি বিপরীত শক্তি যাহা বস্তুকে অগ্রগতির পক্ষে সহায়তা করিতেছে স্বীকার করিতে হইবে। ইহাই ধর্ম। জৈন দার্শনিকেরা গতির নিয়মগুলি অনুধাবন করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা নিউটন-আবিষ্কৃত গতির নিয়মগুলির মধ্যে কয়েকটির পূর্বাভাস দিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।[৪]

পুদ্গল, আকাশ, ধর্ম ও অধর্ম প্রভৃতি তত্ত্ব ভিন্নও জৈন-দর্শনে কালের সত্তা স্বীকৃত হইয়াছে। জৈন-দর্শনে পদার্থজগতে পরিবর্তন ও গতির সত্তা এবং জীব-জগতে বৃদ্ধি ও অগ্রগতি স্বীকৃত হইয়াছে, সুতরাং কাল-সত্তার উপর ইহারা জোর দিয়াছেন। যথার্থ বলিতে গেলে কাল যদি অ-সৎ হইত তাহা হইলে প্রাণি-জগতে গতি-অগ্রগতিনিবন্ধন বিভিন্ন পরিবর্তনও মিথ্যা হইত। জৈন-দর্শনে এইরূপ মত গ্রহণ করা হয় নাই, সুতরাং জৈনমতে কালের বাস্তব সত্য স্বীকৃত। এই কাল-দ্রব্যকে অবিভাজ্য কালিক ক্ষণ দ্বারা গঠিত বলিয়া মনে করা হয়। জীবের খণ্ডিত পাঁচটি অ-জীব সত্তা দ্বারা সমস্ত বিশ্বজগৎ গঠিত হইয়াছে।

জীব বা প্রাণ : পূর্ব-আলোচিত অ-জীব দ্রব্যাদির তুলনায় জীব-দ্রব্য সম্বন্ধে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। জীব সচেতন দ্রব্য। জৈন-দর্শন মতে জীব বহুবিধ, কিন্তু প্রধানতঃ তাহারা দুইটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত। সংসারী অর্থাৎ যাহারা সংসারের মোহে আবদ্ধ, এবং মুক্ত অর্থাৎ সংসারমোহমুক্ত। স-জীব গোষ্ঠীর প্রথম শ্রেণী জন্ম, বৃদ্ধি, জরা ও মৃত্যুর অধীন এইগুলি এই স্থূল জগতের বৈশিষ্ট্য।

এই বদ্ধ জীবসকল আবার বহু গোষ্ঠীতে বিভক্ত। মধ্যজগতের মনুষ্য ও মনুষ্যেতর জীবের মধ্যে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখিলে দেখা যাইবে যে, জৈন দার্শনিকেরা এই জীবের বিষয় বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। ইন্দ্রিয়াদির সংখ্যার তারতম্য-অনুসারে এই জীবসকল ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। এই সকল শ্রেণীর সর্বনিম্ন স্তরে উদ্ভিদ্‌শ্রেণী, যাহাদের কেবলমাত্র স্পর্শেন্দ্রিয় আছে। এই লতা-গুল্ম ও বৃক্ষাদির কেবলমাত্র ঐন্দ্রিক স্পর্শবোধ আছে। এই কারণেই এই সকল জীব একেন্দ্রিয় বলিয়া কথিত হয়। ইহারা স্থবির বলিয়াও অভিহিত হয়, কারণ ইহারা গমনাগমন করিতে পারে না।

উদ্ভিদ্ ব্যতীতও অতি-সূক্ষ্ম একেন্দ্রিয়-যুক্ত জীবের অস্তিত্বও জৈন-দর্শনে স্বীকৃত হইয়াছে। স্থূল দৃষ্টিতে সাধারণতঃ এই সকল জীবকে প্রত্যক্ষ করা যায় না, কিন্তু যৌগিক চেতনায় ইহাদের প্রত্যক্ষ করা যায়। এই সকল আণবিক জীব-সকল জলে, স্থলে, বায়ুতে ও আলোয় বিচরণ করে। এই সকল একেন্দ্রিয় আণবিক জীবসকলকে তাহাদের বাসস্থান-অনুসারে, পৃথিবী, জল ও বায়ুজগতের অধিবাসী বলা হইয়া থাকে।

পরবর্তী স্তরের জীবেরা দুই ইন্দ্রিয়-বিশিষ্ট—যেমন স্পর্শ ও রসেন্দ্রিয়, সুতরাং এই শ্রেণী দ্বীন্দ্রিয় বলিয়া কথিত হয়। দুই ও দুইয়ের অধিক ইন্দ্রিয়-বিশিষ্ট জীবেরা এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গমনাগমনে সমর্থ। সুতরাং তাহারা ত্রস-জীব বা চলমান জীব বলিয়া কথিত হয়। কর্দম-কীট, শুককীট প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত।

এই জীব ক্রমবিকাশের পরবর্তী উন্নত স্তরে ত্রি ইন্দ্রিয়-বিশিষ্ট জীব—অর্থাৎ স্পর্শ, শব্দ ও গন্ধ ইন্দ্রিয়-বিশিষ্ট পতঙ্গসকল। তৎপরবর্তী স্তরে চার ইন্দ্রিয়-বিশিষ্ট জীব (চতুরিন্দ্রিয়) যাহাদের স্পর্শ, রস, গন্ধ ভিন্নও দৃষ্টিশক্তি আছে। এই সকলের ঊর্ধ্বে পঞ্চ ইন্দ্রিয়-যুক্ত জীব। এই সকল জীবের পূর্বোক্ত চতুরিন্দ্রিয় ভিন্নও শ্রবণরূপ পঞ্চেন্দ্রিয় আছে। সকল উচ্চস্তরের জীবই এই শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত। ইহারও ঊর্ধ্বে মনুষ্যসম্প্রদায়ে যাহাদের উক্ত পঞ্চ ইন্দ্রিয় ছাড়াও মনরূপ একটি ষষ্ঠেন্দ্রিয় আছে। মন-বিশিষ্ট পঞ্চ-ইন্দ্রিয়-যুক্ত জীবশ্রেণীর মধ্যে মনুষ্য ভিন্নও দেবতারা এবং নরকের অধিবাসীরা বা নারকেরা অন্তর্ভূক্ত।

কর্মবাদ : জীবসমূহের জাগতিক অবস্থার (সাংসারিক) ব্যাখ্যা হিসাবে জৈন দার্শনিকেরা কর্মবাদের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। জৈন-দর্শনে আট প্রকার প্রধান কর্মের উল্লেখ আছে। (১) জ্ঞানাবরণীয় কর্ম (অর্থাৎ যে কর্ম জ্ঞানকে আবৃত করে), (২) দর্শনাবরণীয় কর্ম (যে কর্ম প্রত্যক্ষকে ব্যাহত করে), (৩) মোহনীয় কর্ম (যে কর্ম মোহ সৃষ্টি করে), (৪) বেদনীয় কর্ম (যে কর্ম সুখ-দুঃখাদির অনুভূতি আনয়ন করে), (৫) নাম-কর্ম (যে কর্মের উপর দেহাদি সৃষ্টি নির্ভর করে), (৬) অন্তরায় কর্ম (যে কর্ম বাধা সৃষ্টি করে), (৭) গোত্র কর্ম (যে কর্ম কে কোন্ বংশে জন্মগ্রহণ করিবে নিরূপণ করে), (৮) এবং অবশেষে আয়ুষ্য-কর্ম (অর্থাৎ যে কর্মদ্বারা জীবের আয়ুষ্কাল নিরূপিত হয়)। মনুষ্য বা মনুষ্যেতর প্রতি জীবই এই আট প্রকার কর্মের নিয়ন্ত্রণাধীন। সংসারে জীবের জীবন উক্ত কর্মসমূহের সহিত সহযোগিতার উপর নির্ভর করে।

উক্ত কর্মসকল আবার দ্বিবিধ, দ্রব্য-কর্ম ও ভাব-কর্ম। প্রথমটি জড় কণিকা-সমূহে গঠিত। এই জড় কণিকাগুলি আত্মার সহিত সংশ্লিষ্ট কার্মিকদেহের মূল অংশের সৃষ্টি করে। সূক্ষ্ম শরীরের চতুর্দিকে স্থূল জড় দেহ পারিপার্শ্বিক জগৎ হইতে আহার সংগ্রহ করিয়া পরিপুষ্ট হয়। ভাব-কর্ম বলিতে অশুদ্ধ মানসিক সংস্কারগুলি বুঝায়। এই মানসিক সংস্কারের উপস্থিতি প্রধানতঃ স্থূল কার্মিক কণিকাগুলিকে আত্মার দিকে আকর্ষণ করে। এই অশুদ্ধ মানসিক সংস্কার জড় কণিকাগুলি হইতে দেহসৃষ্টির উপযুক্ত অবস্থা সৃষ্টি করে, দ্রব্য-কর্ম আবার মানসিক সংস্কারকে প্রভাবিত করে। দ্রব্য-কর্ম দৈহিক অবস্থা এবং ভাব-কর্ম মানসিক সংস্কার। উভয়ের মধ্যে সমান্তরাল অবস্থা বিদ্যমান। উভয়ের মধ্যে সাক্ষাৎ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অবকাশ না থাকিলেও একটির পরিবর্তনে অপরটির পরিবর্তন লক্ষিত হয়। দৈহিক পরিবর্তন পূর্ববর্তী দৈহিক অবস্থার দ্বারা সংঘটিত হয়—তদ্রূপ মানসিক পরিবর্তন পূর্ববর্তী কোন মানসিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। স্থূল ও সূক্ষ্ম যাহাই হউক না কেন এই জড় দেহ হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করিতে হইলে অশুদ্ধ মানসিক সংস্কারটিকে স্ব-চেতনায় পরিশুদ্ধ করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য যোগ ও তপের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

মনুষ্য জীবনের শ্রেষ্ঠত্ব : জৈনদের মতে এমন কি দেবতারাও সাক্ষাৎ মুক্তিলাভ করিতে পারেন না। মুক্তিলাভের আশা করিবার পূর্বে তাঁহাদের এই জগতে মনুষ্যরূপে জন্ম-গ্রহণ করিতে হইবে। মনুষ্যজীবনই সম্ভবতঃ মোক্ষলাভের পথ, কারণ মনুষ্যই এক-মাত্র যোগসাধনে সমর্থ এবং একমাত্র যোগসাধনই বন্ধন-শৃঙ্খল ভঙ্গ করিয়া মুক্তি আনিতে পারে। সুতরাং জৈন-মতবাদে মানুষকে যত উচ্চস্থান দেওয়া হইয়াছে,

তাহা দেবতাদিগকেও দেওয়া হয় নাই। মানুষকে এই জগতে অতি ভাগ্যবান বলিয়া মনে করিতে হইবে, কারণ মানুষই জীবনের চরম লক্ষ্যের সন্নিকটে অবস্থিত। এই বিষয়ে জৈন-দর্শন বদ্ধ জীবদিগের মধ্যে মানুষকে সর্বোচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। এই দৃষ্টিভঙ্গী জৈন-চিন্তাধারাকে অন্যান্য বৈদিক সম্প্রদায়ের চিন্তাধারা হইতে পৃথক করিয়াছে, কারণ বৈদিক সম্প্রদায়গুলির মতে দেবতারা মনুষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

জীবাত্মা তপশ্চর্যা দ্বারা ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন স্তরে আরূঢ় হইতে সমর্থ হইয়া থাকেন এবং প্রতিস্তরেই তিনি অধিকতর শুদ্ধতা লাভ করেন এবং শেষে আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য এবং পরিপূর্ণতার এমন এক অবস্থায় পৌঁছান যেথান হইতে আর ফিরিতে হয় না। যোগসাধনের ফলে আত্মা বিঘ্নজনক পারিপার্শ্বিক এবং জড়দ্রব্যের প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া আপন শুদ্ধ সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হন। আচ্ছাদনকারী মেঘগুলি অপসৃত হইলে সূর্য যেমন কিরণ দান করে, এই অবস্থায় আত্মাও তেমনই আপনার পরিপূর্ণ গৌরবে ভাস্বর হইয়া উঠেন। প্রতি জীবাত্মাই তাহার এই অধ্যাত্ম-মহত্ত্বের স্রষ্টা এবং জন্ম, বৃদ্ধি, ক্ষয়, ধ্বংসরূপ বন্ধনশৃঙ্খল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। মানবাত্মার সর্বোচ্চ অবস্থায় অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত বিশ্বাস, অনন্ত শক্তি ও অনাবিল আনন্দের আবির্ভাব হয়, কারণ এইগুলি চরম উৎকর্ষপ্রাপ্ত আত্মার প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য। এই অবস্থা অদ্বৈত বেদান্তের পরামুক্তির সম-গোত্রীয়।

৩। জ্ঞানতত্ত্ব

জ্ঞানের উৎপত্তি (প্রমাণাদি): জ্ঞানের উৎপত্তি (প্রমাণাদি) জৈন-দর্শনে জ্ঞানের বিভিন্ন উৎপাদক স্বীকৃত হইয়াছে,[১] যেমন মতি, শ্রুতি, অবধি, মনঃ-পর্যায় ও কেবল। এইগুলি যথাক্রমে প্রত্যক্ষ, শব্দ, দূরদর্শন, দূরশ্রবণ এবং সর্বশেষে শুদ্ধ বা সর্বোত্তম জ্ঞান।

অন্যান্য দার্শনিক সম্প্রদায়ের মতে ঐন্দ্রিয়জ্ঞান সাক্ষাৎ-জ্ঞান, কিন্তু জৈনদের মতে অন্য কোন বস্তুর অপেক্ষা না করিয়াই আত্মা যে জ্ঞান লাভ করে তাহাই সাক্ষাৎ-জ্ঞান। সুতরাং প্রথম দুইটি জ্ঞান, মতি ও শ্রুত, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ ও শব্দজ্ঞান, জৈনদের মতে পরোক্ষজ্ঞান, কারণ এই ধরনের জ্ঞান ইন্দ্রিয়াদি বা শাস্ত্রের মাধ্যমে লাভ করা হয়। সুতরাং পরবর্তী তিনটি জ্ঞান প্রত্যক্ষজ্ঞানের অন্তর্ভূত। ইহাদের মধ্যে আবার অবধি-জ্ঞান আধুনিক মনস্তত্ত্বে যাহাকে দূর-দর্শন বা (clairvoyance) বলা হয় তাহার অনুরূপ। দূর-দর্শনের ক্ষমতা কোন ব্যক্তিকে বহু দূরবর্তী স্থান বা

কালের ঘটনায় প্রতিচ্ছবি সম্মুখে উপস্থিত করিতে সহায়তা করে। সুতরাং অবধি-জ্ঞান সম্বন্ধে জৈনদের বর্ণনা আধুনিক মনোবিজ্ঞানের দূরদর্শন-সম্পর্কীয় মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বর্ণনার সহিত সম্পূর্ণ এক। কাহারও কাহারও মধ্যে এই শক্তি জন্মগত, আবার কেহ কেহ মানসিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই ক্ষমতা অর্জন করিয়া থাকেন। কিন্তু ঐন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ যেরূপ ভ্রম-জ্ঞানের জন্য নিষ্ফল হইতে পারে, তদ্রূপ অবধি-জ্ঞানের মধ্যেও ভ্রান্তির অবকাশ আছে।

পরবর্তী উচ্চস্তরের অতীন্দ্রিয় জ্ঞান মনঃপর্যায়। ইহা আধুনিক মনস্তত্ত্বে স্বীকৃত দূর-শ্রবণের (telepathy) ঠিক অনুরূপ। দূর-শ্রবণে ক্ষমতাবিশিষ্ট কোন ব্যক্তি অপরের মনের ভাব ও ধারণাসকল স্পষ্ট অনুভব করিতে পারেন। দূরবর্তী স্থান ও কালের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু সম্বন্ধে অবধি-জ্ঞান হইয়া থাকে, কিন্তু মনঃপর্যায় অপরের মনে কি মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটিতেছে তাহার অন্তর্দৃষ্টি দেয়। এই দূর-শ্রবণ-বিষয়ক জ্ঞানলাভ করা যায় কেবলমাত্র যোগ-তপ-সাধনাদি অভ্যাসের দ্বারা। উক্ত সাধনের পক্ষে কঠোর নিয়মানুবর্তিতা ও একান্ত একাগ্রতা প্রয়োজন। সর্বশেষে উল্লিখিত কেবল-জ্ঞান বা শ্রেষ্ঠজ্ঞান লাভ করা যাহার পরিপূর্ণ আত্মোপলব্ধি ঘটিয়াছে এবং কর্মের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছে এমন শুদ্ধ আত্মার পক্ষেই সম্ভব। এই কেবল-জ্ঞান স্বরূপতঃ অসীম, ইহা সমগ্র বিশ্বের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ বলিয়া কোন কালভেদ নাই, কারণ এই জ্ঞান পরিপূর্ণ অসীম বিশ্বকে আয়ত্ত করিতে পারে।

জ্ঞান-জ্ঞেয়-সম্বন্ধ : জৈন মতে জ্ঞান ও জ্ঞানের বিষয় পৃথক্। যে বিজ্ঞানবাদী দার্শনিকদের মতে জ্ঞানের বিষয় মনের সৃষ্টি তাহাদের সহিত এই ক্ষেত্রে জৈনদের মতভেদ রহিয়াছে। জৈনদের মতে চেতন ও অচেতন বস্তুর মধ্যে পার্থক্য মৌলিক এবং তাঁহারা অবিচলিত ভাবে এই মত পোষণ করেন যে বহির্জগতের জড়দ্রব্য জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র এবং উহা মন কর্তৃক সৃষ্ট নহে। জৈন-দর্শনে জ্ঞান স্বতন্ত্র বহির্বিষয়-সকলকে প্রকাশ করে, জ্ঞেয় বিষয়সকল জ্ঞানক্রিয়ার দ্বারা পরিবর্তিত হয় না। জ্ঞেয় বিষয়সকল মানসিক বৃত্তিও হইতে পারে। মানসিক বৃত্তি সম্পর্কিত জ্ঞান এবং জাগতিক বিষয়-সম্পর্কিত চিন্তন জ্ঞানক্ষেত্রে স্বরূপতঃ এক। এমনকি এই ক্ষেত্রেও জ্ঞানপ্রকাশিত জ্ঞেয় বিষয়সকল জ্ঞান-অতিরিক্ত স্বতন্ত্র বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে, কারণ অন্যথায় এই ভাবে প্রাপ্ত জ্ঞান ভ্রান্ত ও অসৎ হইবে। জ্ঞান স্বয়ংপ্রকাশ, একদিকে নিজেকে নিজে প্রকাশ করে এবং অপরদিকে জ্ঞেয় বিষয়কেও প্রকাশ করে।

৪। জৈন নীতিশাস্ত্র ঃ মোক্ষমার্গ

ভারতবর্ষের অন্যান্য দার্শনিক সম্প্রদায়ের ন্যায় জৈন-দর্শনেও মুক্তিপথের (মোক্ষ-মার্গ) নির্দেশ দেওয়া আছে। উমাস্বামী বলিয়াছেন "সম্যগ্‌দর্শন-জ্ঞান-চরিত্রাণি মোক্ষমার্গাঃ"[৬]—যথার্থ বিশ্বাস, যথার্থ জ্ঞান ও যথার্থ কর্ম—সমষ্টিগতভাবে এই তিনটি মুক্তির পথ। উমাস্বামীর এই সূত্রে সংক্ষিপ্তাকারে জৈন-নির্ধারিত মোক্ষ-মার্গের কথা বর্ণিত আছে। ইহার আবার তিনটি অংশ আছে—অযথার্থ বিশ্বাসের যাহা বিপরীত সেই যথার্থ বিশ্বাস, ভ্রান্ত ভক্তির তুলনায় শুদ্ধা ভক্তি, ভ্রান্তজ্ঞানের যাহা বিপরীত সেই শুদ্ধজ্ঞান, অসৎকর্মের যাহা বিপরীত সেই সৎকর্ম। ভারতীয় দার্শনিক-সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন কোন সম্প্রদায় এই তিনটির মধ্যে একটি মাত্র মার্গকেই মুক্তির পথ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। কোন কোন সম্প্রদায় ভক্তির উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন, ভক্তি থাকিলে সাধক অবশ্যই মুক্তিলাভ করিবে। কেহ কেহ আবার জ্ঞানের উপরে জোর দিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তির বস্তু সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান জন্মে, তাহা হইলে সে তাহার শুদ্ধ আত্মাকে উপলব্ধি করিতে পারে। এই আত্মোপলব্ধি জীবনের চরম লক্ষ্য বা মুক্তি বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। আবার কেহ কেহ সদাচারের উপর জোর দিয়াছেন। কিন্তু জৈন ধারণা অনুযায়ী এই সবগুলিই মুক্তিমার্গের অসম্পূর্ণ বর্ণনা হিসাবে গণ্য হইয়াছে। পূর্বোক্ত তিনটিই মুক্তিকামী ব্যক্তির জীবনে সংযুক্ত হওয়া প্রয়োজন। প্রত্যেকটি পথই প্রয়োজনীয় এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রত্যেকটি সাধনমার্গ অসম্পূর্ণ ও আংশিক।

এই ত্রিবিধ সাধনমার্গ ব্যাখ্যা করিবার জন্য সাধারণ অসুস্থ রোগীর উদাহরণ লওয়া হয়। রোগ-ভোগকারী কোন ব্যক্তির রোগমুক্তির বাসনা থাকিলে তাহার বৈদ্যকে অবশ্য বিশ্বাস করিতে হইবে, এবং কি প্রকার ঔষধ তাহার রোগ নিরাময়ের জন্য নিরূপিত হইয়াছে সেই বিষয়েও তাহার সম্যক্‌ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন এবং অবশেষে বৈদ্যের নির্দেশানুযায়ী সেই ঔষধ সেবন করা প্রয়োজন। সুতরাং শুদ্ধা ভক্তি, সম্যক্‌ জ্ঞান ও সৎকর্ম মুক্তিলাভ করিবার জন্য যুক্তভাবে একই সঙ্গে অভ্যাস করিতে হইবে। সমষ্টিগত ভাবে জৈন-দর্শনে এইগুলি 'রত্ন-ত্রয়' বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। ইহা অবশ্য লক্ষ্য করিবার বিষয় যে জৈনরা সম্যক্‌ দর্শন বলিতে অন্ধবিশ্বাস বুঝেন নাই, যোগ্য গুরুও তাঁহার উপদেশে যুক্তি ও বিচারসম্মত বিশ্বাস বুঝিয়াছেন। সুতরাং জৈনরা সম্যক বিশ্বাস লাভ করিবার জন্য ত্রিবিধ অন্ধ সংস্কারকে দূর করা

প্রয়োজন ইহাই দৃঢ়তার সহিত বলিয়া থাকেন। প্রথমতঃ লোক-মূঢ়া, যেমন কোন বিশেষ জলে স্নান করিলে বা কোন বিশেষ বৃক্ষ প্রদক্ষিণ করিলে মানুষ পবিত্র হয় এই জাতীয় লৌকিক বিশ্বাস; দ্বিতীয়তঃ দেব-মূঢ়া, অর্থাৎ রোগমুক্তির জন্য দেবতাদের পূজা-অর্চনা করা; অবশেষে পাষণ্ড-মূঢ়া, অর্থাৎ প্রবঞ্চকদিগকে বিশ্বাস করা এবং তাহাদিগকে ধর্মগুরু হিসাবে গ্রহণ করা।

এই বিষয়ে ইহা সুস্পষ্ট যে, জৈন দার্শনিকেরা যুক্তিসম্মত দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করিয়াছেন। অধ্যাত্ম-উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের এমন এক অবস্থা উপস্থিত হয় যখন সে বুঝিতে পারে যে শুদ্ধা ভক্তি, সম্যক্ জ্ঞান ও সৎকর্ম সবই তাহার শুদ্ধ প্রকৃতির অঙ্গ। পরিপূর্ণ আত্মোপলব্ধি বলিতে আত্মশুদ্ধির উপর অচল বিশ্বাস, আত্মজ্ঞানের অব্যাহত প্রকাশ এবং অবশেষে নিজের কর্মের নিষ্কলুষ শুদ্ধতা বুঝায়। যখন আত্মা নিজস্ব আন্তর-শুদ্ধতা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়, তখন ইহা পরমাত্মা হইয়া যায়। পরমাত্মা চরম অধ্যাত্ম-সত্তা, ধর্মজীবনের চরম লক্ষ্য। সুতরাং প্রতি আত্মাই সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতা লাভ করিলে ঈশ্বরত্ব লাভ করিতে পারে। অন্যান্য ধর্ম-সম্প্রদায়ের ন্যায় জৈনরা কোন এক নিত্য স্বয়ংসম্পূর্ণ ভগবৎসত্তা স্বীকার করেন না।

পঞ্চ মহাব্রত: সদাচারের পরিপূর্ণ উৎকর্ষ সাধনের জন্য (সম্যক্-চরিত্র) জৈন নীতিশাস্ত্রে পঞ্চ মহাব্রত অনুমোদিত হইয়াছে: অহিংসা, সত্য, অ-স্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ। সর্বজীবে প্রেম ও দয়ার উপর অহিংসা ধর্ম প্রতিষ্ঠিত। ইহা মন, বাক্য এবং দেহের ক্রিয়ার সহিত জড়িত। দেহ, বাক্য ও মনের কোন ক্রিয়া দ্বারা অপর জীবকে আঘাত না করাই আমাদের কর্তব্য। প্রকৃত ক্ষতি করা এবং ক্ষতির বিষয় চিন্তা করা সমান পাপকার্য। জৈন নীতিবিদ্‌রা কেবলমাত্র প্রত্যক্ষভাবে মানসিক, বাচিক ও দৈহিক ক্রিয়াদ্বারা প্রাণি-হিংসা হইতে নিবৃত্ত থাকিতে বলিয়াছেন তাহাই নহে, তাঁহারা পরোক্ষ হিংসাকার্য হইতেও নিবৃত্ত থাকিবার উপর জোর দিয়াছেন। অহিংসানীতিকে যথাযথ পালন করিতে হইলে ত্রিবিধ কর্মকে পরিত্যাগ করিতে হইবে, যেমন প্রত্যক্ষকৃত কর্ম, অপরের মধ্য দিয়া পরোক্ষভাবে কারিত কর্ম, এবং অপরের ক্ষেত্রে অন্যায় কর্মকে অনুমোদন করা, অর্থাৎ কৃত, কারিত ও অনুমত কর্ম। এই ক্ষেত্রে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, কার্যতঃ অপরের অনিষ্ট করা মনে মনে অনিষ্ট চিন্তা করার মতই অন্যায়। ইহাই সর্বোচ্চ নীতিশিক্ষা যাহা Sermon on the Mount-এর সমতুল্য।

জৈনরা সত্য বলিতে কেবল সত্য কথা বলাই বুঝেন না, যাহা সত্য অথচ প্রিয় এবং হিতকর এরূপ কথা বলাই বুঝেন। সকল প্রকার নীতিই জৈনদের মতে অহিংসার

উপর প্রতিষ্ঠিত। সত্য কথা বলিয়া যদি কেহ কোন মানুষ বা পশুর প্রাণনাশ করে, তাহা হইলে সেই সত্য-কথন দূষণীয়। সুতরাং সেই সত্য গ্রহণীয় যাহা অহিংসার বিরোধী নহে।

অনুমতি ভিন্ন পরদ্রব্য গ্রহণ না করিবার নাম 'অ-স্তেয়'। ইহাকে অ-স্তেয় বলা হইলেও ইহার দ্বারা অনেক কিছুই বুঝায়। কোন ব্যবসায়ীর পক্ষে ভ্রান্ত বাট্‌কারা বা ভ্রান্ত মাপ ব্যবহার এই নীতিভঙ্গের একটি উদাহরণ। আবার অন্য দিকে দ্রব্য ক্রয় করিবার সময়ে ভুল বাট্‌কারার দ্বারা নিরীহ বিক্রেতাকে বিভ্রান্ত করিয়া দ্রব্য ক্রয় করাও চৌর্য। অসৎ উপায়ে বা দুর্নীতির পথে ধন-সম্পত্তি অর্জন করিলেও অ-স্তেয় নীতিকে ভঙ্গ করা হয়।

ব্রহ্মচর্য ব্রত বলিতে প্রধানতঃ যৌনসম্ভোগ হইতে নিরত থাকা বুঝায়। কিন্তু কোন কোন জৈন-নীতিবিদের মতে ব্রহ্মচর্য বলিতে সকল প্রকার ইন্দ্রিয়সুখ হইতে বিরত থাকা বুঝায়। সর্ব শেষ ব্রত অপরিগ্রহ। ইহার শব্দগত অর্থ অ-গ্রহণ, অর্থাৎ লোভ পরিত্যাগ করা। জৈন দার্শনিকদিগের মতে এই নীতির দুইটি আকার আছে। তাহাদের পক্ষে যেটি সহজে পালনীয় তাহা গৃহস্থদের জন্য, এবং যেটি পালন করা কঠিন, তাহা সংসারবিরত সন্ন্যাসীদের জন্য।

পঞ্চ মহাব্রত উভয় সম্প্রদায়ের জন্যই নির্ধারিত হইয়াছে। গৃহস্থের পক্ষে (যাহাকে শ্রাবক বা শ্রোতা বলা হইয়া থাকে) উক্ত পঞ্চনীতির পালন কয়েকটি বিশেষক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহাকে সাধ্য মত এইগুলি পালন করিতে হইবে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায়, যাহাকে কৃষিকার্যে নিযুক্ত থাকিতে হইবে এমন কোন গৃহস্থের পক্ষে উদ্ভিদ্ বা একেন্দ্রিয়বিশিষ্ট জীবের প্রতি অহিংসা ধর্ম পালন করা সম্ভব নহে, তাহা হইলে সমাজে গুরুতর বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। সুতরাং গৃহস্থকে উদ্ভিদ অপেক্ষা উচ্চশ্রেণীর চলাচলে সমর্থ জীবের প্রতি অহিংসা পালন করিবার নির্দেশ দেওয়া আছে। কিন্তু সংসারবিরত সন্ন্যাসীর পক্ষে এই নীতি সর্ব-অবস্থায়ই প্রযোজ্য। তিনি কোন জীবকেই আঘাত করিতে পারিবেন না। সুতরাং সন্ন্যাসীদের পক্ষে সদাচার (যতি ধর্ম) এই পঞ্চ মহাব্রতের কোনরূপ অবস্থা বিচার না করিয়া পরিপূর্ণ পালন বুঝায়।

গৃহস্থের পক্ষে ব্রহ্মচর্য এক-দার-ব্রত বুঝায়। গৃহস্থ নিজের স্ত্রীর সম্পর্ক ভিন্ন অন্য কোন প্রকার যৌন-সম্পর্কে লিপ্ত থাকিতে পারিবেন না। কিন্তু সন্ন্যাসীর পক্ষে সকল প্রকার যৌন-জীবন হইতে বিরত থাকাই বিধি। তিনি কায়, মন ও বাক্য-দ্বারা ব্রহ্মচর্য পালন করিবেন। তদ্রূপ অ-পরিগ্রহ ব্রত ক্ষেত্রেও সন্ন্যাসীরা এই নীতি

সর্বতোভাবে প্রতিপালন করিবেন। তাঁহার নিজস্ব বলিয়া কিছুই থাকিবে না। তিনি তাঁহার সমস্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তি এমন কি বস্ত্র অলঙ্কারাদিও পরিত্যাগ করিবেন এবং সাময়িক আহারাদির জন্য গৃহস্থদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল থাকিবেন। সংসারত্যাগী অধ্যাত্ম-সন্ন্যাসী যোগপালন করিবেন এবং সমস্ত চিন্তা-ভাবনা আত্মোপলব্ধির জন্য নিয়োগ করিবেন। এমনকি তাঁহার নিজের দেহও অধ্যাত্ম-উন্নতির কারণ হিসাবে ব্যবহৃত হইবে। সন্ন্যাসী সকল প্রকার সংসারবন্ধন এবং মায়া পরিত্যাগ করিবেন। সমগ্র বিশ্বই তাঁহার সংসার, মনুষ্য, জীবজন্তু সকল প্রাণীরই তাঁহার উপর স্নেহের দাবী আছে। জগতে তাঁহার পর বলিতে কেহই নাই। সকলেই তাঁহার আত্মীয়-স্বজন এবং সকলেই তাঁহার প্রেম ও করুণার পাত্র। এই ভাবে অধ্যাত্ম-উন্নতির পথে নিজেকে নিয়োজিত রাখিয়া যাহারা তাঁহার সাহায্য ও পরিচালনাপ্রার্থী তাহাদের সকলের প্রতিই তিনি তাঁহার সামাজিক কর্তব্য পালন করিবেন। সমাজের সার্বিক সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের প্রতি গৃহস্থ-প্রতিপালিত এই সকল শ্রমণেরা লক্ষ্য রাখেন।

জৈন নীতিশাস্ত্র জাতিধর্ম-বিশেষে কর্তব্য কর্ম নির্ধারণ করে না। জন্ম হইতে প্রত্যেক মানুষই সমান এবং প্রত্যেকেই তাহার ক্ষমতা ও রুচি-অনুযায়ী গৃহস্থ বা সন্ন্যাসী হইতে পারে। সে তাহার ইচ্ছানুসারে সমাজ ও মর্যাদাযোগ্য অনুমোদিত নীতি-ধর্ম প্রতিপালন করিতে পারে।

অ-স্তেয় ব্রত সম্পর্কে জৈন-ধারণা এই ক্ষেত্রে বিশেষ দ্রষ্টব্য। অর্থনৈতিক বৈষম্য হেতু স্বল্পকালের মধ্যে দুইটি মহাযুদ্ধ জগৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছে। জৈন দার্শনিকেরা সম্ভবতঃ পূর্বেই সমাজে এইজাতীয় অর্থনৈতিক বৈষম্য ঘটিতে পারে তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং সেই কারণেই গৃহীদের পক্ষে পরিমিত পরিগ্রহের নীতি বিশেষভাবে পালন করিতে নির্দেশ দিয়া গিয়াছিলেন। যদি প্রত্যেক গৃহস্থ তাহার অবস্থানুযায়ী স্বেচ্ছায় নিজ সম্পত্তি পরিমিত করিয়া লয় এবং তদতিরিক্ত সব কিছুই সমাজকে বিলাইয়া দেয় তাহা হইলে পুঁজিপতি ও শ্রমিক, ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে সঙ্ঘর্ষের কোন অবকাশ থাকে না। সারা বিশ্বে এই জাতীয় অর্থনৈতিক সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত ; তাহা না হইলে অর্থনৈতিক বৈষম্য হইতে রাজনৈতিক এবং অবশেষে সামরিক বিরোধ দেখা দেয়। ফলে মনুষ্যসভ্যতা বিনষ্ট হইয়া যায়, মনুষ্যসমাজের ভবিষ্যৎ সুখ শান্তি অর্থনৈতিক অবস্থার নীতিসম্মত সাম্যের উপর অধিকতর নির্ভর করিতেছে।

উপসংহারের পূর্বে জৈনধর্মের অধ্যাত্মমূল্য সম্পর্কে দুই একটি কথা বলা যাইতে

পারে। পূর্বের আলোচনা হইতে ইহা সুস্পষ্ট যে জৈনধর্ম অহিংসা ও সত্য ব্রতের উপর অধিকতর জোর দেয়। দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও জৈন-সাধুদের ক্রিয়াকলাপের উদাহরণে জৈন-সাহিত্য পরিপূর্ণ। দুঃখকে জয় করা (উপসর্গ জয়) জৈন-সন্ন্যাসীদের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। জৈন-সন্ন্যাসীরা যখনই কোন বিরোধের সম্মুখীন হইয়াছেন, এবং বিরোধীরা যখনই অত্যাচার ও মৃত্যুর ভয় দেখাইয়াছে, জৈন-সন্ন্যাসীরা বিচলিত হয়েন নাই। বিরোধীদের অজ্ঞতা দেখিয়া মৃদু হাস্যে তাহাদের উপর করুণা প্রদর্শন করিয়াছেন।

এই শান্ত অবস্থা অসাধারণ সাহস ও মানসিক স্থৈর্যের পরিচয় দেয় যাহা কেবলমাত্র অধ্যাত্ম-শক্তি ও সাধনা হইতে জন্ম লইতে পারে। আত্মার এই অধ্যাত্ম-ক্ষমতা বা শক্তি গান্ধীজী রাজনৈতিক সংগ্রামে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিয়াছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারতবর্ষ উভয় স্থানেই তিনি দক্ষতার সহিত রাজনীতি-ক্ষেত্রে তাঁহার যে প্রতিদ্বন্দ্বীদের হস্তে ধ্বংস ও অত্যাচারের সাধারণ হাতিয়ার ছিল তাহাদের বিরুদ্ধে এই অধ্যাত্ম অস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছিলেন। সুতরাং গান্ধীজী অহিংসা ও সত্যকে বিশ্ব-মর্যাদায় তুলিয়াছেন। সমাজ ও রাজনীতি-ক্ষেত্রে সত্য ও অহিংসার প্রয়োগ নিঃসন্দেহে ইহার অধ্যাত্মমূল্য প্রমাণ করিয়াছে। অহিংসা ও সত্যাগ্রহের অস্ত্রে সজ্জিত থাকিলে পশুশক্তির উপর নির্ভরশীল যে কোন শত্রুর উপর জয়লাভ করা যায়। জীবিতাবস্থায় গান্ধীজী যুদ্ধোত্থিত ও ভাবীকলহে ক্লিষ্ট জগৎকে এই অধ্যাত্ম অস্ত্র দেওয়ার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। তিনি আশা করিয়াছিলেন যে, এই অধ্যাত্ম আদর্শই জগৎকে ক্লিষ্টকারী নানাবিধ অন্যায়ের নিরাময়ের কার্য করিতে সমর্থ হইবে। আমরা আশা করি যে, গান্ধীজীর আদর্শই শেষ পর্যন্ত জয়ী হইবে, সংগ্রামশীল শক্তিগুলি শান্তিকামী জাতি হিসাবে পরিবর্তিত হইবে এবং জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলেই সুখে-শান্তিতে বাস করিতে পারিবে।

দ্রষ্টব্য

১। তত্ত্বার্থাধিগম-সূত্র—উমাস্বামী

২। ঐ

৩। তুলনীয়—ধর্মাদয়ঃ সংজ্ঞাঃ সাময়িকাঃ—তত্ত্বার্থ-রাজ-বার্তিক

৪। ষ্টিভেন্‌সন্‌—দি হার্ট অব্‌ জৈনিজম্‌—১০৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য
৫। তত্ত্বার্থাধিগম-সূত্র, ন্যায়াবতার ও ষড়্‌দর্শনসমুচ্চয় দ্রষ্টব্য
৬। তত্ত্বার্থাধিগম-সূত্র

গ্রন্থবিবরণী

উমাস্বামী—ইংরেজী অনুবাদসহ তত্ত্বার্থাধিগম-সূত্র, দি সেণ্ট্রাল জৈন পাবলিশিং হাউস, আরা
সিদ্ধসেন দিবাকর—ইংরেজী অনুবাদ সহ ন্যায়াবতার, ইণ্ডিয়ান রিসার্চ সোসাইটি, কলিকাতা
মল্লিসেন—স্যাদ্‌-বাদ-মঞ্জরী, চৌখাম্বা, বারাণসী
হরিভদ্র—ষড়্‌-দর্শন-সমুচ্চয়—এশিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা
নেমিচন্দ্র—দ্রব্য-সংগ্রহ—সেণ্ট্রাল জৈন পাবলিশিং হাউস, আরা
জ্যাকবি—সেক্রেড্‌ বুকস্‌ অব দি ঈস্ট, জৈন ধর্মগ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ
মিসেস্‌ এস্‌ ষ্টিভেনসন্‌—দি হার্ট অব জৈনিজম্‌, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস

দশম পরিচ্ছেদ

বৌদ্ধ দর্শন

ক। প্রাচীন বৌদ্ধ মতবাদ

বুদ্ধের সময়ে দেশের সাংস্কৃতিক অবস্থা : খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন। ইহা এক আধ্যাত্মিক অস্থিরতার যুগ ছিল এবং প্রাচীন ধর্মের বন্ধন হইতে সমাজ দ্রুত সরিয়া যাইতেছিল। বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডে উপাসনার আন্তরিকতা অপেক্ষা যজ্ঞবিধি-সমূহের আক্ষরিক প্রতিপালনের উপরই অধিক গুরুত্ব দেওয়া হইত। শাস্ত্রের প্রতি আনুগত্য দেবভক্তির স্থান অধিকার করিয়াছিল। সমগ্র যজ্ঞবিধি জটিল ও ব্যয়বহুল হইয়া উঠিয়াছিল এবং আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া সম্বন্ধে বহিরাঙ্গিক ত্রুটীবশতঃ ফল সম্বন্ধে অনিশ্চয়তার সম্ভাবনা থাকায় যাঁহারা নির্ভুল মন্ত্রোচ্চারণ করিতে পারিতেন এবং সর্বপ্রকার যাগ-যজ্ঞের সূক্ষ্ম খুঁটিনাটির বিষয় স্মরণ রাখিতে পারিতেন স্বভাবতঃই সমস্ত ক্রিয়া-কাণ্ডের উপর তাঁহাদের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। যাগ-যজ্ঞজনিত নিষ্ঠুরতা অপ্রতিহতভাবে চলিয়াছিল এবং সম্ভবতঃ যজ্ঞের পৃষ্ঠপোষক রাজন্যবর্গের উদ্ভব হওয়ায় পুরোহিত শ্রেণীর ধনলিপ্সা কিয়ৎপরিমাণে বৃদ্ধি পাইবার সুযোগ লাভ করিয়াছিল।

ঐ সময়ে দেশে এমন কতকগুলি দার্শনিক চিন্তাধারা প্রচলিত ছিল যাহা হইতে একেশ্বরবাদ ও অদ্বৈতবাদের উদ্ভব হওয়া সম্ভবপর। জীবনের শেষভাগে ব্যয়বহুল দ্রব্যময় যজ্ঞাদির সাহায্য না লইয়াই ঈশ্বরের ধ্যান ও সাধনা করার জন্য বনগমনের প্রথাও ক্রমেই বাড়িতেছিল। তাহা ছাড়া আত্মজ্ঞান, ধ্যান এবং নৈতিক আচরণকে আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভের অপরিহার্য উপায় স্বরূপ গণ্য করিয়া ইহাদের উপরে সমধিক গুরুত্ব অর্পণ করা হইতেছিল। এই সকল কারণ জটিল দেববাদ, আড়ম্বরপূর্ণ ক্রিয়াকাণ্ড এবং পুরোহিত সম্প্রদায়ের একাধিপত্যের বিরুদ্ধে কাজ করিতেছিল। সম্ভবতঃ সিন্ধু উপত্যকার সুমেরো-দ্রাবিড় সংস্কৃতির সহিত সংঘর্ষের ফলে এবং আর্য-সংস্কৃতির প্রভাবের প্রাচীন সীমান্তের বাহিরেও পূর্ব ও দক্ষিণে যেথানে পার্বত্য এবং বন্যজাতিরা কখনও বা আর্য্য সভ্যতা বিস্তারের প্রতিরোধের চেষ্টা করিতেছিল এবং কখনও বা আর্য্য পূজাপদ্ধতি ও চিন্তাধারা অনুকরণ করিতেছিল। সেই সকল স্থলে এই সংস্কৃতি বিস্তার বাঞ্ছনীয় মনে হওয়ায় উহাকে সম্ভবতঃ যুগোপযোগী এক নূতনরূপ

দিবার চেষ্টার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। আর্যসভ্যতা ভারতের প্রাচীনতর সংস্কৃতিগুলির নিকট কতটা ঋণী সে সম্বন্ধে এতকাল পরে সঠিকভাবে কিছু বলা যায় না, তবে কেহ কেহ এইরূপ মনে করেন যে যৌগিক ধ্যান, কৃচ্ছ্র সাধনা, জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস প্রভৃতি এবং শিবপূজা এবং পরবর্তীযুগের শক্তিপূজা পদ্ধতি অনার্যদের নিকট হইতে আসিয়াছে। প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্যে বৈদিক তত্ত্ব এবং ক্রিয়াকাণ্ড সম্পর্কে যে জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে ক্রিয়াকাণ্ডের পদ্ধতির কোন বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ এই জ্ঞান সাধারণ লোকের বিশ্বাস এবং ধর্মসম্বন্ধীয় ক্রিয়াকাণ্ডকে বুদ্ধিপূর্বক পর্যবেক্ষণ করিয়া সংগৃহীত হইয়াছিল। বৌদ্ধ সাহিত্যে বৈদিক ধর্মের প্রতি একটা বিদ্রূপের মনোভাব ছিল। বৈদিক কর্মকাণ্ডের সমালোচনা অবশ্য ইহার পূর্বেই আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল, কারণ, এমন কি উপনিষদ্‌গুলিতেও যাগযজ্ঞের যে বিশেষ কোন উপকারিতা নাই ইহা বলা হইয়াছিল এবং আনন্দপূর্ণ পরলোক লাভ করিবার শ্রেষ্ঠ উপায় হিসাবে চরমতত্ত্বের জ্ঞানকেই গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছিল। যাহারা নির্ভুলভাবে যাগযজ্ঞাদি সম্পাদন করে তাহাদের গন্তব্যস্থল যে মনোরম স্বর্গভূমি ইহা তাহার ন্যায় নহে, কিন্তু ইহা একটি দুঃখহীন আধ্যাত্মিক শান্তিপূর্ণ অবস্থা। এই অবস্থার স্বরূপ সম্বন্ধে বিভিন্ন মত প্রচলিত ছিল, কিন্তু ইহা যে কষ্টসাধ্য নৈতিক প্রচেষ্টার ফল এবং জগতের ক্ষণস্থায়ী বস্তু সমূহের প্রতি নিবিড় আসক্তি এবং কামনা ও বিতৃষ্ণাপূর্ণ ইন্দ্রিয়জীবনের আলোড়নের অনেক উর্ধ্বে সে সম্বন্ধে কোন মতভেদ ছিল না।

চিন্তার আলোড়নের কেন্দ্রস্থল মগধ : যে অঞ্চলে বুদ্ধ এবং মহাবীর জীবন যাপন করিয়াছিলেন, শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং দেহরক্ষা করিয়াছিলেন, সেই অঞ্চলেই বোধ হয় মনোভাবের এই পরিবর্তন অধিক প্রকট হইয়াছিল। উপনিষদ্‌সমূহে ব্রহ্মের স্বরূপসম্বন্ধীয় যে সকল চিন্তা দেখা যায় এবং যেগুলি সাধারণতঃ কর্মকাণ্ডের বিরোধী মগধের রাজসভা যে কোন উপযুক্ত কারণ ব্যতীতই সেই সকল চিন্তার বিকাশের পক্ষে অনুকূল স্থান হইয়াছিল একথা বলা যায় না। ব্রহ্মজালসুত্তের কথা সত্য হইলে কর্মকাণ্ড বিরোধী সম্প্রদায় বহুসংখ্যক এবং নানাশ্রেণীর ছিল। বৌদ্ধদের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে যে ছয়জনকে প্রধান নাস্তিক আচার্য (তীর্থিক) বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে যথা পুরাণ কস্সপ, মক্‌খলি গোসাল, অজিত-কেশ-কম্বলিন, পকুধ-কচ্চায়ন, নিগণ্ঠ-নাটপুত্ত এবং সঞ্জয় বেলট্‌ঠপুত্ত—তাঁহারা ব্যতীত আরও অনেকে সামাজিক, ধর্মীয় এবং দার্শনিক সমস্যাগুলির নূতনভাবে সমাধানের চেষ্টা করিতেছিলেন এবং স্থান হইতে স্থানান্তরে ভ্রমণ করিয়া তাঁহাদের মতগুলি দেশের সর্বত্র প্রচার করিয়া সকলের

মধ্যে সন্দেহ, অবিশ্বাস ও প্রচলিত মতের বিরোধিতা বিস্তার করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। এই পরিব্রাজকরা সাংসারিক বিষয়ে ঔদাসীন্য অবলম্বন করিতেন কিন্তু মনে হয় যে তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা অধিক উচ্চাকাঙ্ক্ষী তাঁহারা একে অপরের উপদেশ ও আচরণ সমালোচনা করিতেন এবং যাহারা পিতৃ-পিতামহদের প্রাচীন ধর্মেই দৃঢ় বিশ্বাসী ছিল তাহাদের নেতৃত্ব করিতে চেষ্টা করিতেন। ইহা সত্য যে তখন পর্যন্তও অনেকেই যজ্ঞ তপস্যা প্রভৃতি প্রাচীন পদ্ধতিতে বিশ্বাস করিত, কিন্তু সম্ভবতঃ নাগরিক সভ্যতা যতই বিস্তারলাভ করিতে লাগিল এবং এক নূতন শ্রেণী-চৈতন্য জাগ্রত হইবার ফলে লোকেরা যতই আধ্যাত্মিক বিষয়ে ব্রাহ্মণদের একাধিপত্য সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলিতে থাকিল এবং যে ক্রিয়াকাণ্ডে ব্রাহ্মণের উপস্থিতি অপরিহার্য তাহার বিরোধিতা করিতে লাগিল ততই এই সকল পদ্ধতি ক্রমশঃ পুরাতন হইতে থাকিল। প্রাচীন আধ্যাত্মিক জগতে যে সকল লোকের এবং যে সকল অঞ্চলের স্থান নীচে ছিল স্বভাবতঃই তাহাদের মধ্যে এবং সেই সকল অঞ্চলে বিদ্রোহের চিহ্ন দেখা দিয়াছিল এবং আর্যভূমির প্রান্তে অবস্থিত যে অঞ্চল একদিন মহাবীর ও বুদ্ধের ধর্ম-প্রচার ভূমি হইবে তাহা নানারূপ আধ্যাত্মিক অসন্তোষে পূর্ণ হইয়াছিল।

বিভিন্ন জাতিভুক্ত এই পরিব্রাজকগণ প্রাচীন প্রথানুযায়ী দেবতা, ঋষি ও পিতৃপিতামহদের ঋণ পরিশোধ করিবার পূর্বে গৃহত্যাগ করিয়া যাইতেন। কোন গুরুর আশ্রয়ে থাকিয়া আত্মোৎকর্ষ লাভ করাই তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল। এই গুরুই প্রকৃতপক্ষে দেবতাদের স্থান অধিকার করিতেন। মানব, মানবের কর্তব্য ও তাহার চরমগতি সম্বন্ধে নিজেদের এক দার্শনিক মতবাদ গঠন করাই তাঁহাদের পদ্ধতি ছিল।

বুদ্ধের সত্য সন্ধান: মহাসন্ন্যাস গ্রহণ করিবার পর বুদ্ধ এই সন্ন্যাসী সংঘে যোগদান করিয়াছিলেন এবং অন্যান্য অনেকের ন্যায় যাঁহার নির্দেশক্রমে যোগাভ্যাস করিতে পারেন প্রথমে এমন একজন গুরুর সন্ধান করিয়াছিলেন। অনুপিয়ায় কয়েকদিন নিজেকে সন্ন্যাসীজীবনে অভ্যস্ত করিয়া তিনি রাজগৃহে (অধুনা রাজগির) গমন করিলেন। রাজগৃহে মগধের রাজধানী ছিল এবং এইস্থানে বিম্বিসার রাজত্ব করিতেন। তাহার পর তিনি ক্রমান্বয়ে আলারা কালাম এবং উদ্দক রামপুত্ত নামে দুইজন খ্যাতনামা দার্শনিক আচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। আত্মা, অনাত্মা ও তাহাদের বিভেদের জ্ঞান অতিক্রম করিয়া জ্ঞানের প্রবাহকে রোধ করিবার জন্য বিভিন্ন স্তরের সমাধি বা ধ্যান (সমাপত্তি) সাধনা করিয়া কি ভাবে জীবনের সকল দুঃখকষ্ট নিবারণ করিতে পারা যায় তাঁহারা তাহাই শিক্ষা দিতেন। ধ্যান বা সমাধির এই অবস্থা বুদ্ধ নিজেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া দাবী করিতেন। ইহা মনে করা

অসঙ্গত হইবে না যে, তাঁহার শিশুত্বকালে তাঁহার আচার্যগণ তখনকার সুপ্রচলিত যে সকল দর্শনশাস্ত্রের সহিত পরিচিত ছিলেন তিনি সেইগুলির কিছু কিছু জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন এবং এই সকল দর্শনের-মতবাদ পরবর্তীকালের সাংখ্যদর্শনসম্মত জড় ও আত্মার তাত্ত্বিক বিভেদ এবং পরবর্তীকালের যোগশাস্ত্রে বিহিত দেহকে বশীভূত করিবার এবং আত্মার বিস্তারসাধনের জন্য ব্যবহারিক প্রক্রিয়ায় অনুকূল ছিল।

ইহা নিশ্চিত যে বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্বে ভারতীয় চিন্তাধারা সন্ন্যাসের আদর্শের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। যৌনব্যাপার স্বভাবতঃই তীব্র ঘৃণার বিষয় ছিল এবং যৌন পবিত্রতা বা শুদ্ধতা বলিতে যৌনসম্পর্কিত সকল প্রকার চিন্তা, ক্রিয়া ও বাক্য সম্পূর্ণভাবে বর্জন এবং সংসার ত্যাগকেই বুঝাইত। আহার সংযম এবং তাহার পরিণতি উপবাস, নিদ্রা, বিশ্রাম প্রভৃতি শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি ঔদাসীন্য, পরিচ্ছদের স্বল্পতা যাহা প্রায় পূর্ণ নগ্নতারই অনুরূপ, যাহা মানুষের রিপুকে উদ্দীপ্ত করে এবং অপরের ক্লেশ সম্বন্ধে ঔদাসীন্যের অভ্যাসের সৃষ্টি করে সেই আমিষ খাদ্য ত্যাগ—এইগুলি তখনকার ধর্মপ্রচারকগণ অল্প বা অধিক কঠোরতার সহিত অভ্যাস করিতেন।

বোধি-প্রাপ্তি : আমরা ইহা মনে করিতে পারি যে, বুদ্ধ তাঁহার শিক্ষকদের নিকট হইতে তাঁহার প্রার্থিত বস্তু না পাইয়া যেক্ষেত্রে সমাধি দ্বারা সুফল লাভ হয় নাই সেক্ষেত্রে কোন ব্যবহারিক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া জগতের রহস্যের সমাধান করিতে পারা যায় কি না দেখিবার জন্য প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত কৃচ্ছ্রসাধনার পথ গ্রহণ করিলেন। তিনি ছয় বৎসর ধরিয়া যে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহার বিশদ বর্ণনা তিনি নিকায়গ্রন্থগুলিতে নিজেই দিয়াছেন। তাহার পর তিনি অধিকতর কঠোর তপশ্চর্যায় রত হইলেন এবং প্রগাঢ় ধ্যানের সাহায্যে বিশ্বের রহস্য এবং ব্যক্তিজীবনের অন্তরতম প্রদেশের তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু অত্যধিক উপবাসের ফলে দুর্বল হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি চরম কৃচ্ছ্রসাধনার নিষ্ফলতা উপলব্ধি করিলেন এবং পূর্বের ন্যায় আহার করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহার ফলে পাঁচ জন সন্ন্যাসী তাঁহার প্রতি বিশ্বাস হারাইয়া তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গেলেন। তখন তিনি জগতের সমস্যাসমূহের সমাধান করিবার জন্য তাঁহার শেষ পদ্ধতি অবলম্বন করিলেন এবং সফল হইলেন।

তিনি সকল প্রকার কুৎসিত চিন্তা ও সংস্কার দমন করিলেন এবং বাসনা (তৃষ্ণা), কামনা (রাগ), ঘৃণা (অ-রতি) জয় করিলেন। তিনি প্রথমে আত্মা তাহার পর সকল মানবের চরম গতি, অবশেষে সমগ্র বিশ্ব, অর্থাৎ, যাহাকিছুর অস্তিত্ব আছে,

তাহার রহস্য সম্বন্ধে গভীর হইতে গভীরতর অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিলেন। তিনি বোধি লাভ করিলেন এবং জ্ঞানী (বুদ্ধ) বলিয়া অভিহিত হইবার দাবী প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ঠিক এইরূপ লোভের (মারের) বিরুদ্ধে সংগ্রামে জয়ী হইয়া তিনি বীর এবং জয়ী (জিন) আখ্যা লাভ করিলেন। তখন হইতে তিনি তথাগত (যিনি বস্তুসকলের স্বরূপ অবগত হইয়াছেন) বা অর্হৎ (পূজনীয়) বলিয়াও অভিহিত হইতেন। ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে বুদ্ধ কতকগুলি প্রাচীন নীতি ও ধর্মসম্পর্কীয় আচারের পালনীয়তা ও বিশ্বাসের সত্যতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন তুলেন নাই এবং শেষ পর্যন্ত তিনি তাহাদের কতকগুলিকে বর্জন করিলেও অপর কতকগুলিকে তাঁহার নিজের মতবাদ ও ব্যবহার-নীতিতে স্থান দিয়াছিলেন।

বুদ্ধের নব আবিষ্কার : উরুবেলাতে নেরঞ্জরা তীরে সেই সঙ্কটময় রাত্রিতে বুদ্ধ কোন্ বিশিষ্ট তত্ত্ব আবিষ্কার করিবার দাবী করিয়াছিলেন ? স্বভাবতঃ প্রাচীন বৌদ্ধ মতবাদ কি ছিল তাহা জানিবার জন্য পালি ধর্মগ্রন্থ এবং বিশেষ করিয়া ধম্মচক্কপ্পবত্তনসুত্ত, অনত্তালকখণসুত্ত প্রভৃতি যে সকল গ্রন্থে বুদ্ধের নিজের বাণীসমূহ উদ্ধৃত আছে বলিয়া মনে করা হয় তাহাদের উপরেই আমাদিগকে নির্ভর করিতে হইবে। দুর্ভাগ্যবশতঃ বর্তমান পালি সুত্তগ্রন্থগুলিতে বুদ্ধ স্বয়ং যাহা বলিয়াছিলেন ও করিয়াছিলেন তাহার কোন যথার্থ বিবরণ পাওয়া যায় না। এইগুলিতে আদি বৌদ্ধ সংঘের প্রাচীন ও পরবর্তী বিশ্বাসসমূহ লিপিবদ্ধ আছে, সুতরাং বুদ্ধের প্রকৃত মতবাদকে তাঁহার প্রাচীন শিষ্যগণের ও পরবর্তী যুগের ত্রি-পিটকের সম্পাদকগণের চিন্তাসমূহ হইতে পৃথক্ করা খুব সহজসাধ্য নয় এরূপ মনে করা অসঙ্গত হইবে না। হয়ত বুদ্ধের মন কালক্রমে বিকাশলাভ করিয়াছিল অথবা তাঁহার শিক্ষা এবং প্রচারক-জীবনের প্রয়োজনানুসারে তাঁহার চিন্তার মধ্যে যে সকল ত্রুটি ছিল সেগুলি সংশোধন করা হইয়াছিল এবং পূর্বের অসংলগ্ন উক্তিগুলিকে সুসংবদ্ধ করিবার জন্য একটি নূতন পদ্ধতি উদ্ভাবিত হইয়াছিল, অথবা স্থানীয় প্রয়োজন মিটাইবার জন্য মূল মতবাদের মধ্যেই সামান্য সামান্য পরিবর্ধন বা পরিবর্তন করা হইয়াছিল, অথবা ক্রমবর্ধমান সংঘে নিয়মানুবর্তিতা রক্ষা করিবার জন্য এবং সকলের বুঝিবার সুবিধার জন্য চিন্তা ও ব্যবহারক্ষেত্রে বিস্তৃত উপদেশ দেওয়ার প্রয়োজন হইয়াছিল এবং যাহাতে শ্রোতৃবর্গের বোধশক্তির উপযোগী হইতে পারে অথবা কোন বিশেষ সময়ের প্রয়োজন মিটাইতে পারে এই ভাবে জগৎ সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ প্রচার করিতে হইয়াছিল।

ইহার ফলে পরবর্তীকালে বুদ্ধের উপদেশে প্রজ্ঞা (জ্ঞান) এবং উপায় (আকার), অর্থাৎ, আলোচনার উপাদান এবং তাহার আকার উভয়কে সংযুক্ত করার প্রয়োজন

হইয়াছিল। কিন্তু ভিন্নধর্মের প্রবর্তকদের উপদেশের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে দাবীর সম্মুখীন হইয়া এবং তাঁহাদের তুলনায় আপনাদের ধর্মপ্রবর্তকের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতে কৃতসংকল্প হইয়া ধর্মপ্রাণ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন যাজকগণ ও সাধারণ লোকেরা যে সম্ভবতঃ অথবা নিশ্চয়ই বুদ্ধের নিজ উপদেশগুলি বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছিল এবং ঐগুলিতে বহুবিষয় যোজনা করিয়াছিল এরূপ মনে করিবার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি আছে। বৌদ্ধ সূত্র সাহিত্য পালিভাষায় রচিত, বুদ্ধ সম্ভবতঃ যে ভাষায় কথা বলিতেন সেই মগধীয় ভাষায় নয়, এবং এই পালিভাষা সৌরসেনী প্রাকৃতের একটি বিশেষরূপ অবন্তীভাষার সহিত সংশ্লিষ্ট, তাহা হইলেও, ওল্ডেন্‌বার্গের মত অনুসরণ করিয়া আমরা বলিতে পারি যে বুদ্ধ দার্শনিক তত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ দেন নাই কেবলমাত্র কতকগুলি সহজ বিষয় শিক্ষা দিয়াছিলেন এইরূপ ধারণার বশবর্তী হইয়া প্রাচীন বৌদ্ধধর্মে জটিল চিন্তার কোন স্থান নাই ইহা মনে করা সঙ্গত হইবে না।

বুদ্ধের সারনাথে প্রদত্ত উপদেশাবলী নির্ভরযোগ্য বলিয়া মনে করিলে তাঁহার একটি উপদেশকে মূল উপদেশ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। তাহা হইতেছে এই যে, শারীরিক অসুস্থতা সম্বন্ধে যেমন ইহা সত্য যে রোগ, রোগ হেতু, আরোগ্য এবং ভৈষজ্য আছে সেইরূপ দুঃখ (হেয়) এবং দুঃখের কারণ (হেয়-হেতু) যেমন আছে তেমনই দুঃখের নিরাময় (হান) এবং সেই নিরাময়ের উপায় (হানোপায়) আছে। ভেষজ শাস্ত্র এবং মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য এই উভয় ক্ষেত্রেই 'নিদান' শব্দটি দুঃখের কারণ বুঝাইতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দুঃখ, সমুদয় (দুঃখের কারণ), নিরোধ (দুঃখ-নিবারণ) ও মার্গ (দুঃখনিবারণের উপায়)—এইগুলি হইতেছে চারিটি আর্য সত্য। এইগুলিকে স্বীকার না করিলে অধ্যাত্মসাধনা নিরর্থক হইয়া পড়ে। ইহা দুঃখবাদ হইতে পারে, কিন্তু যে আশাবাদ বলে যে আমরা যদি দুঃখ-নিবারণের উপায় অবলম্বন করিতে বিমুখ না হই এবং পিতৃপিতামহদের প্রবর্তিত নিষ্ফল ক্রিয়াকাণ্ড অনুসরণ না করি অথবা সমসাময়িক ব্যক্তিদের ভ্রান্ত উপদেশ পালন না করি তাহা হইলে জীবনের সমস্ত দুঃখ পরিহার করা যায় সেই আশাবাদ ইহার কঠোরতা হ্রাস করিয়াছে। জীবনে যে সকল অসুবিধা ভোগ করিতে হয় তাহাদের জন্যই যে জীবের দুঃখ তাহা নয়, জীবনধারণ করাটাই দুঃখ। কাম, রূপ এবং অরূপ এই তিন লোকে জন্মগ্রহণ করিয়া যে কোনরূপ জীবন ধারণ করিলেই বার্ধক্য, ব্যাধি, ক্ষয় ও অন্যান্য অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা এবং মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। নারকীয় প্রাণী, ইতরপ্রাণী, পিশাচ, রাক্ষস, মনুষ্য এবং দেবতা—ইহাদের মধ্যে কেহই দুঃখ হইতে মুক্ত নয়। যদিও সাধারণ লোকেদের মধ্যে দেবতাদের সম্বন্ধে এক অন্ধ বিশ্বাস

প্রচলিত আছে যে দেবতারা চিরজীবী এবং চিরসুখী—এই বিশ্বাস ভ্রান্ত, কারণ দেবতারাও ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন। এইস্থানে সকল জীবের মধ্যে একমাত্র মনুষ্যই অধ্যাত্ম অন্তর্দৃষ্টির মধ্য দিয়া নির্বাণ লাভ করিতে পারে এবং সকল প্রকার দুঃখের নিরসন করিতে পারে। মিসেস্ রাইস্ ডেভিড্স এই সকল সত্যগর্ভ উপদেশ বুদ্ধের মূল উপদেশ সমূহের অন্তর্ভুক্ত ছিল কি না সে সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন কিন্তু ওল্ডেনবার্গ বিশ্বাস করেন যে এগুলি প্রাচীন বৌদ্ধমতেরই অংশ।

ইহাদের মধ্যে দ্বিতীয় সত্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া আমরা এক মহা সন্দেহের সম্মুখীন হই। দ্বাদশ-গ্রন্থি বিশিষ্ট কারণ শৃঙ্খল, দ্বাদশ নিদান অথবা দ্বাদশ উৎপাদ অথবা প্রতীত্যসমুৎপাদ কি বুদ্ধের মূল উপদেশের অংশ ছিল? অশ্বজিৎ (অস্সজি) যখন সারিপুত্তকে বলিয়াছিলেন যে, বুদ্ধ সকল ক্ষণস্থায়ী বস্তুর কারণ এবং কিভাবে তাহা নিরোধ করা যায় তাহার উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন তখন তিনি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইলেন। পরবর্তী যুগের বহু বৌদ্ধভাস্কর্যবিশিষ্ট শিলাখণ্ডে ক্ষোদিত একটি শ্লোকের (যে ধম্মা হেতুপ্পভবা হেতুন্তেষাং তথাগতো হ্যবদদ্ তস্য যো নিরোধো এবম্ অবাদি মহা শ্রমণো) আকারে ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। মজ্‌ঝিম নিকায়েও বলা হইয়াছে যে, যিনি পতিচ্চসমুপ্পাদকে (যাহা কিছু আছে তাহা কারণ পরম্পরা হইতে উদ্ভূত এই তত্ত্ব) বুঝিয়াছেন তিনিই ধম্ম কি তাহা বুঝিয়াছেন, এবং বিপরীতক্রমে যিনি ধম্ম বুঝিয়াছেন তিনি পতিচ্চসমুপ্পাদ ও বুঝিয়াছেন। কারণ ক্রিয়া করিলে কার্যের আবির্ভাব ঘটে এবং কারণ ধ্বংস হইলে কার্যের তিরোভাব ঘটে—এই কার্য-কারণ নিয়ম বুঝিতে পারাই ধম্ম। মিসেস্ রাইস্ ডেভিড্স বুদ্ধ যে এই কার্য কারণ নিয়ম প্রতিপাদন করিয়াছিলেন এই মতের প্রবল বিরোধিতা করিয়াছেন। তাঁহার মতে বুদ্ধ প্রধানতঃ একজন পথ-প্রদর্শক ও পরিচালক ছিলেন, "কারণ, তিনি যে মার্গ পূর্বে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, যে মার্গ পূর্বে কেহ দেখে নাই তিনি তাহা দেখাইয়াছিলেন, যে মার্গের কথা পূর্বে কেহ বলে নাই তিনি তাহার কথা বলিয়াছিলেন, তিনি ছিলেন মার্গের আবিষ্কর্তা, দ্রষ্টা এবং নিয়ন্তা।"

কিভাবে ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিয়া উন্নতিলাভ করা যায় এবং মানব প্রকৃতির অন্তর্নিহিত শ্রেষ্ঠ সম্ভাবনাগুলিকে বাস্তব রূপ দিতে পারা যায় তিনি মানবদিগকে তাহাই শিক্ষা দিয়াছিলেন ; কারণতত্ত্বসম্বন্ধে শুষ্ক সাধারণ নিয়ম—বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়া যাহা বৈদিক সাহিত্যে ঋত নামে পরিচিত ছিল—সে সম্বন্ধে চিন্তা করিতে

উপদেশ দেন নাই। তাহা হইলেও বৌদ্ধেরা বিনা দ্বিধায় ইহাই বলিয়া আসিতেছেন যে, বুদ্ধ এই কার্য-কারণ নিয়ম মানুষের অন্তর্জগতেও প্রয়োগ করিয়াছিলেন এবং এই নিয়মের ক্রিয়া কিভাবে মানুষের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ করে—কিভাবে এক সুনিয়ন্ত্রিত কার্য-কারণ শৃঙ্খলের আদি কারণ অজ্ঞান হইতে মানুষের জন্ম হয়, এবং যে আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি সকল বন্ধের কারণ অজ্ঞানকে দূর করে তাহার উদয় হইলে কিভাবে মানুষের মুক্তি হয় তাহা বুঝাইয়াছিলেন।

প্রতীত্যসমুৎপাদ : পালি ধর্মগ্রন্থে প্রতীত্যসমুৎপাদ অথবা কার্য-কারণ শৃঙ্খলার আবিষ্কাররূপ ঘটনাকে অত্যন্ত আড়ম্বরের সহিত এইভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে : বুদ্ধের বোধিপ্রাপ্তির ইহাই চরম অবস্থা, বুদ্ধ যখন বিভিন্নভাবে কার্য-কারণ শৃঙ্খলের দ্বাদশটি গ্রন্থি গণনা করিতেছিলেন তখন দশ সহস্র জগতে দ্বাদশবার প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাঁহার এই বোধিপ্রাপ্তিতে সারা বিশ্বে আনন্দের সঞ্চার হইয়াছিল, বোধিপ্রাপ্তির পর বুদ্ধ তাঁহার মনে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সাত দিন রাত্রি ধরিয়া এই কারণ-শৃঙ্খলকে বারবার আবৃত্তি করিয়াছিলেন এবং তিনি সাতসপ্তাহ পর্যন্ত ঐ স্থান ত্যাগ করেন নাই। এই বর্ণনা হইতেই বুঝা যায় যে, যে তত্ত্ব আধুনিক কাল পর্যন্ত ভাষ্যকার এবং ব্যাখ্যাকারদের অপরিমিত ক্লেশের কারণ হইয়াছে, তাহার উপর বৌদ্ধ শ্রমণ ও পণ্ডিতগণ কতটা গুরুত্ব দিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, কার্য-কারণ শৃঙ্খলের ন্যায় কঠিন তত্ত্ব জনসাধারণের উপযোগী বাণী হইতে পারে না। কিন্তু বুদ্ধের সময়ে বিভিন্ন জীবনাদর্শ বিশিষ্ট বহু পরিব্রাজকের উপদেশ লোকরা মনোযোগের সহিত শুনিত ইহা মনে রাখিলে এই আপত্তিকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে হইবে না।

সমস্ত চেতন জীবের জগৎ নিয়মের অধীন, এই তত্ত্বকে বুদ্ধ কি স্বয়ং অথবা তাঁহার কোন অনুগামী প্রতীত্যসমুৎপাদের ভাষায় প্রকাশ করিয়াছিলেন ইহাই হইতেছে প্রকৃত প্রশ্ন। আমাদের ভাগ্য যে আমাদের দ্বারাই সৃষ্ট এবং দেবতাদের খেয়ালের উপর নির্ভর করে না, সুতরাং উহাকে যথাযথ চেষ্টা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিতে পারা যায়, ইহা নিশ্চয়ই বুদ্ধের মূল উপদেশের অংশ ছিল, পরবর্তী যুগের বৌদ্ধসংঘ ইহাকে যে ভাবেই পরিবর্ধিত করুক না কেন। যজ্ঞকালে যে সকল দেবতাকে আহ্বান করা হইত তাঁহাদের কৃপার অপেক্ষা না রাখিয়াই মন্ত্রসমূহ নিজেরাই ফলপ্রসূ হইতে পারে, এই বলিয়া যদি ব্রাহ্মণগুলিকে মন্ত্রের প্রশংসা করা হইয়া থাকে, এবং উপনিষদগুলিতে যদি স্বর্গের দেবদেবীগণের গুরুত্ব হ্রাস করা হইয়া থাকে তাহা হইলে দৈব প্রভাবকে উপেক্ষা করিয়া কার্য-কারণ নিয়মের স্বয়ং-সম্পূর্ণতা শিক্ষা দেওয়াই বুদ্ধ যুক্তিযুক্ত

বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। এই নিয়মই মনুষ্যের ভাগ্য সম্পর্কে কর্মনিয়ম বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল। তৎকালীন যে সকল নাস্তিক মতবাদ দর্শন ও জীবনে দৈবশক্তির কোন স্থান আছে বলিয়া স্বীকার করে নাই, সেই সকল মতবাদে স্বভাবতঃই মানবেচ্ছার সমস্যা যেমন অধিক গুরুত্বলাভ করিয়াছিল তেমনই বাহিরের কোন অতীন্দ্রিয় কারণের সাহায্য না লইয়াই সসীম জীবের উৎপত্তি, স্বভাব, ক্রিয়া ও অন্তিমগতির ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজনও অনুভূত হইয়াছিল। ইউরোপে সোফিষ্ট মত ও মানবতাবাদ—এই দুই চিন্তাধারায় যেরূপ সেইরূপ বুদ্ধের সময়ে ভারতেও ধর্মসম্বন্ধীয় ও দার্শনিক বিচারে মানুষই আগ্রহের কেন্দ্রস্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু মানুষের বুদ্ধি-শক্তি নয়, পরন্তু নৈতিক উৎকর্ষ ও কঠোর অধ্যাত্মসাধনা দ্বারা মানুষ কত উচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারে, মানসিক ও শারীরিক শিক্ষা দ্বারা সে কতটা অন্তর্দৃষ্টি ও শক্তিলাভ করিতে পারে, জীবনের দুঃখসমূহের প্রতি ঔদাসীন্য অভ্যাস করিয়া এবং ব্যক্তিগত অধ্যাত্ম উন্নতির ক্ষেত্রে দৈবপ্রভাবের অযথা প্রবেশকে বাধা দিয়া কি ভাবে স্বীয় দেহ ও মনকে নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা লাভ করিতে পারে, তাহাতেই লোকের আগ্রহ নিবিষ্ট ছিল। বুদ্ধ জনসাধারণকে তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিবার পূর্বে উহাকে অভিজ্ঞতার সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া লইতে, এবং তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ নয়, পরন্তু উহার যৌক্তিকতার জন্যই উহাকে গ্রহণ করিতে বলিয়াছিলেন। অবশ্য বৌদ্ধশাস্ত্রে বুদ্ধের সর্বজ্ঞতায় বিশ্বাস করিবার প্রয়োজনীয়তাও বার বার জোরের সহিত বলা হইয়াছে।

তৎকালীন প্রতিদ্বন্দ্বী দার্শনিক মতবাদসমূহ

যে মূলসূত্রটিকে বুদ্ধ প্রচার করিয়াছিলেন এইরূপ বলা হয় তাহা দুই আকারে প্রচলিত আছে--একটি সহজ ও সরল এবং অপরটি জটিল ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ। তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে বুদ্ধ যে সকল সত্য আহরণ করিয়াছিলেন, এরিষ্টটল কর্তৃক পরবর্তীকালে আবিষ্কৃত সত্যের ন্যায়, তাহা হইতেছে এই যে, চরম পন্থা পরিত্যাগ করিয়া মধ্যপন্থা অনুসরণ করাই জীবনের প্রকৃত নীতি হওয়া উচিত। প্রকৃতি যাহাদিগকে আত্মসংযমের ক্ষমতা দিয়াছে, তাহাদের পক্ষে ভোগাসক্ত জীবন উপযুক্ত নয়। মানুষ স্বভাবতঃ পশুত্বভাবাপন্ন নয়, সুতরাং তাহার প্রকৃতির দাস হওয়া, ক্ষণিক আকর্ষণে প্রলুব্ধ হওয়া অথবা আকস্মিক আবেগ দ্বারা চালিত হওয়ার পক্ষে কোন যুক্তি নাই। রাজা শায়াসি, অজিত-কেশ-কম্বলিন্ এবং অন্যান্য কেহ কেহ

ইহসর্বস্বতাবাদ এবং ভাল ও মন্দ, পাপ ও পুণ্যের চরম পার্থক্যে অবিশ্বাস হইতে উৎপন্ন নৈতিক দায়িত্বহীনতায় বিশ্বাস প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া বৌদ্ধশাস্ত্রে নিন্দিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা মানুষের অতি-প্রাকৃত অথবা ভবিষ্যৎ জীবনে বিশ্বাস করিতেন না অথবা বর্তমান কর্ম মানুষের ভবিষ্যৎ ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রিত করে তাহাও বিশ্বাস করিতেন না, এইজন্য তাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে উচ্ছেদবাদ শিক্ষা দিয়াছিলেন বলা যাইতে পারে। গোসালের ন্যায় কেহ কেহ অধিচ্চসমুপ্পাদ (বিনা নিয়মে যে কোন কারণ হইতে যে কোন কার্য উৎপন্ন হয় এই মত যদৃচ্ছাবাদ যে কোন কার্য যে কোন সময়ে বিনা কারণে উৎপন্ন হইতে পারে এই মত), কোন ব্যক্তি স্বীয় নৈতিক আচরণ ব্যতিরেকেও বিনা আয়াসেই শ্রেষ্ঠত্বলাভ করিতে পারে, এই যে একপ্রকার অদৃষ্টবাদ এবং যাহাতে মানুষের চেষ্টা এবং নৈতিক দায়িত্বের কোন স্থান নাই এমন যে নিয়তিবাদ—এই সকলে বিশ্বাস করিতেন। পূরণ কস্‌সপের ন্যায় কেহ কেহ সকল প্রকার নৈতিক পার্থক্যের প্রতি উদাসীন ছিলেন এবং মনে করিতেন যে, আত্মা নিষ্ক্রিয় বলিয়া কর্মের কোন নৈতিক তাৎপর্য নাই। সঞ্জয়-বেলউপুত্ত প্রভৃতি কাহারও কাহারও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী সন্দেহবাদী ছিল, আবার পকুধ-কচ্চায়নের ন্যায় যাঁহারা জড় ও আত্মার উপাদানগুলির নিত্যসত্তায় বিশ্বাস করিতেন (সাস্‌সতবাদ), তাঁহারা মনে করিতেন যে, ইহাদের মধ্যে সম্বন্ধ এত ঘনিষ্ঠ নয় যে হত্যার ন্যায় দৈহিক ক্রিয়ার সহিত নৈতিক অপরাধরূপ মানসিক ব্যাপার যুক্ত করা যাইতে পারে।

যে নিগণ্ঠ-নাটপুত্তের (মহাবীরের)[১] অনুগামীগণ পরবর্তী যুগে বুদ্ধের অনুগামী-গণের ন্যায়ই বহুসংখ্যক ছিল। তিনি আত্মসংযমকেই অধিক গুরুত্ব দিয়াছিলেন এবং বুদ্ধের অনুগামীগণের মধ্যে কেহ কেহ অকপট বিশ্বাসের বশে অথবা ব্যবহারিক নীতি হিসাবে (যেমন দেবদত্ত) বুদ্ধের উপদিষ্ট আচরণ অপেক্ষাও এমন কতকগুলি কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনা (পরবর্তীকালে যাহাদিগকে ধুতাঙ্গ বলা হইত) প্রচার করিতেন, যাহা বুদ্ধ তাঁহার সমগ্র ধর্মসংঘের জন্য সমর্থন করিতেন না। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান এবং ঔষধসেবন (চার নিস্‌সয় অথবা অবলম্বন) সম্বন্ধে কোন কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করিয়া কঠোরতর আত্মসংযমবিধি পালন করিতে চাহিলে বুদ্ধের তাহাতে সম্মতি ছিল, কিন্তু এক্ষেত্রেও তিনি মধ্য-পন্থা গ্রহণের উপদেশ দিতেন এবং যাহা সত্য তাহাই বলিতেন—দেহ-নিগ্রহ অপেক্ষা আত্মসংযম এবং যথার্থজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক সাধনা। তিনি কার্য-কারণ নিয়ম আবিষ্কার করিয়া মানবের ভাগ্য সম্বন্ধে নৈতিকতার মূল্য স্বীকার করিবার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়াছিলেন। এই কার্য-কারণ-

বাদই সম্ভবতঃ তাঁহার সংঘে ধীরে ধীরে প্রতীত্যসমুৎপাদের নিগূঢ় নিয়মে রূপান্তরিত হইয়াছিল। যদিও, যেমন পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, প্রাচীন বৌদ্ধ ঐতিহ্যে বুদ্ধ বোধিলাভ করার পরে কয়েক দিন ধরিয়া এই নিয়মের মূলসূত্রটির আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত মনে মনে আবৃত্তি করিয়াছিলেন এই কথা বলা হইয়াছে।

নৈতিক কার্য-কারণ শৃঙ্খলের দ্বাদশ গ্রন্থি

বর্তমান জীবনে মানুষ অতীতের সৃষ্টি এবং ভবিষ্যতের নির্মাতা, এইরূপ নির্ধারণ করিয়া এই নিয়ম কালের তিনটি বিভাগকেই একসূত্রে গ্রথিত করিয়াছে (পরবর্তী-কালে এই কাল সম্বন্ধে বহু সূক্ষ্ম দার্শনিক সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছিল)। যে অদৃশ্য সূত্র অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের ঘটনাবলীকে গ্রথিত করে, তাহা হইতেছে নৈতিক প্রচেষ্টা। ইহা বুদ্ধির সাহচর্যে কাজ করে। এই বুদ্ধি দোষযুক্ত হইলে মানবের পুনর্জন্ম হয় এবং নির্দোষ হইলে মুক্তির পথ প্রস্তুত করে। মুক্তির অর্থ মূর্ত বস্তুসমূহের ধারার নিরোধ। সংসার এবং নির্বাণ এই দুইটি বুদ্ধির ক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল। অবিদ্যা হইতেছে বাঁচিয়া থাকিবার প্রচেষ্টার এবং দুঃখের কারণ এবং বোধি হইতেছে মুক্তির কারণ এবং তাহার পথ-নির্দেশক। এই কার্য-কারণশৃঙ্খল দ্বাদশটি গ্রন্থি (দ্বাদশ নিদান) দ্বারা গঠিত। পূর্ববর্তী প্রত্যেক গ্রন্থিটি পরবর্তী গ্রন্থির আবির্ভাবের জন্য দায়ী। ইহাকেই পরে প্রতীত্যসমুৎপাদ বলা হইত। এই গ্রন্থিগুলি হইতেছে অবিদ্যা (অজ্ঞান), সংস্কার (গঠন), বিজ্ঞান (চৈতন্য), নামরূপ (নাম এবং আকার), ষড়ায়তন (ইন্দ্রিয়সমূহের ছয়টি ক্ষেত্র), স্পর্শ (সংযোগ), বেদনা (সংবেদন), তৃষ্ণা (কামনা) উপাদান (আসক্তি), ভব (সত্তা), জাতি (জন্ম) এবং জরা-মরণ (বার্ধক্য ও মৃত্যু)।

যদি কোন জীব অতীত জীবনে কাম-লোক, রূপ-লোক অথবা অরূপ-লোক যে কোন লোকেই হউক না কেন অজ্ঞানের প্রভাবে কর্ম করিয়া থাকে, তাহা হইলে সে অবশ্যই এমন কতকগুলি সংস্কার অর্জন করিয়া থাকিবে যাহার ফলে তাহাকে পুনর্বার জন্মগ্রহণ করিয়া বর্তমান দেহ ধারণ করিতে হইয়াছে। অতীত জীবন এবং বর্তমান জীবনের যোগসূত্র হইতেছে মাতৃগর্ভে দেহধারণের জন্য এক অস্পষ্ট চেতনা বা কামনা; পূর্বজন্মের কামনা এবং কৃতকর্মের উপরই এই দেহের প্রকৃতি নির্ভর করে। ক্রমে মাতৃগর্ভস্থিত ভ্রূণ ধীরে ধীরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া মানস (নাম) এবং জড় (রূপ) দেহে পরিণত হয় এবং তাহার পর মাতৃগর্ভেই ছয়টি ইন্দ্রিয়—দর্শন, শ্রবণ,

গন্ধ, স্বাদ এবং স্পর্শ এই পাঁচটি বহিরিন্দ্রিয় এবং বুদ্ধি বা মনরূপ অন্তরিন্দ্রিয় দ্বারা সম্পূর্ণভাবে সুসজ্জিত শিশুর রূপ ধারণ করে। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয়সকল জগতের সহিত সংস্পর্শে আসিয়া কার্য আরম্ভ করে এবং ইহার ফলে দ্রব্যের গুণ-বিষয়ে প্রীতিকর বা অপ্রীতিকর এবং ঐ দুইটির কোনটি নহে এইরূপ সংবেদন বা প্রত্যক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হয়। প্রীতিকর সংবেদনের ফলে শীঘ্রই তৃষ্ণা বা কামনার উদয় হয়, এবং শিশু নানারূপ বস্তু চাহিতে এবং দৈহিক বাসনা অনুভব করিতে আরম্ভ করে। মনে যখন কেবলমাত্র কামনাগুলি উৎপন্ন হয় না পরন্তু তাহাদিগকে চরিতার্থ করিবার জন্য একটা আগ্রহও উৎপন্ন হয়, তখনই আসক্তির কার্য আরম্ভ হয়। এই দুইটি ছাড়াও আসক্তির তাড়নায় কৃতকর্ম হইতে সঞ্জাত পুণ্য ও পাপ পুঞ্জীভূত হওয়ার ফলে একটি তৃতীয় উপাদান 'ভব' অর্থাৎ 'হওয়া' অথবা পুনর্জন্মের জন্য নূতন বাসনা জন্মগ্রহণ করে। এই নূতন সংস্কার পরবর্তী দেহধারণ কিংবা জন্মের জন্য দায়ী এবং জন্মের অবশ্যম্ভাবী ফল হইতেছে মৃত্যু ও তাহার সহিত অন্যান্য অশুভ যথা মনস্তাপ ও শোক, দুঃখভোগ ও দুর্ভাবনা, বিষাদ এবং হতাশা যেগুলি হইতে কেহই মুক্ত নহে।

যে অজ্ঞান (অবিদ্যা) এই সমগ্র কার্য-কারণশৃঙ্খলের জন্য চরমভাবে দায়ী, তাহা হইতেছে চারিটি আর্যসত্য সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাব ; বিশেষতঃ জীবন দুঃখভোগ নয় সুখসম্ভোগ এই ভ্রান্ত ধারণা। অবিদ্যাকে জাগতিক ভ্রান্তি কিংবা মায়া অথবা সসীম জীব এবং পরব্রহ্মের ঐক্য উপলব্ধি করার অক্ষমতা অথবা শূন্যতারূপ পর্দায় মনঃকল্পিত জগতের নিক্ষেপরূপে চিন্তা করিবার কথা বুদ্ধের মনে উদিত হয় নাই। কোন ব্যক্তির চিন্তা, বাক্য ও ক্রিয়ারূপ যে সকল কর্ম পাপ-পুণ্যের আকারে সঞ্চিত হইয়া থাকে এবং যাহা বিশেষ করিয়া নূতন জন্মের কামনার সংযোগদ্বারা প্রবল হইয়া নূতন দেহ ধারণ করে, তাহাদিগকে সংস্কার বলা হয়। সংস্কারগুলির আমূল উচ্ছেদ না হইলে জীবনের নব অঙ্কুরোদ্‌গম অবশ্যম্ভাবী। কেবলমাত্র দেহ এবং দৈহিক আনন্দ-সমূহ অনিত্য এবং ক্ষণস্থায়ী ইহা উপলব্ধি হইলে এবং যথার্থ জ্ঞানলাভ হইলেই ইহা নিরোধ করা সম্ভবপর। "সংসারগুলি অনিত্য, তাহাদের উৎপত্তি এবং ক্ষয় আছে, উহারা যেমন উৎপন্ন হয় তেমনই আবার বিলুপ্ত হইয়া যায় ; উহাদের বিলুপ্তিতেই সুখ।" কিন্তু কার্য-কারণ নিয়মের ক্রিয়ার পশ্চাতে কোন নিয়ম-কর্তাও নাই অথবা কোন শাশ্বত বস্তুও নাই। বৈদিক ঋত এবং ব্রাহ্মণ্য মন্ত্রশক্তি এবং অপূর্বের ন্যায় কর্মের নিয়ম স্বাধীনভাবেই কাজ করে, কোন শৃঙ্খলাবিধানকারী পুরুষের ব্যবস্থানুযায়ী নয় অথবা যাজ্ঞবল্ক্য যেমন বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৩-৮-৯) বলিয়াছেন, 'অক্ষরের'

শাসনে জাগতিক ব্যাপারগুলি যেভাবে ঘটিয়া থাকে সেভাবেও নয়। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত অজ্ঞান দূরীভূত না হয় এবং তাহার ফলে সংস্কারগুলি বিনষ্ট না হয় এবং পুনর্জন্ম গ্রহণের বাসনা দ্বারা তাড়িত হইয়া উপাদানগুলির নূতন সমষ্টি গঠনে অক্ষম না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত বস্তুপুঞ্জের পর বস্তুপুঞ্জ অবিচ্ছিন্ন ধারায় উৎপন্ন হইতে থাকে। কার্য-কারণ নিয়মের প্রভাব কেবলমাত্র বহির্জগতে নয় অন্তর্জগতেও আছে ; সুতরাং কোন ব্যক্তি বর্তমানে যাহা তাহাই যে কেবল পূর্ববর্তী মানসকারণের ফল তাহা নয়, কিন্তু সে তাহার বর্তমান চিন্তা এবং প্রবৃত্তি যথাযোগ্যভাবে সংযত করিয়া যাহা হইতে চায় তাহা হইতে পারে। যে জ্ঞান সংস্কারগুলিকে দগ্ধ করিয়া দেয়, তাহা লাভ করিবার বিভিন্ন উপায়ের কথা খুব কমই (বৌদ্ধশাস্ত্রে) আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু সংযুক্ত-নিকায়ে দুঃখ হইতে জ্ঞানের ধারাবাহিক ক্রম এইভাবে দেওয়া হইয়াছে—দুঃখ, বিশ্বাস, আনন্দ, উল্লাস, প্রশান্তি, সুখ, স্থৈর্য, জ্ঞান এবং বস্তুসমূহের স্বরূপ সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি। অতএব অজ্ঞান শেষ পর্যন্ত দুঃখের কারণ বটে, কিন্তু দুঃখই আবার আমাদিগকে দুঃখনিবৃত্তির যে উপায় জ্ঞান ও অন্তদৃষ্টি তাহা অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত করে। যে অজ্ঞান জ্ঞেয় বস্তুর স্বরূপকে আবৃত করিয়া ক্লেশসমূহের সৃষ্টি করে, ইহা তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত।

নৈরাত্ম্যবাদ অথবা নৈর্ব্যক্তিকতত্ত্ব

ইহা নিশ্চিতভাবে মনে করা যাইতে পারে যে আত্মার প্রকৃতি ও অন্তিম গতি সম্বন্ধে গবেষণা করা বুদ্ধ-যুগের একটি বাতিক ছিল। শুধু নৈতিক জীবন ও আধ্যাত্মিক বিকাশের প্রতিবন্ধক দূর করা সম্বন্ধেই যে এই আলোচনা হইত তাহা নহে, কিন্তু আত্মার প্রকৃতি এবং শরীর ও আত্মার সম্পর্কও এই আলোচনার বিষয় ছিল। সাধারণভাবে বলা যায় যে, উপনিষদে আত্মা কখনও দেহ নয় এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই তত্ত্ব হইতেই বেদান্ত এবং সাংখ্যের উৎপত্তি। জৈন ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়েরও একই রকম মত। দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি এবং উপাদানসমূহের বীভৎসতা, বাহ্যিক দেহ সৌন্দর্যের মোহ ও ছলনা, দৈহিক প্রয়োজন হইতে উৎপন্ন বাসনাসমূহের পীড়া, ইন্দ্রিয়সংবেদন দ্বারা প্ররোচিত প্রলোভনসমূহ, দেহ-কারাগার হইতে আত্মার চরম মুক্তির প্রয়োজনীয়তা এবং এই উদ্দেশ্যে কৃচ্ছ্রসাধন, দৈহিক ক্লেশের প্রতি ঔদাসীন্য এবং স্বেচ্ছাকৃত দেহনিগ্রহ—এইগুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়া দেহ ও আত্মার এই বিরোধ সম্বন্ধকেই স্পষ্টভাবে প্রতিপাদন করার চেষ্টা করা

হইয়াছিল। আত্মার প্রকৃতি সম্বন্ধীয় আলোচনা হইতে এত বিভিন্ন রকমের মত উৎপন্ন হইয়াছিল যে তাহা বিস্ময়কর—এই সকল মতের মধ্যে জড়বাদ এবং অদ্বৈতবাদ এই উভয় মতেই পরিচ্ছিন্ন জীবাত্মার সত্তা বিলুপ্ত হইয়া গেল (যদিও বিভিন্ন রকমে), আর দ্বৈতবাদে ইহার স্বতন্ত্র সত্তা অক্ষুন্ন থাকিলেও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের চিন্তায় উহার গুণধর্ম বিভিন্ন হইয়া গেল।

বুদ্ধের মত শাশ্বতবাদ (অদ্বয়াত্মক হউক বা দ্বয়াত্মক হউক) এবং বিনাশ-বাদ এই দুই পরস্পর বিরুদ্ধ মতের মধ্যবর্তী। তাঁহার মতে শাশ্বত আত্মা নাই বটে তথাপি আত্মা শুধু জড়ের ধর্ম নয় এবং দেহের সহিত উহার বিচ্যুতি ঘটিলেও উহা সম্পূর্ণভাবে কারণ-ক্ষমতা হইতে বিচ্যুত হয় না। অনাত্মবাদের অর্থ শুধু এই যে, স্থায়ী দ্রব্যরূপে আত্মার অস্তিত্ব নাই। যে 'বিজ্ঞান' মাতৃ-গর্ভে নূতন জন্ম দেওয়ার কাজ করে, উহা জন্মান্তর পরিগ্রাহী একই আত্মা নহে; অবশ্য স্থায়ী এক আত্মার ন্যায় উহাও নূতন শরীরের জড় উপাদানসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু এই বিজ্ঞান হইতেছে এমন একটি সংখার (সংস্কার) যাহা পরিবর্তনশীল এবং যাহা দ্রব্যরূপ নহে। নৃপতি মিলিন্দ (মেনান্দার নামক গ্রীক্ রাজপুত্র) এবং ভিক্ষু নাগসেনের মধ্যে যে বিখ্যাত কথোপকথন হইয়াছিল এবং যাহা মিলিন্দ পঞ্হ নামে পরিচিত। উহাতে প্রধানতঃ এই কথা প্রতিপাদিত হইয়াছে: শরীর যেমন বহু অংশ বা উপাদানের মিশ্রণ, তেমনই আমরা যাহাকে 'ব্যক্তি' বলি (পরে যাহা জীব বা পুদ্গল নামে আখ্যাত হইয়াছে) উহাও কতকগুলি জড় ও মানসিক উপাদানের মিশ্রণ এবং শরীর এবং জীব উভয়েই উহাদের উপাদানসমূহে বিলীন হইতে বাধ্য।

পঞ্চস্কন্ধ

যে সকল উপাদানপুঞ্জে ব্যক্তি বা জীব গঠিত হয়, তাহাদের সংখ্যা পাঁচ—এই পাঁচটি স্কন্ধ অথবা পুঞ্জ দুইটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে, যথা—রূপ অথবা পৃথিবী, জল, অগ্নি এবং বায়ু এই চারিটি ভূতে গঠিত জড়দেহ, এবং নাম অথবা মানসিক উপাদান। এই মানসিক উপাদান চারি রকমের, যথা—সংবেদন অথবা অনুভূতি—(বেদনা), বিষয় প্রত্যক্ষ অথবা ধারণা (সংজ্ঞা), ক্রিয়া-প্রবণতা (সংস্কার) এবং বিবেককারী বুদ্ধি (বিজ্ঞান—প্রতীত্যসমুৎপাদের বিজ্ঞান হইতে বর্তমান বিজ্ঞান পৃথক্)। বিভিন্ন গ্রন্থে এই সকল উপাদানের নামে অল্পবিস্তর পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ছাড়া এইগুলিকে প্রায় দুইশত সূক্ষ্ম উপাদানে

বিভক্ত করা হইয়াছে এবং এই সকল উপাদানও ক্ষণভঙ্গুর। এইভাবে উপনিষদের নাম-রূপ অর্থাৎ ব্যবহারিক সৎ জগতের বাচক শব্দটি বৌদ্ধদর্শনে একটি নূতন অর্থে মণ্ডিত হইয়া উক্ত পাঁচটি উপাদানপুঞ্জের (পঞ্চস্কন্ধের) বাচক হইল। গতি-বেদন এবং অন্যান্য সংবেদন, মনশ্চিত্র এবং ধারণা, অভ্যাস এবং প্রবণতা, আবেগ এবং ভাব—এইগুলি দ্বারাই আমাদের সমগ্র ব্যক্তিত্ব গঠিত। এই সবগুলিই অনবরত ফেনা অথবা বুদ্বুদের পুঞ্জের মত পরিবর্তিত হইতেছে। অস্তিমদৃষ্টিতে ইহারা মরীচিকা, কদলীবৃক্ষের কাণ্ড, ইন্দ্রজাল প্রভৃতির ন্যায় অলীক। সুতরাং আমাদের আন্তর অনুভূতিতে এমন কোন স্থির পদার্থ নাই যাহাকে 'আত্মা' নাম দেওয়া চলে। আমাদের মানস অনুভূতি সমূহ একটি প্রবাহের (সন্তানের) আকারে সদা চলমান। (এই সন্তান শব্দটি পরবর্তী সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে)। এই মানসিক প্রবাহের প্রত্যেকটি বিশিষ্ট অবস্থা সম্পূর্ণভাবে ক্ষণিক, অর্থাৎ উৎপত্তিক্ষণেই উহার বিনাশ হয় অথবা উহা সাপেক্ষভাবে ক্ষণিক, অর্থাৎ উহার স্থিতিকাল এমন একটি আপাতঃ প্রতীয়মান বর্তমানক্ষণ যাহাতে উৎপত্তি, স্থিতি এবং লয়, এই তিন অবস্থাই অবিচ্ছেদ্যভাবে পরস্পরের সহিত সম্বদ্ধ।

এই সব স্পষ্ট ও অস্পষ্ট, অমিশ্র ও মিশ্র চিন্তা, আভ্যন্তরীণ প্রেরণা ও প্রবণতা, জন্মজাত বিশিষ্ট স্বভাব ও সংস্কারের পশ্চাতে কোন স্থায়ী বস্তু আছে কি? যে-সব অংশ বা অবয়ব দ্বারা রথ গঠিত হয়, তাহাদের পশ্চাতে তাহাদের অতিরিক্ত রথ বলিয়া এমন কোন বস্তু নাই, যাহা তাহাদের অভাবেও বিদ্যমান থাকে। তেমনই উক্ত চিন্তা প্রভৃতির পশ্চাতেও কোন স্থায়ী বস্তু নাই। যে-সব জড়-কণিকা, ইন্দ্রিয় সংবেদন, ধারণা, প্রবণতা এবং চিন্তা দ্বারা আত্মা গঠিত, সেই গুলির সহিত আত্মা অভিন্ন, অথবা এইগুলি আত্মার, এইরূপ মনে করা যুক্তি-সঙ্গত নহে। ইহা খুবই সম্ভবপর যে, আত্মা সম্বন্ধে বুদ্ধের ধারণাটি ক্রমে ক্রমে তাঁহার মনে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তাঁহার ধর্মপ্রচারের প্রথম দিকে আত্মার অস্তিত্ব স্পষ্টতঃ নিষেধ করা হয় নাই, শুধু উহার নিত্যত্ব-বিষয়ক সমস্যাটিই আলোচনা করা হইয়াছিল (উদাহরণস্বরূপ ব্রহ্মজালসুত্তে), পরে আত্মবাদকে বিধর্মীদের মতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল (সক্কায়দিট্‌ঠি), অর্থাৎ স্থায়ী জীবাত্মার অস্তিত্ববিষয়ক বিধর্মী মত) এবং উহা এইভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছিল যে, উহা হইতেছে লোভীর মত একটা কিছুকে আঁকড়াইয়া ধরা (উপাদন) এবং উপ-নিষদীয় পারমার্থিক সত্তাবাদ ও আনুষ্ঠানিক ধর্মের (মীমাংসা) সদৃশ। বলা বাহুল্য যে, (সম্ভবতঃ কেবল সঞ্‌যুত্তনিকায়ের বুর্দেনসুত্ত ছাড়া) বৌদ্ধমতে এই পারমার্থিক

সত্তাবাদ এবং আনুষ্ঠানিক ধর্ম প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছিল। অনাত্তলক্ষণসুত্তে স্কন্ধগুলি যে আত্মার সহিত অভিন্ন হইতে পারে না, তাহা দেখাইবার জন্য বলা হইয়াছে যে, উহারা অনিত্য, পরিবর্তনশীল এবং দুঃখদায়ক। কিন্তু ইহাদের বিরুদ্ধ ধর্মযুক্ত কোন পদার্থ আত্মা হইতে পারে, এইরূপ কল্পনা নিষিদ্ধ হয় নাই।

চৈতন্যও উৎপন্ন হয়; সুতরাং তাহা অনিত্য এবং জন্মজন্মান্তরের বাহন হইতে অক্ষম। যেমন নূতন দীপ পুরাতন দীপ দ্বারা প্রজ্বলিত হয়, তেমনই নূতন জীবন পুরাতন জীবন হইতে উৎপন্ন হয়; কিন্তু এই পরিবর্তনে পুরাতন হইতে নূতনের মধ্যে কোন অভিন্ন বস্তু সংক্রামিত হয় না। যেমন কোন নির্বাপিত দীপ অন্য দীপকে প্রজ্বলিত করিতে পারে না, তেমনই জন্মোৎপাদক কারণ সামগ্রীর নিরোধ যাহাকে নূতন ব্যক্তি বলিয়া মনে করা যাইতে পারে এইরূপ নূতন স্কন্ধ-সমূহের জন্মও বন্ধ করিয়া দেয়। কর্মই একজন্মের ব্যক্তির সহিত অপর জন্মের ব্যক্তির একমাত্র সংযোজক। জৈন ও আজীবক ধর্মে কৃচ্ছ্রসাধনকে এই কর্মধ্বংসের উপায় বলা হইয়াছে, কিন্তু বুদ্ধ বিশেষভাবে বলিয়াছেন যে কৃচ্ছ্রসাধনে তাহা সম্ভবপর নহে, কর্মধ্বংস করিতে হইলে নৈতিক আচরণ (শীল), মানসিক শিক্ষা (সমাধি), চারিটি সত্যের পূর্ণজ্ঞান অথবা অন্তদৃষ্টি (প্রজ্ঞা), এই তিনটি বিশুদ্ধি, বিশ্বমৈত্রী এবং অন্যান্য উচ্চভাবের অনুশীলন (ব্রহ্ম-বিহার-ভাবনা) এবং কোন কোন গ্রন্থানুসারে, ঈশিত্ব ও মুক্তির ক্রমিক স্তরসমূহের আরোহণ অত্যাবশ্যক। প্রসঙ্গতঃ বলা যাইতে পারে যে, স্বয়ং বুদ্ধ মহানির্বাণের পূর্বে (পরিনির্বাণ) এই সকল স্তর অতিক্রম করিয়াছিলেন। যাহা দ্বারা স্কন্ধসমূহের একত্রীকরণ নিবারিত হয়, তাহা হইতেছে আসব (কাম, অস্তিত্বের বাসনা, অজ্ঞান অথবা মিথ্যা দৃষ্টি) সমূহের বিনাশ। বুদ্ধ ইহাও বলিতে ভুলেন নাই যে নিত্য আত্মায় বিশ্বাস, সংশয়, এবং কেবল নীতি ও আনুষ্ঠানিক কর্মপদ্ধতির কার্যকারিতায় বিশ্বাস—এই তিনটি বন্ধন ছিন্ন না করিলে কেহই আধ্যাত্মিক বিশুদ্ধির প্রথম ধাপ মুক্তিপ্রবাহেও (সোতাপত্তি) অবতরণ করিতে পারে না, নির্বাণ তো দূরের কথা।

আধ্যাত্মিকতায় অধিকতর উন্নতি করিতে হইলে এবং দ্বিতীয় স্তরে (সকদাগামিন—যে একবার প্রত্যাগমন করিয়াছে) উপনীত হইতে হইলে রাগ, দ্বেষ এবং মোহ পরিত্যাগ করা অত্যাবশ্যক। যাঁহারা তৃতীয় ধাপে আরোহণ করেন এবং নীচে কখনও প্রত্যাবর্তন করেন না (অনাগামিন), কিন্তু উচ্চতর স্তরে স্বচ্ছ (ওপপাতিক—ছায়াদেহধারীর সদৃশ) জীবনযাপন করেন, তাঁহারা আরও শ্রেষ্ঠ সাধক। সর্বোচ্চ সাধকেরা হইতেছেন অর্হৎ। ইহারা

পূর্ববর্ণিত আসবসমূহ নিঃশেষে ধ্বংস করিয়া পূর্ণ আধ্যাত্মিক বিশুদ্ধি সম্পাদন করেন। ইহাঁরাই মুক্ত। পরবর্তী সাহিত্যে প্রায়ই বলা হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি শীল, সমাধি এবং প্রজ্ঞা এই তিনটি বিশুদ্ধির সাহায্যে জন্মের বীজ ধ্বংস করিতে পারিয়াছেন, শুধু তাঁহার পক্ষেই অন্তিম নির্বাণ সম্ভবপর। অতএব, অষ্টাঙ্গিক শ্রেষ্ঠ মার্গে (আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ) সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সঙ্কল্প, সম্যক্ বচন, সম্যক্ আচরণ (কর্মান্ত) সম্যক্ আজীব (=জীবিকা), সম্যক্ ব্যায়াম (=প্রযত্ন), সম্যক্ স্মৃতি এবং সম্যক্ সমাধি অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

যে দীপ সমগ্র রাত্রি ব্যাপিয়া জ্বলে, তাহা হইতে এমন নিরবচ্ছিন্ন শিখা নির্গত হয় যে, উহা প্রতি মুহূর্তে অভিন্ন বলিয়া প্রতিভাত হয়। তথাপি যেহেতু তৈল ও বর্তিকার ভিন্ন ভিন্ন অংশ দ্বারাই দীপের পরিপোষণ হয়, সুতরাং উহা উহার অস্তিত্বের ভিন্ন ভিন্ন মুহূর্তে একও নহে, বিভিন্নও নহে। তেমনই এক কায়াবিশিষ্ট ব্যক্তির জায়গায় যে পরবর্তী ব্যক্তি উৎপন্ন হয়, উহা তাহা হইতে ভিন্নও নয়, অভিন্নও নয়; কারণ একদিকে যেমন এই ব্যক্তিগুলি বহুজন্মধারী কোন অভিন্ন আত্মার ক্রমিক প্রকাশ নহে, তেমনই অন্যদিকে পরবর্তী ব্যক্তি তৎপূর্ববর্তী ব্যক্তির কর্মের প্রভাব হইতে মুক্ত নহে। এই অবিচ্ছিন্ন ক্রমকে আমরা একই বস্তুর অপরিবর্তিত সত্তা বলিয়া ভুল করি। প্রকৃতপক্ষে কোন বস্তুই কোন বস্তুর সহিত অভিন্ন নহে, উহা শুধু নিজের ক্ষণিক সত্তার সহিতই অভিন্ন; অথবা কোন বস্তুকেই সেই বস্তু ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা বর্ণনা করা যায় না (সর্বং স্বলক্ষণম্)—এইটিকে পরবর্তীকালের বৌদ্ধ দার্শনিকগণ 'সব কিছুই দুঃখময়' (সর্বং দুঃখং দুঃখম্) এবং 'সব কিছুই ক্ষণিক' (সর্বং ক্ষণিকং ক্ষণিকম্); এই দুইটি তত্ত্বের সহিত সংযোগ করিয়া দিয়াছিলেন। এইভাবে অনাত্মতা, অনিত্যতা এবং দুঃখতা সর্ব জাগতিক ব্যাপারের বৈশিষ্ট্য। মহাযান দর্শনে 'সব কিছুই শূন্য' (সর্বং শূন্যং শূন্যম্)—এইরূপ অপর একটি অনুসিদ্ধান্তও গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু প্রাচীন বৌদ্ধ চিন্তাধারায় এতখানি নাস্তিত্ববাদ ছিল না। বৈভাষিকদের বস্তু বিষয়ক সাক্ষাৎজ্ঞানবাদ, সৌত্রান্তিকদের প্রতিনিধিবাদ, যোগাচারদের বিজ্ঞানবাদ এবং মাধ্যমিকদের শূন্যবাদ—এইগুলি বস্তুবাদের লৌকিক দৃষ্টি হইতে ক্রমে ক্রমে উদ্ভূত হইয়াছে। বুদ্ধের নিজের উপদেশে নৈরাত্ম্যবাদের সমর্থন আছে কিনা সন্দেহ। অবশ্য ইহা সম্ভবপর যে অধিকাংশ ভারতীয় দার্শনিকদের ন্যায় তিনি এই মত পোষণ করিতেন যে, যাহার উৎপত্তি আছে তাহার বিনাশও আছে, এবং সর্বযৌগিক পদার্থের বিলয় অবশ্যম্ভাবী। যেহেতু শরীর এবং আত্মা উভয়েই কতকগুলি বস্তুর সমষ্টিমাত্র, সুতরাং ইহা যুক্তিসিদ্ধ

যে উহাদের কোনটিই দ্রব্যাত্মক নহে এবং উহাদের মিলন হইতে কোন স্থায়ী ব্যক্তি উৎপন্ন হইতে পারে না।

সত্তার মূল উপাদান সমূহ

কিন্তু ব্যক্তিত্ব বলিতে কতকগুলি উপাদানের (ধম্ম অথবা ধাতুর) একত্র সমাবেশ বুঝা যায়। এই সব উপাদান অবিভাজ্য বলিয়া বিনাশশীল নহে। পৃথিবী, জল, অগ্নি ও বায়ু—এই চারিটি জড় উপাদান এবং মানসিক উপাদান (বিজ্ঞান) মিলিত হইলে তবেই একটি অস্থায়ী ব্যক্তিত্ব উৎপন্ন হইবে। এই পাঁচটি এবং অযৌগিক (অসংস্কৃত) পদার্থ আকাশ এই ছয়টি ধাতু। তাহা ছাড়া ইচ্ছাকৃত নাশ অথবা মুক্তি (প্রতিসংখ্যানিরোধ, নির্বাণ) এবং অনিচ্ছাকৃত নাশ (অপ্রতিসংখ্যানিরোধ) এই দুইটিও সত্তার মূল উপাদান। ইচ্ছাকৃত নাশ বা মুক্তিও আকাশের ন্যায় অপর একটি অমিশ্র (অসংস্কৃত) উপাদান। অনিচ্ছাকৃত নাশের অর্থ উপলব্ধির প্রয়োজনীয় কারণ সামগ্রীর অভাব অথবা বস্তুর স্বাভাবিক বিনাশশীলতাবশতঃ উহার অনুপলব্ধি। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, আদি বৌদ্ধ দার্শনিকগণ অর্থাৎ স্থবিরবাদী ও সর্বাস্তিবাদীরা এই চারিটি সংস্কৃত (যৌগিক) এবং তিনটি অসংস্কৃত (মৌলিক) উপাদান (ধর্ম, ধাতু) স্বীকার করিতেন—তাঁহারা শুধু স্থায়ী ব্যক্তির অস্তিত্ব প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। নাগার্জুন তাঁহার প্রজ্ঞপারমিতা গ্রন্থে বারবার বলিয়াছেন যে, হীনযান অথবা শ্রাবকযানে কেবলমাত্র পুরুষশূন্যতা (ইহাই অন্যত্র পুদ্‌গল-নৈরাত্ম্য নামে অভিহিত হইয়াছে) উপদিষ্ট হইয়াছে, আর বুদ্ধযান অথবা মহাযানে তদুপরি ধর্মশূন্যতাও উপদিষ্ট হইয়াছে। নাগার্জুনের এই উক্তিদ্বারা আমাদের পূর্বোক্ত মন্তব্য সমর্থিত হয়। সম্ভবতঃ আত্মার প্রত্যাখ্যানের সহিত উপাদান বা ধর্মসমূহের প্রত্যাখ্যান সর্বপ্রথমে মহাসংঘিকেরা করিয়াছিলেন এবং এই ব্যাপারে শূন্যবাদিগণ তাঁহাদের অনুসরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু শূন্যবাদীরা তৎসঙ্গে তথতা অথবা ভূত-তথতা এবং বুদ্ধের ধর্মকায় এই দুইটি ভাবাত্মক দার্শনিক মতও প্রতিপাদন করিয়াছিলেন। এই মত দুইটি বিভিন্ন দিক্ দিয়া কম বেশী পরিমাণে বেদান্তদর্শনের ব্রহ্মের ধারণার সদৃশ। আদি সম্প্রদায়গুলিতে বস্তুবাদী চিন্তাধারার তুলনায় বিজ্ঞানবাদ ও শূন্যবাদের প্রভাব অত্যল্প। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত কীথ্ বিশেষ নিপুণতার সহিত এই কথা প্রতিপাদন করিয়াছেন। বৌদ্ধধর্মের প্রথম স্তরে জগৎ প্রপঞ্চের সমস্যা ছিল নৈতিক, বুদ্ধি বা জ্ঞানের সমস্যা নহে।

বন্ধ ও মুক্তি

বুদ্ধদেবের এই দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, মানুষের বহু দুঃখের কারণ এই যে তাহার একটি নিজস্ব স্বতন্ত্র আত্মা আছে এবং উহাকে ইহকালে ও পরকালে পরিপোষণ ও রক্ষা করা প্রয়োজন, এই ধারণার বশবর্তী হইয়া সে পরের হিতের পরিবর্তে নিজের মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করে। নিম্নস্তরের পাঁচটি বন্ধনের (সংযোজনার) মধ্যে প্রথমটি হইতেছে স্থায়ী ব্যক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস ; এবং ঊর্ধ্বস্তরের পাঁচটির বন্ধনের মধ্যে প্রথম দুইটি হইতেছে রূপের জগতে এবং অরূপের জগতে অস্তিত্বের আকাঙ্ক্ষা। মানুষকে যদি বুঝাইয়া স্থির-আত্মায় বিশ্বাস পরিত্যাগ করান যাইত, তাহা হইলে সে স্পষ্টই দেখিতে পাইত যে, ইহজগতে স্বার্থান্বেষণ এবং দেহনাশের পর ভবিষ্যৎ জীবনের আকাঙ্ক্ষা পোষণ—এই দুইই বৃথা। বুদ্ধদেব শাশ্বতবাদ এবং উচ্ছেদবাদ এই দুইয়ের মধ্যবর্তী মার্গের উপদেশ দিয়াছিলেন। স্থায়ী অথবা নিত্য আত্মা বলিয়া কিছু নাই ইহা সত্য বটে, কিন্তু যে সব উপাদানদ্বারা ব্যক্তিত্ব গঠিত হয় সেইগুলি স্থায়ী। স্কন্ধ সমূহ উহাদের উপদানে বিলীন হইয়া যায় বটে তথাপি ব্যক্তি বলিয়া কথিত, একটি অস্থায়ী সমূহের কর্ম অপর এমন একটি অস্থায়ী সমূহে সংক্রামিত হয়, যাহা হইতেছে ভিন্ন একটি ব্যক্তি। যাহা এক জন্ম হইতে অপর জন্মে গমন করে, তাহা স্থায়ী আত্মা নহে, কিন্তু কর্ম। ইহাতে আমাদের দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি পাওয়া উচিত, কারণ আমাদের মৃত্যুর পর আমাদের কর্মবশতঃ যে অপর ব্যক্তি উৎপন্ন হইবে, আমাদের কর্মদ্বারাই তাহার সুখদুঃখের ভিত্তি স্থাপিত হইবে। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের দার্শনিকগণ এই বলিয়া এই বৌদ্ধ মতের সমালোচনা করিয়াছেন যে, এই মত গ্রহণ করিলে দুইটি অন্যায় স্বীকার করিতে হয়। প্রথমতঃ কর্তা তাহার নিজকর্মের ফলভোগ করিতে পারে না (কৃতপ্রণাশ) এবং দ্বিতীয়তঃ তাহার কৃত নৈতিক কর্মের জন্য অপর ব্যক্তিকে উহার ফল ভোগ করিতে হয় (অকৃতাভ্যাগম) ; এতদ্ব্যতীত বুদ্ধের প্রাক্তন জন্মগুলিতে বিশ্বাস করার অর্থ একপ্রকার স্থায়িত্বই স্বীকার করা। আদি বৌদ্ধ দর্শনে নৈতিক কর্মের ফলোৎপাদন ঈশ্বররূপী কোনও ন্যায়-বিধাতার উপর অথবা ভিন্ন ভিন্ন জন্মের দেহগুলিতে একই অভিন্ন আত্মার অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে না—কর্মরূপী এই নৈতিক নিয়ম স্বয়ংক্রিয়, শুধু আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অধিক শক্তিশালী নিয়মের প্রভাবে ইহার ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়। আধ্যাত্মিক জ্ঞানদ্বারা সঞ্চিত এবং আগামী কর্ম সমূহের বিনাশ ঘটে, যদিও যে সব কর্ম বর্তমান জীবনে ফল দিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহাদের (প্রারব্ধের) বিনাশ হয় না। যিনি বুদ্ধত্বলাভ

করিয়াছেন অথবা যিনি অর্হৎ তিনি ইহজগতেই কর্মলেশসহ (উপাধিশেষ) নির্বাণ প্রাপ্ত হন—অর্থাৎ বেদান্তের ভাষায় জীবন্মুক্ত হন; মৃত্যু পর্যন্ত তাঁহার শরীর সক্রিয় থাকে কিন্তু যেহেতু তাঁহার সর্ববাসনা বিনষ্ট হইয়াছে, অতএব পুনর্জন্মের দিকে তাঁহার মধ্যে কোন প্রবণতা থাকে না। শরীর পতনের পর তিনি কর্মলেশরহিত (অনুপাধিশেষ) নির্বাণ প্রাপ্ত হন; কারণ তাঁহার আর কোন নূতন শরীর ধারণ হয় না এবং যে বিজ্ঞানধারায় ব্যক্তিত্বের উৎপত্তি হইয়াছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে শুষ্ক হইয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে সর্ব (কৃষ্ণ, শ্বেত অথবা মিশ্র) সঞ্চিত কর্মও নষ্ট হইয়া যায়, ইহারা আর পরিপক্বও (বিপক্কে) হয় না, ফলপ্রদানও করে না।

মালুঙ্ক্যপুত্ত, উত্তিয় এবং বচ্ছগোত্তর ন্যায় অনুসন্ধিৎসু লোকেরা যে মৃত্যুর পর বুদ্ধের (তথাগতের) কি অবস্থা হইবে তাহা জানিতে চাহিবেন ইহা স্বাভাবিক। পবিত্র জীবনযাপনের সহিত যাহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই এবং যাহা দ্বারা অনাসক্তি, তৃষ্ণানিবৃত্তি, দুঃখনাশ, স্থৈর্য, প্রজ্ঞারূপ উচ্চ আধ্যাত্মিক জ্ঞান এবং শান্তিলাভ হয় না তৎসম্বন্ধে ঔৎসুক্য বুদ্ধদেব পছন্দ করিতেন না। তিনি বলিতেন (উদাহরণস্বরূপ পাসাদি সুত্তন্তে), যে তাঁহার জ্ঞাত বিষয়গুলির মধ্যে ইচ্ছা করিয়াই তিনি কতকগুলিকে স্পষ্টভাবে বুঝিতে চেষ্টা করেন নাই এবং এইগুলির মধ্যে নির্বাণের পর বুদ্ধের অবস্থাও একটি। তাঁহার মতে ওই ব্যাপারে অনুসন্ধান করা বৃথা এবং ধর্মবিরুদ্ধ।

নির্বাণ

আধ্যাত্মিক সাধনার অন্তিম গন্তব্য যে নির্বাণ, উহা তাহা হইলে কি? মুক্তি এবং আত্যন্তিক নাশ যদি সমার্থক হয়, তাহা হইলে সাধনার মূল প্রেরণাই নষ্ট হইয়া যাইবে। আর মুক্তির অর্থ যদি ব্যক্তির শাশ্বত অস্তিত্ব বলিয়া মনে করা হয় তাহা হইলে স্বার্থপরতা পরিপুষ্ট হইবে। বুদ্ধ যখন এই বিষয়ে কোনও বিশিষ্ট মতের বন্ধনে আবদ্ধ করিতে চাহিতেন না তখন তিনি বলিতেন যে (উদাহরণস্বরূপ ব্রহ্মজাল এবং পোট্ঠপাদসুত্তে) নির্বাণে অর্থ পৃথকভাবে সত্তা ও অসত্তা এই দুইয়ের একটিও নহে অথবা মিলিতভাবে উভয় কিংবা উভয়াভাবও নহে। উহা ভাষাদ্বারা ব্যক্ত করা অসম্ভব। নির্বাপিত প্রদীপের অগ্নি কোথায় অথবা কোন্ দিকে যায় এরূপ প্রশ্ন করা যেরূপ অপ্রাসঙ্গিক তেমনই মৃত মহাপুরুষের স্থান ও গতি নির্ধারণের চেষ্টাও অসঙ্গত। উভয়ই শুধু নিবৃত্ত (নিব্বুতো) হইয়া যায় এবং জ্ঞানের বাহিরে চলিয়া যায়। বুদ্ধের এই নীরবতা হইতে এইরূপ ধারণা হইতে পারে যে, নির্বাণপ্রাপ্ত ব্যক্তির

কি অবস্থা হয় তৎসম্বন্ধে কিছু জানিতেন না অথবা জানিয়াও উপদেশ দেন নাই। কিন্তু যেহেতু তিনি উচ্ছেদবাদের বিরোধী ছিলেন, সেহেতু তিনি নেতিবাচক ভাষায় ইহাও শিক্ষা দিয়াছিলেন যে, নির্বাণ হইতেছে জীবনের দুঃখকষ্টের অবসান এবং কামাগ্নিদ্বারা পরিবেষ্টিত সংসার হইতে নিষ্কৃতি অর্থাৎ, উহা হইতেছে সর্ব কাম, আসক্তি, বিরাগ এবং মোহের পরিসমাপ্তি। বিবিধ ধ্যান এবং সমাধির (জ্ঞানের) মধ্য দিয়া আত্মার উর্ধ্বগতির বর্ণনা করিতে গিয়া বুদ্ধদেব শূন্যলোকের (আকিঞ্চন্য) উর্ধ্বে জ্ঞানের আরও কয়েকটি উচ্চস্তরের কথা বলিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, শূন্যতাই আধ্যাত্মিক জীবনের শেষ কথা নহে এবং নির্বাণের অনির্বাচ্যতা সত্ত্বেও উহাকে নিষেধমূলক ভাষায় রাগদ্বেষাদি রিপুসমূহের (ক্লেশাবরণের) এবং সম্যক্ জ্ঞানের সর্ব প্রতিবন্ধকসমূহের (জ্ঞেয়াবরণ) পূর্ণ অপসারণ বলিয়া বর্ণনা করিতে কোন বাধা নাই। এইরূপ কথিত আছে যে, বোধিলাভের অব্যবহিত পরে বুদ্ধদেব উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে তাঁহার দর্শনের যে দুইটি বক্তব্য জনসাধারণের পক্ষে বুঝা বিশেষ কঠিন হইবে, তাহা হইতেছে কার্য-কারণবাদ এবং নির্বাণের স্বরূপ; এমন কি জনসমাজে এই বাণী প্রচার করিবেন কিনা সেই সম্বন্ধে দ্বিধা করিতেছিলেন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্বীয় করুণার বশবর্তী হইয়া (সনির্বন্ধ অনুরোধ ব্রহ্মাসহম্পতির মানস দর্শন এই করুণার প্রতীক) বহুজনের উপকার ও সুখের জন্য ধর্মোপদেশ দেওয়ার কাজের ভার গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু এই কার্য-কারণ-বাদ এবং নির্বাণের স্বরূপ আজও সমস্যাই রহিয়াছে। বিশেষতঃ জিজ্ঞাসুর স্বাভাবিক প্রবৃত্তি এবং সংস্কৃতির স্তর অনুযায়ী নির্বাণ বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছে।

নির্বাণকে একটি অবিমিশ্র উপাদান বলিয়া মনে করায় উহাকে একটি ভাবাত্মক স্বরূপই দেওয়া হইল; আবার উহাকে যখন অমৃতত্ব (অমত-পদম্) এবং আনন্দের (সুখের) প্রাপ্তি বলিয়া বর্ণনা করা হইল, তখন উহাকে প্রায় একটি শাশ্বত আনন্দময় অবস্থা বলিয়া মনে করা হইল। অবশ্য এই আনন্দ ও শান্তিময় অবস্থা সকল বুদ্ধির অগোচর; কারণ এই বিমোক্‌খ (মুক্তি)কে জ্ঞানের সম্পূর্ণ বিরতি (সঞ্‌ঞা-বেদোয়িত-নিরোধ) বলিয়া মনে করা হইয়াছে এবং ইহার সহিত স্বর্গসুখের কোন সম্বন্ধ নাই—পূর্ণতার দিন অগ্রসর হওয়ার পথে অর্হৎ এই স্বর্গসুখকে বন্ধনপাশ ও প্রতারণা জ্ঞানে তুচ্ছ বলিয়া ভাবিতেন। ব্রাহ্মণ্যধর্মের যোগী জৈনধর্মের তীর্থঙ্কর (সিদ্ধদের কথা তো বলাই বাহুল্য) এবং বৌদ্ধধর্মের অর্হৎ ইহারা সকলেই দেবতাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহারা দেবতাদের দীর্ঘস্থায়ী কিন্তু বিনাশশীল অস্তিত্বকে কৃপার চক্ষে দেখেন এবং তজ্জন্য কোনরূপ ঈর্ষাবোধ করেন না। সন্তজন মুক্তিলাভের পথে বহু অলৌকিক সিদ্ধি

(ইদ্ধি) এবং লোকোত্তর জ্ঞান (অভিঞ্‌ঞা) প্রাপ্ত হন। উহাদের ফলে জড়শক্তিসমূহ তাঁহাকে বাধা দিতে সমর্থ হয় না, তিনি উহাদের উপর সম্পূর্ণ প্রভুত্বলাভ করেন এবং দূরস্থ এবং সূক্ষ্ম বস্তু অতীত এবং ভবিষ্যতের ঘটনা অপরের মন এবং লোকের ভাগ্য তাহার জ্ঞানগোচর হয়, কিন্তু এইগুলিকে তাহার সাধনার আনুষঙ্গিক লাভ বলিয়া মনে করাই কর্তব্য, এইগুলির জন্য তাহার উল্লসিত হওয়া উচিত নহে, কারণ কর্ম এবং জ্ঞানসঞ্চয়ের প্রতি মুক্ত আত্মার কোন আসক্তি নাই।

প্রকৃত অথবা উচ্চতম সিদ্ধি হইতেছে জীবনের অশুদ্ধি হইতে সম্পূর্ণভাবে পরাবৃত্ত হওয়া এবং মন, ইচ্ছা, কামনা এবং চিন্তাকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করার ক্ষমতা—লোক ভুলাইবার অথবা অন্যদের স্বমতে আনিবার জন্য অলৌকিক কার্য দেখাইবার শক্তি নহে। তুল্যভাবে, তাঁহাকে ক্রমান্বয়ে সাধারণ যুক্তি ও অনুসন্ধান, আন্তরশুদ্ধি, আনন্দ এবং সম্পূর্ণ উপেক্ষার মধ্য দিয়া ধ্যানের বিভিন্ন ভূমিগুলি আরোহণ করার দিকে নিজের মনকে চালিত করিতে হইবে। ইহার পর তিনি রূপের জগৎ সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করিয়া ক্রমান্বয়ে নিম্নলিখিত অবস্থাগুলি প্রাপ্ত হন—(১) আকাশানন্ত্যায়তনের উপলব্ধি—এই আয়তনে বহুত্ব এবং সান্ত জড়জগতের অস্তিত্ব থাকে না; (২) বিজ্ঞানানন্ত্যায়তনের উপলব্ধি—এখানে বিষয় সম্বন্ধের পূর্ণ অভাব; (৩) অকিঞ্চনায়তনের উপলব্ধি—এখানে বিষয় এবং বিষয়ী উভয়েরই সম্বন্ধ সম্পূর্ণভাবে অবিদ্যমান; (৪) নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞানায়তনের উপলব্ধি—এই স্তরে কোনরূপ স্পর্শ চিন্তার অস্তিত্ব অথবা অনস্তিত্ব কিছুই থাকে না—শুধু নির্বিকল্প ও অব্যপদেশ্য জ্ঞান থাকে; (৫) এবং সর্বপ্রাপঞ্চিক জ্ঞানের নিরোধায়তনের উপলব্ধি। দেবতাদের সম্বন্ধে ধারণা এই যে তাহারা ধ্যানের এই সকল বিভিন্ন স্তরে মগ্ন জীববিশেষ, কিন্তু তাহারা কেহই চারি আর্য-সত্যের অন্তিম উপলব্ধি লাভ করে নাই। এই অন্তিম উপলব্ধি হইতেছে পূর্বোক্ত অরূপ জগতের প্রাপঞ্চিক জ্ঞানের নিরোধাত্মক শেষ স্তরটির ভাবাত্মক আকার। ইহলোকে অথবা পরলোকে কোথাও আত্মবস্তু প্রকৃতপক্ষে অস্তিত্ববান্ নহে, সুতরাং আত্মার কোন প্রকার শরীরকেই শাশ্বত বলিয়া মনে করা যাইতে পারেনা—এমন কি যে ঐশ্বরিক দেহকে শাশ্বত বলিয়া মনে করা হয়, তাহাকেও নহে। সুতরাং নির্বাণের দিকে প্রবাহিত আধ্যাত্মিক নদীতে প্রবেশের যে-সব নৈতিক ও বৌদ্ধিক বিঘ্ন আছে, সেইগুলি দূর করিয়া সাধককে ক্রমান্বয়ে সকৃদাগামী (যে একবার প্রত্যাবর্তন করে), অনাগামী (যে একবারও প্রত্যাবর্তন করে না) এবং অর্হৎএর পদ লাভ করিতে হইবে।

ইহা সুস্পষ্ট যে এই অন্তিম আদর্শে উপনীত হইতে হইলে কঠোর আধ্যাত্মিক

সাধনার প্রয়োজন। মনকে উদার ও উন্মুক্ত করিতে হইলে, অর্থাৎ ব্রহ্মে বিচরণ করিবার যোগ্যতা অর্জন করিতে হইলে (ব্রহ্ম-বিহার ভাবনা) নিম্নোক্ত মহৎ ভাবনা চতুষ্টয় আবশ্যক:—সর্বজীবের হিতকামনা (মৈত্রী), আর্তের প্রতি দয়া (করুণা), অন্যের সুখে আনন্দবোধ (মুদিতা) এবং পরের দোষের প্রতি ঔদাসীন্য (উপেক্ষা)। দেহের ঘৃণ্যতার কথা চিন্তা (অ-শুভ ভাবনা) করিলে এই চারিটি ভাবনা বিশেষ শক্তিশালী হইবে। "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি, সংঘং শরণং গচ্ছামি" এই মন্ত্রের নিয়ত স্মরণ (অনুস্মৃতি), শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি নিশ্চয়ই পরে সংযুক্ত করা হইয়াছে। কিন্তু যৌগিক ধ্যান-ধারণা বুদ্ধের পূর্বকালীন এবং স্থূল হইতে সূক্ষ্মে, বাহ্যজগৎ হইতে অন্তর্জগতে ও সংবেদন হইতে সাক্ষাৎ অনুভূতিতে উন্নীত হওয়ার বিধান বুদ্ধের সমসাময়িক দর্শন-সম্প্রদায়গুলিতেও নিশ্চয়ই প্রচলিত ছিল। প্রশান্তি অথবা সমত্ব এবং নীতি ও ধ্যানের অতীত প্রজ্ঞা সকল সম্প্রদায়েরই লক্ষ্য ছিল। শ্রেষ্ঠ অথবা উত্তম পন্থা নিয়মানুবর্তিতা (বিনয়) এবং সত্যের বিবেক-জ্ঞানের (ধর্মের) উপর নির্ভর করে বলিয়া মনে করা হইত।

ধর্মরূপে বৌদ্ধমত

যে বুদ্ধ মত ও অনুষ্ঠানের ব্যাপারে স্বাধীন বিচার প্রয়োগ করিতে হইবে এই মত ব্যাপকভাবে প্রচার করিয়াছিলেন, তিনিও যে, মহাপদান সুত্তান্তে প্রায় ঈশ্বরের ন্যায় পূজ্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ইহার কারণ এই যে, বুদ্ধ স্বয়ং অন্যান্য সত্য ও মুক্তিকামীদের তুলনায় স্বীয় সর্বশ্রেষ্ঠত্বের, এমন কি দেবতা, মনুষ্য প্রভৃতি হইতে অত্যন্ত পৃথক্ (বুদ্ধরূপে) এক অপূর্ব অসাধারণত্বের দাবী করিয়াছিলেন। তাঁহাতে কতকগুলি মহাপুরুষের লক্ষণ থাকায়, তাঁহাকে সাধারণ মরণশীল জীব হইতে প্রভেদ করা হইত এবং তজ্জন্য শীঘ্রই তাঁহার জীবন ও কার্যের সহিত বহু অতিপ্রাকৃত ঘটনা সমাবেশ করা হইয়াছিল। দশটি শক্তি অথবা সর্ববস্তুর মর্মভেদী জ্ঞান, যেসকল বুদ্ধসুলভ আঠারটি গুণ-দ্বারা সর্বজ্ঞ হইতে পারিয়াছিলেন এবং প্রত্যেক ব্যাপারে স্বীয় আচরণ, বাণী ও মনকে যথাযোগ্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই আঠারটি গুণ, এবং যে চারিটি আত্মপ্রত্যয় দ্বারা তিনি নিশ্চিতভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে মুক্তিপ্রদ জ্ঞানের অধিকারী হইয়াছেন, সেই চারিটি আত্মপ্রত্যয় তাঁহাতে থাকায় তিনি জিন, সর্বজ্ঞ, সুগত, তথাগত, ভগবৎ প্রভৃতি বহু সম্মানবাচক নামের অধিকারী হইয়াছিলেন। তাহা ছাড়া এইরূপও বর্ণনা করা হইয়াছে যে, অতীতে আরও অনেক

বুদ্ধ হইয়া গিয়াছেন এবং তিনি তাঁহাদেরই অন্যতম বলিয়া দাবী করিতেন। এই সকল বুদ্ধের সংখ্যা প্রথমে ছয়টি বলিয়া মনে করা হইত—ইহারা হইতেছেন বিপস্সি, সিখি, বেসসভু, ককুসন্ধ, কোণাগমন এবং কস্সপ। পরে এই সংখ্যা বাড়াইয়া চব্বিশটি করা হইয়াছিল—ইহাদের আদি হইতেছেন বুদ্ধ দীপঙ্কর; ইহারই নিকট বর্তমান বুদ্ধ (তৎকালে তাঁহার নাম ছিল সুমেধ) এরূপ শপথ লইয়াছেন বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে যে, তিনি সৃষ্টজীবের মঙ্গলার্থ স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিবেন এবং এইরূপও বলা হইয়াছে যে, বুদ্ধ দীপঙ্কর ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছিলেন যে গৌতম বুদ্ধ সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান বা বোধি লাভ করিবেন।

মৈত্রেয় প্রভৃতি ভবিষ্যৎ বুদ্ধদের কথা পরবর্তীকালের সাহিত্যেও লক্ষিত হয়। বুদ্ধের সময়ে মাঝে মাঝে এইরূপ স্বীকার করা হইত যে, কোন কোন গৃহী মোক্ষলাভ করিয়াছে। কিন্তু কোন অর্হৎই বহুজন্ম বোধিসত্ত্বের জীবনযাপন করিয়া বহু কৃচ্ছ্রসাধনেও শেষ পর্যন্ত বুদ্ধ হইয়াছেন বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই, কারণ বৌদ্ধধর্মের মূল শাস্ত্রানুসারে এক কালের মধ্যে শুধু একজন বুদ্ধই হইতে পারেন। ইহার ফলে বুদ্ধের জীবন সম্বন্ধে যে বিবিধ কাল্পনিক কাহিনী বৌদ্ধ-সাহিত্যে রচিত হইয়াছিল, এমন কি বুদ্ধ যে সাধারণ মরণশীল জীব এবং মহাপুরুষদের তুলনায় সম্পূর্ণ পৃথক্ ছিলেন ইহা সমর্থন করিয়া ব্যঙ্গ প্রচারিত হইয়াছিল, বিভিন্ন বৌদ্ধ সম্প্রদায় ইহলোকে এবং পরলোকে বুদ্ধের স্বরূপ কি এই বিষয় লইয়া বিবাদ করিত এবং পরলোকগত বুদ্ধের উদ্দেশ্যে কিছু নিবেদন করার কি প্রয়োজন হইতে পারে, এবং যে মুক্ত-আত্মা ভক্তির দ্বারা আকৃষ্ট হইতে অথবা ভক্তির মূল্য উপলব্ধি করিতে অসমর্থ তাঁহার পূজায় কিরূপ আধ্যাত্মিক মঙ্গল প্রত্যাশা করা যাইতে পারে ইহা লইয়া আলোচনা করিত—ইহাতে আশ্চর্যান্বিত হইবার কিছুই নাই। এইরূপ ধারণা প্রচলিত হইল যে, বুদ্ধের জন্ম, বোধিলাভ, প্রথম উপদেশ এবং পরিনির্বাণ যে সকল স্থলে ঘটিয়াছিল, সেইগুলি বৌদ্ধধর্মের তীর্থস্থান; ভিক্ষু এবং ভিক্ষুণীরা একমাত্র বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণ গ্রহণ করিয়াই নির্বাণলাভে সমর্থ, কিন্তু তাহারা কখনও বুদ্ধের স্তরে উপনীত হইতে পারে না এবং বুদ্ধ ব্রাহ্মণ্যধর্মের ইন্দ্র, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতাদের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ছিলেন। এই ধারণা হইতে বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠাতার প্রতি এইরূপ শ্রদ্ধার ভাব উৎপন্ন হওয়া স্বাভাবিক—যাহা ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির ন্যায়; এবং এই ধারণাবশতঃ বৌদ্ধরা স্তূপগুলির প্রতি যে সম্মান দেখাইত, তাহা কোন মন্দিরস্থ দেবতার প্রতি সম্মানের তুল্য।

কিন্তু বুদ্ধ কৃত ধর্মীয়-সংস্কারের প্রকৃত বিরুদ্ধগামী চিন্তাধারা মহাযান সম্প্রদায়ে

আরব্ধ হইয়াছিল। ইহারা বুদ্ধকে জগতের আদিতত্ত্বের স্তরে উন্নীত করিয়াছিল, অন্যান্য ধর্মে দেবতাদের উৎপত্তির বিবরণের ন্যায় ইহারাও বুদ্ধ হইতে জগতের উদ্ভববাদ গ্রহণ করিয়াছিল এবং পরে বৈদিক যুগের প্রাচীন দেবতারাও মহাযান সম্প্রদায়ে পুনরায় স্থান পাইয়াছিলেন এবং শৈব ও বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবে তাহারা নিজস্ব রীতিতে ব্রাহ্মণ্যধর্মের দেবতাদিগকেও গ্রহণ করিয়াছিল। উপনিষদীয় বিচার-প্লাবনে প্রাচীন দেবতাগণ বিদূরিত হওয়ার পর ধর্মজগতে শৈব ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রাধান্য আরম্ভ হইয়াছিল।

হীনযান এবং মহাযান

উচ্চাধিকারীর জন্য গুপ্ত উপদেশ এবং সর্বসাধারণের জন্য প্রকাশ্য উপদেশ মহাযানে এইরূপ যে পার্থক্য করা হইত, প্রাচীন বৌদ্ধমতে তাহা করা হইত না। সংসারে থাকিয়া যাহাতে অন্যকে পবিত্র জীবনযাপনে সাহায্য করা যাইতে পারে এই উদ্দেশ্যে নির্বাণপ্রাপ্তি স্থগিত রাখা কর্তব্য প্রাচীন মতে এই ধারণাকে উৎসাহ দেওয়া হইত না। অর্হৎ মাত্রই বোধিসত্ত্বরূপে সাধনা আরম্ভ করিয়া পরিশেষে বুদ্ধপদপ্রাপ্তি সংকল্প করিতে পারে এরূপ ভ্রান্ত আশাকেও উহা সমর্থন করিত না। অর্থাৎ ইহা সহজসিদ্ধ বিজ্ঞানবাদ এবং শূন্যবাদ অনুমোদন করিত না। উহার শিক্ষা এইরূপ ছিল যে, জগতের অন্ততঃ ততখানি সত্তা আছে যাহাতে উহা সাধকের পক্ষে ক্লেশদায়ক হইতে পারে; উন্নত সাধকেরা যে নিঃসঙ্গ ও একাকী, এবং মুক্তির জন্য বাহিরের সাহায্যের আশা না করিয়া, অথবা কোনও সার্বজনীন সত্তায় বিলীন হওয়ার আশা পোষণ না করিয়া, ব্যক্তিগত প্রযত্নই অত্যাবশ্যক এই মতের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইত—উহা ছিল শ্রদ্ধার কার্যকারিতায় বিশ্বাসী পরবর্তীকালের সহজযানের বিপরীত কঠিনযান (সহজ পথ ও কঠিন পথ); মুক্ত-আত্মা সুখ-স্বর্গ লাভ করিবে ইহাতে সেরূপ কোন আশ্বাস দেওয়া হয় না।

যেহেতু এই মতে প্রত্যেককেই নিজেই নিজের পথপ্রদর্শক হইয়া এবং পরের মুক্তির জন্য চিন্তা না করিয়া ব্যক্তিগতভাবে স্বীয় মুক্তি সম্পাদনের জন্য উপদেশ লওয়া হইত, সেই হেতু উহাকে স্বার্থপরের মত বলা যাইবে কি? ইহা সত্য হইতে পারে না, কারণ বুদ্ধ মুক্তির গুহ্যতত্ত্বকে কেবল নিজের কাছেই রাখিয়া দেওয়ার প্রলোভন সম্বরণ করিয়াছিলেন এবং তিনি ভিক্ষুদিগকে সংসারাসক্ত গৃহীদের নিকট মুক্তির বাণী লইয়া যাইবার জন্য বর্ষাকাল ব্যতীত অন্য সময়ে দেশের সর্বত্র ভ্রমণ

করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। তথাপি প্রতিস্পর্ধী মহাযান সম্প্রদায় এই প্রাচীন পন্থাকে বিদ্রূপ করিয়া 'হীনযান' এই উপ-নাম দিয়াছিল। কারণ এই পন্থায় সকল সাধকই (শ্রাবকই) সমগ্র সমাজের ধর্মোন্নতির কথা না ভাবিয়া যতদূর সম্ভব শীঘ্র স্বীয় মুক্তিলাভের প্রতি সচেষ্ট ছিল। ইহা ব্যতীত তাহাদের অন্য কোন আদর্শ ছিল না। সুতরাং শ্রাবক-যান অথবা অর্হৎ-যান হইতেছে এমন একটি ক্ষুদ্রযান (হীনযান) যাহাতে শুধু একজন যাত্রীই ব্যাত্যাবিক্ষুব্ধ জীবনসমুদ্র নির্বিঘ্নে পার হইতে পারে; কিন্তু বুদ্ধ-যান অথবা বোধিসত্ত্ব-যান হইতেছে একটি বৃহৎ-যান (মহাযান), কারণ সাধক তাঁহার প্রশস্ত নৌকায় অন্য লোককেও সঙ্গে লইয়া বিপৎসঙ্কুল সংসার-প্রবাহ পার হইতে পারেন।

কেহ কেহ এইরূপ বলেন যে, ইহা অপেক্ষা উত্তরদেশীয় ও দক্ষিণদেশীয় বৌদ্ধ-ধর্মের ভেদ যোগ্যতর হইবে—এই ভেদের মধ্যে কোনও নিন্দার সূচনা নাই। সিংহল, ব্রহ্মদেশ এবং শ্যামদেশে প্রাচীন মত প্রবল; এবং তিব্বত, চীন ও জাপান দেশ পরবর্তী মতের আবাসস্থল। ভ্রমণকারীদের বৃত্তান্ত প্রত্নতাত্ত্বিক ভগ্নাবশেষ এবং প্রাচীন সাহিত্যের সাক্ষ্য হইতে প্রতীয়মান হইবে যে, এই ভৌগোলিক বিভাগ সুস্পষ্ট ছিল না, এবং পরবর্তীকালে দক্ষিণদেশীয় এবং উত্তরদেশীয়, হীনযান এবং মহাযান উভয় সম্প্রদায়ই পাশাপাশি, এমন কি একই মঠের অভ্যন্তরে বিরাজ করিত। সুতরাং ইহা বলাই সঙ্গত হইবে যে, ভাষা (সংস্কৃত অথবা পালি অথবা অপভ্রংশ সংস্কৃত), ভাস্কর্য, ধর্মীয় এবং দার্শনিক বিশ্বাস, নৈতিক আচারের কঠোরতা এবং ধর্মগ্রন্থের বিস্তারের ব্যাপারে বিভিন্নতাবশতঃ বুদ্ধের অনুগামীরা দুইটি প্রধান দলে বিভক্ত হইয়াছিল; এই দুই দলের মধ্যে বিভিন্ন বৌদ্ধমতের সম্প্রদায়গুলি সমাবিষ্ট হইয়াছিল; এবং পরপ্রাপ্তীয় বিশ্বাস ও চিন্তাধারার সংস্পর্শে আসিবার ফলে উত্তরদেশীয় সম্প্রদায়ে দক্ষিণদেশীয় সম্প্রদায় অপেক্ষা অধিক পরিমাণে পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছিল—দক্ষিণ সম্প্রদায় তাহাদের সুত্ত (ধর্মমত), বিনয় (আচার), এবং অভিধম্ম (দর্শন) এই তিনটি পিটকের উপরেই নির্ভর করিয়া রহিল। ইহা বিক্ষুব্ধ জীবন-সমুদ্রে কেবলমাত্র একজন আরোহীকে নিরাপদে পারে লইয়া যাইতে পারে, অন্য দিকে বুদ্ধ-যান বা বোধিসত্ত্ব-যান মহৎ উপায় বা মহাযান কারণ ইহার বিস্তৃত নৌকায় সন্ন্যাসী বা শ্রাবক বিপজ্জনক সংসার হইতে অন্যান্য জীবাত্মাদের মুক্তির পারে লইয়া যাইতে সক্ষম।

বৌদ্ধ মতবাদকে আর্যাবর্ত ও দক্ষিণাবর্তের বৌদ্ধ মতবাদে বিভক্ত করিলে ভাল বিভাগ হইবে, কারণ ইহাতে কোন সম্প্রদায়ের প্রতি কোনরূপ দোষারোপ

করা হয় না বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। সিংহল, বর্মা, শ্যাম, প্রাচীন মতবাদের দৃঢ় কেন্দ্রস্থল ছিল, অপর দিকে তিব্বত, চীন ও জাপান পরবর্তী মতবাদের আবাস-স্থল ছিল। ভ্রমণকারীদের বৃত্তান্ত, প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষ ও সাহিত্যিক প্রমাণাদি হইতে ইহাই প্রতিভাত হয় যে, ভৌগোলিক বিভাগ সুস্পষ্ট নহে এবং পরবর্তীকালে উভয় ধারাই—দক্ষিণাবর্ত ও আর্যাবর্ত, হীনযান ও মহাযান পাশাপাশি একই বৌদ্ধ-সংঘে উৎকর্ষলাভ করিয়াছিল। সুতরাং আমরা ইহাতেই সন্তুষ্ট থাকিব যে, ভাষায় (সংস্কৃত, পালি বা মিশ্র-সংস্কৃত), স্থাপত্যে, ধর্ম ও দার্শনিক বিশ্বাসে, নৈতিক নিয়মানুবর্তিতার কঠোরতায়. পবিত্র ধর্মগ্রন্থের বিভিন্নতায় বুদ্ধের অনুগামীগণ দুইটি প্রধান অংশে বিভক্ত হইয়াছিল এবং বিভিন্ন ধরণের চিন্তাধারা সকল সেখানে সমবেত হইয়াছিল ; বিভিন্ন ধরণের বৈদেশিক বিশ্বাস ও চিন্তাধারার সংস্পর্শ আর্যাবর্তের চিন্তাধারায় সুত্ত-সংবলিত ত্রিপিটক্, বিনয় ও অভিধম্মযুক্ত দক্ষিণাবর্তের বৌদ্ধ মতবাদ অপেক্ষা অধিকতর নূতনত্ব প্রবর্তন করিয়াছিল।

গ্রন্থবিবরণী

ত্রিপিটকে নিম্নলিখিত পিটকগুলি আছে—

। বিনয়-পিটক

(১) ভিথ্খু-বিভঙ্গ

(২) ভিখ্খুনী-বিভঙ্গ

(৩) মহা-বগ্গ

(৪) চুল্ল-বগ্গ

(৫) পরিবার-পাঠ

। সুত্ত-পিটক

(১) দীঘ-নিকায়

(২) মঝ্ঝিম-নিকায়

(৩) সঞ্যুত্ত-নিকায়

(৪) অংগুত্তর-নিকায়

(৫) খুদ্দক-নিকায়, ইহার মধ্যে আছে—

(১) খুদ্দক-পাঠ, (২) ধম্মপদ, (৩) উদান, (৪) ইতিবুত্তক, (৫) সুত্ত-নিপাত, (৬) বিমান-বথ্থু, (৭) পেত-বথ্থু, (৮) থের-গাথা, (৯) থেরী-গাথা, (১০) জাতক, (১১) নিদ্দেস, (১২) পটিসম্ভিদ মগ্গ, (১৩) অপদান, (১৪) বুদ্ধ-বংস ও (১৫) চর্যা-পিটক

৩। অভিধম্ম-পিটক

(১) ধম্ম-সংগণি

(২) বিভংগ

(৩) কথা-বথ্‌

(৪) পুগ্‌গল-পঞ্‌ঞত্তি

(৫) ধাতু-কথা

(৬) যমক

(৭) পট্‌ঠান

Sacred Books of the East, Sacred Books of the Buddhists ও Pali Text Societyর গ্রন্থমালায় উপরোক্ত পুস্তকগুলির চমৎকার ইংরাজী অনুবাদ বর্তমানে পাওয়া যায়। নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি উল্লেখযোগ্য—The Vinaya Texts (Rhys Davids ও Oldenderg), Dialogues of the Buddha (Rhys. Davids ও Mrs. Rhys Davids), Further Dialogues of the Buddha (Lord Chalmers), The Book of the Kindred Sayings (Mrs. Rhys Davids and Woodward), The Book of the Gradual Sayings (Woodward and Hare) Dhammapada (Max Muller). The Sutta-Nipata (Fausboll), Psalms of the Brethren (Mrs. Rhys Davids), Psalms of the Sisters (Mrs. Rhys Davids), Udana (Strong), Points of Controversy (Aung and Mrs. Rhys Davids), Puggala-Pannatti (B. C. Law), The Buddha-Vsmsa (Morris) এবং Jatakamala (Speyer).

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলিরও উল্লেখ করা যাইতে পারে—The Mahavmsa (Geiger ও Mrs. Bode), The Questions of King Milinda (Rhys Davids), Dipavamsa (Oldenderg), Buddhist Suttas (Rhys Davids), The First Fifty Discourses of Gotama the Buddha (Silacara) ও Buddhist Psychological Ethics (Mrs. Rhys Davids). Buddhism in Translations (Warren) ও The Vedantic Buddhism of the Buddha (Jennings)এ আংশিক অনুবাদ পাওয়া যাইবে।

প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন বিষয় লইয়া কয়েকটি চমৎকার সংক্ষিপ্ত পুস্তক—Manual of Indian Buddhism (Kern), Buddha—His life, His Doctrine, His Order (Oldenberg), A Manual of Buddhism (Mrs. Rhys Davids), American Lectures on Buddhism (Rhys Davids), Buddhist Philosophy in India and Ceylon (Keith), Life of Buddha ও History of Buddhist Thought (Thomas), Hinduism and Buddhism (Eliot), Early Monastic Buddhism (Dutt), Pre-Buddhistic Indian Philosophy (Barua), The Central Conception of Buddhism (Stcherbatsky), Systems of Buddhistic Thought (Yamakami Sogen), Buddhist India (Rhys Davids) Nirvana (de la Vallee Poussin), Women under Primitive Buddhism (Horner) ও History of Indian Literature, Vol I (Winternitz).

মহাযান মতের উপর লিখিত পুস্তকগুলি উপরের তালিকায় দেওয়া হয় নাই।

বৌদ্ধ দর্শন

খ। ভারতীয় বিভিন্ন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ঐতিহাসিক ভূমিকা

১। ভূমিকা

বৌদ্ধ ও জৈন শাস্ত্রে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে অসংখ্য ধর্ম ও দার্শনিক মতবাদের আলোড়ন চলিতেছিল। এই মতবাদ সকলের সমর্থকেরা 'শ্রমণ' ও 'ব্রাহ্মণ' এই দুইটি পৃথক শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। ব্রাহ্মণদিগের মতবাদ বেদের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু যাহাদিগকে শ্রমণ বলা হইত, তাহারা ইহকালে ও পরকালে সুখ-শান্তির উপায় হিসাবে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও কৃচ্ছ্র-সাধন করিতেন; তাঁহারা ব্রাহ্মণদের বিরোধী ছিলেন এবং বৈদিক কঠোরতা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এই দুই শ্রেণীর আবির্ভাবের পূর্বে ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের মধ্যেই এমন কতক লোক ছিলেন, যাহাদের মধ্যে কেহ (১) কর্মী বা কর্মমার্গের অনুগামীরা—ইহারা বিভিন্ন প্রকার যাগযজ্ঞ সম্পর্কিত বৈদিক ক্রিয়াকর্মাদিতে বিশ্বাসী ছিলেন; এবং কেহ কেহ (২) জ্ঞানী বা জ্ঞানমার্গের অনুগামী; ইহাদের উচ্চ-চিন্তা উপনিষদ সমূহে পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছিল।

সমাজে বিচার ও যুক্তির উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড সম্পর্কিত পশুবলির প্রতি ক্রমশঃ অশ্রদ্ধা এবং পূজা-অনুষ্ঠানের বিভিন্ন প্রকার বাহ্য ও জটিল ক্রিয়কাণ্ডাদির উপর অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইতে থাকিল। ইহার ফলে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মধ্যেও এমন বিভিন্ন শ্রেণীর সৃষ্টি হইয়াছিল, যাঁহারা বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের কার্যকারিতা ও মূল্য সম্পর্কে সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন। বৈদিক ক্রিয়াকর্মাদিকে সংসার-সাগর পার হওয়ার পক্ষে অতি দুর্বল ভেলার মত মনে করিতেন, ফলে এইগুলির রূপক ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা হইয়াছিল। উদাহরণস্বরূপ বৃহদারণ্যক উপনিষদের[১] প্রারম্ভেই পশুযজ্ঞের[২] মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ অশ্বমেধ যজ্ঞকে সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

উপরোক্ত সম্প্রদায় সকলের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্তমান থাকায় ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই কমবেশী একে অপরের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল এবং দেশের তৎকালীন দার্শনিক চিন্তাধারায় 'শ্রমণ' ও 'ব্রাহ্মণ'দিগের দান বিশেষ উল্লেখযোগ্য ও মূল্যবান।

বর্তমানে 'শ্রমণ' বা আরও সঠিক করিয়া বলিতে গেলে বৌদ্ধরাই আমাদের আলোচনার বিষয়। এই শ্রমণেরা দুইটি প্রধান সম্প্রদায়ে বিভক্ত: হীনযান (নিকৃষ্ট

যান) ও মহাযান (শ্রেষ্ঠযান)। মহাযান সম্প্রদায়ই নিজেদের শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করিবার জন্য 'যান' শব্দের পূর্বে 'হীন' ও 'মহা', এই বিশেষণদ্বয় ব্যবহার করিতেন। মহাযানীরা সপ্তগুণের জন্য নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করিতেন—যে সপ্তগুণ হীনযানে[৩] নাই। (মহাযান সূত্রালঙ্কার ১৯-৫৯, ৬০)

অসংগ (খ্রীষ্টাব্দ ৩০০) ও শান্তরক্ষিত (খ্রীষ্টাব্দ ৭০০) প্রভৃতি প্রাচীন আচার্যেরা দুইটি প্রধান প্রশ্ন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে প্রথমটি হইল : মহাযান সূত্রগুলি কি প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধের মূল বাণীকে অনুসরণ করে? মহাযান সম্প্রদায়ের আচার্যেরা এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন—'হাঁ'। দ্বিতীয় প্রশ্ন হইল : হীনযান ও মহাযান এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন্‌টি প্রাচীন? মহাযান মত যে হীনযান অপেক্ষা অধিক সমৃদ্ধ ইহা সুস্পষ্ট। আচার্যেরা মহাযান মতের প্রামাণ্য বিচার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, উহার প্রামাণ্য যথেষ্ট বিতর্কের বিষয় ছিল। আমরা এখানে সাধারণভাবে ভারতীয় বৌদ্ধ-চিন্তাধারার প্রধান শাখাগুলির ঐতিহাসিক বর্ণনা প্রদান করিব এবং বুদ্ধের মূল উপদেশাবলী ও ভারতীয় প্রাচীন চিন্তাধারার সহিত ইহাদের সম্বন্ধ কি তাহা সংক্ষেপে প্রদর্শন করিব।

২। বৈভাষিক সম্প্রদায়

বৌদ্ধধর্মের সমর্থক বিখ্যাত নৃপতি কনিষ্কের রাজত্বকালে (আনুমানিক ১২০ খ্রীষ্টপর) কাশ্মীরে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে পরস্পরবিরোধী মত দেখা দেওয়াতে সম্রাট অশোকের অনুসরণে বৌদ্ধসংঘের একটি অধিবেশন কাশ্মীরে আহ্বান করা হইয়াছিল। সেই অধিবেশনে মূল ধর্মগ্রন্থের সংশোধন করা হইয়াছিল এবং অভিধর্মের উপর বিভাষা[৪] নামীয় একখানি বৃহৎ ভাষ্য রচিত হইয়াছিল। সংস্কৃত ভাষায় রচিত মূল গ্রন্থখানি অধুনা আর পাওয়া যায় না, কিন্তু চীনা ভাষায় দুইখানি অনুবাদ এখনও পাওয়া যায়।

কালক্রমে কাশ্মীরে বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বীগণের মধ্যে বিভেদ দেখা দিল; ইহাদের মধ্যে এক সম্প্রদায়ের বিভাষার উপর বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল, সেইজন্য এই সম্প্রদায়ের লোকরা বৈভাষিক[৫] নামে পরিচিত হইল। পুনরায় বৈভাষিকদিগের মধ্যেই কোন কোন বিষয়ে বিভিন্ন মতবাদ ছিল এবং যাহারা কাশ্মীরে বাস করিত তাহারা 'কাশ্মীর বৈভাষিক' এবং যাহারা পশ্চিম সীমান্তে (পাঞ্জাব) বাস করিত তাহারা 'পাশ্চাত্য

বৈভাষিক' বলিয়া অভিহিত হইত। তাহারা 'অপরান্তক' (যাহারা পাশ্চাত্য সীমান্তে বাস করিত), বহির্দেশক বা (বহির্দেশ বাসী), গান্ধারাচার্য বা (গান্ধার দেশের আচার্যেরা)—এই সব নামেও অভিহিত হইত।

এই বৈভাষিকেরা মূল সর্বাস্তিবাদীদের (যাহারা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সর্বকালে সর্ববস্তুর সত্তায় বা অস্তিত্বে বিশ্বাসী) দুইটি প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি। এই দুইটি সম্প্রদায়ের একটি সম্প্রদায় সর্বাস্তিবাদী নামে পরিচিত ও অপরটি সৌত্রান্তিক সম্প্রদায় বলিয়া খ্যাত। সৌত্রান্ত্রিক সম্প্রদায় সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হইবে। কাশ্মীরের সর্বাস্তিবাদীরা মূল বা আসল সর্বাস্তিবাদী বলিয়া পরিচিত ও অন্যান্য সম্প্রদায় সকল শুধু সর্বাস্তিবাদী বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

সর্বাস্তিবাদীদের সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য ধর্মগ্রন্থ হইল কাত্যায়ণীপুত্র প্রণীত 'জ্ঞান-প্রস্থান'। ইহা ছয়ভাগে বিভক্ত। পূর্বোল্লিখিত বিভাগ এই গ্রন্থের ভাষ্য। এই সম্প্রদায়ের 'বিনয়' ও 'সূত্র' নামক সংগ্রহও আছে। ইহাদের অধুনাপ্রাপ্ত গ্রন্থসকল সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত। সম্ভবতঃ এইগুলি প্রথমে কোন এক প্রকার প্রাকৃত ভাষায় রচিত হইয়াছিল, পরে সংস্কৃত ভাষায় রূপান্তরিত হয়।

সর্বাস্তিবাদীরা এই নামে কথিত হইয়া থাকেন কেন, এই আলোচনা এখানে করা যাইতে পারে। ইহা দ্বারা আমরা বৈভাষিকদিগের দার্শনিক মতবাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি মত স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিব, কারণ বৈভাষিক সম্প্রদায় সর্বাস্তিবাদী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।

'অভিধর্মকোষ'-এর ন্যায় প্রামাণ্য গ্রন্থের বিখ্যাত রচয়িতা বসুবন্ধু তাঁহার এই গ্রন্থে (৫ ২৫. ২৬) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি বস্তুর অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ রূপ ত্রৈকালিক অস্তিত্বে বিশ্বাসী সেই সর্বাস্তিবাদী বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।[৬] সব কিছুই, অর্থাৎ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অস্তিত্ববান—এইরূপ বলা যথার্থই সাহসের কাজ। কিন্তু কোন্ কোন্ প্রমাণের উপর এই মত প্রতিষ্ঠিত? মোটামুটিভাবে ইহার চারিটি প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত।

প্রথমতঃ, বুদ্ধের নিজস্ব উক্তি—তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন যে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ—এই ত্রিবিধ বস্তুরই অস্তিত্ব আছে।[৭]

দ্বিতীয়তঃ, বুদ্ধ আরও বলিয়াছেন যে যখন কোন বিজ্ঞান উৎপন্ন হয় (যথা চক্ষুরিন্দ্রিয় হইতে উৎপন্ন বিজ্ঞান) দুইটি পদার্থ হইতে উৎপন্ন হয়- যথা (১) ইন্দ্রিয় এবং (২) বিষয় (রূপ)। অন্যান্য ইন্দ্রিয় ও অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে একই কথা

প্রযোজ্য। অতীত ও ভবিষ্যৎ বলিয়া যদি কোন কিছু না থাকে, তাহা হইলে ঐ সকল বস্তুর বিজ্ঞান বা মানসিক ছাপ অসম্ভব। সুতরাং যদি অতীত ও ভবিষ্যৎ বলিয়া কিছু না থাকিত, তাহা হইলে 'একদা মহাসম্মত বাস করিতেন,' 'সংঘ সার্বভৌম রাজা হইতে চলিয়াছেন'—এই জাতীয় ভূত ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত উক্তি সকল ভিত্তিহীন হইয়া যাইত—বস্তুতঃ বিষয় যখন অবিদ্যমান, তখন তাহার বিজ্ঞানও সম্ভবপর নয়।

তৃতীয়তঃ, যদি বিষয় (আলম্বন) থাকে তাহা হইলেই তাহার জ্ঞান হইতে পারে, অন্যথায় নহে। সুতরাং অতীত ও বর্তমান বস্তু বলিয়া যদি কিছু না থাকে, তাহা হইলে আলম্বন ভিন্ন ইহার জ্ঞান কি করিয়া সম্ভব ?

চতুর্থতঃ, যদি অতীত বলিয়া কিছুর অস্তিত্ব না থাকে, তাহা হইলে কি ভাবে ভাল কিংবা মন্দ অতীত কর্ম ফলপ্রসূ হইবে ? কারণ তখন তো উহার স্বরূপ বা অস্তিত্ব বলিয়া কিছুই থাকে না। বস্তুতঃ, যখন ফল উৎপন্ন হয়, তখন ইহার কারণ (বিপাক হেতু) নষ্ট হইয়া যায়। এই সকল শাস্ত্র ও যুক্তির ভিত্তিতেই বৈভাষিকেরা অতীত ও ভবিষ্যতের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। প্রচলিত বৌদ্ধ মতবাদে কোন বস্তুরই স্থায়ী অস্তিত্ব নাই। এমন অবস্থায় সর্বাস্তিবাদী বা বৈভাষিকেরা কি করিয়া বলে যে বিষয়ের ত্রৈকালিক অস্তিত্ব আছে ? বিভিন্ন বৈভাষিকেরা এই প্রশ্নের জবাব দিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত চারিটি প্রধান,[৮] যথা :—

১। ভদন্ত ধর্মত্রাত—তিনি ভাবান্যথাবাদের সমর্থক। তিনি তাঁহার মতবাদ এইভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন যে, যখন কোন দ্রব্যের পরিবর্তন লক্ষিত হয়, তখন বস্তুতঃ দ্রব্যের কোন পরিবর্তন হয় না, শুধু ইহার ভাবের পরিবর্তন হয়। স্বর্ণ নামক দ্রব্য বিভিন্নভাবে পরিবর্তিত হইয়া কণ্ঠহার, কুণ্ডল প্রভৃতি নামে অভিহিত হয় ; কিন্তু স্বরূপতঃ স্বর্ণের কোন পরিবর্তন হয় না। একই ভাবে, ভবিষ্যৎ ও অন্যান্য 'ভাব' হইতে আলম্বন বা দ্রব্য পৃথক্। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, যখন কোন দ্রব্য বা আলম্বন ইহার ভবিষ্যৎ ভাব পরিত্যাগ করে, তখন উহা বর্তমান ভাব প্রাপ্ত হয় ; এবং ইহা যখন বর্তমান ভাব পরিত্যাগ করে, তখন অতীত ভাবে উপনীত হয়। কিন্তু কোন অবস্থায়ই স্বরূপতঃ আলম্বনের কোন পরিবর্তন হয় না। ত্রিবিধ ভাবের মধ্যেও বস্তুর প্রকৃতি অপরিবর্তনীয় থাকে। যদি এইরূপ না হইত তাহা হইলে ভবিষ্যৎ, বর্তমান ও অতীত বিষয় সকল একটি অপরটি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক হইত।

২৬

২। ভদন্ত ঘোষকের মতে বস্তুর পরিবর্তন উহার ধর্মেই (লক্ষণে) ঘটে। তাঁহার যুক্তি এই : যখন কোন বস্তু অতীত বলিয়া কথিত হয়, তখন ইহা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ধর্ম হইতে সম্পূর্ণভাবে বিচ্যুত হয় না। উদাহরণস্বরূপ, কোন লোকের একজন বিশেষ স্ত্রীলোকের প্রতি আকর্ষণ থাকিতে পারে, কিন্তু সেই হেতু তিনি অন্যান্য স্ত্রীলোকদিগের প্রতি বিরক্ত নাও হইতে পারেন। তদনুরূপ যখন কোন বিষয় 'বর্তমান' ও 'ভবিষ্যৎ' অবস্থায় থাকে, তখন তাহার ঐ ধর্ম থাকিলেও উহার অপর দুইটি ধর্ম সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয় না।

৩। ভদন্ত বসুমিত্রের মতে বস্তুর পরিবর্তন বলিলে বস্তুর বিভিন্ন রূপ বা অবস্থার পরিবর্তন বুঝায়। তিনি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, দ্রব্যের বিভিন্ন রূপ অনুসারে উহা বিভিন্নভাবে কথিত হইয়া থাকে, কিন্তু এই সকল বিভিন্নতা দ্রব্যের অবস্থার সহিত সম্পর্কিত, দ্রব্যের সহিত নহে। কারণ ত্রিকালেই দ্রব্য এক থাকে। উদাহরণস্বরূপ, যখন কোন মৃদ্-গুড়িকা এককের স্থানে রাখা হয়, তখন উহাকে 'এক' বলা হয়, যখন শতকের স্থানে রাখা হয় তখন 'শত' এবং যখন সহস্রের ঘরে রাখা হয় তখন 'সহস্র' বলা হয়। তদ্রূপ যখন কোন দ্রব্য সক্রিয় বা (কারিত্র)[৯] অবস্থায় থাকে, তখন উহা বর্তমান বলিয়া কথিত হয়। যখন ইহার সক্রিয়তা নষ্ট হইয়া যায় তখন ইহা অতীত, এবং যখন ইহা আদৌ সক্রিয় হয় নাই, তখন ইহা ভবিষ্যৎ বলিয়া কথিত হয়। এইভাবে বস্তুর বিভিন্ন অবস্থা অনুসারে উহা বিভিন্ন নামে কথিত হইয়া থাকে।

৪। বুদ্ধদেবের মতে বস্তুর পরিবর্তন আপেক্ষিকতা বা সম্পর্কের তারতম্যহেতু ঘটিয়া থাকে, (অন্যথান্যথিক)। তাঁহার যুক্তি এইরূপ : কোন বস্তুর পূর্বে কি ঘটিয়াছে এবং উহার পরে কি ঘটিবে, ইহা হইতে ঐ বস্তু 'এইরূপ' কিংবা 'ঐরূপ' বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ, একই স্ত্রীলোককে 'মাতা' ও 'কন্যা' আখ্যা দেওয়া যায়। উক্ত ব্যবহার অতীত ও ভবিষ্যতের উপর নির্ভর করে। যাহার পূর্বে কিছু আছে ও পরেও কিছু আছে উহা বর্তমান ; কিন্তু যাহার পূর্বে কিছুই নাই, কিন্তু পরে কিছু আছে— উহা অতীত।[১০]

বৈভাষিকদিগের পূর্বোক্ত মতগুলি কোন এক ভিন্ন সম্প্রদায়ের বৌদ্ধরা খণ্ডন করিয়াছেন।[১১]

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, বৈভাষিকেরা বস্তুবাদী এবং জগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে তাহারা পরমাণুবাদী। কিন্তু যোগাচার ও মাধ্যমিক সম্প্রদায় এই পরমাণুবাদ খণ্ডন করিয়াছেন।[১২]

৩। সৌত্রান্তিক সম্প্রদায়

যশোমিত্র তাঁহার 'অভিধর্মকোষ'-ব্যাখ্যা গ্রন্থে (বি. বু ১২ পৃষ্ঠা) বলিয়াছেন, "যাহারা সূত্রকে (শাস্ত্রকে নহে)[১৩] প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহারাই সৌত্রান্তিক।" এই সম্প্রদায় সর্বাস্তিবাদীদের অভিধর্মের প্রামাণ্যকে অস্বীকার করেন। কারণ তাঁহাদের মতে অভিধর্ম সকল বুদ্ধের নিজস্ব উক্তি হইতে অত্যন্ত ভিন্ন। সূত্রান্ত শব্দটির যথার্থ অর্থ হইতেছে যাহা সূত্রে স্পষ্টভাবে নিশ্চিত হইয়াছে।

সৌত্রান্তিক সম্প্রদায় তক্ষশিলার কুমারলাত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। বিভিন্ন ধরণের দার্শনিক তথ্য-সংবলিত এই সম্প্রদায়ের মূল গ্রন্থ সকল অতিশয় দুষ্প্রাপ্য। সৌত্রান্তিক মতবাদের অনেক বিষয় বসুবন্ধুর অভিধর্মকোষ ও ইহার ব্যাখ্যা হইতে জানা যায়। বসুবন্ধু যদিও ইহার সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন এবং গ্রন্থের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উক্ত মতবাদ অনুসরণ করিয়াছিলেন, তথাপি সৌত্রান্তিক সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট সহানুভূতি ছিল এবং পরিশেষে তিনি যোগাচার মত গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বৈভাষিক সম্প্রদায়ের ন্যায় সৌত্রান্তিক সম্প্রদায়ও বস্তুবাদী। উভয়ের মধ্যে মূল পার্থক্য এই যে, বৈভাষিকদিগের মতে বহির্জগৎ প্রত্যক্ষ করা যায়, কিন্তু সৌত্রান্তিকেরা বলেন ইহা অনুমেয়। বিজ্ঞানবাদীরা বলেন যে, কেবলমাত্র চেতনা বা বিজ্ঞানই সৎ। এই মতের বিরুদ্ধে সৌত্রান্তিকেরা বলেন যে, বিষয় ব্যতীত শুধু জ্ঞান সম্ভবপর নহে। সুতরাং বহির্জগতের অস্তিত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। বিজ্ঞানবাদীরা[১৪] দেখাইয়াছিল যে, পরমাণু সমর্থন করা যায় না এবং সেই হেতু পরমাণু-সৃষ্ট জগতেরও কোন অস্তিত্ব থাকে না, কিন্তু সৌত্রান্তিকদিগের মতে যে ভাবেই হোক প্রত্যেককে বহির্বস্তুর অনুমেয় সত্তা স্বীকার করিতে হইবে, তাহা না হইলে আমাদের চতুর্দিকের বস্তুর জ্ঞান হইতে পারে না, অথচ এইরূপ বস্তু আমরা অস্বীকার করিতে পারি না।

ব্যক্তি বা বস্তুর নিরবচ্ছিন্ন ধারা (সন্ততি) আছে—ইহা সৌত্রান্তিকদিগের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য মত। ইহা ভালভাবে 'মিলিন্দ পঞহ' (৪০ পৃষ্ঠা)[১৫] গ্রন্থে বর্ণিত আছে। উক্ত গ্রন্থ হইতে নিম্নলিখিত অংশটি গৃহীত হইল :

রাজা কহিলেন, 'হে নাগসেন, যে জন্মগ্রহণ করে, সে কি একই থাকে না অন্য কেহ হইয়া যায়?'

'একও নহে আবার অপর কেহও নহে—' নাগসেন উত্তর দিলেন।

'একটি উদাহরণ দাও।'

'হে রাজন্, আপনি কি মনে করেন? এক সময়ে আপনি শিশু ছিলেন, আপনার শরীর কোমল এবং আকারে ক্ষুদ্র ছিল, পিঠের উপর চিৎ হইয়া আপনি শুইয়া থাকিতেন। যে আপনি এখন বড় হইয়াছেন, সেই আপনি কি ঐ একই শিশু?'

'না, সেই শিশু এবং বর্তমান আমি এক নহি।'

'আপনি যদি সেই শিশু না হ'ন, তাহা হইলে ইহা বলা যায় যে, আপনার মাতা-পিতা বা আচার্য বলিয়া কেহ ছিল না। আপনাকে বিদ্যা, আচার-ব্যবহার বা জ্ঞান কোন কিছুই শিক্ষা দেওয়া সম্ভবপর নয়। হে মহারাজ, ভ্রূণের প্রথম অবস্থার মাতা কি দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ অবস্থার মাতা হইতে ভিন্ন? শিশুর মাতা কি বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তির মাতা হইতে ভিন্ন? যে কিশোর শিক্ষালাভ করে, শিক্ষা সমাপনের পরে সে কি ভিন্ন হইয়া যায়? যে অপরাধ করে এবং যাহার হস্তপদ কাটিয়া শাস্তি দেওয়া হয়, তাহারা কি পরস্পর হইতে ভিন্ন?—নিশ্চয় নহে, এই বিষয়ে আপনি কি বলেন?'

শ্রদ্ধেয় নাগসেন কহিলেন, 'আমি বলিব আমি সেই একই ব্যক্তি, পার্থক্য এই যে আমি এখন বড় হইয়াছি বটে, তবু আমি সেই কোমল ক্ষুদ্র শিশুই যে পিঠের উপর শয়ন করিত। এই সব অবস্থা একই দেহের অবস্থা হওয়ায় একই ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত।'

সৌত্রান্তিকদিগের দুই সম্প্রদায়। (অভিধর্মকোষ, ৪, ১৩৬ পৃষ্ঠা), একটি সৌত্রান্তিক' এই নামেই পরিচিত, অপরটিকে বিভাষা গ্রন্থে 'দার্ষ্টান্তিক' নাম দেওয়া হইয়াছে। বিভাষায় সৌত্রান্তিকদিগের উল্লেখ একেবারে নাই বলিলেই হয়। সুতরাং কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, ভাষ্যকার কেবল দার্ষ্টান্তিকদিগের কথাই জানিবেন। কিন্তু এই সম্প্রদায়ের ইতিহাস এখনও খুব সুস্পষ্ট নহে। সুতরাং কুমারলাতের গ্রন্থ 'দৃষ্টান্ত পঙক্তি' এবং উক্ত 'দার্ষ্টান্তিক' নামের মধ্যে কিছু সম্বন্ধ আছে এইরূপ নির্ণয় করা স্বাভাবিক।[১৬] কেহ কেহ এইরূপ জানিতে চাহিতে পারেন যে, সৌত্রান্তিকেরা বহু দৃষ্টান্ত (উপমা) ব্যবহার করায় ঐ নামে অভিহিত হইয়াছে কিনা—তিব্বতীয় গ্রন্থে এইরূপ বলা হইয়াছে যে, সৌত্রান্তিক ও দার্ষ্টান্তিকদিগের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। সে যাহাই হোক দৃষ্টান্ত শব্দটির অর্থ এখনও নিশ্চিতভাবে নির্ণীত হয় নাই। কেহ কেহ এইরূপ মনে করিতে পারেন যে, দৃষ্টান্ত শব্দটি এই ক্ষেত্রে শাস্ত্রের সহিত বিরোধ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু এখানে কোন্ দৃষ্টান্তের কথা বলা হইয়াছে? এইগুলি নিশ্চয়ই পরম্পরাগত দৃষ্টান্ত হইতে ভিন্ন নহে। এইরূপও মনে করা যাইতে পারে যে, পূর্বোক্ত মিলিন্দ-পঙহতে যেরূপ দৃষ্টান্ত ব্যবহৃত হইয়াছে, বর্তমান দৃষ্টান্তগুলি তদনুরূপই।

জীব ও বস্তুর যে নিরবচ্ছিন্ন ধারা বা সন্ততির ধারণা সম্বন্ধে এইমাত্র বলা হইল, তাহা বৌদ্ধ দর্শনের নূতন কথা নহে, কিন্তু ইহা সাংখ্য দর্শনে পরিণামবাদ নামে সুবিদিত। তবে উভয় মতবাদের মধ্যে পার্থক্য শুধু এই যে, বৌদ্ধ মতবাদে এই সন্ততি সার্বত্রিক, কিন্তু সাংখ্য দর্শনে ইহা কেবলমাত্র বিষয়ের ক্ষেত্রে সত্য—বিষয়ী বা আত্মার ক্ষেত্রে নহে। এই মত জৈন দর্শনেও স্বীকৃত হইয়াছে।

এই সন্ততির ধারণা সর্বব্যাপক পরিবর্তনশীলতা বা ক্ষণভঙ্গবাদের সহিত জড়িত। কারণ কোন বস্তু স্থিরাকার হইলে উহা কিছুতেই ধারা বা প্রবাহ হইতে পারে না। বস্তুর স্বভাব হয় স্থির, না হয় ধারাবাহিক হইতে বাধ্য ; উহা কখনও একই সঙ্গে স্থির এবং ধারাবাহিক উভয়ই হইতে পারে না। নিম্নোক্ত যুক্তি অনুসারে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, যাহারই অস্তিত্ব আছে তাহাই ক্ষণিক আমরা বলি যাহা সংস্কৃত তাহাই ক্ষণিক।"

আমাদের মত এই যে সর্ব বিমিশ্র পদার্থই ক্ষণিক। কিন্তু ইহা কি করিয়া হইতে পারে ? কারণ এইরূপ না হইলে কোন কিছুই ক্রিয়া করিতে পারে না। কারণ তাহাকেই ক্রিয়া বলে যাহার নিরবচ্ছিন্ন ধারা রহিয়াছে এবং এই কথা সত্য হইতে পারে না, যদি প্রত্যেক মুহূর্তেই পরপর উৎপত্তি ও বিনাশ (উৎপাদ ও নিরোধ) না ঘটে। কিন্তু যদি কেহ এইরূপ বলেন যে কোন বস্তু কিছুকাল বর্তমান থাকিয়া পূর্বমূহূর্তের বিনাশ এবং পরমুহূর্তের উৎপত্তিতেও অবিচ্ছিন্ন ধারায় ক্রিয়া করে, তাহা হইলে তাহার কথা গ্রহণযোগ্য নহে ; কারণ ঐভাবে কিছুকাল অপরিবর্তিত থাকার পর উহাতে কোন ক্রিয়া থাকিতে পারে না, কারণ সেখানে ধারাবাহিকতা পাওয়া যাইবে না।

কেহ কেহ এইরূপ মনে করিতে পারেন যে, উৎপন্ন হইবার পরে বস্তু কিছুক্ষণ স্থায়ী হইতে পারে। কিন্তু কি ভাবে সম্ভবপর ? উহা কি অন্য কোন বস্তুর সাহায্য ব্যতীত অথবা সাহায্য লইয়া স্থায়ী থাকে ? প্রথম বিকল্প সমর্থনযোগ্য নহে। কেন ? কারণ পরে ইহা অন্যনিরপেক্ষভাবে থাকে না। কেন ? কারণ এই ভাবে থাকার জন্য কোন হেতু থাকা অত্যাবশ্যক। কিন্তু সেখানে এইরূপ হেতু পাওয়া যাইবে না। বলা যাইতে পারে যে, বিনাশের কারণের অভাববশতঃ উহা থাকিয়া যায় এবং বিনাশের কারণ উৎপন্ন হইলে উহা বিনষ্ট হয়—যথা, কাঁচা মাটির পাত্রের কালো রঙ অগ্নিসংযোগে তিরোহিত হয়। কিন্তু ইহা ঠিক কথা নহে, কারণ ঐ বস্তুর থাকার কোন কারণ সেখানে দেখিতে পাওয়া যায় না এবং পরেও ঐরূপ কোন কারণ থাকে না। কিন্তু এইরূপ কি বলা হয় না যে, মাটির পাত্রের

কালো রঙ অগ্নি-সংযোগে নষ্ট হয়?—ইহা সর্বজনবিদিত। কিন্তু ইহা ভিন্ন ভাবেও ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। এখানে অগ্নি কালো রঙ-এরই বিসদৃশ সন্ততি সৃষ্টি করে মাত্র। এখানে যে সর্বক্রিয়ার সম্পূর্ণ বিরতি ঘটে তাহা নহে।

কেহ কেহ এইরূপ তর্ক করিতে পারেন যে, যদি প্রতি মুহূর্তেই একটি নূতন বস্তু উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে 'ইহাই সেই' এই জাতীয় প্রত্যভিজ্ঞা হইতে পারে না। কিন্তু এইরূপ যুক্তি ঠিক নয়। দীপশিখার ন্যায় পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মুহূর্ত-দ্বয়ের সাদৃশ্য দ্বারা প্রত্যভিজ্ঞা সম্ভবপর হয়।[১৮] এইভাবে বস্তুর স্থায়িত্ববশতঃ নহে, কিন্তু সাদৃশ্যবশতঃ প্রত্যভিজ্ঞা সম্ভবপর। কিন্তু ইহা যে সত্য তাহা কিভাবে জানা যায়? বিনাশের (নিরোধের) স্বরূপ বিচার দ্বারা। যদি কোন বস্তু একই অবস্থায় বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে নিরোধ সম্ভবপর নয়, কারণ উহা তো ঐ বস্তুই থাকিয়া যায়।

ইহা ছাড়াও শেষে বস্তুর কিছু পরিণামও লক্ষিত হয়। পরিণাম ও পরিবর্তন একই কথা এবং বস্তুর সেই পরিবর্তন, (তাহা আভ্যন্তরিকই হোক বা বাহ্যিকই হোক) যদি আদিতেই আরম্ভ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে শেষেও ইহা লক্ষিত হইতে পারে না। সুতরাং পরিণাম প্রথমেই আরম্ভ হয়। ইহা ক্রমে ক্রমে বিস্তারলাভ করে এবং পরিশেষে প্রকট হয়—ইহা দুগ্ধের দধিতে পরিণতির মত। যতক্ষণ এই পরিণাম অতি সূক্ষ্ম অবস্থায় থাকে, ততক্ষণ ইহাকে জানা যায় না, তথাপি প্রতি মুহূর্তেই পরিবর্তন চলিতে থাকে, অর্থাৎ বস্তুর ক্ষণিকত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

আবার কোন বস্তু যদি প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তিত না হয়, তাহা হইলে ইহার কোন বিশিষ্ট ওজন বা পরিমাপ হইতে পারে না। ক্ষুদ্র বালক হঠাৎ যুবক হইতে পারে না। অবিচ্ছিন্ন পরিবর্তন ছাড়া বস্তুর বৃদ্ধি হয় এরূপ স্বীকার করা অর্থহীন। কারণ, পরিবর্তন না হইলে বস্তু একই অবস্থায় থাকে এবং উহার বৃদ্ধি সম্ভবপর নহে।

নদী, দীঘি বা পুষ্করিণীর দৃষ্টান্ত লওয়া যাউক। এই সকল স্থানে কখনও কখনও জল শুখাইয়া যায় বা কিয়ৎ পরিমাণে বাড়িয়া যায়। যদি প্রতি মুহূর্তেই পরিবর্তন না হইত, তাহা হইলে ইহা অসম্ভব হইত। কারণ, তাহা না হইলে পরে ইহার কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যাইবে না। বাতাস স্বভাবতঃ প্রবাহিত হয়, ইহা কখনও উগ্র হয় বা অত্যন্ত ধীর গতিতে বহিতে থাকে। বাতাস যদি অনবরত পরিবর্তিত না হইয়া একই অবস্থায় থাকিত, তাহা হইলে ইহা সম্ভবপর হইত না।

৪। যোগাচার সম্প্রদায়

সৌত্রান্তিক সম্প্রদায়ের বিষয় আমরা আলোচনা করিয়াছি। এইরূপ মনে করিবার হেতু আছে যে, পরবর্তী সৌত্রান্তিকদিগের একটি অংশ বিজ্ঞানবাদীদের সঙ্গে মিলিত হইয়াছিল। সৌত্রান্তিকদিগের মতে যদিও বাহ্য জগতের বাস্তব সত্তা আছে, তথাপি ইহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, কেবলমাত্র অনুমানগম্য। কিন্তু বিজ্ঞানবাদীরা ইহার অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকার করেন।

ইহা সুস্পষ্ট যে বিজ্ঞানবাদ মূলতঃ এমন কতকগুলি উপনিষদ-বাক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, যাহাতে 'জ্ঞান' ও 'বিজ্ঞান' শব্দের উল্লেখ আছে। বৈদান্তিক ব্যাখ্যানুসারে এই শব্দগুলি 'আত্মা' বা 'ব্রহ্মের' বাচক। এই সম্পর্কে 'আত্মা', 'ব্রহ্ম', 'জ্ঞান' ও 'বিজ্ঞান' সমার্থবোধক। উপনিষদে এমন বহু বাক্য আছে,[১৯] যাহা খুব সহজেই জ্ঞানবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।[২০]

যেহেতু ইহারা জ্ঞানকেই পরমতত্ত্ব বলিয়া মানেন, সে কারণ তাঁহারা স্বভাবতঃই বিজ্ঞানবাদী বলিয়া পরিচিত। তাঁহারা যোগাচার নামেও অভিহিত হইয়া থাকেন। যোগাচার (আক্ষরিকভাবে যোগ অভ্যাসকারী) শব্দের মূল অর্থ 'তপস্বী'। কিন্তু ক্রমে ইহা বিজ্ঞানবাদী বা উহাদের সম্প্রদায় অর্থে প্রযুক্ত হইল। ব্রহ্মসূত্রের (১১. ২. ২৮) উপর ভাস্করাচার্যের ভাষ্য অনুসারে যোগ বলিতে সেই পদ্ধতি বুঝায় যাহা শমথ (সমাধি) অর্থাৎ অস্থত ধ্যান ও বিপশ্যনা (প্রজ্ঞা বা পরাজ্ঞান) দ্বারা সাধককে গন্তব্যস্থলে লইয়া যায়—এই দুইটি উপায় যেন গাড়ীতে জোড়া এমন দুইটি বলীবর্দ যাহারা গন্তব্যস্থলে লইয়া যায়। সুতরাং যে সাধনমার্গে যোগের সাহায্যে অগ্রসর হয় সেই যোগাচার। যোগাচারদের আবির্ভাবের পূর্বে বৌদ্ধধর্মে বিজ্ঞানবাদীয় চিন্তা মহাযানসূত্রে পাওয়া যায়। কিন্তু অসঙ্গের গুরু মৈত্রেয়নাথই ইহাকে সর্বপ্রথমে সুসংবদ্ধ রূপ দিয়াছিলেন। নিজস্ব 'সূত্র'সহ সুসংবদ্ধ বিজ্ঞানবাদ খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর অন্তে অথবা চতুর্থ শতাব্দীর আরম্ভে উদ্ভূত হইয়াছিল এরূপ মনে করিলে বিশেষ ভুল হইবে না। তাহার পর এই সম্প্রদায়ের যে সকল আচার্যের অভ্যুদয় হইয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে দিঙনাগ একজন প্রধান। স্বয়ং বুদ্ধের উক্তি বলিয়া কথিত যে বাণীর উপর বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদ প্রতিষ্ঠিত, তাহা এইরূপ : "হে বিজয়ীর (অর্থাৎ বুদ্ধের) সন্তানগণ, এই তিনটি স্তরই[২১] 'কেবলমাত্র বিজ্ঞান'[২২]। এই সম্প্রদায়ের আচার্যগণ বলেন যে, এই সমগ্র বাহ্যজগৎ আভাস ব্যতীত আর কিছুই নহে, কারণ বস্তুতঃ ইহার কোন অস্তিত্ব নাই। যেমন তিমির নামক চক্ষুরোগগ্রস্ত

ব্যক্তির নিকট কেশগুচ্ছ বা দ্বি-চন্দ্র প্রভৃতি এমন সব বস্তু প্রতিভাত হয়, যাহার অস্তিত্ব কল্পনাও করা যায় না, ইহাও তদ্রূপ। বিষয়ের জ্ঞাতা বিষয়ী ব্যতীত বিষয়ের কোন অস্তিত্ব থাকিতে পারে না।"

এই ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত আপত্তি সকল উঠিতে পারে : যদি কোন বিশেষ বিষয়ের বিজ্ঞান সেই বিষয়-নিরপেক্ষ হয় এবং ঐ বিষয় হইতে উৎপন্ন না হয়, তাহা হইলে সর্বস্থানে না হইয়া কোন বিশেষ স্থানে উক্ত বিজ্ঞানের উদয় হয় কেন? পুনরায় জ্ঞান সর্বকালেই না হইয়া কোন বিশেষ কালেই কেন হয়? অপরপক্ষে, যদিও 'তিমির' নামক আংশিক অন্ধতাগ্রস্ত ব্যক্তি একই বস্তু বা ব্যক্তিকে একাধিক স্থলে বা কালে দেখিতে পায় না, তথাপি বস্তুতঃ একই বস্তু বা ব্যক্তি শুধু বিশেষ স্থল এবং কাল নহে, কিন্তু একাধিক স্থল ও কালে দৃষ্ট হয়, আবার শুধু কোন বিশেষ ব্যক্তির দ্বারা নহে, কিন্তু একাধিক ব্যক্তির দ্বারা দৃষ্ট হয়—ইহা কেন এবং কি করিয়া সম্ভবপর?

আবার কোন ব্যক্তির চোখে দোষ থাকিলে সে কেশগুচ্ছ দ্বি-চন্দ্র প্রভৃতি যে সকল পদার্থ দেখে, উহারা ঐ ব্যক্তির কোন কাজে লাগে না কিন্তু তদ্ভিন্ন অন্যান্য বস্তু তাহার কাজে লাগে - ইহা কি করিয়া সম্ভবপর?

অন্য একটি উদাহরণ গ্রহণ করা যাউক। স্বপ্নাবস্থায় কেহ খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু বস্তুতঃ ইহাতে তাহার উদর পূর্ণ হয় না, কিন্তু অন্যান্য আহার ও পানীয় সম্পর্কে এই কথা প্রযোজ্য নহে। এই বিভেদ হয় কেন? সুতরাং আলম্বনের অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে না।

বিজ্ঞানবাদীরা স্বপ্নের অভিজ্ঞতার সাহায্যে এই সকল আপত্তির উত্তর দিয়া থাকেন। ইহা সুবিদিত যে স্বপ্নাবস্থায় কোন বস্তু না থাকিলেও ইহা কোন বিশেষ দেশ ও বিশেষ কালেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। এমন কি স্বপ্নদ্বারা ক্রিয়াও উৎপন্ন হইতে পারে, যেমন স্বপ্নে স্ত্রীপুরুষের মৈথুন না ঘটিলেও, ফলস্বরূপ রেতঃস্খলন হয়।

অপর এক দৃষ্টিকোণ হইতে বিজ্ঞানবাদীরা আলম্বনের (বিষয়ের) অস্তিত্ব নিরাকরণ করেন। তাঁহারা বলেন, কোন বস্তুই (যথা, একখণ্ড বস্ত্র) বাস্তব বলিয়া স্বীকার করা যায় না, কারণ ইহাকে বৈশেষিকদিগের ন্যায় অবয়বীরূপে এক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না, যেহেতু অবয়ব হইতে ভিন্ন অবয়বী বলিয়া কোন বস্তু নাই। আবার ইহাকে অণুরূপে বহু বলিয়াও গ্রহণ করা যায় না, কারণ কোন পরমাণুই প্রত্যক্ষ হয় না। আবার পরমাণুগুলি মিলিয়া একটি বস্তুর উৎপত্তি হয় তাহাও নহে। কারণ কোন একটি পরমাণুর ছয়টি দিকের (যেমন পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর,

দক্ষিণ, উর্ধ্ব, অধঃ) উপর একই সঙ্গে যদি ছয়টি পরমাণু যুক্ত করা যায়, তাহা হইলে অবশ্যই ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, পরমাণুর ছয়টি অংশ আছে কিন্তু উক্ত ক্ষেত্রে তাহাকে আর অণু বলা যায় না ; কারণ তাহাই পরমাণু যাহার কোন অংশ নাই।

মৈত্রেয়নাথের 'মধ্যান্ত বিভঙ্গ কারিকায়' (১-২) এই মতবাদ সম্বন্ধে এইরূপ বলা হইয়াছে : এখানে অবস্তুর কল্পনা (অভূত পরিকল্প) আছে ; এখানে দুই-এর (জ্ঞান ও বিষয়ের) অস্তিত্ব নাই ; কিন্তু শুধু শূন্যতাই আছে ; এবং এই অবস্তু কল্পনাও শূন্যতার মধ্যে আছে।

এই ক্ষেত্রে চারিটি উক্তি আছে। (১) প্রথমটি এই : মিথ্যা কল্পনা আছে, এই উক্তির অর্থ এই যে, কেহ কেহ যে মনে করেন শশশৃঙ্গের ন্যায় কিছুই নাই (সর্বধর্মশূন্যতা) তাহা গ্রহণযোগ্য নহে, কারণ ইহা স্বীকার করিলে নির্বাণের জন্য আর কিছুই করিবার থাকে না। সুতরাং বলা হইয়াছে যে, মিথ্যা কল্পনা আছে। নির্বাণের সাধক নির্বাণের জন্য প্রযত্ন করে। (২) দ্বিতীয় উক্তিটি এই : দ্বৈত অর্থাৎ বিষয় ও বিষয়ী নাই, কারণ এইগুলি আভাস মাত্র, উহারা মনের কল্পনা, মনের বৃত্তি বা অবস্থার অনন্তপ্রবাহ, যাহার আদি নাই এবং নির্বাণে যাহার পরিসমাপ্তি। এইগুলি কার্যকারণ সম্পর্কে একটি অপরটির সহিত সংশ্লিষ্ট, এবং ইহাই সংসার। (৩) তৃতীয় উক্তি : শূন্যতার অস্তিত্ব আছে। এই ক্ষেত্রে শূন্যতা বলিতে বিষয় ও বিষয়ীর ধর্মরাহিত্য বুঝায়[২৪]। (৪) চতুর্থ উক্তি : এইরূপ এই শূন্যতার মধ্যেও অভূত পরিকল্প আছে, কারণ শূন্যতার ধ্যান করিতে হইলে আলম্বন রূপে ভ্রান্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হয়, কারণ ইহা ভিন্ন ধ্যান হয় না।

আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করিয়াছি যে, এই সম্প্রদায়ের মতে জগৎ কেবলমাত্র জ্ঞান (চিত্ত), সুতরাং এই সম্প্রদায়ের লোকেরা স্বীকার না করিয়া পারেন না যে চিত্তই জ্ঞেয় বিষয় (বেদ্য) জ্ঞাতা (বেদক) এবং জ্ঞানক্রিয়া (বেদনা)—এই তিনেরই কাজ করে। কিন্তু যাহার কোন অংশ নাই তাহা ঐরূপ ত্রিবিধ ধর্মবিশিষ্ট হইতে পারে না।

একটি প্রদীপ কেবলমাত্র চতুর্দিকের বস্তুনিচয়কেই আলোকিত করে না, অধিকন্তু নিজেকেও প্রকাশ করে, ইহা লক্ষ্য করিয়া বিজ্ঞানবাদের আচার্যেরা যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, বিজ্ঞানও তদ্রূপ স্বয়ং প্রকাশিত হয়। কিন্তু মাধ্যমিকেরা শাস্ত্রবাক্য উল্লেখ করিয়া ইহা খণ্ডন করিয়াছেন।[২৫] শাস্ত্রবাক্যটি এইরূপ : "জ্ঞানকে (চিত্ত) দেখিতে না পাইয়া তিনি (বোধিসত্ত্ব) চেতনার গতি বা প্রবাহ অনুসন্ধান করিলেন

এবং প্রশ্ন করিলেন, কোথায় ইহার উৎস ? তখন তাঁহার নিকট এইরূপ প্রতিভাত হইল যে, কেবলমাত্র আলম্বন থাকিলেই জ্ঞানের উদয় হয়। যদি তাহাই হয় তবে কি আলম্বন এক বস্তু এবং জ্ঞান অপর কিছু ? অথবা তাহারা কি অভিন্ন ? যদি প্রথম বিকল্প ঠিক হয়, তাহা হইলে জ্ঞান কি করিয়া জ্ঞানের সাহায্যে নিজেকে জানিতে পারে ? ইহা এই ভাবে নিজেকে জানে না অথবা জানিতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, তরবারীর ধার দ্বারা ঐ ধারকে কাটা যায় না। আবার কেহই অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা উক্ত অঙ্গুলীর অগ্রভাগকে স্পর্শ করিতে পারে না।" তদ্রূপ একই জ্ঞান নিজের দ্বারা জ্ঞাত হইতে পারে না।

ইহা ছাড়াও প্রদীপ, প্রদীপ হইতে ভিন্ন বস্তুকেই প্রকাশিত করে, নিজেকে নহে ; কারণ এই ক্ষেত্রে প্রদীপকে আবৃত করিবার মত অন্ধকার নাই।

জ্ঞানের স্বসংবেদ্যত্ব সিদ্ধ করিবার জন্য বিজ্ঞানবাদীরা যুক্তি দেখান যে, যদি জ্ঞানের স্বসংবেদ্যত্ব স্বীকৃত না হয় তাহা হইলে কোন জ্ঞানেরই স্মরণ হইতে পারে না। কিন্তু ইহা সুবিদিত যে, আমরা আমাদের জ্ঞানকে স্মরণ করিতে পারি এবং যাহা অনুভব হয় না তাহার স্মরণ হইতে পারে না।

আচার্যেরা বলেন যে, সাধারণ লোক এবং শাস্ত্রের মধ্যে আত্মা এবং জগৎ বা বস্তুর উপাদানের ভিন্ন ভিন্ন নাম দেখিতে পাওয়া যায় আত্মা এবং জগৎ বা বস্তুর উপাদানের ভিন্ন ভিন্ন নাম দেখিতে পাওয়া যায়—উদাহরণস্বরূপ, আত্মা, জীব প্রভৃতি এবং সমূহ (স্কন্ধ), উপাদান (ধাতু) ইত্যাদি।[২৬] আত্মা ও বস্তুর উপাদান সম্পর্কে যথাক্রমে এই দুইপ্রকার নামের প্রয়োগ মুখ্যার্থে গ্রহণ করিলে ঠিক হইবে না। কারণ, এইগুলি যথাক্রমে প্রকৃত আত্মা ও যথার্থ বস্তুর উপাদান সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয় না। কেন ? কারণ এইগুলি কেবলমাত্র জ্ঞানেরই পরিণাম, কারণ জ্ঞানের বাহিরে ইহাদের কোন অস্তিত্ব নাই। এই ক্ষেত্রে বস্তুতঃ যে আলয়বিজ্ঞান[২৭] নদীর স্রোতের ন্যায় অথবা প্রদীপের শিখার ন্যায় অবিচ্ছিন্ন ধারায় চলিতে থাকে এবং যাহাতে আত্মা, জড়বিষয় প্রভৃতির কল্পনাগুলির বীজ (বাসনা) নিহিত থাকে, সেই আলয়বিজ্ঞান হইতেই আত্মা এবং জড়বিষয় প্রভৃতি আকারগুলি আবির্ভূত হয়। এইগুলি প্রকৃতপক্ষে বাহ্যবস্তু না হইলেও বাহ্য বলিয়া গৃহীত হয়। বস্তুতঃ যদিও আত্মা অথবা বাহ্য জড়বস্তু বলিয়া কিছুই নাই, তথাপি অনাদিকাল হইতে এইরূপ চলিতে থাকে।

পুদ্গলনৈরাত্ম্য ও ধর্মনৈরাত্ম্য বলিয়া যে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ মত সাধারণতঃ যোগাচার ও মাধ্যমিকদের মধ্যে প্রচলিত, প্রকৃতপক্ষে উক্ত আত্মা ও বস্তুর নিরাকরণ

ঐ দুইটি মত হইতে ভিন্ন কিছু নহে[২৮]। নৈরাত্ম্য শব্দটিতে মূলতঃ আত্মশূন্যতা বুঝায়, এই ক্ষেত্রে আত্মা শব্দের অর্থ 'স্বভাব', অর্থাৎ সেই আন্তর স্বরূপ যাহার কোন পরিবর্তন হয় না, এবং যাহার সত্য কোন কিছুর উপর নির্ভর করে না। 'আমি' পদার্থকে আত্মা বলা হয় এইজন্য যে, যাহারা 'আমি'র পৃথক অস্তিত্বে বিশ্বাসী তাহাদের মতে এইমাত্র যেরূপ বর্ণিত হইল, 'আমি'র স্বভাব সেইরূপ এবং আমি কখনও এই স্বভাব হইতে বিচ্যুত হয় না, ফলে ইহা নিত্য বলিয়া মনে করা হয়। 'মানুষ', 'পুরুষ' প্রভৃতি অর্থাৎ 'আমি' দ্বারা আমরা যাহা বুঝি তাহাই পুদ্গল। সুতরাং পুদ্গলনৈরাত্ম্য বলিতে আমরা এইরূপ বুঝিব যে, যাহাকে পুদ্গল বা 'আমি' বলিয়া মনে করা হয়, তাহার কোন নিজস্ব স্বতন্ত্র স্বভাব নাই। ফলে, বস্তুতঃ ইহার কোন যথার্থ অস্তিত্ব নাই, সুতরাং ইহাকে সংবস্তু (বস্তু-সৎ) বলা যায় না, উহার অস্তিত্ব শুধু কাল্পনিক ও ব্যবহারিক। তদ্রূপ ধর্ম অর্থাৎ বস্তুর উপাদানেরও আত্মা অর্থাৎ স্বরূপ বলিয়া কিছুই নাই, কারণ ইহাদের অস্তিত্ব উহাদের কারণের উপর নির্ভর করে (প্রতীত্য-সমুৎপাদ)। ইহাই ধর্মনৈরাত্ম্য।

এই সম্প্রদায়ে বস্তুসকল পরিকল্পিত, পরতন্ত্র[২৯] ও পরিনিষ্পন্ন এই তিন রূপে দেখা হয়।[৩০] এই রূপগুলিকে লক্ষণ বা স্বভাব বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। ঐন্দ্রজালিকের উদাহরণ লইয়া কথাটি স্পষ্ট করা যাউক। ঐন্দ্রজালিক তাহার অলৌকিক শক্তির প্রভাবে আমাদের সম্মুখে একটি হস্তী প্রদর্শন করিতেছে এইরূপ মনে করা হউক। আমরা যে এইক্ষেত্রে একটি হস্তী দেখিতেছি তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এই হস্তীর স্বরূপ কাল্পনিক। আবার ইহাতে সুস্পষ্ট যে, হস্তীর রূপ বা আকারটি ইহার কারণাবলীর উপর নির্ভর করে, তাহা না হইলে ঐ জন্তুটি আমাদের সম্মুখে প্রতিভাতই হইত না। সুতরাং হস্তীর স্বরূপ পরতন্ত্র। পরিশেষে ইহাও সুস্পষ্ট যে হস্তী বলিয়া বস্তুতঃ কিছুই নাই, সুতরাং উহার স্বরূপ পরিনিষ্পন্নও বটে।[৩১] এই দুটি মতবাদ হইল পুদ্গলনৈরাত্ম্য ধর্মনৈরাত্ম্য—মূলতঃ আত্মশূন্যতা বুঝায়।

তিনদিক হইতে পদার্থ বা বস্তুকে দেখা হইয়া থাকে—যখন এই চিত্তের কোনই আলম্বন (অর্থাৎ বিষয়) থাকেনা এবং ইহার ফলে চিত্ত কিছুই প্রত্যক্ষ করে না—যেহেতু প্রত্যক্ষ করার মত সেখানে কিছুই নাই—তখন চিত্ত নিজেতেই নিজে অবস্থিত থাকে।[৩২] এই অবস্থায় কেবল শুদ্ধচৈতন্য থাকে। এই অবস্থাকে বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা অথবা বিজ্ঞানমাত্রতা অর্থাৎ কেবল শুদ্ধচৈতন্য বলা হয়। চিত্তের এই অবস্থা গভীর

ধ্যান (শমথ) এবং পরাজ্ঞান (বিপশ্যনা) উপদিষ্ট এই দুই সাধনার দ্বারা উপলব্ধি করা যায়।

বিজ্ঞান-মাত্রতায় অবস্থিত চিত্তের এই অবস্থার বিভিন্ন রূপ থাকায় উহা বিভিন্নভাবে বর্ণিত হইয়াছে।[৩৩] ঐ অবস্থায় চিত্তকে লোকোত্তর জ্ঞান ও আশ্রয় পরাবৃত্তি বলা হয়। আশ্রয়-পরাবৃত্তিই আলয়বিজ্ঞান, অর্থাৎ সচেতন বিষয়ী অথবা আত্মা। ইহার বিশদ ব্যাখ্যা আচরণ অর্থাৎ জ্ঞেয় বিষয় এবং রাগ, দ্বেষ ও মোহ প্রভৃতি ক্লেশসমূহ এই দুই দুষ্ট অবস্থা দূরীভূত হওয়ায়, আলয়বিজ্ঞান অদ্বয়জ্ঞানরূপ স্বীয় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসে। এখানে অদ্বয়জ্ঞানের অর্থ বিষয়-বিষয়ী এই দ্বৈতবিবর্জিত জ্ঞান। ইহাই অনাস্রব ধাতু (শুদ্ধ ধাতু) এবং বিমুক্তি (মুক্তি)।

শঙ্করাচার্যের গুরু গৌড়পাদের বৈদান্তিক ভাষায় বলিতে গেলে বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা হইতেছে ব্রহ্ম। ইহা গৌড়পাদের আগমশাস্ত্ররূপ প্রাচীন বেদান্তে সূচিত হইয়াছে।[৩৪] কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, প্রচলিত পরবর্তী বেদান্তে এই কথার কোন উল্লেখ নাই।

এখানে ইহা লক্ষণীয় যে, গৌড়পাদ বর্ণিত ব্রহ্ম একদিকে কৈবল্যাবস্থা নির্দেশ করে এবং অপরদিকে বিজ্ঞানবাদী কর্তৃক বর্ণিত চিত্তের নিজেতে নিজের স্থিতি নির্দেশ করে। কৈবল্য বলিতে অন্য বস্তুর সহিত সঙ্গ-বর্জিত অবস্থা অথবা আত্মার (দ্রষ্টা বা পুরুষ) নিজেতে নিজের অবস্থিতি বুঝায়। যোগসূত্রে (১,৩) এইরূপ বলা হইয়াছে। তাহারা দৃশ্যমান জগতে বিলোপ দেখিতে পায় না। যাহা দেখিলে আনন্দের উৎপত্তি হয়।

কোন কিছু সৎও নহে অসৎও নহে। কোন কিছুর উদ্ভবও হয় না, কোন কিছুর বিলুপ্তিও হয় না। কিছু নিত্যও নহে আবার কোন কিছু সান্তও নহে। কোন কিছু এক নহে বহুও নহে। কোন কিছুর গতি নাই।

৫। মাধ্যমিক সম্প্রদায়

যোগাচার সম্প্রদায়ের বিজ্ঞানবাদ যেরূপ মৈত্রেয়নাথ বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন তদ্রূপ মহাযান-সূত্রে বর্ণিত মাধ্যমিকদের শূন্যবাদ নাগার্জুন কর্তৃক বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। 'চতুঃশতিকা'র গ্রন্থকার আর্যদেব (খৃষ্টপর ২০০– ২২৫) তাঁহার যোগ্য শিষ্য, এবং নাগার্জুনের শ্রেষ্ঠগ্রন্থ 'মূল মাধ্যমিক-কারিকা'র সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতাদিগের মধ্যে চন্দ্রকীর্তি (খৃষ্টপর ৬০০—৬৫০) অন্যতম।

যাহারা বুদ্ধের 'মধ্যম মার্গ' অনুসরণ করিয়াছিলেন তাঁহারাই মাধ্যমিক। এই মধ্যপথ কি? ইহা সুবিদিত যে তাঁহার প্রথম উপদেশে[৩৫] তিনি অত্যধিক বিষয় ভোগ ও অত্যধিক আত্ম-নিগ্রহ এই দুই চরম মার্গ বর্জন করিয়া মধ্যম মার্গ প্রচার করিয়াছিলেন।[৩৬] কিন্তু যে মধ্যম মার্গ বর্তমানে আমাদের আলোচ্য বিষয়, তাহা উক্ত মধ্যম মার্গ হইতে পৃথক। নিম্নোক্ত আলোচনায় ইহা সুস্পষ্ট হইবে।

সংস্কৃত শব্দকোষে[৩৭] বুদ্ধের বিভিন্ন নামের মধ্যে একটি নাম অদ্বয়-বাদী, অর্থাৎ "যিনি অ-দ্বয়কে প্রচার করেন"। এই ক্ষেত্রে মাধ্যমিকদিগের মতানুসারে[৩৮] অ-দ্বয়ের 'দ্বয়' শব্দদ্বারা দুইটি নিশ্চয় (অন্ত) বা ধারণা বুঝায়। কিন্তু এই দুইটি ধারণা কি? এইগুলি হইতেছে সৎ ও অসৎ, আত্মা ও অনাত্মা, নিত্য ও অনিত্য প্রভৃতি। এই সকল ধারণাগুলি যে ক্ষতিকর তাহা সংস্কৃত ও পালি ভাষায় লিখিত বৌদ্ধ-সাহিত্যে স্পষ্টভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ, এইরূপ কথিত আছে যে বুদ্ধদেব বলিয়াছেন: "হে কাত্যায়ন, যেহেতু অধিকাংশ লোক অস্তিত্ব ও নাস্তিত্বের ধারণায় নিমগ্ন থাকে তাই তাহারা মুক্ত হয় না।"[৩৯] আর নাগার্জুন বলিয়াছেন,[৪০] "যে সকল অজ্ঞব্যক্তি অস্তি ও নাস্তি দেখে, তাহারা দৃশ্যের শান্তিময় উপশম উপলব্ধি করে না।"[৪১]

আবার এইরূপ দেখা যায়,[৪২] "হে কাশ্যপ! 'ইহা সৎ' এইটি একটি নির্দিষ্ট নিশ্চয়, 'ইহা অসৎ' ইহা আর একটি নির্দিষ্ট নিশ্চয়। কিন্তু এই দুইটি নির্দিষ্ট নিশ্চয়ের মধ্যবর্তী নির্দিষ্ট নিশ্চয় কি তাহা বর্ণনা করা যায় না, উদাহারণের সাহায্যে প্রকাশ করা যায় না, ইহার কোন ভিত্তি নাই, কোন বাহ্য আকার, চিহ্ন কিংবা নাম নাই। হে কাশ্যপ! যাহা দ্বারা বস্তুর উপাদানের প্রকৃত পরীক্ষা করা যায় তাহাকেই মধ্যম মার্গ বলে।"[৪৩] সুতরাং ইহা সুস্পষ্ট ভাবে বলা হইল যে, বুদ্ধ দুইটি সুনির্দিষ্ট নিশ্চয় বা অন্ত স্বীকার না করিয়া তাঁহার মধ্যম মার্গের মত শিক্ষা দিয়াছিলেন।[৪৪] অতএব, এই মতানুসারে কিছুই সৎও নহে, আবার কিছুই অসৎও নহে; কোন কিছুর উৎপত্তিও নাই, বিলুপ্তিও নাই; কোন কিছু অনন্তও নয়, আবার সান্তও নয়। কোনও কিছু অভিন্নও নয়, আবার ভেদযুক্তও নয়; কোন কিছু নিকটেও আসে না বা দূরেও যায় না। এইভাবে উক্ত সম্প্রদায়ের অনুগামিগণ মধ্যম পন্থা গ্রহণ করায় মাধ্যমিক নামে পরিচিত হইল।[৪৫]

পূর্বোক্ত আলোচনায় কেবলমাত্র ভাববাচক ও অভাববাচক এই দুইটি দিক গৃহীত হইয়াছে; কিন্তু কখনও কখনও তিনটি এমনকি চারিটি[৪৭] দিকও গৃহীত হইয়াছে।[৪৮]

পরস্পরবিরুদ্ধ দুইটি ধারণার (যাহাদের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং সুপ্রসিদ্ধ

বাচক শব্দ হইতেছে সৎ ও অসৎ) উভয়েরই পরিহার ঋগ্বেদেও দেখিতে পাওয়া যায় (১০।১২৯।১); তখন "সৎ ও অসৎ বলিয়া কিছুই ছিল না।" ক্রমেই এইরূপ উভয়-অন্তের পরিহার—উপনিষদ[৩১] এবং ভগবদ্গীতায় (১৩।১২) দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রতীত্য-সমুৎপাদের নিয়ম বুঝিতে পারিলে মাধ্যমিকদের এই মত বোধগম্য হইবে। প্রতীত্য-সমুৎপাদের অর্থ এই যে, সর্ববস্তুর উৎপত্তি উহাদের পূর্ববর্তী কারণের উপর নির্ভর করে। মাধ্যমিকদের মূলতত্ত্ব শূন্যবাদের সহিত এই মত জড়িত। এখন আমরা এই মতটির মূল কথাগুলি নিম্নলিখিত কয়েক ছত্রে ব্যাখ্যা করিব।

আমরা বলিয়া থাকি যে, প্রত্যেক বস্তুরই একটি নিজস্ব স্বভাব বা প্রকৃতি আছে, যেমন অগ্নির স্বভাব উত্তাপ। কিন্তু বস্তুতঃ এই স্বভাব কি ? স্বভাবের স্বরূপ কি ? ইহা হইতেছে অন-কৃত্রিম যাহা স্বসত্তার জন্য অন্য কিছুর উপর নির্ভর করে না। পূর্বে না থাকিয়া পরে উৎপন্ন হইয়াছে এমন কিছুও নহে। কিন্তু উত্তাপ তো উহার কারণ দ্বারা উৎপন্ন হয়, পূর্বে না থাকিয়া পরে অস্তিত্বলাভ করে এবং স্বসত্তার জন্য অন্য পদার্থের উপর নির্ভর করে—উহা কিছুতেই অগ্নির স্বভাব হইতে পারে না। অগ্নির যদি এমন কোন ধর্ম থাকে যাহা উহাকে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কোন কালেই পরিত্যাগ করে না, যাহা পূর্বে না থাকিয়া পরে উৎপন্ন হইয়াছে এমনও নহে এবং যাহা স্বসত্তার জন্য অন্য পদার্থের উপর নির্ভর করে না, শুধু ঐরূপ ধর্মকেই অগ্নির স্বভাব বলা যাইতে পারে। কিন্তু অগ্নির এইরূপ কোন ধর্ম আছে কি ?

আমরা বলি, "ইহা সৎও নহে অসৎও নহে।" তবুও অশিক্ষিত শ্রোতৃবর্গের ভীতি দূরীকরণের জন্য, ব্যবহারিক সত্যের দিক হইতে আমরা ইহার উপর অস্তিত্ব আরোপ (সমারোপ) করিয়া বলি, "ইহা সৎ"।

কিন্তু যদি বলা হয় যে, ইহা এখন আরোপিত রূপ ব্যবহারিক সত্তায় বিদ্যমান, তাহা হইলে বাস্তবিক পক্ষে পারমার্থিক সত্তায় ইহার রূপ কি ?

উত্তর এই, "ইহা হইতেছে ধর্মতা, অর্থাৎ 'ধর্মের ভাব—বস্তুর উপাদান'। কিন্তু 'ধর্মতা' কি ? স্বরূপ বা (স্বভাব)। এখন এই স্বভাব কি ? প্রকৃতি ? এই প্রকৃতি কি ? যাহা শূন্যতা বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। এই শূন্যতার অর্থ কি ? স্বভাব-মুক্ত অবস্থা (নৈঃস্বাভাব্য)। ইহা দ্বারা আমরা কি বুঝিব ? যেইরূপ সেইরূপ (তথতা) ? এই তথতা কি ? যেইরূপ সেইরূপ হওয়া, অর্থাৎ অ-বিকারিত্ব সর্বদা বিদ্যমানতা (সদৈব স্থায়িতা)।"

"অতএব উত্তাপ যে অগ্নির স্বভাব এই কথা আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু যেহেতু অগ্নির অনুৎপত্তি অন্য কিছুর উপর নির্ভর করে না এবং অ-কৃত্রিম, অতএব

উহাই তাহার স্বভাব বলিয়া ধরিতে হইবে।”[৩০] যেহেতু বস্তুর স্বভাব বলিয়া কিছু নাই, অতএব উহার কোন উৎপত্তি নাই, এবং উৎপত্তি নাই বলিয়া উহার কোন নিরোধও নাই।

অগ্নির ন্যায় সকল বস্তুই স্বভাব-মুক্ত, কারণ স্বভাবেরই কোন অস্তিত্ব নাই। এই মতবাদে বৌদ্ধশাস্ত্রে "সর্ব ধর্মাঃ শূন্যাঃ"—বস্তুর সর্ব উপাদানই শূন্য—এইরূপ যে সকল বাক্য আছে, তাহাতে শূন্যতা দ্বারা এই মতবাদে 'প্রকৃতপক্ষে স্বভাবহীনতা (নৈঃস্বাভাব্য) বুঝায়। পূর্ব অনুচ্ছেদেও পাঠকবর্গ ইহা লক্ষ্য করিবেন।

যে সকল বস্তু আমাদের সম্মুখে প্রতিভাত হয়, তাহা তাহাদের স্ব-স্বরূপে প্রতিভাত না হইয়া আরোপিত রূপে প্রতিভাত হয়। এই প্রসঙ্গে কোন গ্রন্থে[৩১] উদ্ধৃত একটি শ্লোক প্রাসঙ্গিক হইবে :

সর্ব আরোপ হইতে বিনির্মুক্ত তত্ত্ব স্বতঃই উদ্ভাসিত হয়। শূন্যতাদি শব্দ দ্বারা তত্ত্বে আরোপ নিরাকরণ করা হয়।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ নাগার্জুনের সময়েও শূন্যতা শব্দটি বিনাশ (অভাব) বা অনস্তিত্ব (নাস্তিতা) প্রভৃতি অর্থে অত্যন্ত ভ্রান্তভাবে গৃহীত হইয়াছিল। ইহার অবশ্যম্ভাবী কুফল দেখিয়া নাগার্জুনকে লিখিতে হইয়াছিল : (২৪।১১) সর্পকে ঠিক ভাবে ধারণ না করিলে অথবা বিদ্যাকে ভুল ভাবে গ্রহণ করিলে যেরূপ তাহার দ্বারা সর্বনাশ হয়, সেইরূপ শূন্যতাকেও ভুল ভাবে বুঝিলে নিজের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। এই ভ্রান্ত ধারণার জন্য স্বভাবতঃই যে সকল আপত্তি উঠিতে পারে, নাগার্জুন নিজের গ্রন্থে উহাদের যে উত্তর দিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে এই : (২৪) যদি সব কিছুই অভাবাত্মক হয়, উৎপত্তি ও বিলয় বলিয়া যদি কিছু না থাকে, তাহা হইলে চারিটি আর্য সত্যও থাকিতে পারে না এবং এই সকল সত্যের জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত অষ্ট মার্গও নিরর্থক হইয়া পড়ে,—সৎ ও অসৎ কর্মের কোন ফল থাকিতে পারে না, বুদ্ধের প্রচারিত ধর্মমত, বৌদ্ধ সংঘ, এমন কি স্বয়ং বুদ্ধও থাকিতে পারে না।

শাঙ্কর বেদান্তে যেরূপ করা হইয়াছে, নাগার্জুনও সেইভাবে প্রধানতঃ সংবৃতি সত্য অর্থাৎ ব্যবহারিক সত্তা এবং পরমার্থ সত্য অর্থাৎ পারমার্থিক সত্তা, এই দুইটি সত্যের সাহায্যে সর্ব-আপত্তির নিরসন করিয়াছেন। অবশ্য শাঙ্কর বেদান্তে প্রাতিভাসিক সত্যরূপ একটি অতিরিক্ত সত্য স্বীকৃত হইয়াছে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, যাহারা এই উভয়বিধ সত্যের পার্থক্য বুঝে না, তাহারা বুদ্ধের উপদেশের গভীর তত্ত্বও উপলব্ধি করিতে পারে না। পরমার্থ বা সর্বোচ্চ সত্য না জানিয়া নির্বাণ লাভ করা যায় না। ব্যবহারিক সত্তা না মানিলে পারমার্থিক সত্তার উপদেশ হইতে পারে না। শূন্যতার

প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারিলে এই সকল আপত্তির অবকাশ থাকে না। এই শূন্যতা প্রতীত্যসমুৎপাদই বটে, আর প্রতীত্যসমুৎপাদের অর্থ কারণ সামগ্রী হইতে বস্তুর উদ্ভব ব্যতীত কিছুই নহে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইহাই বস্তুর স্ব-স্বরূপে অনুৎপাদ এবং এখানেই সর্ব-ভাষার বিরাম (প্রপঞ্চোপসম)।

৬। উপসংহার

প্রশ্ন এই যে, কিসের প্রেরণায় বৌদ্ধ আচার্যগণ এইভাবে চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ? ইহার উত্তরে বিশেষ চিন্তা না করিয়াই রূপকের ভাষায় বলা যাইতে পারে যে, বুদ্ধের 'মার-বিজয়' এই প্রেরণার উৎস। 'মার-বিজয়' হইতেছে প্রলুব্ধকারীকে জয় করা, কিন্তু বস্তুতঃ ইহার অর্থ কামনার নিরোধ। এই কামনা যখন আয়ত্তে না থাকে, তখন এইগুলি ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং জীবের জীবনে সকল প্রকার দুঃখের মূল কারণ হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং ইহা এক দুর্ধর্ষ শত্রু, যে কোন উপায়েই হোক ইহাকে অবশ্যই জয় করিতে হইবে। কামনা নিবৃত্তির এই ধারণা বৈদিক যুগেও বিশেষ সুবিদিত ছিল। এই ধারণা কেবলমাত্র বৌদ্ধধর্মের নহে, অধিকন্তু ভারতীয় সকল ধর্মেরই মূল কথা। মনে রাখিতে হইবে যে, প্রলুব্ধকারীকে জয় করিয়াই বুদ্ধ 'বুদ্ধ' এই নামে পরিচিত হইয়াছিলেন।

বুদ্ধ বিশেষভাবে ঔপনিষদিক চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন, সে কারণ তাঁহার প্রধান সমস্যা ছিল মানুষের মনে স্বভাবতঃ যে সকল কামনার উদয় হয় তাহাদিগকে কি করিয়া সংযত করা যায়। তিনি অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্মা তাঁহার এই তিনটি মূল তত্ত্বের মধ্যে এই সমস্যার সমাধান খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন। যদি কেহ জাগতিক বস্তুনিচয়ের সম্পর্কে এই তত্ত্বগুলির গভীরভাবে ধ্যান করে, তাহা হইলে তাহার ভোগ করিবার বাসনা নিশ্চয়ই দূরীভূত হইবে। বৌদ্ধ দর্শনের আচার্যেরা সকলেই এই তত্ত্বগুলি গ্রহণ করিয়াছেন।

বৈভাষিকেরা এই প্রশ্ন সম্বন্ধে নূতন কিছু যুক্তি বলিয়াছিলেন কিনা তাহা আমরা জানি না। কিন্তু সৌত্রান্তিক, যোগাচার ও মাধ্যমিক এই তিনটি সম্প্রদায়ের উক্ত বিষয়ে যে অবদান আছে তাহা উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা কেবলমাত্র প্রথম ও শেষ অর্থাৎ অনিত্য ও অনাত্মা এই দুইটি তত্ত্বের বিশদ ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। ইহা নিঃসন্দিগ্ধ যে, সৌত্রান্তিকগণ তাহাদের অবিচ্ছিন্ন ধারা (সন্ততি) এবং ক্ষণিকত্ব (ক্ষণভঙ্গ) বাদের সাহায্যে 'অনিত্য' তত্ত্বের মধ্যে নূতন

চৈতন্য সঞ্চার করিয়া উহার অধিক বিকাশ সাধন করিয়াছিলেন—পূর্বেই ইহা দেখান হইয়াছে যে, পূর্বোক্ত যোগাচার ও মাধ্যমিকদের যে অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কামনার জন্য বিষয়ী এবং বিষয় এই দুইটি পদার্থ অত্যাবশ্যক, এবং এই দুইটিরই তাঁহারা প্রবল যুক্তির সাহায্যে নিরাকরণের চেষ্টা করিয়াছিলেন।

বিজ্ঞানবাদের সাহায্যে তাঁহারা সুষ্ঠুভাবে প্রমাণ করিলেন যে, বিষয় বা বিষয়ী বলিয়া পৃথক কিছু নাই, একমাত্র বিজ্ঞানই আছে। তাঁহারা আত্মা ও বস্তুর উপাদান এই দুইয়েরই অসারতা দেখাইয়াছেন (পুদ্গলনৈরাত্ম্য ও ধর্মনৈরাত্ম্য) এই মত মাধ্যমিকেরাও গ্রহণ করিয়াছেন।[৫৩] সুতরাং এই ক্ষেত্রে কামনার কোন অবকাশ নাই ; কারণ কেই বা কামনা করিবে এবং কি বা কামনার বিষয়বস্তু হইবে ? মাধ্যমিকেরা তাঁহাদের শূন্যবাদের সাহায্যে দেখাইয়াছেন যে, সর্ববস্তুই 'শূন্য' অর্থাৎ স্বভাবশূন্য (নিঃস্বভাব), সুতরাং কি বিষয় কামনা হইবে এবং কেই বা কামনা করিবে ?

"যে শূন্যে বিশ্বাসী, সে জাগতিক কোন বিষয় দ্বারা আকৃষ্ট হয় না. কারণ জাগতিক বস্তুসমূহের কোন অধিষ্ঠান নাই। তিনি লাভে উৎফুল্ল হন না, কিংবা লাভ করিতে না পারায় নিরুৎসাহও হন না। তিনি তাঁহার নিজের শ্রেষ্ঠত্বে গর্ব বোধ করেন না অথবা শ্রেষ্ঠত্বের অভাবে সঙ্কোচ বোধও করেন না। কাহারও ঘৃণার ভয়ে তিনি লুক্কায়িত হন না, অথবা প্রশংসা তাঁহাকে জয় করিতে পারে না। সুখের প্রতি তাঁহার আসক্তি নাই, এবং দুঃখের প্রতি তাঁহার কোন বিরক্তি নাই। যিনি জাগতিক বস্তুতে আকৃষ্ট হন না তিনিই শূন্যের তাৎপর্য বুঝিতে পারেন। সুতরাং শূন্যে বিশ্বাসী ব্যক্তির ইচ্ছা বা অনিচ্ছা কিছু নাই। যাহা তাঁহার ভাল লাগিতে পারে তাহাকেও তিনি শুধু শূন্য বলিয়া জানেন, এবং গণনা করেন। কোন কিছুর প্রতি যাঁহার ইচ্ছা বা অনিচ্ছা আছে তিনি শূন্য কি জানেন না, এবং যিনি অপরের সহিত কলহ বিতর্ক বা বিতণ্ডা করেন, তিনি ইহাকে শূন্য বলিয়া জানেন না কিংবা গণনাও করেন না।"[৫৪]

দ্রষ্টব্য

১। শতপথ-ব্রাহ্মণ ১০ম, ৬-৪

২। শতপথ-ব্রাহ্মণ ১৩শ, ১-৫

৩। মহাযান-সূত্রালঙ্কার ১৯শ, ৫৯-৬০

৪। ইঁহাকে 'মহাবিভাষা'ও বলা হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 'নির্বাণ' ও 'মহাপরিনির্বাণ'-এর ন্যায় ইহাদের মধ্যেও কোন প্রভেদ নাই। 'মহা' সংজ্ঞাটি কেবলমাত্র বিশেষ সম্মানার্থে প্রযুক্ত।

৫। যশোমিত্র তাঁহার 'স্ফুটার্থ'তে (B. B. ১২পৃঃ) বলিয়াছেন যে, যাঁহারা 'বিভাষা'র প্রশংসা করেন বা তাহাতে আনন্দ পান বা বিহার করেন বা যাঁহারা 'বিভাষা' কি তাহা জানেন, তাঁহারাই বৈভাষিক। 'সর্বদর্শন-সংগ্রহে' (Government Oriental Hindu Series ৪৩পৃঃ) এই শব্দের ব্যাখ্যা প্রকৃতপক্ষে কল্পনাপ্রসূত।

৬। "তদস্তি-বাদাৎ সর্বাস্তিবাদী মতঃ"।

৭। যথা 'সংযুক্তাগম' ৩য়, ১৪, মধ্যমক বৃত্তি ২২শ, ১১ দ্রষ্টব্য, মঝ্‌ঝিম নিকায় ৩য়, ১৮৮

৮। 'পঞ্জিকা' সহ 'তত্ত্বসংগ্রহ' ১৭৮৭ হইতে ঝা কৃত ইংরাজী অনুবাদ।

৯। 'ব্যাপার' দ্বারাও 'কারিত্র' প্রকাশ হয়।

১০। 'অভিধর্মকোষ'-এ বসুবন্ধু এইরূপ বলিয়াছেন। ৫ম, ২৫-২৬

১১। 'পঞ্জিকা' সহ 'তত্ত্বসংগ্রহ' ১৮১০ হইতে।

১২। সৌত্রান্তিকগণ অণুতে বিশ্বাসী, কিন্তু অণু তাঁহাদের মতে প্রকৃত বস্তু নহে, তাহাদের অস্তিত্ব নামে মাত্র (প্রজ্ঞাপ্তি-সং)। সর্বসিদ্ধান্তসংগ্রহ। সৌত্রান্তিক ৫

১৩। 'শাস্ত্র' সম্পর্কে Calcutta Oriental Series-এর মধ্যান্ত-বিভাগ সূত্রভাষ্য টীকা দ্রষ্টব্য ১১পৃঃ। এই সকল ক্ষেত্রে সাধারণতঃ বুদ্ধের বাণীই 'সূত্র' ও তাহার উপর বিখ্যাত উপদেষ্টাদের লিখিত ভাষ্য 'শাস্ত্র'।

১৪। বিংশতিকা ১১-১৫

১৫। Sacred Books of the East, ইং অনুবাদ ৩৫শ, খণ্ড ৬৩ পৃঃ হইতে।

১৬। Levi, J A, ১৯২৭ ; ৯৫-১২৭ পৃঃ

১৭। মহাযান সূত্রালঙ্কার ১৮শ ৮২-৮৮

১৮। চৈনিক সংস্কৃত মতে 'মায়াকার-পলকবৎ'। কিন্তু এস্থলে 'পলক'-এর অর্থ কি ?

১৯। যথা এইরূপ (তৈত্তিরীয় উপ, ৩য়, ৫, ১) "তিনি প্রত্যক্ষ করিলেন 'ব্রহ্ম'ই 'বিজ্ঞান' ; 'বিজ্ঞান' হইতে সর্বজীবের উৎপত্তি, জন্মের পর 'বিজ্ঞান'-এ তাহাদের স্থিতি এবং অন্তে তাহাদের 'বিজ্ঞান'-এ লয়।"

২০। Indian Historical Quarterly, ১০ম, খণ্ড ১৯৩৪ ১-১১ পৃঃ আমার Evolution of Vijnanavada দ্রষ্টব্য।

২১। কাম-লোক, রূপ, অরূপ "কামনার স্তর বা বস্তু, রূপ ও রূপের অভাব", এই তিন স্তরের মধ্যে জগৎ নিহিত।

২২। 'লঙ্কাবতার'ও দ্রষ্টব্য (১০ম, ১৫)। "মূর্খেরা যেমন বাহ্যবস্তু কল্পনা করে, সেইপ্রকার কোন বাহ্যবস্তু নাই। মন 'বাসনা'র দ্বারা (ধারণা) চালিত হয়, এবং তাহারই ফলে বস্তুগুলির আবির্ভাব ঘটে।" মনে রাখিতে হইবে যে চিত্ত, মনস্, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞপ্তি শব্দগুলি একার্থবাচক ও প্রকৃতপক্ষে এই ক্ষেত্রে 'চেতনা' বুঝায়।

২৩। সুক্রত ১ম, ৩

২৪। এখানে বলা প্রয়োজন যে, 'বিজ্ঞানবাদ' ও 'শূন্যবাদ' (অর্থাৎ মাধ্যমিক সম্প্রদায়) এই উভয় মতেই 'শূন্যতা' স্বীকৃত, কিন্তু ভিন্নার্থে। কারণ পূর্ববর্তী মতে ইহার অর্থ জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের অস্তিত্বের অভাব যেমন এখানে দেখিতেছি ; কিন্তু শূন্যবাদে ইহার অর্থ ব্যক্তির অন্তর্নিহিত অবস্থার অস্তিত্ববিহীনতা (নিঃস্বভাবতা), পরে যেমন দেখা যাইবে।

২৫। 'মধ্যমক বৃত্তি'তে পৃঃ ৬২ উল্লিখিত 'আর্য-রত্ন-চূড়া-সূত্র'-র (বা পরিপৃচ্ছা) ন্যায়, 'বোধিচর্যাবতার-পঞ্জিকা' ৩৯২ পৃঃ

২৬। ত্রিংশিকা ১ম, ১৬ পৃঃ

২৭। এই 'আলয় বিজ্ঞান'কে 'আত্মা' হিসাবে ধরা হয়, এবং ইহা 'অহম্' এই ধারণার বিষয়বস্তু। অন্য বস্তু সম্বন্ধে চেতনাকে বলা হয় 'প্রবৃত্তি বিজ্ঞান', 'ব্যক্তিগত চেতনা' উহারা এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে। "(লঙ্কাবতার ২য়, ৯৯-১০০)" কারণ রূপ বায়ু দ্বারা উত্থিত হইয়া সমুদ্র তরঙ্গ যেরূপ অবিরত নৃত্য করে, সেইরূপ চেতনার আধারস্রোত বিষয়বস্তুর বাত্যাতাড়িত হইয়া চেতনার বিভিন্ন রূপে নৃত্য করিতে থাকে।"

২৮। চন্দ্রকীর্তির এই দুইটি শব্দের ব্যাখ্যার জন্য **Memoirs of the A S B** ৩য়, খণ্ড ; ৮ম, সংখ্যা ৪৪৯-৫১৪ পৃষ্ঠায় "চতুঃশটিকা" দ্রষ্টব্য।

২৯। স্থিরমতি "ত্রিংশিকা"য় ৩৯ পৃঃ এইরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন। পরজন্য অর্থাৎ কারণ ও করণের দ্বারা উৎপন্ন বলিয়া ইহা 'পরতন্ত্র'।

৩০। কখনো কখনো প্রথম ও শেষ অভিধাগুলি "কল্পিত" ও "নিষ্পন্ন" শব্দমাত্র দ্বারা ব্যক্ত হয়।

৩১। 'ত্রিস্বভাব নির্দেশ' ২৮ দ্রষ্টব্য।

৩২। বসুবন্ধু বলেন (ত্রিংশিকা ২৮) "স্থিতম্ বিজ্ঞান-মাত্রত্বে"। মাত্র বিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল।

৩৩। 'ত্রিংশিকা' ২৯-৩০

৩৪। গৌড়পাদ-এর মায়াবাদী মত সম্বন্ধে গৌড়পাদ রচিত 'আগমশাস্ত্র' দ্রষ্টব্য পৃঃ ১৩৩ হইতে বিশেষ ভাবে ১৫ পরিচ্ছেদ, **The Philosophy of Gaudapada**, ৩য়, ৩৫-৪৬, ৪র্থ, ৪৭-৫৭, ৭২, ৬০, ৬৬।

৩৫। "মহা-বগ্গ' (বিনয়) ১ম, ৬-১৭

৩৬। এই দুই মতের নিন্দা করিয়া, একটি যুক্তিযুক্ত অর্থাৎ মধ্যপন্থা গৃহীত হইয়াছে। 'ভগবদ্গীতা' ৬ষ্ঠ, ১৬ দ্রষ্টব্য।

৩৭। 'অমর' ১ম, ১'১৪।

৩৮। এই সম্পর্কে বিজ্ঞানবাদিগণ 'দ্বি' শব্দে দ্রষ্টা ও দৃষ্ট বস্তু অর্থাৎ যথাক্রমে 'জ্ঞাতা' ও 'জ্ঞেয়' বুঝান।

৩৯। 'মধ্যমক-বৃত্তি'তে ২৬৯ পৃঃ উক্ত 'কাত্যায়নাব-বাদ' 'সংযুক্ত নিকায়' ২য়, খণ্ডে ১৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

৪০। 'মধ্যমক-কারিকা' ৫, ৮

৪১। 'মধ্যমক-কারিকা' দ্রষ্টব্য ১৫ পৃঃ ৭ ; 'সংযুক্ত নিকায়' ২য়, খণ্ড, ১৭ পৃঃ

৪২। 'কাশ্যপ-পরিবর্ত' ৬০ (৯০ পৃঃ) 'মধ্যমক বৃত্তি'তে উদ্ধৃত ২৭০ পৃঃ

৪৩। এই ধরণের কয়েকটি অংশের জন্য গৌড়পাদের 'আগমশাস্ত্র' ১০৩-৪ পৃঃ দেখা যাইতে পারে।

৪৪। 'সংযুক্ত নিকায়' ২য়, ১৭ পৃঃ (১২শ ১৫)। 'তথাগত মধ্য পন্থা অবলম্বন করিয়া সত্যের প্রচার করেন'।

৪৫। 'মধ্যমক-কারিকা'র প্রারম্ভে নাগার্জুন বর্ণিত "প্রতীত্য-সমুৎপাদ"-এর মূলতত্ত্ব দ্রষ্টব্য। গুণের সংখ্যা অসীম, কিন্তু সুবিধার্থে উল্লিখিত আটটি মাত্র গৃহীত হয়।

৪৬। 'সর্বদর্শন-সংগ্রহ' (৩০ পৃঃ) এই নামের কল্পনাপ্রসূত ব্যাখ্যা দিয়াছেন।

৪৭। এইগুলি বর্তমান, অবর্তমান, উভয় ও উভয় নহে 'চতুঃ-শটিকা' ৮ম, ২০ ; ১৬শ, ২৫ 'মধ্যমক কারিকা' ২২শ, ২১।

৪৮। বিস্তারিত বিবরণের জন্য গ্রন্থকারের (**Jha Commemoration Volume**-এর) ৮৫ পৃঃ হইতে এর 'চতুষ্কোটি' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৪৯। 'শ্বেতাশ্বতর' ৪র্থ, ১৮ 'বৃহদারণ্যক' ৩য়, ৮, ৮ তুলনীয়।

৫০। 'মধ্যমকবৃত্তি' ২৬৪-৫ পৃঃ। বস্তুর "স্বভাব"-এর বিরুদ্ধে অন্যান্য যুক্তির জন্য 'মহাযান সূত্রালঙ্কার' ১১শ, ৫০-১ দ্রষ্টব্য।

৫১। 'অদ্বয় বজ্রসংগ্রহ' GOS ১২১ পৃঃ স্থিত 'তত্ত্বরত্নাবলী'তে লিখিত আছে, "সর্বারোপ-বিনির্মুক্তম্ স্বতত্ত্বম্ চকাসতি। শূন্যতাভিধানৈস্তু তত্রারোপ-নিরাক্রিয়া।"

৫২। 'মার বিজয়'-এ "মার" শব্দ (যাহার আক্ষরিক অর্থে 'মৃত্যু' বা 'মৃত্যুর কারণ') "কাম" বা কামনা অর্থে ব্যবহৃত অনিষ্টকর ফলের কথা চিন্তা করিলে ইহা অপেক্ষা কোন উত্তম অভিধা দেওয়া যাইতে পারে না।

৫৩। মাধ্যমিক মতে ইহাদের নাম যথাক্রমে 'পুদ্গল-শূন্যতা' ও 'ধর্ম-শূন্যতা'।

৫৪। 'শিক্ষা-সমুচ্চয়' পৃঃ ২৬৫তে উদ্ধৃত 'আর্যধর্ম সংগীতি সূত্র'-**Bendall** ও **Rouse** কৃত ইং অনুবাদ কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত।

বৌদ্ধ দর্শন

গ। বৌদ্ধধর্মের দার্শনিক সম্প্রদায় সমুহ

১। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অভ্যুদয়

বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসের গোড়ার দিকেই বিভিন্ন সম্প্রদায় ও উপ-সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইবার দিকে প্রবণতা দেখা দেয়। 'কথাবত্থু'তে (২৪৬ খৃঃ পূঃ) বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মতভেদের আলোচনা আছে। সুতরাং সম্প্রদায়গুলি তৎকালে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল। বৌদ্ধ সংঘের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ প্রথম বিভেদ বুদ্ধের নির্বাণ লাভের প্রায় একশত বর্ষ পরে বেসালি অধিবেশনে দেখা দিয়াছিল। উক্ত অধিবেশনে প্রাচীনেরা (স্থবিরেরা) দশ হাজার বজ্জীয় ভিক্ষুকে সংঘ হইতে বহিষ্কৃত করেন। ইহার বাহ্য কারণ সংঘের আচরণীয় দশটি অপ্রধান নিয়মের[১] ব্যাখ্যা, কিন্তু ইহার প্রকৃত কারণ ছিল মূলগত মতের বিভিন্নতা। বজ্জীয় ভিক্ষুরা মহসংঘিক[২] নামে একটি পৃথক সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন। মহাযান সম্প্রদায়ের সূচনা এই দলগত বৈষম্যের মধ্যে লক্ষ্য করা যাইতে পারে। কালক্রমে আবার প্রাচীনেরা সর্বাস্তিবাদী এবং সাম্মিতিয় এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইলেন। ইহাদের প্রত্যেকটির মধ্যে আবার বহু ক্ষুদ্র উপ-সম্প্রদায় ছিল।

বসুমিত্র বিনীতদেব ও ভব্য প্রভৃতি প্রাচীন বৌদ্ধ ঐতিহাসিকেরা আঠারটি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের[৩] উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই পরম গুরু বুদ্ধের শিক্ষাবলীর যথার্থ প্রতিনিধি বলিয়া দাবী করেন। ইহাদের মধ্যে কেবলমাত্র নিম্নলিখিত চারিটি প্রধান সম্প্রদায়ই উল্লেখযোগ্য। (১) স্থবিরবাদ, (২) সর্বাস্তিবাদ, (৩) মহাসংঘিক ও (৪) সাম্মিতিয়। অন্যান্য সম্প্রদায়গুলি ইহাদেরই উপশীরা।

প্রথমে স্থবিরবাদের প্রাধান্য অধিক ছিল ; কিন্তু তৃতীয় অধিবেশনের (অশোকের রাজত্বকাল) সময় হইতেই ইহার গুরুত্ব ও প্রভাব ধীরে ধীরে কমিয়া অবশেষে ইহা ভারতের অভ্যন্তর হইতে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া গেল। অবশ্য সিংহল, ব্রহ্ম, ও শ্যাম প্রভৃতি দেশে ইহা এখনও ক্রমবর্ধমান। আদিতে সর্বাস্তিবাদ সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ছিল। ইহার শাখা-প্রশাখা কাশ্মীর ও গান্ধারসহ ভারতের সর্বত্র বিস্তৃত ছিল। সাম্মিতিয়গণ (বাৎসী পুত্রীয়েরা) নিঃসংশয়ে সমৃদ্ধিশালী সম্প্রদায় ছিল, ইহার অনুগামী সংখ্যাও যথেষ্ট ছিল। এই সম্প্রদায়ের কোন মূল গ্রন্থ রক্ষিত

হয় নাই। সুতরাং ইহাদের মত নির্ণয় করা কঠিন ; কারণ এই সম্বন্ধে অল্পস্বল্প যাহা কিছু জানা যায়, তাহাও উহাদের বিরোধীদের কথা হইতেই সংগ্রহ করিতে হয়। তাঁহারা প্রায় স্থায়ী সত্তাবান্ এমন এক জীবন্ত্মা (পুদ্গল-আত্মার) অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন, যাহা চিত্তাবস্থাগুলি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নও নহে, অভিন্নও নহে।[৪] অন্যান্য সম্প্রদায় কর্তৃক একবাক্যে প্রকৃত বৌদ্ধধর্মের বিরোধী বলিয়া নিন্দিত হইলেও তাঁহারা তাঁহাদের এই মত কখনও পরিত্যাগ করেন নাই। অন্যান্য সম্প্রদায়ের একদেশদর্শী বিশেষ বিশেষ মত হইতে মাধ্যমিকের সর্বমত শূন্যতায় উপনীত হইবার পথে মধ্যবর্তী স্তররূপে সাম্মিতিয় সম্প্রদায়ের গুরুত্ব। কিন্তু মহাসংঘিক দিগকেই সুনিশ্চিত ভাবে মহাযান ধর্ম ও দর্শনের পূর্বগামী বলিয়া অভিহিত করা যায়।[৫] সৎ (ধর্ম) নির্বাণ, বুদ্ধকথা, ব্যক্তিগত বা সার্বজনীন মুক্তি (বোধিসত্ত্বের আদর্শ) প্রভৃতি ধারণা সম্পর্কে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সকল বিভেদ অস্পষ্টভাবে বিদ্যমান ছিল, তাহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। বহুকালের বাদ-বিবাদ ও মত-সংঘর্ষের ফলে বৌদ্ধ দর্শনের প্রসিদ্ধ ও প্রধান সম্প্রদায়-গুলি পূর্ণাঙ্গ পরিণতিলাভ করিয়াছিল।

কোন একটি বিশিষ্ট মতকে বৌদ্ধ দর্শন বলিয়া নির্দেশ করা যায় না। উহা হইতেছে বিভিন্ন মতের উৎপত্তিস্থল। নিজেদের মধ্যে আভ্যন্তরিক বিরোধ থাকা সত্ত্বেও কোন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ই বস্তুকে দ্রব্যাত্মক স্থায়ী, অভিন্ন ও সামান্য বলিয়া কল্পনা করে নাই। অপর দিক দিয়া জৈন ও অন্যান্য সর্ব অ-বৌদ্ধ সম্প্রদায়সকল কোন না কোন ভাবে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিত।

নৈরাত্ম্য অথবা অদ্রব্যতা হইতেছে বৌদ্ধধর্মের এমন একটি সামান্য ধারণা যাহা বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন শাখাগুলি বুঝিতে এবং ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছে এবং এই জন্যই ইহারা বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের বিভিন্ন শাখা।

বৌদ্ধচিন্তার প্রাচীনতম স্তর হইতেছে বস্তুবাদ। এই স্তরে অদ্রব্যতা অথবা দ্রব্যের নিষেধ-এর (পুদগলনৈরাত্ম্য) ব্যাখ্যা করা হইত যে, কেবল দ্রব্যের পৃথক পৃথক উপাদানগুলিই (ধর্ম) সত্য, দ্রব্য সত্য নহে। থেরাবাদ ও সর্বাস্তিবাদ (বৈভাষিক) এই বিনা বিচারে গৃহীত বহুমতবাদের প্রধান ব্যাখ্যাতা। সুপ্রসিদ্ধ সৌত্রান্তিক মত এই বস্তুবাদেরই বিচারসম্মত সংস্করণ।

ইহা কাণ্টের ন্যায় একটি সুনির্দিষ্ট ও সুসংবদ্ধ জ্ঞানতত্ত্বের উদ্ভাবন করিয়াছিল। সৌত্রান্তিকেরা তাহাদের সূক্ষ্মবিচারে এবং জ্ঞানবাদীয় অন্তর্মুখী চিন্তা দ্বারা মাধ্যমিক ও যোগাচার মতবাদের পথ প্রস্তুত করিয়াছিল।

নাগার্জুন (খৃষ্টপর দ্বিতীয় শতাব্দী) মাধ্যমিক দর্শন বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহা বৌদ্ধচিন্তাধারার দ্বিতীয় ও প্রধান স্তর। এই মতবাদের মৌলিক পদার্থ সমূহের (ধর্মের) ভিন্ন ভিন্ন মতও অস্বীকৃত হইয়াছে (ধর্মনৈরাত্ম্য) ; দ্রব্য (আত্মা) যদি মনো-নির্মাণ (অবাস্তব) হয়, তাহা হইলে ইহার ধর্ম ও গুণ সকলও তদ্রূপই হইবে। সাংখ্য এবং বেদান্তের মতই সদ্বস্তুকে যদি স্থায়ী ও সামান্যাত্মক বলিয়া মনে করা ঠিক না হয়, তাহা হইলে প্রাচীন বৌদ্ধ দর্শনের ন্যায় উহাকে ক্ষণিক ও বিশেষ বলিয়া মনে করাও ঠিক হইবে না। বস্তুর সত্তার আপেক্ষিকতা (শূন্যতা) এই চরম তত্ত্বে পৌঁছিবার ধাপরূপেই[৬] বুদ্ধদেব ক্ষণিকবাদের উপদেশ দিয়াছিলেন।

শঙ্করের অদ্বৈতবাদ যেমন ব্রাহ্মণ্য দর্শনে, তেমনই মাধ্যমিক মতও বৌদ্ধ দর্শনে বিপ্লবসাধন করিয়াছিল। পারমার্থিক ও ব্যবহারিক (সংস্কৃতি) দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধধর্মগ্রন্থের শিক্ষাবলীর সমন্বয়সাধনের ইহা একটি অবিরাম প্রযত্নের ফল। ব্রাহ্মণ্য দর্শনের দ্রব্যবাদ (আত্মবাদ) ও প্রাচীন বৌদ্ধদের ধর্মবাদ (নৈরাত্মবাদ) এই দুই মূল বিরোধী ঐকান্তিক মতবাদের সমালোচনা হইতে মাধ্যমিক বিচারের উদ্ভব। কাণ্টের বিচারের ন্যায় মাধ্যমিকের বিচারও দর্শন-মাত্রেরই সমালোচনা।[৭]

(১) ব্যবহারিক বিকল্পবর্জিত পরমতত্ত্ব, (২) অবভাসের সিদ্ধান্ত (৩) পারমার্থিক সত্য ও ব্যবহারিক সত্যের ভেদ—এই সব মাধ্যমিক দর্শনের মূল মত বৌদ্ধগণ কর্তৃক গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু এই মতবাদে ব্যবহারিক জগৎ সম্পূর্ণ ও ঐকান্তিক ভাবে অস্বীকৃত হইয়াছে বলিয়া কাহারও কাহারও নিকট মনে হওয়ায় উহার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছিল। যোগাচার সম্প্রদায়ের বিজ্ঞানবাদকে মাধ্যমিক নেতিবাদের একটি অর্থপূর্ণ আংশিক রূপান্তর বলিয়া বুঝিতে হইবে। এই মতানুসারে একমাত্র সদ্বস্তু, ইহা অবশ্যস্বীকার্য; কিন্তু বিষয়ী ও বিষয়রূপে যে দ্বৈতদ্বারা এই জ্ঞান দূষিত, উহাকে অবাস্তব (শূন্য) বলিয়া মনে করিতে হইবে; দ্বৈত অবাস্তব ; কিন্তু যাহাতে দ্বৈতের অভাব (দ্বয়শূন্যতা) তাহা শূন্য নয়।[৮]

কাণ্টের বিচারমূলক দর্শন হইতে পাশ্চাত্য দেশে ফিশ্‌টে, শেলিং ও হেগেলের জ্ঞানবাদী দর্শনের উদ্ভব হইয়াছিল, এখানেও যোগাচারের বিজ্ঞানবাদ মাধ্যমিক দর্শনের সাক্ষাৎ ফল। ইহা বৌদ্ধ দর্শনের তৃতীয় প্রধান স্তর।

বিজ্ঞানবাদের উপরে অপ্রত্যাশিতভাবে তন্ত্রমত (বজ্রযান, মন্ত্রযান প্রভৃতি) দেখা দিয়াছিল। পারমার্থিক তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত মন্ত্র, অনুসন্ধান ও পূজা-পদ্ধতির ইহা এক অপূর্ব মিশ্রণ। ইহা একাধারে ধর্ম ও দর্শন উভয়ই। ভারতবর্ষে যখন

বৌদ্ধধর্মের বিলোপ ঘটিল (একাদশ হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে) তখন বিশেষভাবে বৌদ্ধ দর্শনের এই তান্ত্রিক রূপান্তরই তিব্বতে প্রসারলাভ করিয়াছিল। বৌদ্ধ দর্শনের কতকগুলি প্রাচীন সম্প্রদায় অত্তপি চীন জাপানে বর্তমান আছে।[৯]

বস্তুবাদ, পরমার্থবাদ এবং বিজ্ঞানবাদ—এইভাবে বৌদ্ধচিন্তার স্তরগুলিকে বিভক্ত করিলে উহা বৌদ্ধ দর্শনের যৌক্তিকতা ও ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের সম্পূর্ণ অনুগামী হইবে। অন্যান্য ঐতিহাসিকেরা বৌদ্ধচিন্তার ক্রমবিকাশের এই তিনটি যুগকে ধর্মচক্রের তিনটি আবর্তন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (ধর্মচক্র প্রবর্তন)।[১০] অ-বৌদ্ধেরা সকলেই বৈভাষিক, সৌত্রান্তিক, মাধ্যমিক ও যোগাচার—এই চারিটি বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের উল্লেখ করিয়া থাকেন। প্রথম দুইটি হীনযান সম্প্রদায়ভুক্ত। ইহারা বহুমতবাদী ও বস্তুবাদী। শেষোক্ত দুইটি মহাযান সম্প্রদায়ভুক্ত। ইহারা পরমার্থ-বাদের সমর্থক। আস্তিক্য মতবাদে সংঘের যেরূপ স্থান, বৌদ্ধমতবাদে বৈভাষিক-এর (আভিধার্মিক) স্থানও তদ্রূপ। অন্যান্য মতবাদ সমূহ ইহার আংশিক পরিবর্তন ও সমালোচনা দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে। এইরূপ মনে করা ঠিক হইবে না যে, মাধ্যমিকের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আভিধর্মিক মতের বিকাশ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল এবং যোগাচারের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে মাধ্যমিক মতের বিলোপ ঘটিয়াছিল। বহু শতাব্দী ধরিয়া এই সম্প্রদায়সকল একই সঙ্গে বিকাশলাভ করিতেছিল। এইসকল মতবাদের পৌর্বাপর্য উহাদের প্রাথমিক ও শৃঙ্খলাবদ্ধ রচনার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বৌদ্ধমত তিন যুগেই প্রতীত্য-সমুৎপাদরূপ মুখ্য তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত ধর্ম (বস্তু)-বাদ রূপেই বিদ্যমান ছিল। এই সকল মত বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছিল; তাহা ছাড়া প্রতি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ই নিজেকে মধ্যম-মার্গের অনুসরণকারী বলিয়া মনে করিত। আভিধার্মিক সম্প্রদায় সমূহের প্রাচীন বৌদ্ধমত, ধর্মমতের এরূপ ব্যাখ্যা করিতেন যে, দ্রব্য (আত্মা) বস্তুর পৃথক পৃথক উপাদান (ধর্ম)গুলির অস্তিত্ব আছে। প্রতীত্য-সমুৎপাদ হইতেছে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর উৎপত্তি এবং বিলয়ের কার্যকারণ নিয়মই নিয়ন্ত্রণকারী এবং মধ্যম মার্গ হইতেছে শাশ্বতবাদ এবং বিনাশবাদ এই দুই ঐকান্তিক মতকেই পরিহার করা। মাধ্যমিক সম্প্রদায়ে প্রতীত্য-সমুৎপাদ হইতেছে, বস্তুসমূহের স্বরূপতঃই পরস্পরের উপর নির্ভর-শীলতা এবং পৃথক ধর্মগুলির অবাস্তবতা; এবং মধ্যম মার্গ হইতেছে সৎ ও অসৎ এই দুই প্রধান দৃষ্টির অস্বীকৃতি—একদিকে বস্তুবাদ (বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব) অপর দিকে শূন্যবাদ বিষয় এবং জ্ঞান উভয়েরই অস্বীকৃতি; আর বিজ্ঞানবাদ বস্তুবাদের বিচার-শূন্যতা এবং শূন্যবাদের সংশয় এই দুই অন্তকে পরিহার করিয়া চলে।

২। বৌদ্ধধর্মের মূল মতসমূহ

পালি ভাষায় লিখিত বৌদ্ধ শাস্ত্রসমূহে বলা হইয়াছে যে, সর্ববস্তুই অনিচ্চ (অনিত্য) অনাত্ত (অনাত্ম) ও দুক্খ (দুঃখ)। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত অনুভব-নিরপেক্ষ শুদ্ধ যুক্তির উপরে নহে বরং সাক্ষাৎ অনুভূতি এবং পর্যবেক্ষণের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহার স্বপক্ষে যুক্তি পরে, বিশেষতঃ সৌত্রান্তিকেরা দিয়াছিল। আত্মবাদী সম্প্রদায়সমূহে দ্রব্য স্থায়ী পদার্থ এবং 'সামান্যে'র অস্তিত্ব স্বীকার করা হইত; এবং সর্ব বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অনুমোদিত নৈরাত্ম্য-দৃষ্টি ইহারই বিরুদ্ধে যুক্তিমূলক প্রতিবাদ। এই নৈরাত্ম্য-দৃষ্টি বস্তুর ক্ষণিকত্ব, অনাত্মত্ব এই তিনটি পরস্পরসম্বদ্ধ মত গৃহীত হইত।

বৌদ্ধ মতে সৎ হইতেছে তাহাই যাহা কার্যক্ষম, অর্থাৎ যাহা কোন কার্যের কারণ (অর্থ-ক্রিয়াকারী)। যেহেতু স্থায়ী পদার্থ কার্যক্ষম নয়, অতএব উহা কারণ-কার্যের সমসাময়িক হইয়া অথবা পূর্ববর্তী হইয়া স্বীয় শক্তি প্রয়োগ করে। কারণ যদি কার্যের সমসাময়িক হয় তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, উহার সর্বকার্য একই সঙ্গে সাধিত হয়; এবং তখন জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে স্থায়ী কারণটি প্রথম মুহূর্তের পরে থাকে কি থাকে না? যদি বলা হয় থাকে, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, উহা দ্বিতীয় এবং তৎপরবর্তী মুহূর্তগুলিতেও একই কার্যসমূহ উৎপন্ন করে—এইভাবে একই কারণ হইতে একই কার্যের অনন্তধারা উৎপন্ন হইতে থাকিবে। ইহা অসম্ভব। যদি এইরূপ ধারা ইহা উৎপন্ন না করে অথচ পরবর্তী মুহূর্তগুলিতেও স্থায়ী থাকে, তাহা হইলে ইহা স্পষ্ট যে প্রথম মুহূর্তে উহার যে স্বরূপ তাহা পরবর্তী মুহূর্তগুলিতে উহার যে স্বরূপ তাহা হইতে ভিন্ন; কারণ প্রথম মুহূর্তে উহা কার্যক্ষম (সমর্থ), কিন্তু অন্যান্য মুহূর্তগুলিতে ঐ কার্য করিতে উহা অক্ষম (অ-সমর্থ)। যাহাতে দুই বা ততোধিক বিরুদ্ধধর্মের আরোপ করা হয়, তাহা কখনও এক (অভিন্ন পদার্থ) হইতে পারে না। স্থায়ী পদার্থ ক্রমশঃ উহার কারণ-শক্তি প্রয়োগ করে—যেমন অ প্রথমে ক'কে তাহার পর খ'কে তাহার পর গ'কে উৎপন্ন করে ইহাও সম্ভবপর নহে। কারণ, প্রশ্ন হইবে অ যখন ক'কে উৎপন্ন করে, তখন খ'কে উৎপন্ন করার শক্তিও উহাতে আছে কিনা? যদি বলা হয় আছে, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, অ উহার সর্বকার্য একই সঙ্গে সম্পাদন করে; এবং তাহা হইলে দ্বিতীয় বিকল্পটিও কার্যকারণের সমসাময়িকতারূপ প্রথম বিকল্পে পরিণত হইবে। যদি বলা হয় যে তখন অ'তে সেরূপ শক্তি থাকে না, তাহা হইলে বলিতে

হইবে যে উহা খ'কে কখনও উৎপন্ন করিবে না—দৃষ্টান্তস্বরূপ যত দীর্ঘ সময়ই দেওয়া যাক না কেন, প্রস্তরখণ্ড কখনও অঙ্কুর উৎপন্ন করিতে পারে না। তবু যদি আমরা ধরিয়া লই যে, অ দুই বা ততোধিক মুহূর্তে অভিন্ন পদার্থরূপেই বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে উহাকে একই কার্য উৎপন্ন করার ব্যাপারে সক্ষম এবং অক্ষম এইরূপ বলিতে হইবে।

ইহার বিরুদ্ধে বলা যাইতে পারে যে, কারণ পদার্থটি (উদাহরণস্বরূপ একটি বীজ) এক বা অভিন্নই থাকে, শুধু সহকারীদের উপস্থিতি অথবা অনুপস্থিতির উপর উহার কার্যক্ষমতা নির্ভর করে। ইহার উত্তরে জিজ্ঞাসা করিব, এই সকল সহকারীদের উক্ত স্থায়ী পদার্থের উপর কোন প্রভাব আছে কিনা? উহাদের শুধু নিষ্ক্রিয় উপস্থিতি কোন ফলোৎপাদন করিবে না। সুতরাং বীজ হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হইবার পূর্বে উহাদিগকে বীজে কিছু পরিবর্তন ঘটাইতে হইবে। পরিবর্তিত অবস্থাতেই বীজ তাহার কার্য উৎপন্ন করে। যদি এই পরিবর্তিত অবস্থা বীজের স্বরূপেরই অন্তর্ভুক্ত এইরূপ মানা হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, ঐ পরিবর্তিত অবস্থা সর্বদাই বীজে থাকে। ঐরূপ স্বীকার না করিলে বলিতে হইবে যে বীজের দুইটি স্বরূপ: (১) উহার অন্য-নিরপেক্ষ স্বরূপ এবং (২) সহকারীদের প্রভাবে উহা যেইরূপ ধারণ করে। কিন্তু পূর্বোল্লিখিত বৌদ্ধ মতানুসারে কোন বস্তুর দুইটি স্বরূপ আছে এইরূপ স্বীকার করার অর্থ হইতেছে দুইটি বস্তু স্বীকার করা। সুতরাং প্রতি মুহূর্তে এক বস্তু ধ্বংস হইয়া অন্য বস্তু উৎপন্ন হয়। সময়ের ভেদ হইলে বস্তুরও ভেদ হইবে; কোন দুই মুহূর্তেই বস্তু অভিন্ন থাকে না। সত্তা হইতেছে ক্ষণিক।

বস্তুর ক্ষয় এবং ধ্বংসের স্বরূপ আলোচনাদ্বারাও একই সিদ্ধান্তে অনিবার্যভাবে উপনীত হইতে হয়। আমাদের সাধারণ ধারণা এই যে, বিরুদ্ধশক্তিদ্বারা বিনষ্ট না হইলে বস্তু বিদ্যমান থাকিবে। কিন্তু নিজের ধ্বংসসাধন করার ক্ষমতা যদি বস্তুর নিজের মধ্যে না থাকে, তাহা হইলে কোন প্রকার বাহ্য প্রভাবদ্বারা উহার ধ্বংস হওয়া তো দূরের কথা, এমন কি তদ্দ্বারা উহাতে কোন পরিবর্তনই ঘটিতে পারে না। বলা যাইতে পারে যে, দণ্ডের আঘাতে ঘটের নাশ হয়। কিন্তু এই নাশ বা ধ্বংস যদি ঘটের স্বরূপের অন্তর্গত না হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, আঘাতের দ্বারা ঘটের কিছুই হয় না, অর্থাৎ আঘাতের পরেও উহা শূন্য আকাশের মত যথাপূর্ব অবিকৃতভাবেই বর্তমান থাকিবে। আর যদি ধ্বংসকে ঘটস্বরূপের অন্তর্গত বলিয়া মনে করা হয় তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, দণ্ডের আঘাত ঘটনিবৃত্তির নিমিত্তমাত্র—উহা এই ধ্বংসকে উৎপন্ন করে না। এখন বস্তুর বার্ধক্য অথবা ক্ষয়দ্বারা কি বুঝায়

তাহা বিবেচনা করা যাক্। ইহা নিশ্চিত সত্য নয় যে, কিয়ৎকাল উহা অবিকৃতভাবে বিদ্যমান থাকে এবং তাহার পর হঠাৎ তাহাতে পরিবর্তন আরম্ভ হয়। প্রকৃতপক্ষে উহা প্রত্যেক মুহূর্তে সমানভাবে, অলক্ষিতভাবে এবং অনিবার্যভাবে পরিবর্তিত হয়। তাহা হইলে ইহা বলা ঠিক হইবে নাকি যে, পরিবর্তন এমন কি জন্মও প্রতিমুহূর্তেই মৃত্যু ?—বস্তুর অস্তিত্বকালের প্রত্যেক মুহূর্তেই উহা ভিন্ন হইয়া যাইতে বাধ্য। বস্তুর স্থায়িত্ব দীপশিখা অথবা স্রোতের একত্বের ন্যায় ভ্রান্তিমাত্র।[১১] অস্তিত্ব হইতেছে বিরামহীন পরিবর্তন, বস্তু হইতেছে ক্ষণ-মাত্র এবং নিরংশ বিন্দুমাত্র। ইহার 'পূর্ব'ও নাই 'পর'ও নাই, কালিক বিস্তার বা স্থায়িত্ব নাই। নাশ বা নিবৃত্তি হইতেছে বস্তুর স্বভাব এবং সর্বাঙ্গীণ (অহেতুকো নিরন্বয়ো বিনাশঃ)।

অবয়বীর (অন্বয়ীর) অস্তিত্বও একই যুক্তিদ্বারা নিরাকরণ করা হয়। অবয়বীর একত্ব কিভাবে সম্পাদিত হয় ? লৌকিক দৃষ্টিতে বলা যাইতে পারে যে, টেবিলটি এক বস্তু, বৃক্ষও এক বস্তু—অবশ্য ইহারা বহু অংশ বা অবয়বদ্বারা গঠিত। কিন্তু একই সঙ্গে টেবিলের সব অংশ দেখা অসম্ভব বলিয়া উহা অংশতঃ দৃষ্ট এবং অংশতঃ অদৃষ্ট। বৃক্ষের কিয়দংশ সঞ্চালিত হয়, আবার কোন কোন অংশ হয় না। উহার কিছু ভাগ ছায়াতে কিছু ভাগ সূর্যালোকে থাকে। এখন প্রশ্ন এই যে, একই বস্তুতে কি করিয়া দুই বা ততোধিক বিরুদ্ধ ধর্ম (যথা দৃষ্ট ও অদৃষ্ট, সঞ্চালিত ও অসঞ্চালিত, ছায়াচ্ছন্ন এবং আলোকোদ্ভাসিত) আরোপ করা যাইতে পারে ? এই যুক্তি এড়াইবার জন্য ইহা বলা ঠিক হইবে না যে, সঞ্চালিত অংশ হইতে অসঞ্চালিত অংশ ভিন্ন। কারণ উভয় অংশই একই বস্তুর অবয়ব ; অংশের ধর্ম বস্তুরও ধর্ম—বস্তুটিও অংশগুলিরই অবয়বী। সুতরাং পৃথক্‌ভাবে পরিজ্ঞেয় যতগুলি অংশ বা রূপ আছে, বস্তুও ততগুলি আছে ইহা স্বীকার করিতে হইবে। অর্থাৎ বস্তুর বিস্তার অথবা বিমিশ্রস্বরূপ বলিয়া কিছু নাই। বহু বস্তুর (অংশ এবং রূপের) একত্ব শস্যরাশির একত্বের ন্যায় ভ্রান্তিমূলক।[১২]

সুতরাং বস্তু যে শুধু কালিক বিস্তারহীন ক্ষণিকমাত্র তাহা নহে, অধিকন্তু সর্ব-পরিমাণ ও বৈচিত্র্যহীন দৈশিক বিন্দুতুল্যও বটে।

সামান্য অথবা বিভিন্ন বস্তুর একরূপতা নিরাকরণ ও একই যুক্তিদ্বারা সংসাধিত হয়। প্রত্যেক বস্তুই অপর বস্তু হইতে ভিন্ন, এবং অনন্যসাধারণ (স্বলক্ষণ)। বহু বিশিষ্ট বস্তুতে (বস্তু-ব্যক্তিতে) একই সামান্যের অস্তিত্ব-স্বীকারে বহু অলঙ্ঘ্য বাধা আছে। দেশ ও কালের ব্যবধানদ্বারা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন কতকগুলি বিশেষ বস্তুতে একই বস্তু কি করিয়া উহাদের বৈশিষ্ট্যদ্বারা কিছুমাত্র প্রভাবিত না হইয়া

উহার সমগ্ররূপে বিদ্যমান থাকিতে পারে? তাহা ছাড়া আমরা যখন কোন বস্তুকে জানি, তখন নিশ্চয়ই উহাকে (বিশিষ্ট বস্তুটিকে) এবং উহার অনুরূপ অপর একটি বস্তুকে (সামান্যকে) জানি না। সদ্যোজাত মনুষ্যে কোথা হইতে মনুষ্যস্বরূপ সামান্যটি আসে? ঐ ব্যক্তির মৃত্যু হইলে ঐ সামান্যটি কোথায় চলিয়া যায়? এই সকল আপত্তিবশতঃ বৌদ্ধ দার্শনিকেরা মনে করেন যে, অস্তিত্বশীল বস্তুমাত্রই বিশেষ-বস্তু; সামান্য হইতেছে বুদ্ধিনির্মাণ, বিকল্প।

বস্তুর অস্তিত্ব অথবা উহার নাশ মূর্তির দেহ অথবা রাহুর শিরের মতই কথা-মাত্র।[১৩] অস্তিত্ব এবং বিনাশ বস্তুর ধর্ম নহে, অথবা বাহির হইতে আসিয়া উহার সহিত সংলগ্ন হয় না; কিন্তু উহারা প্রকৃতপক্ষে বস্তুস্বরূপই। বৌদ্ধমতে পরিবর্তন হইতেছে একটি সমগ্র বস্তুর স্থানে অপর একটি বস্তুর আগমন; উহা হইতেছে সমগ্ররূপে উৎপত্তি ও বিনাশশীল বহু বস্তুর ধারা; এক বস্তু যে অন্য বস্তুতে পরিণত হয় এমন নহে। গতির অর্থ এমন নয় যে, কোন বস্তু একস্থান হইতে অপরস্থানে গমন করে; গতি হইতেছে চলচ্চিত্রের ভিন্ন ভিন্ন খণ্ড চিত্রগুলির আবির্ভাবের ন্যায় যথাযোগ্য কালিক ব্যবধানে ধারাবাহিকভাবে বহু ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর আবির্ভাব-মাত্র।[১৪] ভিন্ন ভিন্ন বস্তুগুলির কোনটির মধ্যেই, এমন কি উহাদের সমগ্র ধারাটির মধ্যেও প্রবাহ বা গতি বলিয়া কিছু নাই; দ্রষ্টাই বহু স্থিরবস্তুর উপর এই গতির আরোপ করে।

যেহেতু জ্ঞান এবং উহার বিষয় সমকালীন নয়, সুতরাং উহারা একে অন্যকে ধরিতে অথবা আত্মসাৎ করিতে পারে না, উহাদের সম্বন্ধ হইতেছে কার্যকারণীয়। আবার যেহেতু কোন বস্তুই স্থায়ী নয়, কিন্তু উৎপন্ন হইয়াই সমগ্রভাবে বিনষ্ট হয়, অতএব কার্যকারণবাদও প্রকৃতপক্ষে একপ্রকার নিমিত্তবাদেই পর্যবসিত হয়।[১৫] এই সকল অন্তর্নিহিত সমস্যা বৌদ্ধ-চিন্তাধারাকে অহংবাদ এবং বিজ্ঞানবাদের অভিমুখী করিয়াছে।

৩। আভিধর্মিক দর্শন

থেরবাদ ও সর্বাস্তিবাদ: আভিধর্মিক মতেই সর্বপ্রথম বুদ্ধের উপদেশাবলী সুসংবদ্ধ করিবার যথাপদ্ধতি প্রয়াস করা হইয়াছে। প্রথমে বিনা-বিচারে গৃহীত বস্তুনিষ্ঠ বিশ্বাসগুলি সমর্থিত হইয়াছে; বৌদ্ধ দর্শনে যে সকল নির্বিশেষ পরমতত্ত্ববাদী মত আছে, সেইগুলি ইহারই সমালোচনা হইতে পরে উৎপন্ন হইয়াছে। অভিধর্মকোষ[১৬]

গ্রন্থে অভিধর্মকে ধর্মসমূহের (সদ্বস্তুসমূহের) বিশুদ্ধ অপরোক্ষ জ্ঞান এবং উহা সম্পাদন করিবার আনুষঙ্গিক সাধন বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। অভিধর্ম হইতেছে পরমতত্ত্বের মর্মে প্রবেশ করিয়া উহাকে যথার্থভাবে বর্ণনা করা।

থেরবাদ : পালি ধর্মশাস্ত্রে অভিধম্ম নামক যে সাতটি নিবন্ধ আছে[১৭] বৌদ্ধপরম্পরায় এইগুলিকে বুদ্ধের নিজের বাণী বলিয়া মনে করা হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহারা বুদ্ধের উক্তির থেরবাদীয় ব্যাখ্যা। ধম্ম-সংগনি এবং তদধীন অন্যান্য গ্রন্থগুলিতে ধম্ম (বস্তু)-সমূহের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে অসংখ্য তালিকা দেওয়া হইয়াছে—এই সকল দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে নৈতিক দৃষ্টি প্রধান। উহাদের বাক্যগুলি মুখ্যতঃ শীর্ষলিপি অথবা স্মৃতি-সহায়ক শব্দ (মাতিকা)। মৌখিক ব্যাখ্যাদ্বারা ইহাদের অর্থ স্পষ্ট করিতে হইবে এই অভিপ্রায়েই উহারা রচিত। উহাদের মধ্যে যুক্তিপ্রয়োগ প্রায় নাই, এবং উহাদের অন্তর্নিহিত দার্শনিক তত্ত্বগুলিও কদাচিৎই স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে। এই যুক্তিবিহীন অন্ধ-শ্রদ্ধা যুগের পর যুগ থেরবাদের বিকাশ ব্যাহত করিয়াছে। বুদ্ধঘোষের বিসুদ্ধি-মাগ্‌গ এই সম্প্রদায়ের সর্বপ্রথম সুসংবদ্ধ গ্রন্থ (বুদ্ধঘোষ বসু বন্ধুর সমসাময়িক)—কিন্তু এই গ্রন্থের দার্শনিক বিষয়বস্তু অভিধর্মকোষের বিষয়বস্তু হইতে তুলনায় নিকৃষ্ট ; তথাপি নীতিশাস্ত্রীয় গ্রন্থরূপে বিসুদ্ধি-মাগ্‌গ মূল্যবান্ গ্রন্থ। সিংহল, ব্রহ্ম এবং শ্যামদেশে বহুল ব্যবহৃত অনুরুদ্ধের অভিধম্মত্থ-সংগহ[১৮] (একাদশ শতাব্দী) বিশেষ জ্ঞানপ্রদ সংগ্রহ-পুস্তক নয় ; উহাও কতকগুলি তালিকার অপর একটি সঞ্চয়মাত্র।

ভারত-ভূখণ্ডে থেরবাদের কখনও প্রচলন ছিল কিনা সন্দেহ ; প্রায় এইরূপ বলাই ঠিক হইবে যে, উহা কেবলমাত্র দক্ষিণস্থ বৌদ্ধ দেশগুলিরই সৃষ্টি। মাধ্যমিক অথবা যোগাচার সম্প্রদায়ে যখন অভিধর্মবাদের কথা বলা হয়, তখন সর্বদাই সর্বাস্তিবাদকেই নির্দেশ করা হয়, পালি অথবা সিংহলদেশীয় মতকে নির্দেশ করা হয় না।[১৯]

সর্বাস্তিবাদ : থেরবাদের সহিত সর্বাস্তিবাদের মতগত ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে এবং থেরবাদ যত প্রাচীন উহাও অনুরূপ প্রাচীন। এই সম্প্রদায়ে অতীত ও ভবিষ্যৎ ঘটনা বর্তমানের ন্যায়ই সমভাবেই অস্তিত্ববান্ বলিয়া স্বীকার করা হয়। ইহার এই আত্যন্তিক বস্তুবাদীয় দৃষ্টি অন্যান্য সম্প্রদায় কর্তৃক নিন্দিত হইয়াছে। সর্ববস্তু সর্ব সময়েই অস্তিত্ববান্, এই মত হইতেই এই সম্প্রদায় সর্ব-(দা)স্তি-বাদ এই আখ্যা লাভ করিয়াছে।

সর্বাস্তিবাদীরা নিজেদের শাস্ত্র সংস্কৃত ভাষায় লিখিতেন ; এইসকল গ্রন্থের

কোন কোন অংশ মধ্য এশিয়া এবং গিল্‌গিট প্রান্তে আবিষ্কৃত হইয়াছে। যদিও সর্বাস্তিবাদ সমগ্র দেশ ব্যাপিয়া বিস্তৃত ছিল, তথাপি কাশ্মীর ও গান্ধার দেশেই উহা সর্বাপেক্ষা বেশী প্রচলিত ছিল। ইহার বিস্তৃত অভিধর্ম-সাহিত্য সংস্কৃত ভাষায় বিলুপ্ত হইয়া গেলেও, উহা সম্পূর্ণ আকারে চীন ভাষায়[২০] এবং অংশতঃ তিব্বতীয় ভাষায় রক্ষিত আছে। এই সাহিত্যের মূল গ্রন্থ হইতেছে কাত্যায়নী-পুত্রের জ্ঞানপ্রস্থান ও তদধীন ছয়টি গ্রন্থ[২১] (ষট্‌পাদাঃ)। এই ছয়টির মধ্যে তিনটি বুদ্ধের সাক্ষাৎ শিষ্যদের গ্রন্থ বলিয়া বিবেচনা করা হয়। উক্ত ছয়টি গ্রন্থ হইতেছে: বসুমিত্রের প্রকরণপাদ, দেবশর্মার বিজ্ঞানকায়, শারিপুত্রের ধর্মস্কন্ধ, মৌদ্‌গলায়নের প্রজ্ঞপ্তিশাস্ত্র, পূর্ণের ধাতুকায় এবং মহাকৌষ্ঠিলের সঙ্গীতিপর্যায়।

সর্বাস্তিবাদের পরবর্তী বিকাশ কণিষ্কের (আনুমানিক ১২৫ খৃঃ) রাজত্বের সময়ে অথবা তন্নিকটবর্তী কালে মহাবিভাষা এবং ক্ষুদ্রতর বিভাষা নামক বিরাটকায় টীকার রচনায় লক্ষিত হয়। টককুসুর মতে মহাবিভাষা গ্রন্থটি কাশ্মীর সম্প্রদায়ের এবং ক্ষুদ্রতর-বিভাষাটি গান্ধার সম্প্রদায়ের।[২২] বিভাষা সর্বাস্তিবাদের মূলগ্রন্থ বলিয়া সর্বাস্তিবাদকে সাধারণতঃ বৈভাষিক দর্শন বলা হয়।[২৩]

ধর্মোত্তরের অভিধর্মহৃদয় এবং উহার টীকার রচনাকাল হইতে এই সম্প্রদায়ের তৃতীয় এবং সুসংবদ্ধ চিন্তাধারার যুগ আরম্ভ হয়। বসুবন্ধুর (আনুমানিক ৩৫০ খৃঃ) অভিধর্মকোষ[২৪] এই সম্প্রদায়ের সর্বসম্মতিক্রমে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ (শাস্ত্র) বলিয়া গৃহীত হয়। বসুবন্ধুর রচনায় সৌত্রান্তিক মতের দিকে যে প্রবণতা তাহা সংশোধন করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহারই সমসাময়িক সঙ্ঘভদ্র 'ন্যায়ানুসার' ও 'অভিধর্মসময়-প্রদীপিকা' নামক দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন। যশোমিত্রের 'স্ফুটার্থা' নামক অত্যন্ত মূল্যবান্ এবং বিস্তৃত টীকা এখনও সংস্কৃত ভাষায় রক্ষিত আছে।

ধর্ম: বৈভাষিক দর্শন হইতেছে বিশুদ্ধ বহুবাদ। ইহা স্থিরদ্রব্যের অস্বীকৃতি এবং পরস্পর হইতে পৃথক্ ক্ষণিক ধর্মের স্বীকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত। ধর্ম হইতেছে সৎ-এর অন্তিম উপাদান—এই অর্থে ধর্ম শব্দ শুধু বৌদ্ধ দর্শনেই ব্যবহৃত হয়। ধর্মগুলি বস্তুর অন্তিম অবয়ব; কারণ উহারা একেবারে অমিশ্র (পৃথক্) বস্তু—উহারা ক্ষুদ্রতর উপাদানে গঠিত নয়। দ্রব্য (উদাহরণস্বরূপ একটি বৃক্ষ বা একজন মানুষ) এই সব উপাদানের সমষ্টি (স্কন্ধ); এই সমষ্টি অথবা অবয়বী পদার্থটি বৈশেষিক দর্শনে যেরূপ বলা হইয়াছে, সেইরূপ উপাদানাতিরিক্ত কোন বস্তু নয়। এই সকল ধর্ম বা উপাদান অনিত্য; উহারা ক্ষণিক এবং কালিক বিস্তারহীন। "এক ধর্মে অন্য ধর্মে কখনও সমবায়ী নয়, সুতরাং ধর্মাতিরিক্ত দ্রব্য বলিয়া কিছু

নাই ; পৃথক্ পৃথক্ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ধর্ম ব্যতীত অন্য কোন জড়বস্তু নাই, এবং পৃথক্ পৃথক্ বিজ্ঞান ব্যতীত আত্মা বলিয়াও কিছু নাই (ধর্ম=অনাত্মা)।"[২৫]

অভিধর্ম নামক গ্রন্থগুলিতে, বিশেষতঃ অভিধর্মকোষে, এই সকল ধর্ম বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করিয়া উহাদের লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে। সর্বাস্তিবাদ-মতে মোট পঁচাত্তরটি ধর্মের তালিকা দেখিতে পাওয়া যায় ; ইহাদের মধ্যে বাহাত্তরটি অন্য-সাপেক্ষ অবভাসাত্মক কার্যবস্তু (সংস্কৃত অর্থাৎ পরস্পরের সহযোগে ক্রিয়াশীল) ; বাকি তিনটি অন্যনিরপেক্ষ পারমার্থিক তত্ত্ববস্তু (অ-সংস্কৃত অর্থাৎ মিলিতভাবে ক্রিয়াশীল নয়)। অবিদ্যা এবং তদনুচর রাগদ্বেষাদি (ক্লেশ)-বশতঃ ধর্মগুলি কার্যকারণসম্বন্ধে মিলিত হইয়া নির্দিষ্ট সংসারস্রোতের আকারে প্রবাহিত হয়।[২৬] সুতরাং সংস্কৃত ধর্মগুলি হইতেছে দুঃখ অথবা দুঃখের কারণ (সমুদায়)। আবার এই ধর্মগুলিই প্রজ্ঞাপ্রসূ আধ্যাত্মিক সাধনায় (মার্গদ্বারা) পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন এবং দমিত হইলে উহারা শান্তি[২৭] অথবা শূন্যতায় (নির্বাণে) পরিণত হয়। উক্ত তিনটি অন্যনিরপেক্ষ তত্ত্বের মধ্যে সদ্যোবর্ণিত অবস্থা একটি। দ্বিতীয়টি হইতেছে সংসারের অ-প্রতিসংখ্যানিরোধ[২৮] অর্থাৎ এমন নিরোধ যাহা (যেমন নির্বাণের ক্ষেত্রে) সম্যক্ জ্ঞানের দ্বারা সাধিত হয় না, কিন্তু যাহা সংসারের আবশ্যক কারণের অভাবে সাধিত হয় ; উদাহরণস্বরূপ মনোযোগ অন্যত্র চালিত হইলে গন্ধ, স্বাদ প্রভৃতি ধর্মগুলি জ্ঞানের বিষয় না হইয়া আপনা-আপনি বিলীন হইয়া যায়। তৃতীয় অন্যনিরপেক্ষ তত্ত্বটি হইতেছে আকাশ ; উহার লক্ষণ হইতেছে প্রতিবন্ধকাভাব[২৯] : ইহা কোন পদার্থকে বাধা না দিয়া থাকিবার স্থান দেয়, আবার নিজে শূন্য বা ফাঁকা বলিয়া কোন কিছু হইতে বাধাপ্রাপ্ত হয় না।

সৌত্রান্তিকেরা নির্বাণসহ তিনটি অন্যনিরপেক্ষ তত্ত্বের সবগুলিকেই শুধু নামাত্মক বলিয়া অস্বীকার করিয়াছে। থেরবাদিগণ একমাত্র নির্বাণই স্বীকার করিয়াছে ; আবার যোগাচার সম্প্রদায় এইগুলির সংখ্যা ছয় পর্যন্ত বাড়াইয়াছে— পূর্বোক্ত তিনটির সহিত নিম্নলিখিত তিনটিও স্বীকার করিয়াছে (১) অচলা (স্থিরাবস্থা) ; (২) সংজ্ঞা-বেদয়িতৃ-নিরোধ (মূর্চ্ছা) এবং (৩) তথতা (তদ্রূপতা) ; ইহাদের মধ্যে শুধু শেষেরটিই প্রকৃতপক্ষে পরমতত্ত্ব।

বৌদ্ধশাস্ত্রে সর্বত্র এবং পুনঃপুনঃ ধর্মগুলিকে স্কন্ধ, আয়তন এবং ধাতু এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে ; ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, স্বয়ং বুদ্ধই এই শ্রেণীকরণের কর্তা। ইহা দ্বারা জীবকে কতকগুলি অবস্থার এমন একটি সমষ্টি বলিয়া বিশ্লেষণ করা হইয়াছে, যাহাতে তদতিরিক্ত কোন স্থির দ্রব্য

অথবা আত্মার স্থান নাই। ধর্মের এই শ্রেণীকরণকে জ্ঞাতৃসাপেক্ষ বলা যাইতে পারে; কারণ এই শ্রেণীকরণে মুখ্যতঃ ইন্দ্রিয়সংবেদন, ব্যক্তিবিশেষ এবং উহার উপাদানের দিকে লক্ষ্য রাখা হইয়াছে।

স্কন্ধগুলি (সমূহ)[৩০] সংখ্যায় পাঁচ: রূপ (জড়াত্মক অথবা স্থূলদেহাত্মক উপাদান), বেদনা (ইন্দ্রিয়সংবেদন), সংজ্ঞা ('সামান্যের' ধারণা), সংস্কার (বাসনা ও অন্যান্য প্রেরণা), এবং বিজ্ঞান (বিশুদ্ধ জ্ঞান)। আয়তন শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইতেছে জ্ঞানোৎপত্তির 'দ্বার'। আয়তন বারটি—মন-সহ ছয়টি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং চিন্তার বিষয়-সহ ঐ ছয় ইন্দ্রিয়ের ছয়টি গ্রাহ্য পদার্থ। ধাতু আয়তনেরই বিস্তারিত রূপ; ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের মধ্যবর্তী উহাদেরই সন্নিকর্ষ হইতে জাত চাক্ষুষ জ্ঞান প্রভৃতি ছয়প্রকার জ্ঞান গণনা করিয়া এই ধাতুর সংখ্যা আঠার করা হইয়াছে।

বস্তুসাপেক্ষ শ্রেণীকরণে[৩১] ধর্মগুলিকে পাঁচ শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে: রূপ (জড়বস্তু—১১), চিত্ত (চৈতন্য—১), চেতসিক (মানসিক অবস্থা এবং বিশেষ বিশেষ গুণ—৪৬), চিত্ত-বিপ্রযুক্ত-সংস্কার (কেবলমাত্র জড়বস্তু কিংবা কেবলমাত্র মনের নহে কিন্তু উভয় সাধারণ প্রেরণাশক্তিসমূহ—১৪) এবং অসংস্কৃত (অন্য-নিরপেক্ষ—৩)। শেষোক্ত শ্রেণী পূর্বেই বিবেচিত হইয়াছে।

জড়বস্তু (রূপ) অভেদ্য এবং কঠিন (সপ্রতিভ)। ইহাকে নিম্নলিখিত একাদশ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে: পঞ্চ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য (রং ইত্যাদি), পঞ্চ ইন্দ্রিয় এবং অনভিব্যক্ত জড় (অ-বিজ্ঞপ্তি-রূপ)।[৩২] পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে একপ্রকার স্বচ্ছপ্রায় ও সূক্ষ্ম জড়বস্তু (রূপপ্রসাদ) বলিয়া ধারণা করা হইয়াছে। অনভিব্যক্ত জড় হইতেছে কার্যের অথবা কার্যের সঙ্কল্পের ভাল বা মন্দ ফল—ইহা ব্রাহ্মণ্য দর্শনগুলির 'অদৃষ্টে'র অনুরূপ। জড়বস্তু দুইপ্রকার মৌলিক (ভূত কিংবা মহাভূত) ও গৌণ (ভৌতিক)। মৌলিক জড়বস্তু[৩৩] চারিটি—পৃথিবী, জল, অগ্নি এবং বায়ু। ইহারা ইহাদের বিশিষ্ট গুণের দ্বারা পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে—কাঠিন্য, আর্দ্রতা, উত্তাপ এবং গতি—এইগুলি ইহাদের বিশিষ্ট গুণ; ইহাদের কার্য হইতেছে আশ্রয়দান, সংশ্লিষ্টকরণ, পক্ক করা এবং সম্প্রসারণ।

"জড়বস্তুর সাধারণ উপাদানগুলি* বৌদ্ধ দর্শনসম্মত সকল উপাদানের মত স্থিরদ্রব্য-রূপে নহে, বরং কার্যোন্মুখ শক্তিরূপে কল্পিত হইয়াছে। এই চারিটি উপাদান সর্বদাই

* অর্থাৎ পৃথিবী, জল, অগ্নি এবং বায়ু—অনুবাদক

একসঙ্গে এবং সমানুপাতে থাকে। কাষ্ঠখণ্ডে কিংবা জলে যে পরিমাণ উত্তাপের উপাদান আছে, প্রদীপ্ত অগ্নিশিখাতেও তাহাই এবং ব্যুৎক্রমেও এই কথা সত্য। উহাদের মধ্যে যেটুকু পার্থক্য আছে তাহা শুধু তীব্রতার।"[৩৪]

চিত্ত অথবা বিজ্ঞান হইতেছে নিরাকার চৈতন্য। উহাতে কোন উপাদান-বৈচিত্র্য নাই, চৈতন্যই উহার একমাত্র উপাদান। তথাপি নিজ উৎপত্তির জন্য উহা বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করে; উহার ছয়টি প্রকার আছে এইরূপ বলা যাইতে পারে। এতদনুরূপ প্রক্রিয়া দ্বারাই থেরবাদীরা বিভিন্ন অবস্থা এবং সত্তার বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী চিত্তবস্তুকে অতি বিস্তৃতভাবে উননব্বইটি প্রকারে বিভক্ত করিয়াছেন।[৩৫] যোগাচার সম্প্রদায় চিত্তের উক্ত ছয়টি প্রকারের সহিত আলয় এবং ক্লিষ্ট-মনোবিজ্ঞান যোগ করিয়া আট প্রকার বিজ্ঞানের উল্লেখ করিয়াছেন।

চৈত্ত বা চেতসিক বস্তুগুলির সংখ্যা ৪৬[৩৬] বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছে। উহারা নিম্নলিখিত অবান্তর শ্রেণীগুলিতে বিভক্ত করা হইয়াছে, যেগুলি সর্ব-অবস্থাতেই বর্তমান (মহাভূমিক, ১০), উত্তম (কুশল) অবস্থাগুলিতে বর্তমান দশটি সাধারণ ধর্ম, ছয়টি মূল হৃদয়াবেগ (ক্লেশ) দুইটি খারাপ (অকুশল) চিত্তধর্ম, ১০টি গৌণ হৃদয়াবেগ (উপক্লেশ) এবং আটটি অস্পষ্টাকার (অনিয়ত) উপাদান।

অচেতসিক শক্তি এই শ্রেণীতে সর্বাস্তিবাদীরা প্রাপ্তি, উৎপত্তি, স্থিতি, ক্ষয়, মৃত্যু প্রভৃতি চোদ্দটি ক্রিয়ার সমাবেশ করিয়াছেন। যোগাচারিগণ এই সংখ্যা আরও বাড়াইয়া চব্বিশ করিয়াছেন, কিন্তু যোগাচার-মতে এইগুলির পারমার্থিক সত্তা নাই। সৌত্রান্তিকগণ এইগুলিকে বিভিন্ন পৃথক্ বস্তু বলিয়া স্বীকার করিতে সম্মত হয় নাই, কারণ এইগুলি উপাদানসমূহের কার্যাবলী ধারণা করিবার প্রকার-মাত্র।

কার্যকারণ নিয়ম : সদ্বস্তুর অন্তিম উপাদানসমূহের স্বরূপ ও লক্ষণ নির্ধারণ করা হইয়াছে। এখন কি প্রকারে মিলিত হইয়া এই সকল উপাদান ব্যবহারিক জগতের বস্তুসমূহ (সংস্কৃত) উৎপন্ন করে, তাহা ব্যাখ্যা করিতে হইবে। প্রশ্ন হইতেছে, প্রপঞ্চরূপ প্রক্রিয়ার গতিতত্ত্ব কি? বৌদ্ধ দর্শনে সর্বদাই কার্যকারণ নিয়ম যে সার্বত্রিক ও অলঙ্ঘনীয় ইহার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে। বুদ্ধদেব নিজে শাশ্বতবাদ এবং বিনাশবাদ এই দুই পরস্পরবিরোধী মত পরিহার করিয়া বিশেষভাবে নৈতিক দায়িত্বের ব্যাপারে কার্যকারণ নিয়ম প্রয়োগ করিয়াছেন। কোন কিছুই বিনাকারণে নিয়তিবশতঃ অথবা ঈশ্বরের শক্তিতে ঘটে না। আবার কোন কিছুই শাশ্বত নয়। কর্মই—অর্থাৎ আমরা যাহা করিয়াছি এবং করি তাহাই—জগদ্রূপে

পরিণত হয় এবং উহার বৈচিত্র্যের হেতু (কর্মজং লোকবৈচিত্র্যম্)।[৩৮] আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, বৌদ্ধ দর্শনে কার্যকারণ নিয়মের সহিত ক্ষণিকত্ব নৈরাত্ম্য এবং অনন্যরূপতা (স্বলক্ষণ) জড়িত আছে। সত্তার ত্রিবিধ স্তরেই কোথাও এই নিয়মের ব্যতিক্রম কিংবা বিরাম নাই। শুধু অন্যনিরপেক্ষ তত্ত্বগুলিই এই নিয়মের গণ্ডীর বহির্ভূত। অন্যসাপেক্ষ বস্তুর স্বরূপের মধ্যে ইহা জড়িত থাকে যে, উহা কেবল একটি কারণ হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না[৩৯] (ন হ্যেকম্ একস্মাৎ), কিন্তু কতকগুলি কারণের সমষ্টি হইতেই উৎপন্ন হইতে পারে এবং কার্যকারণ হইতে অত্যন্ত ভিন্ন।

কারণতা শব্দটি সাধারণ ও বিশেষ এই দুই অর্থেই গৃহীত হইয়াছে। প্রথম অর্থে কারণকে মুখ্য কারণ[৪০] (হেতু, উদাহরণস্বরূপ—অঙ্কুর উৎপাদনে বীজ) এবং নিম্নলিখিত তিনপ্রকার সহকারী কারণে (প্রত্যয়) বিভক্ত করা হইয়াছে: বিষয়রূপ কারণ (আলম্বন), অব্যবহিত পূর্ববর্তী কারণ (সমনন্তর) এবং প্রবল কারণ (অধিপতি)।

জীবের ক্ষেত্রে কার্যকারণ নিয়মের বিশেষ প্রয়োগ হইতেছে দ্বাদশ গ্রন্থিযুক্ত শৃঙ্খলরূপ প্রতীত্যসমুৎপাদ। অভিধর্মকোষে ইহার নিম্নলিখিতরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে: "আত্মা (দ্রব্য) বলিয়া কিছু নাই; পাঁচটি বিভিন্ন পুঞ্জও ক্ষণিকসত্তার প্রবাহের ন্যায় অগ্রসর হইয়া, এবং কর্ম এবং ক্লেশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে এবং যথাযথ কর্ম ও ক্লেশের দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া অবস্থানিচয়ের এই অবিচ্ছিন্ন ধারা জন্ম হইতে জন্মান্তরে চলিতে থাকে। এই নিরন্তর ঘূর্ণায়মান জীবন-চক্র হইতেছে প্রতীত্যসমুৎপাদ—ইহা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত দ্বাদশ গ্রন্থির একটি শৃঙ্খল। ইহাদের মধ্যে প্রথম দুইটি গ্রন্থি (অর্থাৎ অবিদ্যা এবং সংস্কারসমূহ) পূর্বজন্মের, মধ্যবর্তী আটটি গ্রন্থি বর্তমান জন্মের এবং শেষ দুইটি ভবিষ্যৎ জন্মের।"[৪১]

সংসার হইতেছে দুঃখরূপ। ইহা রাগ, দ্বেষ, লোভ এবং ক্লেশদ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহারা অবিদ্যা হইতে উদ্ভূত হয়। অবিদ্যা হইতেছে স্থির এবং অভিন্ন বস্তু (আত্মা) আছে এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা; আমরা বস্তুসমূহকে স্থির মনে করিয়া উহাদের প্রতি আসক্ত হই। সুতরাং আত্মার অস্তিত্বে ভ্রান্ত বিশ্বাসই দুঃখের মূল কারণ, উহা হইতেই সংসার-চক্র উৎপন্ন হয় এবং সঞ্চালিত থাকে (প্রতীত্যসমুৎপাদ)। এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া নির্বাণের সাধক দুঃখনিবর্তক আধ্যাত্মিক সাধনায় নিযুক্ত হন। বৌদ্ধধর্মের সর্বসম্প্রদায়েই এই সাধনমার্গের তিনটি ধাপ আছে—সদ্গুণসমূহের অনুশীলন (শীল), ধ্যান (সমাধি) এবং সাক্ষাৎ অন্তর্দৃষ্টি (প্রজ্ঞা)।

অভিধর্মগ্রন্থসমূহে সিদ্ধিলাভের চারিটি স্তর এবং চারিটি আর্যসত্যের প্রত্যেকটির জন্য চারিটি প্রজ্ঞাভূমি— এইভাবে ষোলটি প্রজ্ঞাভূমির বর্ণনা আছে।

অভিধর্মের ধারণা এই যে, অন্তর্দৃষ্টির শক্তিদ্বারা সাপেক্ষ অবস্থা বস্তুতঃই নিরপেক্ষ তাত্ত্বিক অবস্থায় পরিণত হয়। নির্বাণকে প্রায় এইভাবে কল্পনা করা হইয়াছে যে, উহা ক্রিয়াপ্রবণ জাগতিক শক্তিসমূহের অভাব অথবা বিনাশরূপ। এইসব ধারণা হইতে বুঝা যায় যে, নির্বাণ এবং সংসার পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। মাধ্যমিক কিন্তু এই সকল মতের বিরোধী।

৪। সৌত্রান্তিক সম্প্রদায়

(বিচারমূলক বস্তুবাদ)

সর্বাস্তিবাদের সমালোচনা ঃ আভিধর্মিক দর্শনে বিনাবিচারে গৃহীত বহু মত রহিয়াছে; উহাতে মানসিক ধারণা এবং শব্দসমূহকে বাস্তব সত্তা দেওয়ার দিকে প্রবণতা দেখিতে পাওয়া যায়; তাহা ছাড়া বস্তুর অন্তিম উপাদানসমূহের সদা বিদ্যমানতা স্বীকার করা উহার একটি বৈশিষ্ট্য। অন্যান্য বৌদ্ধসম্প্রদায় এই সবগুলিরই সমালোচনা করিয়াছিল। সৌত্রান্তিক সম্প্রদায় অভিধর্মগ্রন্থগুলিকে পরিহার করিয়া স্বয়ং বুদ্ধের সাক্ষাৎ বাণীর (সূত্রের) উপর নির্ভর করে[৪২] এবং এই সম্প্রদায়ই উক্ত সমালোচনা সুসংবদ্ধভাবে করিয়াছে।

সর্বাস্তিবাদীরা বলে যে, অন্তিম উপাদানসমূহ ধর্ম) অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সর্বকালেই বিদ্যমান, কারণ "(১) শাস্ত্রে এইরূপ বলা হইয়াছে, (২) যেহেতু প্রত্যক্ষের দুইটি (কারণ) আছে, (৩) যেহেতু প্রত্যক্ষের বিষয়ের অস্তিত্ব আছে, (৪) যেহেতু (পূর্বকর্মদ্বারা) ফলের উৎপত্তি হয়। যেহেতু আমরা এই সকল বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করি, সেইজন্য আমরা সব কিছুই আছে এই মতবাদ (সর্বাস্তিবাদ) পোষণ করি।"[৪৩] প্রধান যুক্তিটি এই যে, যোগ্য ইন্দ্রিয় এবং বিষয়দ্বারা জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সুতরাং আমরা যখন কোনও অতীত ঘটনা স্মরণ করি অথবা কোন ভবিষ্যৎ ঘটনার কথা ভাবি, তখন ঐ অতীত ও ভবিষ্যৎ ঘটনা জ্ঞানের বিষয়রূপে কাজ করিবার জন্য অবশ্যই বিদ্যমান থাকিবে। অতীতের হৃদয়াবেগ-সমূহও আমাদের বর্তমান ব্যবহারের উপর প্রভাব বিস্তার করে এরূপ লক্ষিত হয়। বস্তুর ত্রৈকালিক সত্তার স্বরূপ ব্যাখ্যা করিবার জন্য চারিটি ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ[৪৪] উপস্থাপিত করা হইয়াছিল।

এই সম্বন্ধে সৌত্রান্তিকের প্রশ্ন এই : "বস্তুর উপাদান যে অর্থে বর্তমানকালে আছে, যদি সেই অর্থেই উহা ভবিষ্যতে এবং অতীতে থাকে, তাহা হইলে উহা ভবিষ্যৎ অথবা অতীত বলা হয় কেন ?" তাহা হইলে সর্বকালিক ভেদেরই বিলোপ ঘটিবে। ইহা বলাও ঠিক হইবে না যে, অতীতে এবং ভবিষ্যতে উপাদানের শুধু স্বরূপটিই বিদ্যমান থাকে, কিন্তু উহার ক্রিয়া থাকে না। কারণ বস্তু উহার ক্রিয়া ব্যতীত অন্য কিছুই নয়। উপাদানসমূহের অবিরত বিদ্যমানতা স্বীকার করা শাশ্বতবাদেরই একটি প্রকার। ইহাও অত্যাবশ্যক নহে যে, জ্ঞানের বিষয় হওয়ার জন্য একটা কিছু বস্তুতঃই থাকিবে। কারণ এইরূপ মানিলে বহু অসম্ভব কথা মানিতে হয়। যথা : সুদূর ভবিষ্যৎ, অলীক অর্থাৎ সম্পূর্ণ অসৎ বস্তু অথবা অপ্রাপ্ত নির্বাণ বুদ্ধির বিষয় হওয়া মাত্রই অস্তিত্বলাভ করে। সর্বাস্তিবাদী হইতেছেন বিনাবিচারে বস্তুবাদের সমর্থনকারী, তাই তিনি যাহা শুধু বুদ্ধির আকারে বিদ্যমান এবং যাহা বাস্তবিকই অস্তিত্ববান এই দুয়ের মধ্যে ভেদ করিতে পারেন না।

ধর্মসমূহ : বৈভাষিকেরা ধর্মসমূহের যে সকল প্রকাণ্ড তালিকা করিয়াছেন, সৌত্রান্তিকগণ সেইগুলিকে সংক্ষিপ্ত আকার দিয়াছেন। তাঁহারা যে শুধু অতীত এবং ভবিষ্যৎ অবস্থাগুলিকে অস্বীকার করিয়াছেন তাহা নহে, অধিকন্তু আকাশ, নির্বাণ এবং অ-মানসিক শক্তিগুলিকেও (চিত্ত-বিপ্রযুক্ত) পরিত্যাগ করিয়াছেন। অন্তিম বিশ্লেষণে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত তেতাল্লিশটি ধর্মের[৪৫] একটি তালিকা প্রণয়ন করা হইয়াছিল। নিম্নলিখিতগুলি এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত :—

(অ) জড়বস্তু (রূপ)—চারিটি মূল রূপ (উপাদান) এবং তদধীন চারিটি রূপ (উপাদয়ে-রূপ)।

(আ) বেদনা—সুখ, দুঃখ এবং ঔদাসীন্য।

(ই) ইন্দ্রিয় (সংজ্ঞা) ছয়টি—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন (চিত্ত)।

(ঈ) চৈতন্য (বিজ্ঞান) ছয়টি—উপরে লিখিত ছয়টি ইন্দ্রিয়ের অনুসারী ছয় প্রকার জ্ঞান।

(উ) শক্তিসমূহ (সংস্কার) কুড়িটি—দশটি সু, এবং দশটি কু।

প্রমাণশাস্ত্র : ভারতীয় চিন্তাধারার বিকাশে সৌত্রান্তিকদের প্রকৃতপক্ষে যে বিশেষ দান, তাহা হইতেছে ব্যবহারিক জগৎ জ্ঞাতা বা মনের লোকাতীত ক্রিয়াদ্বারা নির্মিত হয়, এই তত্ত্বের আবিষ্কার। দিঙ্‌নাগ (পঞ্চম শতাব্দী) ও ধর্মকীর্তি (সপ্তম শতাব্দী) কান্টীয় চিন্তাধারার অনুযায়ী এক বাহুল্যবর্জিত সুসংবদ্ধ ও বিপ্লবকারী তর্কশাস্ত্র এবং প্রমাণশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন।

ইহার আলোচ্য বিষয় হইতেছে প্রমাণ (জ্ঞানের যথাযোগ্য সাধন বা উপায়)। প্রমাণের লক্ষণ হইতেছে ঐরূপ জ্ঞান[৪৭] যাহা সদ্বস্তুর সহিত বিসংবাদী নয়; তাহা ছাড়া উহা হইতেছে অবিদিত অথবা অনধিগতের জ্ঞান।[৪৮] প্রমাণসম্বন্ধে চারিটি বিষয়ের[৪৯] আলোচনা করা হয়—উহাদের সংখ্যা, স্বরূপ, বিষয় এবং ফল। বৌদ্ধ ন্যায়শাস্ত্রে সর্বত্র শুধু দুইপ্রকার প্রমাণ স্বীকৃত হইয়াছে[৫০]—প্রত্যক্ষ এবং অনুমান; ইহারা পরস্পরের বিরোধী এবং এই দুইটি হইতে পৃথক অন্য কোনও প্রমাণ নাই। প্রত্যক্ষের কাজ হইতেছে গ্রহণ অথবা অকৃত্রিম বস্তুর সহিত পরিচয় করিয়া দেওয়া। দ্বিতীয়টির কাজ হইতেছে উহাকে কোন এক ছাঁচে ফেলিয়া ভাবা বা চিন্তা করা (অধ্যবসায়)।[৫১] কান্টের মতের সহিত এই মতের অভেদত্ব লক্ষণীয় : "...মানবীয় জ্ঞানের দুইটি শাখা—ইন্দ্রিয়সংবেদন এবং বুদ্ধি বা চিন্তা; হয়ত ইহারা একই, কিন্তু আমাদের নিকট অপরিজ্ঞাত মূল হইতে উৎপন্ন হয়। প্রথমটি দ্বারা আমাদের নিকট বিষয়সমূহ উপস্থাপিত হয় এবং দ্বিতীয়টি দ্বারা উহারা চিন্তিত অথবা বোধগম্য হয়।"[৫২]

যদিও অনুমানের বিষয় 'সামান্য' এবং প্রত্যক্ষের বিষয় 'বিশিষ্ট', তথাপি এইরূপ বুঝিলে ঠিক হইবে না যে, 'বিশিষ্ট' এবং 'সামান্য' বলিয়া দুইপ্রকার সমসত্তাক বস্তু আছে। প্রকৃতপক্ষে একমাত্র বিশিষ্টই সৎ (মেয়ং ত্বেকং স্বলক্ষণম্) কিন্তু উহা দুই বিভিন্ন রকমে[৫৩] জ্ঞাত হয় : প্রত্যক্ষে উহা স্বরূপে এবং অনুমানে বা চিন্তায় উহা পররূপে গৃহীত হয়। এই দুই প্রমাণের মধ্যে প্রত্যক্ষই মৌলিক আর চিন্তা হইতেছে তদধীন মিথ্যা বিভূতি। বিশিষ্টই পরমার্থসৎ আর সামান্য শেষবিচারে অবস্তু। অনুমান স্বরূপতঃই ভ্রান্ত[৫৪] (ভ্রান্তমনুমানম্)। যদিও অন্তিম বিচারে উহা (সামান্য) অবস্তু, তথাপি উহার ব্যবহারিক প্রামাণ্য আছে। "মণি হইতে নিঃসৃত রশ্মি এবং দীপ হইতে নিঃসৃত রশ্মি এই দুইটির একটিও মণি নহে; কিন্তু প্রথমটিকে মণি বলিয়া ভ্রান্তি হইলে মণিলাভ হইতে পারে, অপরটিকে মণি বলিয়া ভ্রান্তি হইলে তাহা সম্ভবপর নহে।"[৫৫]

অনুমান পরিহার করা সম্ভবপর নয়, যেহেতু প্রত্যক্ষই একমাত্র[৫৬] প্রমাণ এই কথা বলিতেও ভেদ এবং সম্বন্ধ অত্যাবশ্যক, কারণ এইস্থলে আমরা প্রত্যক্ষসম্বন্ধে কিছু বলি। তাহা ছাড়া নীলের সংবেদন হওয়াই উহাকে নীল বলিয়া জানা নয়। প্রত্যক্ষকে প্রত্যক্ষ বলিয়া জানিতে হইলে, উহাকে অন্য পদার্থ হইতে ব্যাবৃত্ত করিয়া উহাকে বুদ্ধিদ্বারা পরিচ্ছিন্ন করিতে হইবে, এবং এইরূপ জ্ঞান (অধ্যবসায়) কেবল সামান্যের জ্ঞান (বিকল্প)-দ্বারাই সম্ভবপর। অধিকন্তু যে জগতে বহু জ্ঞাতা আছে,

সেখানে একজনকে নিজের অনুভব অপরের নিকট ব্যক্ত করিবার জন্য সংকেত এবং সামান্যের ধারণা অপরিহার্যভাবে ব্যবহার করিতে হয়। সুতরাং প্রত্যক্ষ ছাড়া অনুমানও স্বীকার করিতে হইবে।

'প্রত্যক্ষ' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইতেছে, 'ইন্দ্রিয়ের সম্মুখীন'। কিন্তু এইরূপ জ্ঞানের সার হইতেছে সাক্ষাত্ত্ব[৫৭] অর্থাৎ বিশুদ্ধ পরিচিতি, এইরূপ বুঝা যাইতে পারে। দিঙ্‌নাগ[৫৮] প্রত্যক্ষের এইরূপ লক্ষণ দিয়াছেন: প্রত্যক্ষ হইতেছে সেইরূপ জ্ঞান যাহা সর্বপ্রকার কল্পনা অর্থাৎ নাম, জাতি হইতে বিমুক্ত। কল্পনা নয় এইভাবে নিষেধাত্মক লক্ষণ দেওয়াই এখানে অপরিহার্য হইয়াছে। ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য হইতেছে প্রত্যক্ষকে উহা যাহা নয় তাহা হইতে, অর্থাৎ অভিধেয় হইতে পৃথক্ করা কিংবা ব্যবচ্ছিন্ন করা। এরূপ বলা ঠিক হইবে না যে, কোন পদার্থ হইতে চিন্তার সর্বআকারগুলিকে সরাইয়া দিলে অবশিষ্ট কিছুই থাকে না, কারণ তখনও প্রত্যক্ষে যাহা দেওয়া থাকে তাহার অভ্যন্তরস্থ অবশ্যস্বীকার্য একটা কিছু সারবস্তু অনুভবে থাকিতে বাধ্য—ঐ ইদং যাহার উপর চিন্তার আকারগুলি আরোপ করা হয়। ঐ ইদং যদি অনুভব করা না হইত, চিন্তা তাহার ব্যাখ্যাকর্য আরম্ভই করিতে পারিত না। সবিকল্প জ্ঞানের বিশেষ্য পদার্থটিকে বিশেষণ পদার্থে সম্পূর্ণভাবে পরিণত করা যায় না বলিয়া উহাকে একেবারে অস্বীকার করা সমর্থনযোগ্য নহে। সবিকল্প জ্ঞানের প্রকৃত বিশেষ্য উহার বাহিরেই থাকে এবং সমগ্র সবিকল্পজ্ঞানটিই উক্ত বিশেষ্যের চিন্তাবস্তুরূপ বিশেষণ রূপে বিধান করা হয়। "প্রত্যক্ষ ব্যতীত চিন্তা শূন্যগর্ভ হইবে"—প্রত্যক্ষের সাক্ষাৎজ্ঞানে যাহা প্রদত্ত হয়। এই প্রদত্ত পদার্থটির অস্তিত্ব অথবা অভাব[৫৯] দ্বারাই অনুভবের বৈশিষ্ট্য নির্দিষ্ট হয়।

সাক্ষাৎজ্ঞান স্বরূপতই সত্য, এবং বিষয়ের সহিত অবিসংবাদী নয়। ইহাতে ভ্রান্তির[৬০] সম্ভাবনা নাই, কারণ ইহাতে বিচারাত্মক নির্ণয় এবং ব্যাখ্যা নাই। সাক্ষাৎজ্ঞানের বিষয় হইতেছে স্বস্বরূপে স্থিত বস্তু (পরমার্থসৎ), সৌত্রান্তিকগণ বুদ্ধের প্রকৃত শিষ্যরূপে উহাকে অনন্যসাধারণ অণু-ক্ষণ (স্বলক্ষণ)[৬১] বলিয়া মনে করেন। কোন কোন অদ্বৈতবাদীও বলেন যে, প্রত্যক্ষে আমরা স্বরূপে স্থিত বস্তুই সাক্ষাৎ করি ; কিন্তু অদ্বৈতমতে উহা হইতেছে ব্যাপকতম নির্বিশেষ অদ্বয়তত্ত্ব।

সাক্ষাৎজ্ঞান চারিপ্রকার : (১) ইন্দ্রিয় জন্য (ইন্দ্রিয়নিমিত্তম্) (২) মানস (মানস-প্রত্যক্ষ)।[৬২] ইহার বিষয় হইতেছে অণু-ক্ষণ এবং ইহা ইন্দ্রিয়জ-প্রত্যক্ষের অব্যবহিত পরক্ষণেই উৎপন্ন হয়। যে প্রয়োজনে কাণ্ট বৌদ্ধিক আকারগুলির কল্পনায় অস্পষ্ট রূপায়ণ স্বীকার করিয়াছিলেন, সেই প্রয়োজনেই মানস-প্রত্যক্ষের এই

প্রহেলিকাময় ব্যাপার স্বীকার করা হইয়াছিল। ঐ প্রয়োজনটি হইতেছে প্রত্যক্ষ এবং চিন্তা এই দুইয়ের মিলন ঘটাইতে পারে এরূপ মধ্যবর্তী কোন ব্যাপার[৬৩] আবিষ্কার করা। (৩) জ্ঞান এবং সুখদুঃখাদি মানসিক অবস্থাগুলির সাক্ষাৎজ্ঞান (স্ব-বিষয়ক জ্ঞান, স্ব-সংবেদন)। ভাট্টমতে যেমন এইগুলি অজ্ঞাত থাকে অথবা ন্যায়মতে যেমন এইগুলি অন্য জ্ঞানদ্বারা জ্ঞাত হয়, বৌদ্ধমতে সেরকম অজ্ঞাত অথবা জ্ঞাত কিছুই নয়। (৪) যোগি-প্রত্যক্ষ।[৬৪] ইহা হইতেছে যোগীর অতীন্দ্রিয় বৌদ্ধিক প্রত্যক্ষ। যোগীরা তাঁহাদের একাগ্রতার (ভাবনার) শক্তিদ্বারা বস্তুর যাহা প্রকৃতস্বরূপ তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করেন।

নৈয়ায়িক এবং মীমাংসক যাহাকে সবিকল্প প্রত্যক্ষ বলেন, বৌদ্ধদের মতে তাহা প্রত্যক্ষ নহে, কারণ উহার সহিত চিন্তা (বিকল্প)-ও জড়িত আছে। যেমন প্রত্যভিজ্ঞায় বর্তমানে জ্ঞাত বিষয়ের সহিত পূর্বদৃষ্ট বিষয় সংশ্লিষ্ট থাকে, তেমনই সবিকল্প প্রত্যক্ষও শুধু সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। শিশু যখন মাতৃস্তন তাহার পরিচিত স্তনই (স এবেতি) বুঝিয়া[৬৫] ক্রন্দন পরিত্যাগ করে, তখন সে কোনও শব্দ প্রয়োগ না করিলেও তাহার জ্ঞানে বিকল্পের সকল উপাদানই বর্তমান থাকে। অতএব যাহা শব্দদ্বারা প্রকাশ করা হয়, তাহার সহিত যাহা অভিন্ন অথবা[৬৬] তাহার সহিত যাহা অভিন্ন হওয়ার যোগ্য, এইরূপ জ্ঞানকে বিকল্প বলে। দিঙ্‌নাগের মতে নাম ও জাতির আরোপই 'বিকল্পে'র লক্ষণ। এই লক্ষণের এইরূপ দোষ দেওয়া হইয়াছে[৬৭] যে, জাতি (দ্রব্যাদি) নাম ব্যতীত অন্য কিছু নহে।

যেহেতু কল্পনা হইতেছে নাম, সুতরাং কল্পনার শ্রেণীবিভাগ নামেরই শ্রেণীবিভাগ। কাণ্ট যেমন আকারীয় তর্কবিজ্ঞানে সবিকল্প জ্ঞানের যে সব শ্রেণী মানা হইয়াছে সেইগুলিই গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ দিঙ্‌নাগও[৬৮] শব্দ অথবা নামের প্রচলিত শ্রেণী বা বিভাগগুলিই গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বিভাগ বা শ্রেণীগুলি হইতেছে : ব্যক্তির নাম, জাতি, দ্রব্য, গুণ এবং কর্ম। নাম জাতিবিষয়ক জ্ঞান যদি কেবল অনুমানদ্বারাই উৎপন্ন হয় (সামান্যবিষয়মনুমানম্‌), এবং অনুমান যদি সামান্যের (হেতুর) জ্ঞানতঃ প্রয়োগ না করিয়া সম্ভবপর না হয়, তাহা হইলে হয় চক্র নয় অনবস্থা এই দোষ অপরিহার্য হইয়া পড়ে। দুই প্রকার জ্ঞানের বিষয়ও দুই প্রকার বৌদ্ধদের এই মতের বিরুদ্ধে সঙ্গতভাবেই কুমারিল[৬৯] এই আপত্তিটি উত্থাপন করিয়াছেন, বৌদ্ধগণ কিন্তু বিকল্পের দুইটি বিভিন্ন স্তর[৭০] স্বীকার করিয়া এই সঙ্কট এড়াইয়াছেন—প্রথমটি হইতেছে প্রত্যক্ষের সহিত সংযুক্ত (প্রত্যক্ষ-পৃষ্ঠ-ভাবি-বিকল্প); এবং দ্বিতীয়টি হইতেছে প্রত্যক্ষ হইতে বিনির্মুক্ত—ইহাই অনুমানে

সজ্ঞানে লিঙ্গরূপে ব্যবহৃত হয় (অনুমানবিকল্প)। প্রথমটি হইতেছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে একটি কল্পনার আরোপ রূপ সবিকল্প জ্ঞান; দ্বিতীয়টি হইতেছে একটি কল্পনার সাহায্যে অপর একটি কল্পনার আরোপ রূপ জ্ঞান।

প্রত্যক্ষাত্মক সবিকল্পক জ্ঞান (এবং ইহা নিশ্চয়ই সবিকল্পক জ্ঞানের প্রকৃষ্ট উদাহরণ) উহার বিধি কিংবা নিষেধ (বিধিবিকল্প ও নিষেধবিকল্প) এই দুইরূপের কোন রূপেই পূর্বোক্ত দুইটি প্রমাণ হইতে ভিন্ন কোন প্রমাণ নহে। যেহেতু পদার্থ-সমূহ স্বরূপতঃই পরস্পর হইতে ভিন্ন, সুতরাং নিষেধ বিকল্প অর্থাৎ চিন্তায় কিংবা বিকল্পে উহাদের ভেদীকরণদ্বারা নূতন কিছুই বলা হয় না। বিধিবিকল্পের অর্থ হইতেছে, পদার্থসমূহের ভেদ এবং ক্ষণিকত্ব উপেক্ষা করিয়া এক অভিন্ন সামান্যধর্ম উপস্থাপিত করা। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে উহা মিথ্যাধর্মেরই আরোপ; অতএব উহাও কোন প্রমাণ নহে।

অনুমান দুই প্রকার: স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমান। প্রথমটি মৌলিক, দ্বিতীয়টি হইল অন্যের মনে বিশ্বাস উৎপাদন করিবার জন্য শব্দের প্রয়োগদ্বারা প্রমাণ করা। অনুমিতি হইতেছে, সজ্ঞানে কোন লিঙ্গের সাহায্যে অপ্রত্যক্ষ বস্তুর জ্ঞান। লিঙ্গের উদাহরণ: যথা, নিয়তভাবে ত্রিধর্মযুক্ত[১২] ধূম—ত্রিধর্মের প্রথমটি হইতেছে পক্ষে হেতুর অবস্থিতি, দ্বিতীয়টি হইতেছে সদৃশ স্থলে (শুধু সপক্ষে) হেতুর অবস্থিতি, এবং তৃতীয়টি হইতেছে সর্ব বিসদৃশ স্থলে (বিপক্ষে) হেতুর অনবস্থিতি। এই ত্রিধর্মের ব্যতিক্রম হইলে ক্রমান্বয়ে অসিদ্ধ, অনৈকান্তিক এবং বিরুদ্ধ এই তিন প্রকার হেত্বাভাসের উৎপত্তি হয়। ব্যাপ্তি[১৩] (অবিনাভাব) অর্থাৎ হেতু এবং সাধ্যের যে সম্বন্ধ, উহার মাত্র তিনটি বিভাগ আছে। কিন্তু মূলতঃ উহা দুইটি পরস্পরবিরোধী ভাগে বিভক্ত—প্রথমটিতে সাধ্যের অস্তিত্ব এবং দ্বিতীয়টিতে সাধ্যের অভাব (অনুপলব্ধি) নির্দেশ করা হয়। প্রথমটিকে আবার দুইটি উপশ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—(১) প্রথমটিতে, হেতু এবং সাধ্য এই দুই ধারণা দ্বারাই একই অভিন্ন বস্তুকে নির্দেশ করা হয় (তাদাত্ম্য অথবা স্বভাব হেতু), যথা ইহা বৃক্ষ যেহেতু ইহা অশ্বত্থ; (২) দ্বিতীয়টিতে, হেতু এবং সাধ্য পরস্পর হইতে ভিন্ন হইলেও কার্যকারণরূপে নিয়ত নির্ভরশীল[১৪] (তদুৎপত্তি অথবা কার্য-হেতু), যথা, অগ্নি আছে যেহেতু ধূম আছে। উপলব্ধি এবং অনুপলব্ধি—এই দুইয়ের কোনটি দ্বারাই এই সব ব্যাপ্তির নির্ণয় হয় না।[১৬] উহারা অনুভব-নিরপেক্ষ, অবশ্যস্বীকার্য বৌদ্ধিক নিয়ম।

প্রত্যক্ষ এবং অনুমিতি এই উভয়প্রকার জ্ঞানেই, জ্ঞান (প্রমিতি) এবং জ্ঞানের সাধন (প্রমাণ) এই দুইটি পরস্পরের সহিত অভিন্ন।[১৭]

৫। মাধ্যমিকের দ্বন্দ্বমূলক চরমতত্ত্ববাদ

সৌত্রান্তিক মতের সমালোচনা: সৌত্রান্তিকের প্রমাণবিজ্ঞানে দুই বিভিন্ন স্তরের জ্ঞান স্বীকার করা হইয়াছে। এই মতবাদ দুই বিভিন্ন শ্রেণীর বিষয়ের স্বীকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত। (১) সাক্ষাৎ জ্ঞানলব্ধ স্বরূপস্থ বস্তু এবং (২) চিন্তা অথবা কল্পনায় উহার ধারণাত্মক প্রতিনিধি (বিকল্প)। স্বরূপস্থ বস্তু এবং বিকল্প, এই দুই বিজাতীয়[১৮] উপাদানের সমন্বয় অথবা তাদাত্ম্য (সারূপ্য)—ইহাই আমাদের অনুভব। এই সারূপ্য সম্বন্ধটিকে প্রতিনিধিবাদ* বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। প্রতিনিধিবাদের মূল কথা এই যে, আমরা বাহ্যবস্তু সাক্ষাৎভাবে জানি না, সাক্ষাৎভাবে যাহা জানি, তাহা হইতেছে মনের কতকগুলি ধারণামাত্র। (এই ধারণাগুলি বাহ্য-বস্তুর প্রতিচ্ছবি)। কিন্তু সৌত্রান্তিকেরা দৃঢ়ভাবে বলেন যে, প্রত্যক্ষে আমরা সদ্বস্তুর সহিত সাক্ষাৎভাবেই সংস্পর্শে আসি। তাঁহাদের বক্তব্য শুধু এই যে, প্রত্যক্ষে জ্ঞানের জ্ঞাতৃগত অংশটিকে জ্ঞাতৃনিরপেক্ষ স্বরূপস্থ বস্তু বলিয়া ভ্রম করা হয়। ব্যাবহারিক জগতে আমাদের যে সব ভ্রান্তি ঘটে, এই ভ্রম তাহাদের মত নয়। মানবীয় অনুভবের লক্ (Locke) যে বিশ্লেষণ দিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা কাণ্ট (Kant) যে বিশ্লেষণ দিয়াছেন, উহার সহিত এই সৌত্রান্তিক মতের সাদৃশ্য বেশী। মানবীয় জ্ঞানে 'চিন্তা'র কার্য কি তাহাই এই মতবাদে বিচারের সাহায্যে স্পষ্টভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে।

সৌত্রান্তিকদের এই বিপ্লবকারী আবিষ্কারের ফলে, মাধ্যমিকদের চরমতত্ত্ববাদ এবং যোগাচারদের বিজ্ঞানবাদ, এই দুই দিকে বৌদ্ধচিন্তার গুরুত্বপূর্ণ বিকাশ ঘটিয়াছিল। মাধ্যমিক বলেন যে, সৌত্রান্তিক বাস্তবিকই জ্ঞানের জ্ঞাতৃগত অংশটি আবিষ্কার করিয়াছেন, কিন্তু উহার যে গভীরতর তাৎপর্য তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই; তিনি কতকগুলি ক্ষণিক বস্তুর সত্তা স্বীকার করিয়া, উহাদের উপর বৌদ্ধিক আকার আরোপ করা হয়, এইরূপ মানিয়া বিশেষ না ভাবিয়া, অতি শীঘ্র একটি মতবাদ গড়িয়া তুলিলেন। তাঁহার সমালোচনাত্মক বিচার পর্যাপ্ত নহে। কারণ, ইহার ঠিক বিপরীতভাবে এইরূপ মতও পোষণ করা যাইতে পারে যে, সদ্বস্তু প্রকৃতপক্ষে শাশ্বত, ব্যাপক এবং এক, উহার উপরে ভেদ এবং পরিবর্তন আরোপ করা হয়—

---

* পাশ্চাত্য জ্ঞানতত্ত্বে এরূপ একটি মত আছে যে, আমরা বাহ্যবস্তু কখনও সাক্ষাৎভাবে জানি না, কিন্তু মনের কোনও ধারণার মাধ্যমে তাহা জানি; এই ধারণা বাহ্যবস্তুর প্রতিনিধিরূপে কাজ করে—এই মতবাদকে প্রতিনিধিবাদ বলা হয়।—বাজলা সংস্করণের সম্পাদকগণ

এইরূপ আপাতযুক্তিসিদ্ধ মত বেদান্তদর্শনে গৃহীত হইয়াছে। প্রথমটি নৈরাত্ম্যবাদ ও অপরটি আত্মবাদ ; এবং উহারা পরস্পরের বিরোধী।[৭৯] একই সঙ্গে এই দুইটি মত সত্য হইতে পারে না, এবং এই উভয় মতকেই জ্ঞাতৃসাপেক্ষ বলিয়া প্রত্যাখ্যান না করিয়া অন্য উপায়ে ইহাদের বিরোধ দূর করা অসম্ভব। সদ্বস্তুকে ক্ষণিক অথবা শাশ্বত, বিশিষ্ট অথবা সামান্য ইহার কোন ভাবেই ধারণা করা সঙ্গত হইবে না। ক্ষণিক ও শাশ্বত দুইই বিকল্পমাত্র, অর্থাৎ বুদ্ধিনির্মাণ। সদ্বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে হইলে উক্ত দুই দৃষ্টিই পরিত্যাগ করিতে হইবে (দৃষ্টিসমূহের শূন্যতা)। ইহাই মাধ্যমিকের বিরোধমূলক অথবা দ্বন্দ্বমূলক যুক্তি। সমালোচনাত্মক বিচারের ইহাই পরিপক্ক পরিণতি।

বস্তু এবং তাহার জ্ঞানের সম্বন্ধ (সারূপ্য) কী ? ইহা লইয়া যোগাচার-সম্প্রদায় বিশেষ বিচার করিয়াছিলেন। জ্ঞানে যে বস্তুর ভ্রান্তিমূলক অধ্যাস করা হয়, তাহাতে বুঝা যায় যে, উহাদের মূলে একটি পরম সত্তা আছে। এই সত্তা চৈতন্য (বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা) ছাড়া আর কিছু হইতে পারে না। সৌত্রান্তিকের মতে জ্ঞানে প্রতিভাত বিষয় জ্ঞানেরই বিকারমাত্র হইলেও স্বরূপে স্থিত বস্তুর জ্ঞান-নিরপেক্ষতা স্বীকৃত হয়। হেগেল যেভাবে কাণ্টের সমালোচনা করেন, সেইভাবে সৌত্রান্তিকের সমালোচনায় যোগাচারের বক্তব্য এই যে, জ্ঞানের যে বিষয় জ্ঞানাতিরিক্ত বলিয়া মনে হয়, তাহাও প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানেরই সৃষ্টি ; বিষয়ী এবং বিষয়ের দ্বৈত (গ্রাহদ্বয়) তৎপূর্ববর্তী একটি অদ্বৈতবিজ্ঞানের সূচনা করে। ইহাই পারমার্থিক সদ্বস্তু।

এইভাবে সৌত্রান্তিকের বিচারমূলক বস্তুবাদ হইতে একদিকে মাধ্যমিকের দ্বন্দ্ব-মূলক চরমতত্ত্ববাদ এবং অপরদিকে যোগাচারের বিজ্ঞানবাদের উৎপত্তি হইয়াছিল।

<u>মাধ্যমিক চিন্তার বিকাশ</u> : মাধ্যমিক দর্শনের প্রাণ হইতেছে দ্বন্দ্বমূলক বিচার। বুদ্ধ যখন জগৎ, আত্মা এবং পূর্ণতাপ্রাপ্ত জীব (তথাগত)-সম্বন্ধে চৌদ্দটি প্রশ্নের (অব্যাকৃতের) উত্তর দিতে রাজী না হইয়া নীরবতা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তখন তিনি মাধ্যমিক দর্শনের মূলতত্ত্বের পূর্বাভাস দিয়াছিলেন।[৮০] কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, বুদ্ধের প্রধান ঝোঁক ছিল কর্মের দিকে, সেইজন্য তিনি তত্ত্ববিদ্যার প্রতি উদাসীন ছিলেন অথবা তত্ত্বের ব্যাপারে তিনি অজ্ঞেয়বাদী অথবা নিস্তত্ত্ববাদী ছিলেন। বুদ্ধের নীরবতার প্রকৃত ব্যাখ্যা অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন্ এইভাবে দিয়াছেন : "যদি পরমতত্ত্বের স্বরূপ নির্ধারণ করিতে বুদ্ধ অস্বীকার করিয়া থাকেন, অথবা যদি তিনি উহার শুধু নেতিমূলক লক্ষণ দিয়াই সন্তুষ্ট থাকেন, তাহা হইলে উহার একমাত্র অর্থ এই যে, পরমতত্ত্ব সর্বপ্রকার

লক্ষণের উর্ধ্বে।"[৮১] বুদ্ধ নিজেকে সর্বপ্রকার মতবাদের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন : "তথাগত সকল মতবাদ হইতে বিমুক্ত।"[৮২] তিনি কচ্চায়নকে বলিয়াছিলেন : "সর্ব বস্তুই আছে, ইহা এক অন্ত, উহা নাই, ইহা অপর অন্ত। তথাগত এই দুই অন্তের মধ্যবর্তী ধর্মের উপদেশ দেন (মজ্‌ঝেন ধম্মম দেসেত্তি)।"[৮৩] ইহাতেই মাধ্যমিকের দ্বন্দ্বমূলক বিচারের সারমর্ম নিহিত আছে, এবং নাগার্জুন[৮৪] বুদ্ধের এই উক্তির দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য দিয়াছেন।

প্রজ্ঞাপারমিতা নামক গ্রন্থসকল,[৮৫] সদ্ধর্মপুণ্ডরীক, কাশ্যপ-পরিবর্ত (রত্নকূট) এবং অন্যান্য মহাযান সূত্রসমূহ মাধ্যমিক চিন্তার বিকাশে দ্বিতীয় স্তর। এই সব গ্রন্থে যে একটি মূল ধারণা পুনঃপুনঃ ব্যক্ত করা হইয়াছে, তাহা হইতেছে এই যে, প্রকৃতপক্ষে উৎপত্তি নাই, বিনাশও নাই, আগমনও নাই, গমনও নাই এবং বস্তু আত্মাও নহে অনাত্মাও নহে প্রভৃতি : উহা সর্ব-ব্যাবহারিক ধর্মবিবর্জিত (শূন্য)। দুই প্রকার সত্তা এবং পরমতত্ত্ব এবং ব্যাবহারিক জগতের অভেদ—এগুলিও বিশেষ-ভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

মাধ্যমিক দর্শন উহার প্রতিষ্ঠাতা নাগার্জুনের (আনুমানিক ১৫০ খৃঃ) অসামান্য প্রতিভার একটি মাত্র স্পর্শেই পরিপূর্ণ বিকাশলাভ করিয়াছিল। তাঁহার পর এই দর্শনের মতবাদে কোন গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হয় নাই। তাঁহার প্রতিভাশালী শিষ্য আর্যদেব এই মত প্রতিপাদনে বিশেষ দক্ষতার সহিত তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছেন। বুষ্টনের (Buston) মতে নাগার্জুনের প্রধান গ্রন্থ ছয়টি : মূল মধ্যমককারিকা (প্রজ্ঞামূল), শূন্যতাসপ্ততি, যুক্তিষষ্টিকা, বিগ্রহব্যাবর্তনী, বৈদল্যসূত্র এবং ব্যবহারসিদ্ধি। ইহাদের মধ্যে প্রথমটি ওই সম্প্রদায়ের 'শাস্ত্র' বলিয়া কথিত হয়। এতদ্‌ব্যতীত আরও অনেক গ্রন্থ নাগার্জুন-রচিত বলিয়া মনে করা হয়। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি (যথা—রত্নাবলী, চতুঃস্তব প্রভৃতি) যে তাঁহার রচনা, ইহা মনে করার যোগ্য কারণ আছে। আর্যদেবের চতুঃশতিকার গুরুত্ব মধ্যমককারিকার পরেই। তিনি তাঁহার সাতিশয় বিচারনৈপুণ্যদ্বারা এবং সাংখ্য ও বৈশেষিক প্রভৃতি অ-বৌদ্ধ মতবাদের নিরাকরণ-দ্বারা শূন্যবাদকে বলিষ্ঠ এবং লোকপ্রিয় করিয়াছিলেন।

ইহার পর মাধ্যমিক সম্প্রদায় দুইটি উপ-সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছিল—প্রথমটির নাম প্রাসঙ্গিক, উহার প্রধান সমর্থক বুদ্ধপালিত, দ্বিতীয়টির নাম স্বাতন্ত্রিক এবং উহার প্রধান সমর্থক ভাববিবেক[৮৬]। ভাববিবেকের মতে মাধ্যমিক কেবল পর-মতের স্ববিরোধ দেখাইয়াই (প্রসঙ্গ) ক্ষান্ত থাকিবে না, তদুপরি তাহার বিরুদ্ধে নিজস্ব যুক্তিও প্রদর্শন করিবে। এই জন্যই এই সম্প্রদায়ের নাম স্বতন্ত্র-মাধ্যমিক।

বুদ্ধপালিত এবং ভাববিবেক উভয়েই সমসাময়িক এবং খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর লোক ছিলেন।

চন্দ্রকীর্তি (ষষ্ঠ শতাব্দী) এবং শান্তিদেব (সপ্তম শতাব্দী) ইহারাই বিশেষভাবে মাধ্যমিক দর্শনকে উহার যুক্তিবদ্ধ নৈষ্ঠিক আকার দান করেন। চন্দ্রকীর্তি একজন অসাধারণ গুণসম্পন্ন লেখক ও ভাষ্যকার; তাঁহার বিচারনৈপুণ্য শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর। শেরবাট্স্কি (Stcherbatsky) তাঁহাকে "অদ্বৈতমত প্রতিষ্ঠায় নেতিমূলক পদ্ধতির শক্তিশালী সমর্থক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।" ভাববিবেকের বিরুদ্ধে তিনি স্ববিরোধ দেখাইয়া (প্রসঙ্গ) অন্যের মত নিরাকরণের পদ্ধতিই যে প্রকৃত মাধ্যমিক পদ্ধতি ইহা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। নাগার্জুন এবং আর্যদেব-প্রণীত গ্রন্থসমূহের বৃত্তি বা টীকা ব্যতীত চন্দ্রকীর্তি মধ্যমকাবতার নামক এই দর্শনের এক মূল্যবান্ গ্রন্থও রচনা করিয়াছেন।

শান্তিদেবের 'শিক্ষাসমুচ্চয়' (ইহা মহাযানসূত্রসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত রূপ) 'বোধিচর্যাবতার' সমগ্র মহাযান-সাহিত্যের মধ্যে সর্বাপেক্ষা লোকপ্রিয় দুইটি গ্রন্থ। তাঁহার গ্রন্থসমূহে সর্বত্রই একটি অত্যন্ত উচ্চস্তরের আধ্যাত্মিক গাম্ভীর্য ও অনাসক্তির ভাব বিদ্যমান।

শান্তরক্ষিতের (আনুমানিক অষ্টম শতাব্দী) 'তত্ত্বসংগ্রহে' এবং তাঁহার শিষ্য কমলশীলের 'পঞ্জিকা'য় মাধ্যমিক চিন্তাবিকাশের পরবর্তী অবস্থার সহিত আমরা পরিচিত হই—ইহা হইতেছে যোগাচার এবং মাধ্যমিক মতবাদের মিশ্রণ। "ইহারাই তিব্বতের উপর সাংস্কৃতিক জয় সম্পাদন করিয়া উহাকে বৌদ্ধধর্মের দেশে পরিণত করিয়াছিল। আজ পর্যন্ত মাধ্যমিক মতবাদই তিব্বতীয় ধর্মযাজকদের দ্বারা সমর্থিত দর্শনরূপে বিদ্যমান আছে।"

<u>মাধ্যমিক দ্বন্দ্বমূলক বিচারের গঠন</u> : সম্পূর্ণ পরস্পরবিরুদ্ধ পূর্বপক্ষ এবং প্রতিপক্ষরূপ অন্ততঃ দুইটি মত (দৃষ্টি) হইতে দ্বন্দ্বমূলক চিন্তার উৎপত্তি হয়। এই বিরোধ সর্বাঙ্গীণ, উহা বস্তুর প্রত্যেক অংশ বা দিক্‌কেই স্পর্শ করে, এবং কার্যতঃ এই বিরোধের নিষ্পত্তি হওয়া অসম্ভব, কারণ অভিজ্ঞতার দরবারে ইহার কোন মীমাংসা নাই।

গুরুত্ববোধের সহিত এবং প্রণালীবদ্ধভাবে দর্শনের চর্চা করিলে বিচারবুদ্ধিতে এই বিরোধ দেখা দেয় : দার্শনিক চিন্তার মধ্যে দ্বন্দ্বমূলক বিচার বীজরূপে নিহিত আছে।

ব্রাহ্মণ্য দর্শনসমূহের দ্রব্যবাদ (আত্মবাদ) এবং প্রাচীন বৌদ্ধ দর্শনের ধর্মবাদ

(নৈরাত্ম্যবাদ) এই দুইটি মাধ্যমিক দ্বন্দ্বমূলক বিচারের দুই অন্ত। সৎ এবং অসৎ এই দুইটি হইতেছে মূল বিকল্প। ইহাদিগকে একই সঙ্গে বিধান এবং নিষেধ করিলে তজ্জনিত অপর দুইটি বিকল্পের উদ্ভব হয়। উহাদের আকার 'সদসৎ' এবং 'ন সৎ নৈবাসৎ', অর্থাৎ, 'আছে এবং নাই' ও 'আছে এমন নয়, আবার নাই এমনও নয়।' ইহাই মাধ্যমিকের সুপ্রসিদ্ধ চতুষ্কোটি। যে কোন সমস্যা বিবেচনার জন্য যতগুলি দৃষ্টিভঙ্গী সম্ভবপর, উহাদের সকলগুলিরই প্রতিনিধি হইতেছে এই চারিটি বিকল্প বা কোটি। তাহা ছাড়া এই বিকল্পগুলির সাহায্যে সর্ব দার্শনিক প্রস্থানের শ্রেণীকরণও সম্ভবপর।

হেগেলীয় দর্শন এবং জৈন দর্শনের ন্যায় অন্যান্য দ্বন্দ্বমূলক মতবাদে এই সকল কোটি বা বিকল্পের সমন্বয় বা মিলনদ্বারা এই বিরোধ পরিহারের চেষ্টা করা হইয়াছে। মাধ্যমিক মতে বিকল্প অথবা কোটিগুলিকে এককভাবে অথবা সম্মিলিতভাবে নিষেধ করিয়া এবং বিচারের একটি উচ্চভূমিতে উঠিয়া এই বিরোধের মীমাংসা করা হইয়াছে; কিন্তু বিচারের এই উচ্চভূমিটি প্রকৃতপক্ষে একটি বিশিষ্ট মত বা দৃষ্টি নহে। প্রত্যেক মত বা দৃষ্টিই উহার নিজের বিরুদ্ধেই প্রযুক্ত হইয়াছে: উহার মধ্যে যে স্ববিরোধ নিহিত আছে, তাহা দ্বন্দ্বমূলক বিচারের সাহায্যে অসঙ্গতি প্রদর্শনদ্বারা (প্রসঙ্গ)[৮৮] উদ্‌ঘাটিত করা হইয়াছে। মাধ্যমিক নিজস্ব কোন যুক্তি বা উদাহরণ দেন না, কারণ তাঁহার প্রতিপাদ্য কোন নিজস্ব মত নাই: অপরের মত তাঁহাদেরই সম্মত নিয়ম ও যুক্তির সাহায্যে অপ্রমাণ করা, ইহাই মাধ্যমিকের একমাত্র উদ্দেশ্য।[৮৯]

উদাহরণস্বরূপ, কার্যকারণসম্বন্ধ-বিষয়ে এই দ্বন্দ্বমূলক বিচারপদ্ধতিটি কিরূপ তাহা নিম্নে দেওয়া হইতেছে। সাংখ্যমতে কার্য ও কারণ অভিন্ন, অর্থাৎ উহা একপ্রকার স্ব-পরিণামবাদ। মাধ্যমিক ইহার বিরুদ্ধে সঙ্গতভাবেই বলেন[৯০], নিজেরই পুনরাবৃত্তি করার কোন অর্থ নাই, তাহা ছাড়া এরূপ পুনরাবৃত্তির কোন সীমাও ধার্য করা যায় না। কিন্তু ইহার বিরুদ্ধ মত যে কার্যকারণ হইতে ভিন্ন, তাহাও কম অযৌক্তিক নহে। যেহেতু কার্যকারণ হইতে ভিন্ন সুতরাং উহা সর্বত্রই উৎপন্ন হইতে পারিবে,[৯১] অথবা কোথাও উৎপন্ন হইতে পারিবে না। প্রথম মতে বাস্তবিক পক্ষে উৎপত্তি বলিয়া কিছুই নাই, দ্বিতীয় মতে উৎপত্তি আছে বটে, কিন্তু উহা অহেতুক। যদি এই দুই মতবাদের সমন্বয় (যেমন জৈন দর্শনে দেখা যায়) করা হয়, তাহা হইলে উভয়-মতের বিরুদ্ধে উক্ত সবগুলি আপত্তিই এই সমন্বয়ের বিরুদ্ধেও প্রযোজ্য হইবে। এমন একটি চতুর্থ বিকল্প হইতে পারে যাহাতে কার্য ও কারণের ভেদ এবং অভেদ

এই দুইয়েরই নিষেধ করা হয় ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহাতে কার্যকারণের সম্বন্ধই নিষেধ করিয়া আকস্মিক উৎপত্তি সমর্থন করা হয়।

এইপ্রকার সর্বঘাতী সমালোচনা ক্রমান্বয়ে দ্রব্য, গুণ, সম্বন্ধ প্রভৃতি সর্বপ্রকার পদার্থের বিরুদ্ধেই প্রয়োগ করা হইয়াছে। ব্র্যাড্লির (Bradley) ন্যায় নাগার্জুনও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, অন্যসাপেক্ষ নয় এমন কোন পদার্থই নাই।[২২] আর সাপেক্ষ পদার্থমাত্রই মিথ্যা। বুদ্ধি সত্যকে বিকৃত করে ; উহা দ্বারা আমরা শুধু অবভাসের সহিতই পরিচিত হই।

সাধারণতঃ মনে করা হয় যে, নিজের একটি বিশিষ্ট দৃষ্টি বা মত না থাকিলে সমালোচনা করা সম্ভবপর নয়। কিন্তু বাদীরা যদি প্রত্যেকেই একটি সাধারণ অথবা বিশিষ্ট দৃষ্টি গ্রহণ করিয়া বাদবিবাদে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে বিচারফল স্পষ্টতঃই কাহারও সপক্ষে যাইতে পারে না। কোন মতবাদই উহার প্রতিদ্বন্দ্বী অপর কোন মতবাদদ্বারা নিরাকরণ করা সম্ভবপর নহে। কোন মতবাদের নিরাকরণ করিতে হইলে উহার সমর্থককে বুঝাইয়া দেওয়া দরকার যে, উহাতে স্ববিরোধ রহিয়াছে। মাধ্যমিক শুধু এই পদ্ধতিই অবলম্বন করে। ইহা বলাও সঙ্গত হইবে না যে, মতবাদসমূহের সমালোচনাও অপর একটি মতবাদ ; অর্থাৎ, সর্বদৃষ্টির শূন্যতাও একটি দৃষ্টি। সমালোচনা হইতেছে বিভিন্ন মতবাদ সম্বন্ধে সচেতন হওয়া অথবা উহাদের বিশ্লেষণ করা। উহা নূতন কোন মতের সমর্থন নহে, কিন্তু উহা হইতেছে মতসমূহের গঠন বা স্বরূপ-উদ্ঘাটন। প্রজ্ঞা (শূন্যতা) হইতেছে বিভিন্ন দৃষ্টির নিবৃত্তি অথবা বিলয়।[২৩]

পরমতত্ত্ব : মনে হইতে পারে যে, মাধ্যমিকের এই দ্বন্দ্বমূলক বিচারের ফল হইতেছে আত্যন্তিক নিষেধ এবং এই দর্শনে খুঁটিনাটি সর্বব্যাপারে সম্পূর্ণ অভাববাদ সমর্থন করা হইয়াছে। এই সমালোচনার মূলে রহিয়াছে ভ্রান্ত ধারণা এবং উহা এই দর্শনের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধেও অজ্ঞানেরই পরিচায়ক। উহার বিচারপ্রণালী নেতিমূলক বটে, কিন্তু উহার উদ্দেশ্য নিষেধাত্মক নহে। বুদ্ধি বা বিচার সত্যকে জানিতে পারে না এই কথা বলিলেই সত্যকেও নিষেধ করা হয় এমন নহে। বুদ্ধি বা বিচারই জ্ঞানের একমাত্র প্রকার নহে। মাধ্যমিকের দ্বন্দ্বমূলক বিচার তিনটি স্তরের মধ্য দিয়া সম্বস্তর বুদ্ধ্যতীত সাক্ষাৎ অথবা অদ্বয়াত্মক জ্ঞানে পর্যবসিত হয়। প্রথমতঃ বিনাবিচারে গৃহীত দৃষ্টিসমূহের সংঘর্ষ উপলব্ধি করা হয়। দ্বিতীয় স্তরে এই জ্ঞান উৎপন্ন হয় যে, এইসব দৃষ্টি অথবা বিচার-নির্মিতি সম্বস্তর মিথ্যা বিকৃতি-মাত্র। দৃষ্টিগুলির মধ্যে স্ব-বিরোধ রহিয়াছে এই যুক্তিদ্বারা পূর্বোক্তরূপ দৃঢ়প্রত্যয়

অম্লান হয়। বিচার বা বুদ্ধির আত্যন্তিক নিষেধই একই সঙ্গে অস্তিত্ব ও নাস্তিত্বের দ্বৈত হইতে বিমুক্ত তত্ত্বের সাক্ষাৎ অনুভূতি। উহা হইতেছে প্রজ্ঞা অথবা জ্ঞানমদ্বয়ম্[২৪] এবং তত্ত্বের সহিত অভিন্ন।

এই দর্শনে অবভাসের ভিত্তিরূপে তত্ত্ব[২৫] (বা সত্যবস্তু) স্বীকার করা হয়। তত্ত্বের লক্ষণ হইতেছে : যাহা বুদ্ধির অতীত, সম্বন্ধ-বিবর্জিত, নির্বিকল্প, শান্ত, অপরোক্ষ এবং অ-দ্বয়।" অস্তি বা নাস্তিবাচক উভয়প্রকার ধর্মই তত্ত্বের সম্পর্কে নিষেধ করা হয়। পরমতত্ত্ব বুদ্ধির সর্বপ্রকার বিকল্প হইতে বিমুক্ত (শূন্য)। পরমতত্ত্ব যে লোকোত্তর উহার অর্থ এমন নয় যে, উহা প্রপঞ্চ হইতে ভিন্ন এবং উহার বহির্ভূত; প্রকৃতপক্ষে তত্ত্বই প্রপঞ্চের মূল স্বরূপ। সুতরাং নাগার্জুন বলেন যে : পরমতত্ত্ব (নির্বাণ) এবং সংসারের মধ্যে কিছুমাত্রও পার্থক্য নাই।[২৬] এই বিশ্বকে যখন আমরা কার্যকারণাত্মক রূপে দেখি তখন উহা সংসার। আবার উক্ত কার্যকারণাত্মক দৃষ্টি পরিত্যাগ করিলে, অর্থাৎ উহাকে উহার পূর্ণরূপে অথবা "স্বাভাবিক নিত্যরূপে" (Sub specie aeternitatis) দেখিলে এই বিশ্বই পরমতত্ত্ব।

যেহেতু পরমতত্ত্ববাদে স্বরূপস্থ বস্তু এবং উহার উপাধিজনিত অবভাসের মধ্যে ভেদের সূচনা থাকে, সুতরাং উহাতে সদ্বস্তু এবং উহার জ্ঞানের দুইটি স্তর গ্রহণ করা অনিবার্য। নাগার্জুনের মতে, "যাহারা দুইপ্রকার সত্যের (পরমার্থ ও সংবৃতি সত্যের) বিভেদ অবগত নহে, তাহারা বুদ্ধের উপদেশের গম্ভীর তাৎপর্য বুঝিতে অসমর্থ।"[২৭]

পরমার্থ সত্য হইতেছে বুদ্ধির সাহায্যগ্রহণ এবং বুদ্ধির আকারদ্বারা বিকৃতিসাধন না করিয়া অকৃত্রিম বস্তু-রূপের জ্ঞান; প্রকৃতপক্ষে অনির্বাচ্য (অনভিলাপ্য), অচিন্ত্য এবং উপদেশাতীত।[২৮] সংবৃতি সত্য হইতেছে তথাকথিত সত্য, অর্থাৎ অবভাস। চন্দ্রকীর্তি তিনপ্রকারে উহার লক্ষণ দিয়াছেন[২৯] : "যাহা বস্তুর রূপ সমগ্রভাবে আচ্ছাদন করে এবং উহাকে স্বীয় স্বভাব হইতে ভিন্নরূপে প্রতীয়মান করে; অথবা সংবৃতি হইতেছে ভাবসমূহের পরস্পর-নির্ভরতা, অর্থাৎ উহাদের অন্যোন্যসাপেক্ষতা; অথবা উহা হইতেছে লোকব্যবহারানুগ অর্থাৎ ব্যাবহারিক সত্তা।" এই মতের এমন অর্থ নহে যে দুই প্রকার সদ্বস্তু এবং দুইটি পরস্পর-সমকক্ষ সত্যজ্ঞান আছে। পরমার্থই একমাত্র সদ্বস্তু অথবা সত্য।

মাধ্যমিকের দ্বন্দ্বমূলক বিচারের অবসান বুদ্ধিলব্ধ অনুভূতি (প্রজ্ঞা); এবং উহা শুধু জ্ঞানীয় চেতনারই ফল নহে, অধিকন্তু কর্মীয় ও ধর্মীয় চেতনারও ফল। দুঃখ ও অপূর্ণতার মূল কারণ হইতেছে অবিদ্যা, অর্থাৎ সদ্বস্তুকে সামান্যধর্মের মাধ্যমে

বুঝিবার এবং উহাতে অবাস্তব আকার আরোপ করিবার প্রবণতা। বস্তু শাশ্বত অথবা অশাশ্বত এইরূপ ভুল করিয়া আমরা উহার প্রতি আসক্ত হই কিংবা বিরক্তি প্রকাশ করি। নাগার্জুন বলেন: "কর্ম ও ক্লেশের ক্ষয় হইলে মোক্ষ হয়; উহাদের উৎপত্তি বিকল্পে; বিকল্পসমূহ বিবিধ ভ্রান্তি হইতে উৎপন্ন হয়; এবং শূন্যতার জ্ঞানে এইসব ভ্রান্তির নাশ হয়।"[১০০] সাক্ষাৎ (নির্বিকল্প) অনুভূতিতে পরিণত দ্বন্দ্বমূলক বিচার আমাদিগকে দুঃখ-সম্ভাবনার ঊর্ধ্বে লইয়া যায়। উহা নিজেই মুক্তি (নির্বাণ)।

তথাগত তাঁহার যেই রূপে সর্বভূতের মূলস্বরূপ, (ধর্মকায়), সেই রূপের সহিত এই সর্বোচ্চ জ্ঞান (প্রজ্ঞাপারমিতা) অভিন্ন। তিনি হইতেছেন পূর্ণতাপ্রাপ্ত সেই বস্তু, যাহা সম্ভাব্যরূপে সর্বজীব এবং যাহা অন্তিমে আধ্যাত্মিক সাধনাদ্বারা সকল জীবই একদিন হইবে। "তথাগত হইতেছেন ভগবান্ (ঈশ্বর); কারণ তিনি ক্ষমতাশালী ও পূর্ণত্ববান্। তিনি সর্বকাম ও কর্ম এবং আবরণদ্বয় (ক্লেশাবরণ ও জ্ঞেয়াবরণ) নিঃশেষে দূরীভূত করিয়াছেন। তিনি সর্ববিৎ (সর্বজ্ঞ ও সর্বাকারজ্ঞ)। চরমতত্ত্ব এবং সংসার উভয়বিষয়েই তিনি পূর্ণজ্ঞানবান্ (প্রজ্ঞাপারমিতা)।" সর্বজীবের প্রতি তাঁহার সাতিশয় দয়া (মহা-করুণা), ও স্বার্থশূন্য, বিরামহীন এবং সক্রিয় আনুকূল্যবশতঃ বুদ্ধ প্রেমের ভগবান্ হইয়াছেন।

তথাগত হইতেছেন চরমতত্ত্বের (শূন্য বা প্রজ্ঞার) স্বাধীন অবভাসাত্মক (পৌরুষের) রূপ। পরমতত্ত্বরূপী গর্ভাশয় হইতে বিভিন্ন সময়ে তথাগতরা অবস্থা ও প্রয়োজনানুসারে নিজদিগকে বাহিরে প্রকট করেন। তথাগত ও চরমতত্ত্বের সম্বন্ধ অদ্বৈতবেদান্তের ঈশ্বর ও ব্রহ্মের সম্বন্ধের ন্যায়—তিনি মুক্তপুরুষ হইলেও তাঁহার স্থান চরমতত্ত্বের নীচে।

৬। যোগাচারের বিজ্ঞানবাদ

বৌদ্ধচিন্তা সর্বদাই জ্ঞাতাকে প্রাধান্য দেওয়ার দিকে প্রবণ। উহা প্রথম হইতেই অবয়বী, স্থায়ী ও সামান্য প্রভৃতি সাধারণতঃ সত্য বলিয়া গৃহীত বহু পদার্থের বাস্তব সত্তা অস্বীকার করিয়া উহাদিগকে কল্পনা (বিকল্প)-মাত্রে পর্যবসিত করিয়াছে। যোগাচারের পূর্বেই সৌত্রান্তিক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন; তথাপি তিনি কিছু বস্তুবাদ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া স্বরূপস্থ বস্তুর অস্তিত্ব ত্যাগ করিতে পারেন নাই। যোগাচার এই ছায়াসদৃশ বস্তুর অস্তিত্বও অস্বীকার করিয়া উহাকে জ্ঞানের সৃষ্টি

(বিজ্ঞান) বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। মাধ্যমিকের শূন্যতা মোটামুটিভাবে গ্রহণ করিয়া যোগাচার উহা হইতে কতক ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণ করিয়া উহাকে বেশ নূতন রূপ দিয়াছেন।

যোগাচার : মৈত্রেয়নাথ (আনুমানিক ২৭০-৩৫০ খৃঃ) যোগাচার-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। আজকাল সাধারণতঃ মৈত্রেয়নাথের ঐতিহাসিকতা[১০১] স্বীকার করা হয়। কিন্তু তিনি এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হইলেও তাঁহার মতের বিশেষ বিবরণ ও সমর্থন তাঁহার বিখ্যাত শিষ্য অসঙ্গ এবং তদীয় অধিক সুপ্রসিদ্ধ বসুবন্ধুই দিয়াছেন।[১০২] নিম্নলিখিত পাঁচটি গ্রন্থ অসঙ্গের রচনা বলিয়া মনে করা হয় : মহাযানসূত্রালঙ্কার, মধ্যান্তবিভাগ, ধর্মাধর্মতা-বিভঙ্গ, অভিসময়ালঙ্কার এবং উত্তর-তন্ত্র। প্রথম তিনটি গ্রন্থ যোগাচারীয় দৃষ্টিতে রচিত ; চতুর্থটির বিষয় মাধ্যমিক এবং যোগাচার উভয়সম্মত আধ্যাত্মিক সাধনমার্গ এবং শেষ গ্রন্থটি স্পষ্টতই মাধ্যমিক-মতানুযায়ী। এইজন্য অসঙ্গ কোন্ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, ইহা একটি সমস্যা।[১০৩] বসুবন্ধুর বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধি (বিংশতিকা এবং ত্রিংশিকা) বিজ্ঞানবাদের মূল গ্রন্থ। ইহার উপরে স্থিরমতি, ধর্মপাল এবং অন্যান্যেরা টীকা লিখিয়াছেন। বসুবন্ধু মধ্যান্তবিভাগ (অর্থাৎ মধ্য ও অন্তের পার্থক্য) গ্রন্থের টীকা রচনা করিয়াছেন এবং ত্রিস্বভাবনির্দেশ এবং আরও অনেক ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিয়াছেন। বসুবন্ধুর প্রধান গ্রন্থগুলির উপর স্থিরমতি (আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ৫ম শতাব্দী) অতিশয়-উদ্ভাসক টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। দিঙ্‌নাগ, ঈশ্বরসেন, ধর্মপাল এবং ধর্মকীর্তির বিজ্ঞানবাদে যোগাচার সম্প্রদায়ের মত রক্ষিত ও বিকশিত হইয়াছে। দিঙ্‌নাগ ও ধর্মকীর্তি যুক্তিশাস্ত্র এবং প্রমাণশাস্ত্রের বিশেষ বিচার করিয়াছেন। তাঁহাদের সৌত্রান্তিক মতের দিকে বিশেষ প্রবণতা ছিল। তাঁহারা আলয়-বিজ্ঞান নামক প্রাচীন যোগাচার-মত সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইহা বলাই অধিক ঠিক হইবে যে, এই সম্প্রদায়ের এই পরবর্তী রূপ সৌত্রান্তিক এবং যোগাচার-মতের সংমিশ্রণ— প্রপঞ্চব্যাপারে উহা সৌত্রান্তিক, এবং পরমতত্ত্ববিষয়ে উহা যোগাচার। মাধ্যমিকের সংস্পর্শ ও প্রভাববশতঃ হয়ত উহার সহিত মাধ্যমিক মতেরও মিশ্রণ হইয়াছিল। শান্তরক্ষিত এবং কমলশীল বিজ্ঞানবাদের এই শেষ রূপের প্রতিনিধি। ইহা আমরা তাঁহাদের গ্রন্থসমূহ এবং তিব্বতীয় ঐতিহাসিকদের সাক্ষ্য হইতে জানিতে পারি।

বিজ্ঞানবাদীয় যুক্তি : "বিজ্ঞানবাদী দুইটি প্রধান মত পোষণ করে।[১০৪] (১) বিজ্ঞান সত্য, অবভাস নহে ; এবং (২) একমাত্র বিজ্ঞানই সত্য, বিষয় নহে। প্রথমটি মাধ্যমিক সিদ্ধান্তের বিরোধী, কারণ মাধ্যমিক মনে করেন যে, জ্ঞান ও জ্ঞাতবিষয়

উভয়েই পরস্পরসাপেক্ষ বলিয়া উহারা স্বরূপে কিছুই নহে। দ্বিতীয় মতটি বস্তুবাদের বিরোধী, কারণ বস্তুবাদী বিনাবিচারে ধরিয়া লন যে, বিজ্ঞান যতখানি সত্য, বিষয়ও ততখানি সত্য।"

(১) মাধ্যমিকের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানবাদের সর্বাপেক্ষা অব্যর্থ যুক্তি এই: দ্বন্দ্বমূলক বিচারের বিশ্লেষণে সব কিছুই উড়াইয়া দেওয়া এবং মিথ্যা বলিয়া প্রতিপাদন করা সম্ভবপর হইলেও, মিথ্যাজ্ঞান এমন একটি অধিষ্ঠান[১০৫] (বিজ্ঞান) সূচিত করে, যাহার উপর মিথ্যাকল্পনা আরোপ করা হয়। বিজ্ঞানবাদী প্রজ্ঞাপারমিতার শূন্যতা স্বীকার করেন এবং দৃঢ়নিশ্চয়তার সহিত ইহাও বলেন যে,[১০৬] তিনি এই শূন্যতার সম্যক্ ব্যাখ্যাই দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মতে এই শূন্যতার অর্থ হইতেছে এই যে, উহা জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়রূপ দ্বৈত হইতে বিমুক্ত শুদ্ধ বিজ্ঞান (দ্বয়শূন্যতা)। জ্ঞেয় বিষয় কখনও স্বতন্ত্রভাবে নিরপেক্ষ-রূপে থাকিতে পারে না; কিন্তু জ্ঞানের পক্ষে তাহা সম্ভবপর। জ্ঞানই বিবিধ বিকারপ্রাপ্ত হয় এবং ক্লেশদ্বারা ক্লিষ্ট হয়, আবার আরোপিত দ্বৈত হইতে মুক্ত হইয়া নিজেকে বিশুদ্ধ করে।[১০৭]

বিজ্ঞানবাদী কয়েকটি আপাতপ্রতীয়মান হেতুদ্বারা বিষয়ের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করে। বস্তুবাদী মনে করে যে, জ্ঞানের আকার বিষয়ের (আলম্বনের) স্বরূপদ্বারা উৎপন্ন হয় এবং এই বিষয় জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্রভাবে বিদ্যমান। বস্তুবাদীর এই প্রকল্পের বিরুদ্ধে অনেক অখণ্ডনীয় আপত্তি আছে। (১) জ্ঞানের আকার (যথা 'বৃক্ষ', 'আসন', ইত্যাদি) এবং আলম্বনের মধ্যে কোনও সারূপ্য নাই, কারণ আলম্বন হইতেছে পৃথক্ পৃথক্ রূপে এক একটি পরমাণু অথবা কতকগুলি পরমাণুর সমষ্টি। জ্ঞানে স্থূলরূপের প্রতিভাস হয়, কিন্তু ঐ স্থূলতাবিহীন পরমাণু উক্তরূপ জ্ঞানের আলম্বন হইতে পারে না। অর্থাৎ জ্ঞানে যে রূপ প্রতিভাত হয়, বহির্জগতে তাহার অনুরূপ কিছুই নাই; সুতরাং জ্ঞানের আকার কিছুদ্বারা জনিত নহে, এবং যদি বাহিরে কিছু থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে উহাও জ্ঞানে প্রতিভাত হয় না।[১০৮] অবয়বী অথবা বিভিন্ন অংশের সমুদায়ে গঠিত বাস্তবিক অংশী বলিয়া কিছু ন্যায়-বৈশেষিকের ন্যায় বিজ্ঞানবাদী স্বীকার করেন না। প্রাচীন বৌদ্ধ দর্শনেই, বিশেষতঃ সৌত্রান্তিক মতে, অবয়বীর অস্তিত্ব ইহার পূর্বেই যুক্তিসহকারে নিরাকরণ করা হইয়াছে।[১০৯]

(২) জ্ঞান একস্থলে এবং বিষয় অন্যস্থলে এবং উহাদের মধ্যে সারূপ্যসম্বন্ধ রহিয়াছে এইরূপ দ্বৈতমূলক প্রকল্পদ্বারা জ্ঞানের ব্যাখ্যা দিতে গেলে যেমন সুস্পষ্ট আপত্তির সম্মুখীন হইতে হয়, সেইগুলি এই দ্বৈত-কল্পনার অসারতা নির্দেশ করে

সম্বন্ধমাত্রই জ্ঞানের অভ্যন্তরে,[১১০অ] জ্ঞান এবং উহার বহিঃস্থ অন্য কিছুর মধ্যে নহে ; কারণ এরূপ সম্বন্ধ জানা কিংবা প্রমাণ করা সম্ভবপর নহে।

(৩) জ্ঞান এবং তাহার বিষয় সর্বদাই অবিচ্ছেদ্য। উহাদের এই সহোপলম্ভ নিয়ম,[১১০আ] অর্থাৎ অজ্ঞাত বিষয়ের অনুপপত্তি ইহাই বিজ্ঞানবাদীর প্রধান যুক্তি।

(৪) ভ্রান্ত-প্রত্যক্ষ, স্বপ্ন প্রভৃতিতে যে জ্ঞানের আকার থাকা সত্ত্বেও তদনুরূপ কোন বিষয় নির্দেশ করা যায় না, ইহা সকলেই স্বীকার করে। যেহেতু ভ্রান্ত-প্রত্যক্ষ, স্বপ্ন প্রভৃতি ঘটিয়া থাকে, সুতরাং প্রমাণিত হয়[১১১] যে জ্ঞান নিজেই নিজের বিষয় সৃষ্টি করে, উহা স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং কোন বাহ্যবস্তুর উপর নির্ভর করে না।

(৫) সত্য এবং মিথ্যাজ্ঞানের পার্থক্য, বিভিন্ন জ্ঞাতৃ-সাধারণ একই জগৎ, বস্তুসমূহের স্থায়িত্ব প্রভৃতি[১১২] লোকসিদ্ধ সকলপ্রকার অনুভবের বিজ্ঞানবাদী মোটামুটি যুক্তিসঙ্গতভাবেই ব্যাখ্যা দিতে সমর্থ এবং দিয়া থাকেন। এই ব্যাখ্যার মূলে এই মতবাদ রহিয়াছে যে, বিজ্ঞানের অন্তর্নিহিত অনাদি বাসনাদ্বারা উহার অভ্যন্তরে যে সকল পরিবর্তন ঘটে, উহাদের সাহায্যে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের আকার প্রকাশ করে।

বিজ্ঞানের স্তরসমূহ : বিজ্ঞানই একমাত্র সদ্বস্তু ; দ্রব্যরূপে (যথা চেয়ার, টেবিল, মানুষ ইত্যাদি) এবং ধর্মরূপে প্রতীয়মান বিষয় হইতেছে বিজ্ঞানের অবস্থা-সমূহের উপর মিথ্যা উপচারমাত্র।[১১৩] বিজ্ঞানের অবস্থা বা স্তর তিনটি : আলয়-বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান এবং প্রবৃত্তি (অথবা বিষয়)-বিজ্ঞান।

আলয় হইতেছে সর্ববাসনার অর্থাৎ সর্ববস্তুর বীজাবস্থার আশ্রয় বা বাহন। অন্যান্য বিজ্ঞানগুলি উহার সহিত উহার কার্যরূপে সম্পৃক্ত। শেষের দুইটি স্তর কেবল আলয়ের উপর নির্ভর করে এমন নহে, অধিকন্তু আলয়ের পুষ্টিসাধনও করে। আলয় কূটস্থ অথবা স্থিতিশীল নহে—প্রবল স্রোতস্বিনীর সহিত উহার উপমা দেওয়া হইয়াছে। মনের বাসনাসমূহ প্রতিমুহূর্তেই পরিবর্তিত হইতেছে - হয় উহাদের উপচয়, নয় অপচয় ঘটিতেছে। আলয় ও প্রাপঞ্চিক জীবন বা সংসার পরস্পরের সমকালীন।[১১৪] আলয়ের অভাবে, জ্ঞানের বিকার অথবা বিকারের ধারাও সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া যাইবে। প্রতীয়মান হয় যে, আমরা যে আমাদের মূলধন খরচ করি, তাহা শুধু উহাকে বাড়াইবার জন্য। আবার, যদি আলয় না থাকিত, তাহা হইলে সংসার হইতে মুক্তিলাভের প্রযত্ন অর্থহীন হইত। যেহেতু বিজ্ঞানমাত্রই ক্ষণস্থায়ী, সুতরাং উহার অপসারণের জন্য প্রযত্নের প্রয়োজন নাই। স্পষ্টভাবে মানা হইয়াছে যে, অর্হৎ-অবস্থাতেও আলয়ের অবসান হয়।[১১৫] এই অর্হৎ-অবস্থা জীবন্মুক্তির অনুরূপ।

জ্ঞানের দ্বিতীয় বিকার হইতেছে বুদ্ধি অথবা মনোবিজ্ঞান। আলয় হইতেছে সম্ভাব্যের অবস্থা; আর মনন বাস্তবীকরণের অবস্থা, বাস্তবীকৃত অবস্থা নহে। মনন সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা করা অসঙ্গত হইবে না যে, উহা হইতেছে 'আমি' ও 'আমার' এই ভ্রান্ত কল্পনার ভিত্তিতে বৌদ্ধিক আকারে আকারিত করার অথবা ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করার মানসিক ক্রিয়া, বিজ্ঞানের তৃতীয় বিকার হইতে আমরা পঞ্চ বহিরিন্দ্রিয় এবং অন্তরিন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয়োপাত্ত এই ছয় রকম বিষয় প্রাপ্ত হই।

নিরপেক্ষ অথবা পারমার্থিক বিজ্ঞান: বিজ্ঞানের এইসব বিকারে বাহ্য সত্তা আরোপ করা হয়। তাহার ফলে গৃহ, বৃক্ষ, পর্বত প্রভৃতি পদার্থের প্রতীতি জন্মায়। কিন্তু এইরূপ পদার্থের অস্তিত্ব নাই। এইজন্য ইহাদিগকে পরিকল্পিত[১১৬] আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ইহারা স্বরূপতঃই মিথ্যা। কিন্তু এইসব মিথ্যা পদার্থের প্রতীতি বা প্রত্যয় সত্য না মিথ্য? এইরূপ মানা যাইতে পারে যে, যদিও বহিঃস্থ বৃক্ষ পদার্থটি অবাস্তব, তথাপি বৃক্ষ-প্রত্যয়টি নিশ্চয়ই জ্ঞানীয় পদার্থরূপে অস্তিত্ববান্। বার্ক্লি প্রভৃতি জ্ঞাতৃ-কেন্দ্রিক বিজ্ঞানবাদীরা এই মতই গ্রহণ করেন। কিন্তু বিজ্ঞানবাদীর মত ইহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, বিষয়কে বাদ দিলে, জ্ঞানীয় পদার্থ-প্রত্যয়টিও উহার ব্যক্তিত্ব বা বৈশিষ্ট্য হারাইয়া ফেলে; তখন আর উহাকে এই বা ঐ বলিয়া নির্দেশ করা যায় না, জ্ঞানের বিকারগুলিকে (আলয়ও জ্ঞানের বিকার) পরতন্ত্র[১১৭] অর্থাৎ অন্য-সাপেক্ষ বলা হয়। উহাদের বৈশিষ্ট্য বিষয়ের উপর নির্ভর করে। এইদিক হইতে উহারা মিথ্যা। কিন্তু উহারা স্বরূপতঃ মিথ্যা নহে; কারণ উহারা প্রকৃত পক্ষে পরিনিষ্পন্ন অর্থাৎ বিশুদ্ধ বিজ্ঞান বা পরমার্থ হইতে অভিন্ন। এই জন্যই বলা হইয়াছে যে, পরতন্ত্র পদার্থসমূহ অর্থাৎ প্রতীতির জ্ঞানীয় জগৎ পরিনিষ্পন্ন হইতে ভিন্নও নহে, অভিন্নও নহে,[১১৮] কারণ পরতন্ত্র হইতেছে বিষয়ী ও বিষয় এই দ্বৈত-দোষে দুষ্ট; আবার ভিন্নও নহে কারণ পরমতত্ত্ব উক্ত দ্বৈত, পরিবর্তন এবং নানাত্ব-বিবর্জিত পরতন্ত্র হইতে অন্য কিছু নহে। পরিনিষ্পন্নকে ধর্মতা অথবা তথতা অর্থাৎ পদার্থের স্বরূপও বলা হয়। উহার প্রকৃতি আকাশের ন্যায় নানাত্ব-বিবর্জিত এক-রসাত্মক।[১১৯] লোকোত্তর জ্ঞানে ইহার সাক্ষাৎ উপলব্ধি হয় (জ্ঞানং লোকোত্তরং চ তৎ)। এই অবস্থায় বিষয়-বিষয়ী ভেদের লেশমাত্রও থাকে না। যতক্ষণ পর্যন্ত এইরূপ জ্ঞান থাকে যে এই অবস্থার উপলব্ধি হইয়াছে, ততক্ষণ পর্যন্ত বলা যায় না যে, উহার উপলব্ধি হইয়াছে। কারণ তখনও উহাতে দ্বৈতগন্ধ থাকে। বসুবন্ধু, উপ-সংহারে বলিয়াছেন, "যতক্ষণ পর্যন্ত জ্ঞান শুদ্ধজ্ঞানে অধিষ্ঠিত না হয়, ততক্ষণ দ্বৈত-দৃষ্টির প্রবণতা নিবৃত্ত হয় না।" "'ইহা পূর্ণ বিশুদ্ধ জ্ঞান' এইরূপ জানিলেও দৃষ্টির

সম্মুখে একটা কিছু রাখা হয় এবং ঐজন্য বিশুদ্ধ জ্ঞানের অবস্থায় থাকা হয় না।" "জ্ঞান যখন কোন বিষয়কে জানে না, তখন উহা বিশুদ্ধ জ্ঞান : বিষয়ের অভাবে বিষয়ীর জানাও নিবৃত্ত হয়। শুদ্ধজ্ঞানের এই অবস্থাকে আমরা কি করিয়া বর্ণনা করিব?" "ইহা মনন নহে, জানা নহে : কিন্তু উহা লোকাতীত জ্ঞান (লোকোত্তরং জ্ঞানম্); দুই প্রকার ভ্রান্তির বিনাশ হওয়াতে আলয়ও বিনষ্ট হইয়াছে।" "ইহা অবিকৃত ধাতু, অচিন্তনীয়, শান্ত, নিত্য এবং শিব—ভগবান্ বুদ্ধের স্বাধীন ধর্মকায়।"[১২০]

৭। উপসংহার

(ব্যাখ্যা-সংক্রান্ত কয়েকটি সমস্যা)

<u>নির্বাণ</u> : "বৌদ্ধমতের ইতিহাস হইতেছে নির্বাণের ইতিহাস।" হীনযান সম্প্রদায়-সমূহে নির্বাণ বস্তুতঃই বিলোপ বা বিনাশের অবস্থা; উহা আধ্যাত্মিক সাধনাদ্বারা উৎপন্ন হয়। হীনযানে সংসার এবং নির্বাণের মধ্যে পার্থক্য করা হয়; কিন্তু মাধ্যমিক উহাদের মধ্যে পার্থক্য আছে বলিয়া স্বীকার করেন না, তাঁহার মতে নির্বাণ প্রপঞ্চের বিলোপ নহে, উহা শুধু আমাদের ভ্রান্ত ধারণার বিলোপমাত্র (কল্পনাক্ষয়ো হি নির্বাণম্) যেহেতু বিজ্ঞানবাদী নিরপেক্ষ পরমতত্ত্ব স্বীকার করেন, অতএব তিনি সঙ্গতভাবেই নির্বাণের কোন লক্ষণ দিতে প্রস্তুত নহেন, কিন্তু তিনি নির্বাণকে বিশুদ্ধ বিজ্ঞান হইতেও অ-ভিন্ন বলেন—এই বিশুদ্ধ বিজ্ঞানেই অশুদ্ধি এবং শুদ্ধি এই উভয় প্রক্রিয়াই ঘটে। মাধ্যমিকের মতে বিজ্ঞানকে পরমতত্ত্ব হইতে অভিন্ন বলিয়া ভাবা এবং বিজ্ঞানে বাস্তবিক পরিবর্তন ঘটে এরূপ ধারণা পোষণ করা বিচারশূন্যতা এবং যুক্তিহীনতার পরিচায়ক। মহাযান সম্প্রদায়সমূহে ধর্মকায় হইতেছে দর্শনশাস্ত্রীয় পরমতত্ত্বের ধর্মীয় রূপ।

<u>অন্যান্য মতবাদের সহিত সম্বন্ধ</u> : যেহেতু বৌদ্ধসম্প্রদায়সমূহের মতবাদগুলি জৈন ও ব্রাহ্মণ্য দর্শনের সহিত একই সঙ্গে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল, এতএব উহাদের পরস্পরের উপর প্রভাব পড়িয়াছিল এইরূপ মনে করা সঙ্গত হইবে। কিন্তু এই প্রভাবের প্রকৃতি এবং প্রসার নির্ভুলভাবে নির্ণয় করা সহজ নহে, কারণ এই সমস্যা অত্যন্ত বিরাট এবং জটিল। এক মতের উপর অন্য মতের প্রভাব যে অনিবার্য-ভাবে অনুকরণ এবং গ্রহণদ্বারাই ব্যক্ত হয় এমন নহে, কিন্তু বিরোধও নিরাকরণ দ্বারাও ব্যক্ত হয়। বৌদ্ধ ও অ-বৌদ্ধ চিন্তার ব্যাপারে এই কথা অতীব সত্য।

সাংখ্য দর্শনের সহিত আভিধর্মিক মতবাদের খুব পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সাংখ্য দর্শনই উহার মূল প্রতিরূপ এবং সাংখ্য দর্শন হইতেই উহার আরম্ভ। ধর্মের ধারণা সাংখ্যোক্ত প্রকৃতির অনুকরণে গঠিত হইয়াছে। উভয় দর্শনেই পরিবর্তনের সমস্যা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বৌদ্ধ-চিন্তায় সার্বত্রিক পরিবর্তনের হাত হইতে (সাংখ্যোক্ত পুরুষের ন্যায়) কোনও সংপদার্থকেই অব্যাহতি দেওয়া হয় নাই; এবং পরিবর্তনকেও একের জায়গায় অন্যের আগমন রূপে কল্পনা করা হইয়াছে—পরিবর্তন হইতেছে কালিক পরিমাণহীন পদার্থসমূহের উৎপত্তি এবং লয়।

কিছু পরবর্তীকালে ন্যায়-বৈশেষিক, মীমাংসা ও জৈন এই সকল বস্তুবাদী মতের সহিত বৌদ্ধ (বিশেষতঃ সৌত্রান্তিক) মতের সাক্ষাৎ ও বিরামহীন বিরোধ লক্ষিত হয়। এক দিকে অক্ষপাদ (ন্যায়সূত্র), বাৎস্যায়ন, উদ্দ্যোতকর, বাচস্পতি মিশ্র, কুমারিল, উদয়ন, জয়ন্ত প্রভৃতি ব্রাহ্মণ্যধর্মের সমর্থকদের গ্রন্থে এবং অপর দিকে দিঙ্‌নাগ, ধর্মকীর্তি এবং ধর্মোত্তরের গ্রন্থে এই বিরোধের প্রচুর প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যাইবে। প্রত্যক্ষ, অনুমান, অপোহ (নামমাত্রবাদ) অবয়বী, সামান্য প্রভৃতি প্রায় প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েই এই বিরোধের প্রভাব অনুভূত হইয়াছিল। ন্যায় এবং মীমাংসামতাবলম্বিগণ তাহাদের নিজ নিজ বস্তুবাদ অধিক সজ্ঞানে এবং পূর্ণতরভাবে নূতন করিয়া উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। বৌদ্ধগণ তাঁহাদের জ্ঞানকেন্দ্রিক এবং সমালোচনামূলক ভাবধারাই ধরিয়া থাকিলেন। এই সংঘর্ষের ফলে প্রত্যেক দর্শনই চিন্তার স্পষ্টতা এবং গাম্ভীর্যের ব্যাপারে লাভবান্‌ হইল। এই বিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় দর্শনের ব্যাখ্যা শিক্ষাপ্রদ হইবে।

মহাযানের বিকাশে বেদান্তের প্রভাব এবং বেদান্তের বিকাশে মহাযানের প্রভাব—এই সমস্যাও কম চিত্তাকর্ষক নহে। প্রাচীন বৌদ্ধমত বস্তুবাদী এবং বহুবাদী। মাধ্যমিক এবং যোগাচার দর্শনে বৌদ্ধচিন্তা যে অদ্বৈতাভিমুখী হইয়াছিল উহা পরিবর্তনশীল অভাবসমূহের অধিষ্ঠানরূপে অপরিণামী ব্রহ্মের ধারণার দ্বারা প্রভাবিত বলিয়া মনে হয়। কোন কোন পণ্ডিতের[১১] মতে এই ব্যাপারে মাধ্যমিক ও যোগাচার দর্শন বেদান্তের নিকট সাক্ষাৎভাবে ঋণী।

গৌড়পাদ ও শঙ্কর শুধু বিচারদ্বারা অদ্বৈতমতের প্রতিষ্ঠা করিয়া বেদান্তচিন্তা-ধারায় বিপ্লব আনয়ন করেন; তাঁহারা পরিদৃশ্যমান ঘটনারাজিকে মিথ্যা অবভাস (মায়া) বলিয়াছেন এবং তিনপ্রকার সত্য ও দুইপ্রকার শাস্ত্র (পর এবং অপর) আছে এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন। যে সকল বেদান্ত সম্প্রদায় অদ্বৈতবাদী নহে,

তাহারা অদ্বৈতমতকে সোজাসুজি প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত বলিয়াই মনে করিয়াছে এবং কোন কোন আধুনিক ব্যক্তি এই মত সমর্থন করিয়াছেন।[১২২]

কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার্য যে, বৌদ্ধমতের বিকাশে যেরূপ ঘটিয়াছিল, তেমনই উপনিষদের আত্মবাদও উহার আভ্যন্তরীণ প্রেরণাদ্বারা চালিত হইয়াই অদ্বৈতাভিমুখী হইয়াছিল। শঙ্কর পূর্ব বেদান্তে সাংখ্য দ্বৈতবাদের দোষগুণ বিচারদ্বারা এক অদ্বয় বস্তুর অস্তিত্ব প্রতিপাদন করা হয়; স্বয়ং শঙ্কর ভর্তৃপ্রপঞ্চ প্রভৃতি দার্শনিকদের ভেদাভেদবাদের সমালোচনা করিয়া তাঁহার অদ্বয়বাদে উপনীত হইয়াছিলেন। তিনি যে অন্যের নিকট সাক্ষাৎভাবে ঋণী, ইহার কোন প্রমাণ তাঁহার নিজের লেখায় দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু গৌড়পাদের মাণ্ডুক্যকারিকার ভাষা ও মত হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তিনি মহাযান সম্প্রদায়দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন।[১২৩] কিন্তু এই গ্রন্থের বিভিন্ন অংশগুলি পরস্পরের সহিত সুসংবদ্ধ নহে; হয়ত এইগুলি বিভিন্ন লেখকের রচনা :[১২৪] এবং শুধু তৃতীয় ও চতুর্থ প্রকরণেই বৌদ্ধ-প্রভাবের স্পষ্ট নিদর্শন আছে। আত্মবাদী দার্শনিক কি করিয়া নৈরাত্মবাদী মতের নিকট ঋণী হইতে পারেন তাহাও ধারণা করা কঠিন। সুতরাং আন্দাজ করা যাইতে পারে যে, এই ঋণ মতবাদ অপেক্ষা বিচারপ্রণালীর ব্যাপারে। হয়ত নাগার্জুনের দ্বন্দ্বমূলক বিচারপদ্ধতি বিজ্ঞানবাদীয় ভ্রমের ব্যাখ্যা এবং দুই রকম সত্যের মতবাদ হইতে গৌড়পাদ ও শঙ্কর উপনিষদীয় দর্শনের ব্যাখ্যার সর্বাপেক্ষা সুসঙ্গত প্রণালীর ইঙ্গিত পাইয়াছিলেন।

বিভিন্ন পরমতত্ত্ববাদ : ইহা হইতে আমরা শূন্যতা, বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা এবং ব্রহ্ম এই বিভিন্ন পরমতত্ত্ববাদগুলির প্রকৃত ব্যাখ্যা কি এই স্বরূপগত সমস্যায় উপনীত হই। উহাদের প্রভেদ কি শুধু নামগত ?

প্রধানতঃ অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন্ শূন্যতার যে ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার ফলে উহার অভাবাত্মক ব্যাখ্যা এখন আর কেহ সমর্থন করে না। সম্ভবতঃ এই অভাবাত্মক ব্যাখ্যা এই ভীতিদায়ক 'শূন্য' শব্দটি ছাড়া অন্য কোন প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। কিন্তু উক্ত অভাবাত্মক ব্যাখ্যা পরিত্যাগ করিলে এই আশঙ্কা থাকিয়া যায় যে, এই তিনটি দর্শনের অন্ততঃ উহাদের বিচারপ্রণালী ও বিশেষদৃষ্টিগত পার্থক্য উপেক্ষা করা হইবে। এই দর্শনগুলি পরস্পরের দোষ ও পরস্পর হইতে পরস্পরের অত্যন্ত প্রভেদ প্রদর্শন করিয়া থাকে। উহাদের এই বাদানুবাদের কোন অর্থ বাহির করা সম্ভবপর কি ?

এরূপ মনে হইতে পারে যে, এই সকল বিভিন্ন দর্শন পরমতত্ত্বের আকারসম্বন্ধে

একমত, কিন্তু উহার প্রতি তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গী পৃথক্ এবং এই পরমতত্ত্ব কোন বস্তুর সহিত অভিন্ন এই সম্বন্ধেও তাহাদের মত বিভিন্ন। এই সকল দর্শনের প্রত্যেকটির মতেই পরমতত্ত্ব হইতেছে প্রপঞ্চাতীত, কারণ উহা সর্ব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ধর্ম হইতে বিমুক্ত; আবার এই পরমতত্ত্ব একই সঙ্গে প্রপঞ্চের অভ্যন্তরেও বিদ্যমান, কারণ উহা প্রপঞ্চের মূলস্বরূপ। এতদ্ব্যতীত ইহাদের প্রত্যেকের মতেই এই পরমতত্ত্বকে ইন্দ্রিয়াতীত অনুভবে উপলব্ধি করা সম্ভবপর এবং প্রত্যেকেই পরমতত্ত্ববাদের পরিপূরক আভাস-বাদও স্বীকার করে।

কিন্তু উহাদের মতের বিভিন্নতাও উপেক্ষা করা সঙ্গত হইবে না। বেদান্তের প্রতিষ্ঠা হইতেছে একমাত্র আত্মার অস্তিত্বজ্ঞাপক উপনিষদের তর্কাতীত ঐশী-বাণী—মনন ও নিদিধ্যাসনদ্বারা উপনিষৎ-প্রকাশিত এই সত্য উপলব্ধি করার চেষ্টা করিতে হয়। মাধ্যমিক বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর বিরোধ হইতে যুক্তির নিয়মানুসারে যে দ্বন্দ্বাত্মক জ্ঞানের উদ্ভব হয় তাহাকে আশ্রয় করেন। আর যোগাচার যে একমাত্র জ্ঞানের অস্তিত্বে দৃঢ়বিশ্বাসী, উহার ভিত্তি হইতেছে সেই সকল সমাধি-অবস্থার অনুভব, যাহাতে বিষয়ের অবর্তমানেও জ্ঞান বিদ্যমান থাকে। বেদান্ত এবং বিজ্ঞানবাদ ইন্দ্রিয়-জন্য ভ্রান্তির বিশ্লেষণ করিয়া উহা তুল্যভাবে জগতেও প্রয়োগ করে। বেদান্তের মতে সদ্বস্তু হইতেছে 'ইদম্' অর্থাৎ জ্ঞানে যাহা দেওয়া আছে অথবা বিশুদ্ধ সত্তা; আর 'রজত' হইতেছে প্রতিভাসমাত্র, কারণ উহা শুধু জ্ঞানেই অস্তিত্ববান্। বিজ্ঞানবাদীর মত ইহার বিপরীত: জ্ঞানে যে 'ইদম্' দেওয়া আছে তাহা হইতেছে মিথ্যা, অর্থাৎ জ্ঞানেরই অকারণ বাহ্যাবভাস—জ্ঞানই একমাত্র সত্য। বিজ্ঞানকে বিশুদ্ধসত্তা (কূটস্থ) বলিয়া ধারণা করা হয় না, কিন্তু উহা হইতেছে সৃষ্টি ও অবভাসকারী; উহাকে বিশ্বোৎপাদক ইচ্ছাশক্তি বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। মাধ্যমিকের মত এই দুই মত হইতেই ভিন্ন। তিনি বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর বিরোধ হইতে যে প্রপঞ্চ-পূর্ব ভ্রান্তির সৃষ্টি হয় সাক্ষাৎভাবে উহার বিচারেই নিযুক্ত হন; তিনি এই বিরোধাত্মক অনুভবের মাধ্যমেই পরমতত্ত্বে উপনীত হন। ব্রহ্মকে বিশুদ্ধসত্তা এবং বিজ্ঞানকে সৃজনীশক্তি বলিয়া মনে করা যাইতে পারে; কিন্তু শূন্যতাকে লৌকিক জ্ঞানের কোন বিষয়ের সহিতই অভিন্ন বলিয়া মনে করা যায় না—উহা হইতেছে দৃষ্টিসমূহের সমালোচনাত্মক অথবা স্বসংবেদনাত্মক যে চেতনা তাহাই। এই সকল কথা যে সকল সমস্যা উপস্থাপিত করে, তাহাদের সমাধান একমাত্র উচ্চতর দার্শনিক ব্যাখ্যা-দ্বারাই সম্ভবপর।

সংক্ষিপ্ত শব্দের ব্যাখ্যা

এ কে ভি—**Abhidharma kosa-vyakhya of Yasomitra. Ed. by Woghihara, Tokio.**

এম্ কে—**Madhyamaka-karika of Nagarjuna, Ed. by de la V. Poussin (Bib. Budd. IV)**

এম্ কে ভি—**Madhyamaka-karika-vritti (Prasanna-pada) by Chandrakirti (Bib. Budd. IV)**

এন্ বি—**Nyaya-bindu of Dharmakirtti (Bib. Budd. VII)**

এন্ বি টি—**Nyaya-bindu-tika of Dharmottara (Bib. Budd. VII)**

পি এস্—**Pramana-samuccaya of Dinnaga, Part I, Restored into Sanskrit by H. R. H., Iyengar, Mysore.**

পি ভি—**Pramana-varttika of Dharmakirtti with the Manoratha-nandini, J B O R S, Patna.**

টি এস্—**Tattva-samgraha of Santiraksita, 2 Vols, G. O. S., Baroda.**

দ্রষ্টব্য

১। দীপবংশ, পৃঃ ৩৫ ; বাষ্টনের "বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস", ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯১ ইত্যাদি।

২। দীপবংশ, পৃঃ ৩৬। উত্তরদেশীয় বিবরণগুলিতে মহাসংঘিকের উৎপত্তি অন্য ভাবে বিবৃত হইয়াছে।

৩। যদিও সকল প্রামাণিক গ্রন্থই ১৮ সংখ্যা সম্বন্ধে একমত, তথাপি বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলির নাম এবং শ্রেণী-বিভাগ সম্বন্ধে তাহাদের মধ্যে মতভেদ আছে। বাষ্টন্ (বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯৭ ইত্যাদি) ভিক্ষু বর্ষাগ্রপৃচ্ছা এবং বিনীতদেবের বিবরণের উপর নির্ভর করিয়া এই সকল নামের উল্লেখ করিয়াছেন : পূর্বশৈল, অপরশৈল, হৈমবত, লোকোত্তরবাদী এবং প্রজ্ঞপ্তিবাদী—ইঁহারা মহাসংঘিক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ; মূল সর্বাস্তিবাদী, কাশ্যপীয়, মহীশাসক, ধর্মগুপ্ত, বাহুশ্রুতীয়, তাম্রচৈতীয় এবং বিভজ্যবাদ—ইঁহারা সর্বাস্তিবাদের অন্তর্ভুক্ত ; জেতবনীয়, অভয়গিরিবাসিগণ এবং মহাস্থবিরগণ স্থবির সম্প্রদায়ভুক্ত ; কুরুকুল্লকগণ, অবন্তক এবং বাৎসীয়পুত্রীয় সাম্মিতীয় সম্প্রদায়ভুক্ত। বসুমিত্রের নিকায়ালম্বন শাস্ত্রও (মাসুদা কর্তৃক ইংরেজীতে অনূদিত—**Asia Major** ২য় খণ্ড, ১৯২৫) দ্রষ্টব্য। **Max Walleser** প্রণীত **Dic Sektem des alten Buddhismus** গ্রন্থে বসুমিত্রের (পৃঃ ২৪ ইত্যাদি) এবং ভব্যের (পৃঃ ৭৭ ইত্যাদি) মতানুসারে সম্প্রদায়গুলির বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। **Rockhill** প্রণীত "বুদ্ধের জীবনী"তে (পৃঃ ১৮১ ইত্যাদি) তিব্বতীয় গ্রন্থসমূহ হইতে অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে। কথাবত্থু, ইহার টীকা এবং দীপবংশে (পৃঃ ৩৭-৮) পালি অথবা দক্ষিণ-দেশীয় বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

৪। অভিধর্মকোষ (পরিশিষ্ট), পুদ্গল বিনিশ্চয় (Stcherbatsky কর্তৃক অনূদিত আত্মাবাদ), কথা-বত্থু—প্রথম পরিচ্ছেদ ; মধ্যমক কারিকা ৯ ও ১০

৫। কিমুরা—"হীনযান ও মহাযান", পৃঃ ১২, ১৫, ৬৭, ১১৫ ইত্যাদি। এন্. দত্ত, "বৌদ্ধধর্মের তিনটি প্রধান সম্প্রদায়", পৃঃ ৩ ইত্যাদি।

৬। বোধিচর্যাবতার, ৯।৭ ; বিংশতিকা, ১০

৭। মৈত্রেয় (নাথ), অসঙ্গ এবং বসুবন্ধু (আনুমানিক ৪র্থ শতাব্দী) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

৮। মধ্যান্ত-বিভাগের প্রথম শ্লোকের (পৃঃ ৯) সহিত তুলনীয়—

অভূতপরিকল্পোঽস্তি দ্বয়ং তত্র ন বিদ্যতে
শূন্যতা বিদ্যতে ত্বত্র তস্যামপি স বিদ্যতে।

৯। সর্বাস্তি-বাদ (কুশ), সৌত্রান্তিক (যোষিংস্). যোগাচার (ফা-সিয়াং বা হস্সো) ; মাধ্যমিক (সানরণ)। তাকাকুসুর Essentials of Buddhist Philosophy, হনলুলু, ১৯৪৭ দ্রষ্টব্য।

১০। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫২-৪

১১। বৌদ্ধদর্শনে বলা হইয়াছে, "যো বিরুদ্ধ-ধর্মাধ্যাসবান্ নাসাবেকঃ।"

১২। অর্চিষাং সন্তানে প্রদীপ ইতি উপচর্যতে, এক ইবেতি কৃত্বা। এ কে ভি, পৃঃ ৭১৩ , রাশীবদ্ধারাবদিতি, ঐ পৃঃ ৭০৫।

১৩। এম্ কে ভি, পৃঃ ৬৬-৯

১৪। নগতির্নাশাং সংস্কৃতং ক্ষণিকং যতঃ, এ কে, ৪।২, টি এস্, পৃঃ ২৩১-২

১৫। পি ভি, ২।৪১৬-২০

১৬। প্রজ্ঞা অমলা সানুচরা অভিধর্মাঃ এ কে ভি, পৃঃ ১৮। মহাযানসূত্রালংকার, ১১।৩

১৭। এইগুলি হইতেছে ঃ ধম্ম সংগণি, বিভঙ্গ, ধাতু-কথা, পুগ্গল পঞ্ঞত্তি, কথা-বত্থু, যমক এবং পট্ঠান।

১৮। আউঙ্গ এবং শ্রীমতী রাইস্ ডেভিড্স্ কর্তৃক অনূদিত।

১৯। McGovern : A Manual of Buddhist Philosophy, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬-১৭

২০। তাকাকুসু সর্বাস্তিবাদিদের অভিধর্মসাহিত্যের একটি বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন, পৃঃ ৬৭-১৪৬, J P T S, ১৯০৫

২১। এ কে ভি (পৃঃ ৯ এবং ১১) এবং বাষ্টনের বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস (১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৯-৫০) অনুসারে ইহা বলা হইল। এই বাক্যের প্রবক্তা সম্বন্ধে ভিন্ন মতের জন্য সর্বাস্তিবাদ সাহিত্য সম্বন্ধে তাকাকুসুর প্রবন্ধ (পৃঃ ৭৪-৮) দ্রষ্টব্য।

২২। The Essentials of Buddhist Philosophy, হনলুলু হইতে প্রকাশিত, ১৯৪৭

২৩। বিভাষয়া দীব্যন্তি, চরন্তি বা, বিভাষাং বিদন্তি, বৈভাষিকাঃ, এ কে ভি, পৃঃ ১২

২৪। রাহুল সাংকৃত্যায়ন কর্তৃক তিব্বতে আবিষ্কৃত অভিধর্মকোষ ভাষ্যের সংস্কৃত ভাষায় লিখিত দুষ্প্রাপ্য হস্তলিখিত পুঁথি এখনও মুদ্রিত হয় নাই।

২৫। Central conception of Buddhism, পৃঃ ৭৪

২৬। এ কে ভি, পৃঃ ১২-১৩
২৭। ঐ পৃঃ ১৬
২৮। ঐ পৃঃ ১৭
২৯। ঐ পৃঃ ১৫
৩০। ঐ পৃঃ ৪২
৩১। ঐ পৃঃ ২৪ ইত্যাদি। **McGovern, A Manual of Buddhism,** পৃঃ ১০৩ ইত্যাদি। **Rosenberg, Probleme die Buddhist Philosophie,** পৃঃ ১২৮-৯
৩২। এ কে ভি, পৃঃ ২৯ ইত্যাদি।
৩৩। এ কে ভি, পৃঃ ৩৩
৩৪। **Central Conception,** পৃঃ ১৩
৩৫। **Manual of Buddhism,** পৃঃ ১৩৬
৩৬। **Central Conception,** পৃঃ ১০ ইত্যাদি।
৩৭। এ কে ২।৩৫ ইত্যাদি ; এ কে ভি ১৪ ইত্যাদি।
৩৮। এ কে, ৪
৩৯। এ কে, ২।৬৫ , এ কে ভি, পৃঃ ২০
৪০। এ কে, ২।৪৯ ; এ কে ভি, পৃঃ ২৩১ ইত্যাদি।
৪১। এ কে, ৩।১৮ ইত্যাদি।
৪২। যে সূত্রপ্রামাণিকা ন শাস্ত্রপ্রামাণিকাঃ তে সৌত্রান্তিকাঃ, এ কে ভি, পৃঃ ১১
৪৩। এ কে ভি, পৃঃ ২৫ ; এ কে ভি, পৃঃ ৪৬৮ ইত্যাদি , **Central Conception** পৃঃ ৭৭
৪৪। এ কে, ৫।২৬। মতবাদের সংখ্যা চার, কারণ (১) প্রথমটি হইতেছে যে সত্তার পরিবর্তন হয় (ভাব-পরিণাম—ধর্মত্রাতার মত বলিয়া কথিত), (২) দ্বিতীয়টি হইতেছে যে লক্ষণের পরিবর্তন হয়—(লক্ষণ-পরিণাম—ঘোষের মতবাদ বলিয়া কথিত), (৩) তৃতীয়টি হইতেছে যে অবস্থার পরিবর্তন হয় (অবস্থা-পরিণাম—বসুমিত্রদ্বারা সমর্থিত), অথবা নির্ভরশীলতা (অপেক্ষা-পরিণাম—বুদ্ধদেবের মত)। তৃতীয় বিকল্পটিই সত্য। কালের প্রভেদ উপাদানগুলির ক্রিয়ার প্রভেদের (কারিত্র-ভেদের) উপর নির্ভর করে। **Central Conception,** পৃঃ ৭৮-৯
৪৫। শৈবসিদ্ধান্তগ্রন্থ শিবজ্ঞানসিদ্ধির অরুণন্দি (ত্রয়োদশ শতাব্দী) প্রণীত টীকা অবলম্বনে এই তালিকা রচিত হইয়াছে। পণ্ডিত ঐয়স্বামী শাস্ত্রী প্রথমে ইহার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। (আলম্বন-পরীক্ষার তৎপ্রণীত 'পরিশিষ্ট' দ্রষ্টব্য)।
৪৬। দিঙ্‌নাগের স্বলিখিত বৃত্তিসহ প্রমাণ-সমুচ্চয় তাঁহার সর্বপ্রধান গ্রন্থ। বৌদ্ধ-তর্কশাস্ত্রে ইহার স্থান ন্যায়সূত্রের সমতুল্য। ইহা ছাড়াও তিনি বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে আলম্বন-পরীক্ষা, ত্রিকাল-পরীক্ষা, হেতুচক্র সমর্থন এবং ন্যায়-মুখ এইগুলি প্রধান। আলম্বন-পরীক্ষা এবং প্রমাণ-সমুচ্চয় (অংশতঃ) তিব্বতীয় ভাষা হইতে সংস্কৃতে পুনর্লিখিত হইয়াছে, অন্যান্য পুস্তকসমূহ কেবলমাত্র তিব্বতীয় ভাষাতেই পাওয়া যায়। ন্যায়-প্রবেশকে অনেকে দিঙ্‌নাগ কর্তৃক লিখিত বলিয়া মনে করেন, কিন্তু ইহা প্রকৃতপক্ষে শঙ্করস্বামীর রচনা।

ধর্মকীর্তি বিখ্যাত প্রমাণ-বার্তিক (ইহাকে দিঙ্‌নাগের প্রমাণ-সমুচ্চয়ের একটি ধারাবাহিক টীকা বলা যাইতে পারে), প্রমাণ-বিনিশ্চয়, হেতুবিন্দু, সম্বন্ধ-পরীক্ষা, সন্তানান্তরসিদ্ধি এবং ন্যায়-বিন্দুর রচয়িতা। ইহাদের মধ্যে কেবলমাত্র প্রথম এবং শেষ পুস্তকটি সংস্কৃতভাষায় পাওয়া যায়।

৪৭। পি ভি, ১।৩; এন্‌ বি টি, পৃঃ ৩

৪৮। পি ভি, ১।৭; এন্‌ বি টি, পৃঃ ৩

৪৯। পি এস্, পৃঃ ৪; এন্‌ বি টি, পৃঃ ৫

৫০। পি এস্, পৃঃ ৪; পি ভি, ২, এন্‌ বি টি, পৃঃ ৫ ইত্যাদি।

৫১। এন্‌ বি টি, পৃঃ ১২; **Buddhist Logic** প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৪৭ ইত্যাদি।

৫২। **Critique of Pure Reason** (কেম্প স্মিথের অনুবাদ) পৃঃ ৬১-৬২, পৃঃ ৬৫, পৃঃ ৯৩ ইত্যাদি।

৫৩। পি ভি, ২।৫৩-৫৪

৫৪। পি ভি, ২।৫৫-৫৬; এন্‌ বি টি, পৃঃ ৭; দেশ কাল ও বৌদ্ধিক আকারগুলি যে প্রত্যক্ষজগতে অনুভূত হইলেও উহারা জ্ঞাতৃতন্ত্র এবং প্রাক্‌প্রত্যক্ষ কাণ্টের এই মতবাদের সহিত তুলনীয়।

৫৫। পি ভি, ২।৫৭-৫৮

৫৬। পি ভি, ২। পৃঃ ৬৫ ইত্যাদি।

৫৭। এন্‌ বি টি, পৃঃ ৬

৫৮। পি এস্, পৃঃ ৮

৫৯। এন্‌ বি টি, পৃঃ ১৩

৬০। সেইজন্য দিঙ্‌নাগ ভ্রান্ত-প্রত্যক্ষকে প্রত্যক্ষের অন্তর্ভুক্ত না করিয়া প্রত্যক্ষের লক্ষণ নির্ণয়ের চেষ্টা করেন নাই। ধর্মকীর্তি কিন্তু প্রত্যক্ষকে বৌদ্ধিক কল্পনা এবং ভ্রান্তি হইতে মুক্ত জ্ঞান বলিয়াছেন। যে সকল ভ্রান্তি বৌদ্ধিক কল্পনাপ্রসূত নয় পরন্তু দ্রুত গতি, দূরত্ব, ইন্দ্রিয়ের ক্ষতি বা রোগ প্রভৃতি কেবলমত্র বস্তুঘটিত অথবা শরীরঘটিত কারণপ্রসূত সেগুলিকে বর্জন করিবার জন্যই এইরূপ করা হইয়াছে। এন্‌ বি, ১।৬

৬১। এন্‌ বি, ১।১২-১৪

৬২। পি ভি, ২।২৪৩; এন্‌ বি, ১।৯

৬৩। **Buddhist Logic** ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৮

৬৪। এন্‌ বি, ১, ২; পি ভি, ২।২৮১ ইত্যাদি।

৬৫। এন্‌ বি টি, পৃঃ ৮

৬৬। এন্‌ বি, ১।৫

৬৭। টি এস্, পৃঃ ৩৭২ ইত্যাদি।

৬৮। পি এস্, পৃঃ ১২; **Buddhist Logic,** ১ম খণ্ড, পৃঃ ২১৭।

৬৯। শ্লোকবার্তিক (অনুমান পরিচ্ছেদ পৃঃ ১৪৯ ইত্যাদি)। অর্চতের হেতুবিন্দুটীকায় উদ্ধৃত (পৃঃ ২৩-২৪)। ইহা ধর্মকীর্তি প্রণীত হেতুবিন্দুর টীকা। বরোদা G. O. S-এ মুদ্রিত করিবার জন্য ইহাকে লওয়া হইয়াছে। আমার বন্ধু শ্রীমালবানিয়া অনুগ্রহ করিয়া এই টীকার প্রুফ আমায় দেখাইয়াছিলেন।

৭০। হেতুবিন্দুটীকা, পৃঃ ২৪

৭১। ঐ পৃঃ ২৫-২৮

৭২। এন্ বি, ২।৩-৭।

৭৩। পি ভি, ৩।১ ; এন্ বি, ২।১১-১২

৭৪। এন্ বি টি, পৃঃ ২৪

৭৫। এন্ বি, পৃঃ ১৮ ইত্যাদি।

৭৬। পি ভি, ৩।৩০

৭৭। পি ভি, ২।৩০৬ ; এন্ বি, ১।১৮ ইত্যাদি।

৭৮। অত্যন্তবিলক্ষণানাং সলাক্ষণ্যম্, তাৎপর্য টীকা ; পৃঃ ৩৪০

৭৯। আত্মেতি, কাশ্যপ, অয়ম্ একোঽন্তঃ ; নৈরাত্ম্যমিত্যয়ং দ্বিতীয়োঽন্তঃ ; যদাত্মানৈরাত্ম্যয়োর্মধ্যং তদরূপ্যমনিদর্শনম্—ইয়মুচ্যতে···মধ্যমা প্রতিপদ্ধর্মাণাং ভূত-প্রত্যবেক্ষা—কশ্যপ-পরিবর্ত, পৃঃ ৮৭ , এস্ কে ভি-তে উদ্ধৃত, পৃঃ ৩৫৮

৮০। মজ্ঝিম নিকায় (সুত্ত ৭২) সংযুক্ত নিকায় ৩। পৃঃ ২৫৭ ইত্যাদি ৪। পৃঃ ৩৭৪-৪০৩ , এস্ কে দ্বাবিংশ, পঞ্চবিংশ এবং সপ্তবিংশ অধ্যায় এবং অষ্ট-সহস্রিকা পৃঃ ২৬৯ ইত্যাদি।

৮১। **Gautama the Buddha,** পৃঃ ৫৯ ; **Ind. Phil,** প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৬৮২-৩

৮২। মজ্ঝিম নিকায় (সুত্ত ৭২) ; **Warren, Buddhism in Translations,** পৃঃ ১২৫

৮৩। সংযুত্ত নিকায় ২।১৭

৮৪। এম্ কে ১৫।৭

৮৫। ইহার কয়েকটি বিভিন্ন পাঠ প্রচলিত আছে। মনে হয় অষ্টসাহস্রিকা (আনুমানিক প্রথম শতাব্দী পূঃ খৃঃ) মূলগ্রন্থ এবং শতসাহস্রিকা পঞ্চবিংশতি প্রভৃতি উহারই বিস্তৃত ব্যাখ্যা এবং বজ্র-ছেদিকা ও অধ্যর্ধশতিকা উহার সংক্ষিপ্ত আকার।

৮৬। মধ্যমক বৃত্তি এবং প্রজ্ঞাপ্রদীপ যথাক্রমে বুদ্ধপালিত এবং ভাববিবেক কর্তৃক লিখিত মধ্যমক কারিকার ভাষ্য। ভাববিবেক ইহা ব্যতীত তর্কজ্বালা মধ্যমকার্থসংগ্রহ এই দুইটি গ্রন্থেরও প্রণেতা। এই দুইটি তিব্বতীয় ভাষায় রক্ষিত আছে।

৮৭। চতস্রঃ দ্বেতা দৃষ্টয়ঃ। এস্ কে ভি, পৃঃ ৫৭২-৩। চতুঃশতিকা, ১৪।২১

৮৮। আচার্যো ভূয়সা প্রসঙ্গাপত্তি মুখেনৈব পরপক্ষং নিরাকরোতিস্ম। এম্ কে ভি, পৃঃ ২৪

৮৯। এম্ কে ভি, পৃঃ ১৬, ১৮, ৩৪

৯০। ঐ পৃঃ ১৪, ২২ ; এস্ কে, ২০।২০

৯১। ঐ পৃঃ ৩৬ ঐ ২০।১৯

৯২। এম্ কে, ১৮।১০, ১৪।১৯। বিরোধ-মূলক বিচারের মূল নিয়ম সম্বন্ধে এস্ কে, ২।২১, ১৯।৬, এম্ কে ভি, পৃঃ ২০০ দ্রষ্টব্য।

৯৩। এম্ কে, ১৩।৮, ১৪।১১ ; এম্ কে ভি, পৃঃ ২৪৭ ৮

৯৪। প্রজ্ঞা-পারমিতা জ্ঞানমদ্বয়ম্ স তথাগতঃ—দিঙ্নাগ প্রণীত প্রজ্ঞাপারমিতা পিণ্ডার্থ।

৯৫। এম্ কে, ১৮, বোধিচর্যাবতার ৯।২

৯৬। ঐ ২৫। পৃঃ ১৯, ২০, ৯

৯৭। ঐ ২৪।৯

৯৮। এম্ কে ভি, পৃঃ ৪৯৩

৯৯। ঐ পৃঃ ৪৯২

১০০। এম্, কে, ১৮।৫ ২৩

১০১। **Tucci, Some Aspects of the Doctrines of Maitreyanatha**, পৃঃ ২ ইত্যাদি।

১০২। বসুবন্ধু ২৮০-৩৬০ খৃষ্টাব্দ, অথবা ৪২০-৫০০ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। সাধারণতঃ এখন প্রথম মতটিই গৃহীত হইয়া থাকে।

১০৩। **Obermileer, The Doctrine of Prajnaparamita**, পৃঃ ৯৯-১০০

১০৪। ত্রিংশিকাভাষ্য, পৃঃ ১৫

১০৫। ঐ পৃঃ ৬৬

১০৬। মধ্যান্ত বিভাগ টীকা, পৃঃ ৯, ১৩-১৪, ১৮

১০৭। সংক্লিষ্টা চ বিশুদ্ধা চ সমলা বিমলা চ। মধ্যান্ত, পৃঃ ৪২-৩

১০৮। আলম্বন পরীক্ষা (দিঙ্নাগ) ১, ২। বিংশতিকা, ২। টি এস্, পৃঃ ৫৫১ ইত্যাদি।

১০৯। এই প্রবন্ধের দ্বিতীয়াংশ দ্রষ্টব্য।

১১০। (ক) পি ভি, ২।৪৪২-৫

১১০। (খ) ঐ ২।৩৩৬, ৩৮৯-৯১, ৫৭১ ইত্যাদি।

১১১। বিংশতিকা। ১, ৯

১১২। ঐ ২

১১৩। ত্রিংশিকা, ১

১১৪। এবমালয়বিজ্ঞানে সতি সংসারপ্রবৃত্তিনিবৃত্তিশ্চ ত্রিংশিকা, পৃঃ ৩৮

১১৫। ঐ তস্য ব্যাবৃত্তির্অর্হত্বে।

১১৬। ত্রিংশিকা, ২০

১১৭। ঐ ২১

১১৮। ঐ ২২

১১৯। ত্রিংশিকাভাষ্য, পৃঃ ৩৯-৪১

১২০। ত্রিংশিকা, ২৬-৩০

১২১। "মহাযান মতবাদ সম্ভবতঃ কিছু পরিমাণে উপনিষদের প্রভাবের নিকট ঋণী"—**Stcherbatsky, Buddhist Nirvana**, পৃঃ ৫১

১২২। ঐ, পৃঃ ৫১, ৬২

১২৩। অধ্যাপক বিধুশেখর ভট্টাচার্য তাঁহার গ্রন্থ গৌড়পাদের আগম শাস্ত্রে তাঁহার স্বভাবসুলভ দক্ষতার সহিত প্রমাণ করিয়াছেন।

১২৪। আগমশাস্ত্র, পৃঃ **CX LIV, IV**

গ্রন্থবিবরণী

যশোমিত্র—অভিধর্মকোষ ব্যাখ্যা
ধর্মকীর্তি—প্রমাণ বার্তিক
ধর্মকীর্তি—ন্যায়বিন্দু
নাগার্জুন—মূল মধ্যমক কারিকা চন্দ্রকীর্তির প্রসন্নপদাসহ
শান্তিদেব—বোধিচর্যাবতার
বসুবন্ধু—বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধি
শান্তিরক্ষিত—তত্ত্বসংগ্রহ
ওবারমিলার—বাষ্টন্ প্রণীত বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস, ১ম ও ২য় খণ্ড (অনুবাদ)
রাধাকৃষ্ণন—ভারতীয় দর্শন, ১ম খণ্ড পৃঃ ৬১১ ইত্যাদি
দাসগুপ্ত—ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস, ১ম ও ২য় খণ্ড
শেরবাস্কি—নির্বাণ সম্বন্ধে বৌদ্ধমত
শেরবাস্কি—বৌদ্ধ তর্কশাস্ত্র, ২য় খণ্ড
উইন্টারনিজ—ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস (ইংরাজী অনুবাদ), ২য় খণ্ড

একাদশ পরিচ্ছেদ

ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন

ক। প্রাচীন ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন

১। ভূমিকা

ন্যায় ও বৈশেষিক এই দুইটি স্বাধীন বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত বস্তুবাদী দর্শন। এই দুইটি দর্শন বৌদ্ধ আভাসবাদ ও বিজ্ঞানবাদের বিরুদ্ধে মূল্যবান প্রতিক্রিয়া। ন্যায় প্রধানতঃ যুক্তি ও প্রমাণশাস্ত্র এবং বৈশেষিক প্রধানতঃ পদার্থ ও তত্ত্ববিদ্যা। অবশ্য উভয়েরই মূল তত্ত্বগুলি এক এবং উভয়ের লক্ষ্যও এক—জীবের মুক্তি বা অপবর্গ লাভ। এই দুইটি প্রস্থানের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক থাকায় এবং বহুকাল যাবৎ উহারা একই মূল দর্শনের অঙ্গ বলিয়া গৃহীত হওয়ায়, এই পরিচ্ছেদে তাহাদের এক সঙ্গেই আলোচনা করা হইবে।

ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের ইতিহাস বিংশ-শতাব্দী পরিব্যাপ্ত। প্রাচীন ও নবীন—এই দুই ভাগে ইহা বিভক্ত। গৌতম এবং কণাদ (আনুমানিক খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতক) হইতে প্রাচীন ন্যায়-বৈশেষিকের আরম্ভ এবং নব্য-ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাতা গঙ্গেশের (খৃঃ ১২০০) আবির্ভাবের সঙ্গে ইহার পরিসমাপ্তি। গৌতমের ন্যায়সূত্রই ন্যায় দর্শনের প্রথম সুবিন্যস্ত রচনা। প্রাচীন ন্যায়ের অন্যান্য বিখ্যাত গ্রন্থের মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি উল্লেখযোগ্য : বাৎস্যায়নের ন্যায়-ভাষ্য (আনুমানিক খৃঃ ৪০০), উদ্দ্যোতকরের ন্যায়বার্তিক (আনুমানিক খৃঃ ষষ্ঠ শতক), বাচস্পতি মিশ্রের ন্যায়-বার্তিক-তাৎপর্য-টীকা (খৃঃ নবম শতক), উদয়নের ন্যায়-বার্তিক-তাৎপর্য-পরিশুদ্ধি (খৃঃ দশম শতক) ও ন্যায়কুসুমাঞ্জলি (খৃঃ দশম শতক), জয়ন্ত ভট্টের ন্যায়মঞ্জরী এবং ভাসর্বজ্ঞের ন্যায়-সার (খৃঃ দশম শতক)। কণাদের বৈশেষিক-সূত্র বৈশেষিক দর্শনের প্রথম সুবিন্যস্ত রচনা। ইহা ন্যায়সূত্রের পূর্বে রচিত বলিয়া মনে হয়। বৈশেষিক সূত্রের কোন ভাষ্য এখন আর পাওয়া যায় না। যদিও লঙ্কাধিপতি রাবণ ইহার একখানি ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া শোনা যায়। প্রশস্তপাদের পদার্থ-ধর্ম-সংগ্রহকেই (খৃঃ চতুর্থ শতক) সাধারণতঃ বৈশেষিক-সূত্রের ভাষ্য বলিয়া গ্রহণ করা হয়। কিন্তু এই গ্রন্থ পড়িলে ইহাকে ভাষ্য বলিয়া মনে হয় না। মনে হয় যেন ইহা বৈশেষিক দর্শনের উপর লিখিত একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ। প্রশস্তপাদের এই গ্রন্থের উপর

তিনটি উৎকৃষ্ট টীকা আছে : যথা ব্যোমশিবের ব্যোমবতী (খৃঃ নবম শতক), শ্রীধরের ন্যায়-কন্দলী এবং উদয়নের কিরণাবলী (খৃঃ দশম শতক)। উদয়নের লক্ষণাবলী বৈশেষিক দর্শনের উপর লিখিত একটি ক্ষুদ্র সংগ্রহ-পুস্তক। শিবাদিত্যের সপ্তপদার্থী এবং বল্লভাচার্যের ন্যায়-লীলাবতী বৈশেষিক দর্শনের উপর লিখিত অপর দুইখানি মূল্যবান্ গ্রন্থ ; এই গ্রন্থ দুইখানি প্রাচীন যুগের শেষ দিকে রচিত এবং ইহাদের মধ্যে ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

প্রাচীন ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনকে প্রমাশাস্ত্র ও তত্ত্ববিদ্যা এই দুই ভাগে ভাগ করিলে আলোচনার সুবিধা হইবে।

২। প্রমাশাস্ত্র

ন্যায়-বৈশেষিকের প্রমাশাস্ত্রে জ্ঞান-সম্পর্কিত প্রধান প্রধান সমস্যার সবগুলিই আলোচিত হইয়াছে। জ্ঞান আত্মার একটি গুণ, বিষয়ের প্রকাশই উহার স্বরূপ। জ্ঞানের নানা প্রকার আছে। ন্যায় দর্শনে জ্ঞানকে প্রমা বা যথার্থ জ্ঞান এবং অপ্রমা বা অযথার্থ জ্ঞান —এই দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি ও শব্দ এইগুলি প্রমার বিভাগ। স্মৃতি, সংশয়, বিপর্যয় ও তর্ক এইগুলি অপ্রমার বিভিন্ন প্রকার। বৈশেষিক দর্শনেও জ্ঞানকে প্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে : বিদ্যা বা যথার্থজ্ঞান এবং অবিদ্যা বা অ-যথার্থ জ্ঞান। কিন্তু প্রত্যক্ষ, অনুমান, স্মৃতি এবং আর্যজ্ঞান এইগুলিই প্রথমটির উপবিভাগ, এবং দ্বিতীয়টির উপবিভাগ হইতেছে সংশয়, বিপর্যয়, অনধ্যবসায় এবং স্বপ্ন। যথার্থজ্ঞান বলিতে বোঝা যায়, বিষয় বা বস্তু যেমন আছে তাহার সম্বন্ধে ঠিক তেমন অসন্দিগ্ধ, সুনির্দিষ্ট ও নির্ভুল অনুভব। এই মত অনুসারে, সংশয়, বিপর্যয়, তর্ক, অনধ্যবসায় এবং স্বপ্নকে যথার্থজ্ঞান হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে এইজন্য যে, উহারা হয় অনিশ্চয়তা-দোষে দুষ্ট অথবা তাহারা বিষয়কে যথার্থভাবে প্রকাশ করে না। স্মৃতিকে নৈয়ায়িকরা অযথার্থ জ্ঞান বলিয়া মনে করেন, কারণ ইহা অনুভব নয়, কিন্তু কোন বিষয়ের অতীত অনুভবের সংস্কারজনিত জ্ঞান। যদিও কোন কোন বৈশেষিক স্মৃতিকে প্রমার অন্তর্ভুক্ত করেন, তথাপি অন্য কেহ কেহ উহাকে প্রমা হইতে বাদ দিয়া থাকেন। আর্যজ্ঞানকে নৈয়ায়িকরা যথার্থ-জ্ঞান বলিয়া গ্রহণ করেন, কিন্তু ইহাকে অলৌকিক জ্ঞানের পর্যায়ে ফেলা হয়।[১]

প্রমাকে কিভাবে অযথার্থ বা ভ্রান্ত জ্ঞান হইতে পৃথক্ করা হইবে, সে বিষয়ে ন্যায়-বৈশিষেকের মত এইরূপ : বিষয়ের স্বভাবের সঙ্গে জ্ঞানের যখন মিলন ঘটে,

তখনই জ্ঞান যথার্থ বলিয়া পরিগণিত হয়; ইহার অন্যথা হইলেই জ্ঞান ভ্রান্ত হয়। কোন জ্ঞান যথার্থ কিনা জানিতে হইলে দেখিতে হইবে যে, উহা সফল প্রবৃত্তির জনক কিনা। জ্ঞান যদি সফল প্রবৃত্তির জনক হয়, তাহা হইলে উহা সত্য, তাহা না হইলে উহা মিথ্যা। অতএব, জ্ঞানের সত্যতা ও মিথ্যাত্ব নির্ভর করে বিষয়ের স্বভাবের সহিত জ্ঞানের সঙ্গতি এবং অসঙ্গতির উপর এবং প্রবৃত্তিসংবাদ বা প্রবৃত্তি-বিসংবাদের সাহায্যে জ্ঞানের এই সত্যত্য বা মিথ্যাত্ব নির্ধারিত হয়। জ্ঞানের সত্যতা এবং মিথ্যাত্ব নির্ভর করে বিষয়ের স্বভাবের সহিত জ্ঞানের সঙ্গতি এবং অসঙ্গতির উপর, এবং প্রবৃত্তিসংবাদ বা প্রবৃত্তি-বিসংবাদের সাহায্যে জ্ঞানের এই সত্যতা বা মিথ্যাত্ব বস্তুর সহিত জ্ঞানের সঙ্গতি এবং অসঙ্গতি এই দুইটি কারণের উপর নির্ভর করে। এবং প্রবৃত্তিসংবাদ ও প্রবৃত্তিবিসংবাদের সাহায্যে জ্ঞানের সত্যতা এবং মিথ্যাত্ব নির্ধারিত হয় বলিয়া এই মতকে পরতঃপ্রামাণ্য এবং পরতঃ-অপ্রামাণ্যবাদ বলা হয়। কোন কোন নৈয়ায়িক অবশ্য বিশেষ ক্ষেত্রে স্বতঃপ্রামাণ্যবাদ স্বীকার করেন।[২]

প্রমা বলিতে যেমন যথার্থ জ্ঞান বুঝায়, তেমনি প্রমাণ বলিতে ঐরূপ জ্ঞানের নিয়তকরণ বুঝায়। কতগুলি প্রমাণ স্বীকার করা হইবে সে-বিষয়ে ন্যায় ও বৈশেষিকের মধ্যে মতভেদ আছে। নৈয়ায়িক সাধারণতঃ চারটি প্রমাণ স্বীকার করিয়া থাকেন। যথা—প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি ও শব্দ। বৈশেষিক কেবল প্রত্যক্ষ ও অনুমিতিকে পৃথক প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন এবং তাঁহার মতে উপমিতি এবং শব্দ অনুমিতিরই অন্তর্ভুক্ত। কোন কোন নৈয়ায়িক অবশ্য উপমিতিকে শব্দপ্রমাণ বলিয়া মনে করেন। আবার কোন কোন বৈশেষিক স্মৃতি এবং শব্দকে স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। অন্যান্য দার্শনিকরা অর্থাপত্তি, অনুপলব্ধি প্রভৃতি যে কতকগুলি পৃথক প্রমাণ মানিয়া থাকেন, ন্যায়-বৈশেষিক সেই সকল প্রমাণকে তাঁহাদের স্বীকৃত প্রমাণের কোন না কোন একটির মধ্যে গণ্য করিয়া থাকেন।[৩]

সকল প্রমাণের মধ্যে প্রত্যক্ষের স্থান প্রথম। প্রাচীন ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে প্রত্যক্ষের এইরূপ লক্ষণ করা হইয়াছে; উহা বিষয়েন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষ-জনিত বিষয়ের নিশ্চিত এবং যথার্থ জ্ঞান। প্রাচীন নৈয়ায়িকদের অন্য একটি সংজ্ঞা অনুসারে প্রত্যক্ষ বলিতে বুঝায় এমন সাক্ষাৎ প্রতীতি যাহা পূর্ব প্রত্যক্ষ বা অনুমানের উপর নির্ভর করে না।[৪] এই মতের মধ্যে নব্যন্যায়ের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষ হইতে উৎপন্ন প্রত্যক্ষজ্ঞানের নানাপ্রকার শ্রেণীবিভাগ আছে। প্রত্যক্ষজ্ঞান

যখন চক্ষু, কর্ণ, ত্বক্, জিহ্বা, নাসিকাদ্বারা উৎপন্ন হয়, তখন ইহাকে বাহ্য-প্রত্যক্ষ বলা হয়। যে প্রত্যক্ষজ্ঞান মন বা অন্তঃকরণ ও উহার যোগ্য বিষয়ের সন্নিকর্ষদ্বারা উৎপন্ন হয়, তাহা আন্তর বা মানস-প্রত্যক্ষ। অন্যদিক হইতে প্রত্যক্ষজ্ঞানকে আবার দুইভাগে ভাগ করা হইয়াছে; যথা—নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ এবং সবিকল্প প্রত্যক্ষ। নির্বিকল্প প্রত্যক্ষে বস্তুর কেবল অস্তিত্বের দিকটাই প্রকাশিত হয়; 'ইহা অমুক প্রকারের পদার্থ' এইরূপ কোন ধর্মধর্মিভাব স্পষ্টভাবে গৃহীত হয় না। উহা শুধু বস্তু ও উহার গুণগুলির অসংবদ্ধ জ্ঞানমাত্র, বস্তুটিকে উদ্দেশ্য করিয়া এবং গুণগুলিকে বিধেয় করিয়া শব্দের মাধ্যমে জ্ঞান নহে। সবিকল্প প্রত্যক্ষে বস্তুকে কোন ধর্মযুক্ত বলিয়া জানা হয়। ন্যায়-বৈশেষিক মতে প্রত্যভিজ্ঞা সবিকল্প প্রত্যক্ষেরই প্রকারবিশেষ। প্রত্যভিজ্ঞাতে আমরা এইরূপ বাক্য ব্যবহার করিয়া থাকি : "যে ঘট আমি পূর্বে দেখিয়াছি উহা তাহাই।" অতএব, উহা পূর্বে অনুভূত হইয়াছিল এই ভাবে কোন বিষয়ের জ্ঞান।[৫]

প্রত্যক্ষের পরেই অনুমানের আলোচনা করা হইয়াছে। অনুমান বলিতে এমন এক বিচারপ্রণালী বুঝায়, যাহাদ্বারা কোন বস্তুর প্রত্যক্ষে অজ্ঞাত ধর্মের জ্ঞান হয়। এই জ্ঞান ঐ বস্তুতে বিদ্যমান এমন একটি চিহ্ন বা লিঙ্গের সাহায্যে উৎপন্ন হয় যাহা উক্ত ধর্মের সহিত নিয়তভাবে সম্বদ্ধ। উদাহরণস্বরূপ আমরা পর্বত হইতে ধূম দেখিয়া ধূম ও অগ্নির নিয়ত সম্বন্ধ স্মরণ করি; অনুমান করি যে, পর্বতে অগ্নি আছে। যে পদার্থে কোন ধর্মের অনুমান করা হইয়া থাকে (যেমন এ ক্ষেত্রে পর্বত) উহাকে অর্থাৎ, অনুমিতি-বাক্যের উদ্দেশ্যকে পক্ষ বলা হয়। যাহা অনুমিতির বিষয় (যেমন এ ক্ষেত্রে অগ্নি) তাহাকে সাধ্য বলা হয় এবং যে চিহ্নের সাহায্যে এই অনুমিতি লাভ করা হইল (যেমন এ ক্ষেত্রে ধূম) তাহাকে লিঙ্গ বা হেতু বলা হয়। ধূমকে এ ক্ষেত্রে অগ্নির লিঙ্গ বলিয়া ধরা হইয়াছে এই জন্য যে, ইহা পর্বতে দৃষ্ট হয় এবং পূর্ব-অভিজ্ঞতা হইতে জানা যায় যে, ধূমমাত্রেই অগ্নির সহিত নিয়তভাবে সম্বদ্ধ। পক্ষে লিঙ্গের অবস্থিতিকে বলা হয় পক্ষধর্মতা এবং লিঙ্গের সহিত সাধ্যের অব্যভিচারী সম্পর্ককে বলা হয় অ-বিনা-ভাব বা ব্যাপ্তি। অতএব দেখা যাইতেছে যে, কেবল লিঙ্গের সাহায্যেই অনুমান করা হয় না, কিন্তু লিঙ্গের সহিত সাধ্যের অব্যভিচারী সম্পর্ক এবং পক্ষে উহার অবস্থিতির জ্ঞান অনুমিতির করণ। এই জ্ঞানকে লিঙ্গপরামর্শ বলা হয়।[৬]

পূর্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, অনুমানে তিনটি শব্দ ও তিনটি বাক্য থাকিবে। এই তিনটি শব্দকে বলা হয় পক্ষ, সাধ্য,

লিঙ্গ। এ্যারিস্টট্‌ল্‌-এর তর্কশাস্ত্র মতে ইহাদিগকে যথাক্রমে minor, major এবং middle term বলা যাইতে পারে। লিঙ্গের মাধ্যমে সাধ্যের সহিত পক্ষের সম্পর্ক স্থাপন করাই অনুমিতি। সুতরাং অনুমানে তিনটি বাক্য থাকে। প্রথম বাক্যে সাধ্যকে পক্ষের বিধেয় করা হয়; যথা—পর্বত বহ্নিমান্‌। দ্বিতীয়টিতে পক্ষে যে লিঙ্গের সম্বন্ধ আছে তাহা বলা হয়; যথা—কারণ, পর্বত ধূমবান্‌। তৃতীয়টিতে বলা হয় যে, লিঙ্গ সাধ্যের সহিত নিয়ত সম্বদ্ধ। যথা—যেখানে যেখানে ধূম আছে সেখানেই বহ্নি আছে, যথা পাকশালা। এইভাবে আমরা এমন একটি ন্যায় পাই যাহার তিনটি অবয়ব। এই ন্যায় স্বার্থানুমান, অর্থাৎ যাহা নিজের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু যে অনুমান অপরকে কিছু বুঝাইবার জন্য করা হয়, তাহাকে বলা হয় পঞ্চাবয়বী-ন্যায়; ইহা পরার্থানুমান। এই পাঁচটি অবয়ব এবং উহাদের ক্রম নিম্নলিখিত রূপ:[১]

(১) প্রতিজ্ঞা—	পর্বত বহ্নিমান্‌।
(২) হেতু—	কারণ, পর্বতে ধূম আছে।
(৩) উদাহরণ, অর্থাৎ দৃষ্টান্তসহ ব্যাপ্তি-বাক্য—	যেখানে ধূম আছে সেখানেই বহ্নি আছে, যেমন—পাকশালা।
(৪) উপনয়, অর্থাৎ প্রয়োগ—	এই পর্বতের ধূমও সেইরূপ।
(৫) নিগমন অর্থাৎ সিদ্ধান্ত—	অতএব, এই পর্বত বহ্নিমান্‌।

এখানে আমরা এমন একটি ন্যায়ের উদাহরণ পাইতেছি যাহাতে পাঁচটি সর্তনিরপেক্ষ বাক্য আছে। ভারতীয় ও এ্যারিস্টটলীয় ন্যায়ের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। উভয়ের মতেই প্রত্যেক ন্যায়ে তিনটি মাত্র মুখ্য পদ থাকে। তিন অবয়বযুক্ত ভারতীয় ন্যায়ে যে তিনটি বাক্য থাকে, সেইগুলি এ্যারিস্টটলীয় ন্যায়ের সিদ্ধান্ত, অপ্রধান ও প্রধান বাক্যের অনুরূপ। এই সাদৃশ্যের জন্য কোন কোন পণ্ডিত বলিয়া থাকেন যে, ভারতীয় ন্যায়ের বিকাশের মূলে এ্যারিস্টটলের প্রভাব রহিয়াছে। কিন্তু আমরা যখন উভয়ের মৌলিক প্রভেদগুলি লক্ষ্য করি, তখন আর এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারি না। ভারতীয় ন্যায়ে, যেখানে তিনটি অবয়ব থাকে তাহাদের ক্রম এ্যারিস্টট্‌ল্‌ কর্তৃক নির্দিষ্ট ক্রমের বিপরীত। 'সকলে' এবং 'কেহই নহে'—এতৎসংক্রান্ত নিয়ম এ্যারিস্টটলীয় ন্যায়ের মূলসূত্র এবং উহা কোন শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত হওয়া রূপ সম্বন্ধের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। অপর দিকে, ভারতীয় ন্যায়ের মূলসূত্র হইল সাধ্য ও লিঙ্গের মধ্যে অব্যভিচারী এবং অনন্যথাসিদ্ধ সহচার-নিয়ম। তাহা ছাড়া, এ্যারিস্টটলের

ন্যায় কেবল আকারগত এবং এই ন্যায়দ্বারা সিদ্ধান্তের শুধু আকারগত সত্যতাই নির্ধারিত হয়। ইহা অনুমান অপেক্ষা বরং উপাত্তবাক্যের সত্যতা হইতে অন্য বাক্যের সত্যতা উপপাদন করার ন্যায়। অর্থাৎ হেতুবাক্যগুলির সত্যতা স্বীকার করিলে সিদ্ধান্তের সত্যতাও স্বীকার করিতে হয়। ভারতীয় ন্যায় যথার্থই অনুমিতি; উহাকে হেতুবাক্যগুলির সত্যতা নিশ্চিতভাবে পরিজ্ঞাত এবং এইরূপ হেতুবাক্য হইতে আমরা একটি বাস্তব সত্য এবং অবশ্যস্বীকার্য সিদ্ধান্তে উপনীত হই। ভারতীয় ন্যায়ের তৃতীয় বাক্যটি প্রকৃতপক্ষে ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত একটি সার্বিক বাক্য। সুতরাং ইহাতে অবরোহ এবং আরোহ অনুমানের এবং আকারগত ও বস্তুগত সত্যের সমন্বয় করা হইয়াছে। ভারতীয় ন্যায়ের চতুর্থ বাক্যে এ্যারিস্টটলীয় প্রধান এবং অপ্রধান হেতুবাক্যের সমন্বয়সাধন করা হয়। এইরূপ করাতে প্রধান ও অপ্রধান হেতুবাক্যে যে একই মধ্যপদ ব্যবহার করা হইয়াছে উহা স্পষ্টভাবে দেখান হয়। এফ্. এইচ্. ব্র্যাড্লি প্রমুখ কোন কোন আধুনিক পাশ্চাত্য নৈয়ায়িক স্বীকার করিয়া থাকেন যে, ন্যায়ে এই জাতীয় সমন্বয়ের প্রয়োজন আছে। এ্যারিস্টটলীয় ন্যায়ে ভারতীয় ন্যায়ের অন্তর্গত চতুর্থ বাক্যের অনুরূপ কোন হেতুবাক্য নাই।

ন্যায় ও বৈশেষিক সম্প্রদায়ে অনুমানের বিভিন্নপ্রকার শ্রেণীবিভাগ আছে। স্বার্থ ও পরার্থ অনুমান (অর্থাৎ নিজের জন্য এবং পরকে বুঝাইবার জন্য অনুমান) প্রসঙ্গে ন্যায় ও বৈশেষিক একমতাবলম্বী। ন্যায়-প্রদর্শিত পূর্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানের স্থলে বৈশেষিক মতে দৃষ্ট ও সামান্যতোদৃষ্ট মাত্র এই দুই প্রকারের অনুমান স্বীকার করা হইয়াছে। যে অনুমানে আমরা প্রত্যক্ষ কারণ হইতে অপ্রত্যক্ষ কার্যে যাই, তাহাকে পূর্ববৎ অনুমান বলে; শেষবৎ অনুমানে আমরা প্রত্যক্ষ কার্য হইতে অপ্রত্যক্ষ কারণে উপনীত হই। দৃষ্ট অনুমানে আমরা অতীতে দৃষ্ট, হেতু ও সাধ্যের ব্যাপ্তির উপর নির্ভর করিয়া থাকি। হেতু ও সাধ্যের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে এমন দুই পদার্থের মধ্যে যে অব্যভিচারী সম্পর্ক তাহার উপর প্রতিষ্ঠিত ন্যায়কে সামান্যতোদৃষ্ট ন্যায় বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যেহেতু কর্তন-ক্রিয়ার জন্য একটি যন্ত্রের প্রয়োজন হয়, যেমন কুঠার; তেমনি জ্ঞানক্রিয়ার ব্যাখ্যা করিতে গেলে ইন্দ্রিয়সমূহের অস্তিত্বকে অনুমান করিতে হয়। অনুমানকে আবার অন্যভাবে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়; যেমন—কেবলান্বয়ী, কেবল-ব্যতিরেকী এবং অন্বয়-ব্যতিরেকী। যে অনুমান হেতু ও সাধ্যের কেবল অন্বয়-ব্যাপ্তির (অর্থাৎ যেখানে হেতু সেখানে সাধ্য এইরূপ ব্যাপ্তি) উপরে প্রতিষ্ঠিত, তাহাকে কেবলান্বয়ী

অনুমান বলে; কেবল-ব্যতিরেকী অনুমান হেতু ও সাধ্যের একমাত্র ব্যতিরেক-ব্যাপ্তির (অর্থাৎ যেখানে সাধ্যাভাব সেখানে হেতুর অভাব এইরূপ ব্যাপ্তির) উপর প্রতিষ্ঠিত; অন্বয়-ব্যতিরেকী অনুমানে হেতু ও সাধ্যের মধ্যে অন্বয় ও ব্যতিরেক এই উভয়প্রকার ব্যাপ্তিই থাকে।[৮]

সাধারণতঃ ন্যায়-বৈশেষিক মতে অনুমানে পাঁচ প্রকারের হেত্বাভাস, অর্থাৎ সদোষ হেতু মানা হয়। অবশ্য কোন কোন মতে তিন চার বা ছয় প্রকারের হেত্বাভাসের উল্লেখ দেখা যায়।[৯] ভ্রান্ত অনুমান হেতুদোষ-ঘটিত। এই হেত্বাভাস-গুলির নাম নিম্নলিখিত রূপ: (১) স-ব্যভিচার (২) বিরুদ্ধ (৩) সৎপ্রতিপক্ষ (৪) অসিদ্ধ (৫) বাধিত। সব্যভিচার স্থলে হেতু শুধু সাধ্যের স্থানেই থাকে এমন নহে, কিন্তু মাঝে মাঝে সাধ্যশূন্য স্থানেও থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, বহ্নিকে যদি হেতু হিসাবে গ্রহণ করিয়া ধূমের অস্তিত্ব অনুমান করা হয়, তাহা হইলে এই জাতীয় হেত্বাভাস ঘটে। যে হেতুদ্বারা অভীষ্ট সাধ্যের পরিবর্তে সাধ্যাভাবই প্রমাণিত হয়, তাহাকে বিরুদ্ধহেতু বলে। যেমন যদি বলা হয়, "শব্দ নিত্য, কারণ ইহা জন্য" তাহা হইলে 'বিরুদ্ধ' হেত্বাভাস হইবে, কারণ যাহা জন্য তাহা অবশ্যই অনিত্য। সৎপ্রতিপক্ষস্থলে তুল্যবল অপর এমন একটি হেতু দেখান হয়, যাহার সহিত সাধ্যাভাবের ব্যাপ্তি থাকে। যথা—শব্দ নিত্য, যেহেতু ইহা কর্ণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য—এইরূপ অনুমানের বিরুদ্ধে বলা যাইতে পারে, "শব্দ অনিত্য, যেহেতু ইহা উৎপন্ন।" যে হেতু কোন যথার্থ পদার্থকে নির্দেশ করে না বরং একটি ভ্রান্ত কল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, সেই হেতুকে অসিদ্ধ বা সাধ্যসম বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ, "গগনারবিন্দ সুরভি" কারণ উহা অরবিন্দ, যথা পার্থিব অরবিন্দ। যদি অন্য প্রমাণদ্বারা সাধ্যের অভাব নির্ণীত হয়, তাহা হইলে তৎসাধ্যক হেতুকে 'বাধিত হেতু' বলা হয়; যেমন—"অগ্নি শীতল। কারণ ইহা একটি দ্রব্য।" এই স্থলে অগ্নির শীতলত্ব প্রত্যক্ষপ্রমাণদ্বারাই বাধিত হইয়া থাকে।[১০]

উপরোক্ত পাঁচপ্রকার হেত্বাভাসের নানাপ্রকার উপ-বিভাগ আছে। অসদুত্তর বা দ্ব্যর্থক উত্তর, অভিমত শব্দার্থ বা বাক্যার্থ হইতে ভিন্ন অর্থের কল্পনা ইত্যাদি হইতে যে সকল দোষের উদ্ভব হয়, সেগুলিকে ন্যায়শাস্ত্রে পৃথক্‌ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে; যথা—ছল, জাতি, নিগ্রহস্থান ইত্যাদি। এই বিভাগের সহিত এ্যারিস্টট্‌ল-কৃত ভাষাগত এবং ভ্রান্তিবিচারগত সাদৃশ্য আছে। এ্যারিস্টট্‌ল-কৃত এই বিভাগেও অব্যাপ্ত মধ্যপদ, সিদ্ধান্তে প্রধান বা অপ্রধান পদের অধিক ব্যাপকতা প্রভৃতি অনুমানের আকারগত দোষগুলির সমাবেশ নাই।

ন্যায় মতে উপমান তৃতীয় প্রমাণ। কোন অজ্ঞাত বস্তুর সহিত জ্ঞাত বস্তুর সাদৃশ্য বা বৈষম্যের বর্ণনার উপর নির্ভর করিয়া কোন নাম ও নামীর সম্বন্ধের যে জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহাকে উপমিতি বলে। যে নগরবাসী 'গবয়' নামক অরণ্যচর পশুর সহিত পরিচিত নহে, তাহাকে বনবাসী বলিয়া দিতে পারে যে 'গবয়' গাভীর ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট পশু। পরবর্তীকালে যদি সেই লোক বনে ঐ জাতীয় প্রাণী দেখিতে পায় এবং ইহাকে 'গবয়' বলিয়া চিনিতে পারে, তখন তাহার এই জ্ঞান 'উপমান-জন্য' হইবে। ন্যায়োল্লিখিত উপমান মীমাংসা ও বেদান্ত মত হইতে ভিন্ন।[১১]

ন্যায় মতে শেষ প্রমাণ শব্দ। যাঁহার কোন বিষয়ে প্রত্যক্ষজ্ঞান আছে এমন বিশ্বাসী লোকের উক্তিও শব্দপ্রমাণ। যাঁহাদের অবশ্য ঐ ঐ বিষয়ে প্রত্যক্ষজ্ঞান নাই, তাঁহারা বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির নিকট হইতে ঐ বিষয়ে পরোক্ষজ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন। এই জাতীয় জ্ঞান প্রত্যক্ষ বা অনুমানের দ্বারা লব্ধ নহে বলিয়া ন্যায় ও অন্যান্য ভারতীয় দর্শনে শব্দপ্রমাণ নামে একটি পৃথক্ প্রমাণ স্বীকার করা হইয়া থাকে। শব্দ দুই প্রকারের—দৃষ্টার্থ ও অদৃষ্টার্থ। যেখানে শব্দজ্ঞান প্রত্যক্ষ বিষয়কে নির্দেশ করে সেখানে দৃষ্টার্থ, এবং যেখানে পরোক্ষ বিষয়কে নির্দেশ করে সেখানে অদৃষ্টার্থ। প্রথমোক্ত জ্ঞানের মধ্যে আমরা পাই বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির উক্তি এবং প্রত্যক্ষ বস্তুর সম্পর্কে শ্রুতির উক্তি। দ্বিতীয় প্রকার জ্ঞানের মধ্যে পাই আত্মা, ঈশ্বর ও অমরত্ব প্রভৃতি বিষয়ে মানুষের এবং শ্রুতির[১২] উক্তি।

৩। তত্ত্ববিদ্যা

চরমতত্ত্বসম্বন্ধে ন্যায় : বৈশেষিক মত বস্তুবাদী এবং বহুত্ববাদী। এই মত অনুসারে বহু স্বতন্ত্র বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় ; ইহাদের প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়া থাকে—ভাব ও অভাব। ছয় প্রকার ভাবাত্মক পদার্থ স্বীকার করা হইয়া থাকে। যথা—দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায়। অভাব বলিতে সকলপ্রকার নেতিবাচক বস্তু বা অবস্থাকে বুঝায়। বৈশেষিক মতে সাতটি পদার্থ স্বীকার করা হয়।[১৩] ন্যায় মতে পদার্থের সংখ্যা ষোল। যথা—প্রমাণ, প্রমেয়, (অথবা জ্ঞানের বিষয়) সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি (অথবা নিষ্ফল আপত্তি), নিগ্রহস্থান (অথবা বাদ-বিবাদে পরাজয়ের স্থান) এইগুলিকে অবশ্য বাস্তবপদার্থের শ্রেণী বলিয়া মনে করিলে ভুল

হইবে; আসলে ইহারা দার্শনিক বিচারের বিষয়মাত্র। দ্বিতীয় পদার্থের মধ্যে সর্বজ্ঞের বিষয় এবং বৈশেষিক-সম্মত সর্বপদার্থও অন্তর্ভুক্ত।[১৪]

দ্রব্য হইতেছে গুণ ও কর্মের আধার এবং অবয়বী পদার্থসমূহের উপাদান-কারণ। দ্রব্য নয় প্রকার; যথা—পৃথিবী, জল, অগ্নি বায়ু, আকাশ, কাল, দেশ, আত্মা ও মন। পৃথিবী, জল, অগ্নি ও বায়ুর পরমাণুগুলি নিত্য, কিন্তু উহাদের দ্বারা গঠিত বস্তুগুলি অনিত্য। সাধারণতঃ পরমাণুর প্রত্যক্ষ হয় না; উহাদের অস্তিত্ব অনুমানের সাহায্যে প্রমাণ করা হয়। অবয়বীর অবয়বগুলিকে যদি আমরা পৃথক করিতে থাকি, তাহা হইলে আমরা বৃহৎ হইতে ক্রমে ক্ষুদ্র এবং ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর এবং পরিশেষে অবিভাজ্য ক্ষুদ্রতম অংশে উপনীত হইব। জড় দ্রব্যের এই সব সূক্ষ্ম, অবিভাজ্য অংশকে পরমাণু বলা হয়। তাহারা নিত্য এবং তাহাদের মধ্যে জাতিগত পার্থক্য বিদ্যমান। জৈন ও গ্রীক পরমাণুবাদীদের মতে পরমাণুগুলির মধ্যে কেবল পরিমাণগত ভেদ আছে জাতিগত ভেদ নাই। এই দিক হইতে ন্যায়-বৈশেষিক মত উহাদের মত হইতে ভিন্ন। আকাশ এমন একটি জড় দ্রব্য যাহা এক, নিত্য এবং সর্বব্যাপী। শব্দ উহার গুণ। আকাশের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় না; কিন্তু উহাকে শব্দের আশ্রয়রূপে অনুমান করা যায়, যেহেতু শব্দ একটি গুণ এবং অন্য কোন দ্রব্য উহার আশ্রয় হইতে পারে না। দেশ ও কালের প্রত্যক্ষ হয় না; উহাদের প্রত্যেকটি এক, নিত্য এবং সর্বব্যাপী।[১৫]

আত্মা নিত্য এবং বিভু পদার্থ। জ্ঞান, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, সুখ, দুঃখ, ধর্ম, অধর্ম প্রভৃতি আত্মার গুণ। কোন জড় দ্রব্যের এই সকল গুণ থাকিতে পারে না। সুতরাং এমন একটি অজড় দ্রব্য আছে, যাহার এইগুলি গুণ এবং উহাকেই আত্মা বলা হয়। আত্মা দেহ, ইন্দ্রিয়, মন এবং জ্ঞানধারা হইতে ভিন্ন। কোন কোন ন্যায়-বৈশেষিকের মতে আত্মা প্রত্যক্ষ হয় না, উহার অস্তিত্ব শ্রুতি-প্রমাণের সাহায্যে এবং জ্ঞান, ইচ্ছা, দ্বেষ প্রভৃতি চেতন-ধর্ম হইতে অনুমানদ্বারা নির্ধারণ করিতে হয়। অন্যান্য ন্যায়-বৈশেষিকদের মতে আত্মার অস্তিত্ব মানস-প্রত্যক্ষের সাহায্যেও জানা যায়; যখন কেহ বলে: আমি আছি, আমি জানিতেছি, আমি সুখী ইত্যাদি, তখন সে আত্মাকে প্রত্যক্ষ করে। জ্ঞান বা চৈতন্য আত্মার একটি একটি গুণ বটে, কিন্তু ইহা আত্মার স্বরূপগত এবং অবিচ্ছেদ্য গুণ নহে। এই গুণটি আগন্তুক, কারণ ইহা কেবল শরীরী আত্মারই ধর্ম। তত্ত্বজ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে যখন অপবর্গলাভ হয়, তখন আত্মা দেহ হইতে মুক্ত হয় এবং ইহার সুখদুঃখের অনুভূতি বা অন্য কোন প্রকার জ্ঞান থাকে না।[১৬]

মন একটি পরমাণু এবং প্রত্যক্ষাতীত দ্রব্য। আত্মা এবং ইহার সুখদুঃখাদি গুণাবলী ইহা দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায় বলিয়া মনকে অন্তরিন্দ্রিয় বলা হয়। যেমন বাহ্য প্রত্যক্ষের জন্য বহিরিন্দ্রিয় প্রয়োজন হয়, তেমনি আন্তর প্রত্যক্ষের জন্য মন বা অন্তরিন্দ্রিয়ের প্রয়োজন হয়। মনের অস্তিত্ব অন্য প্রকারেও জানা যায়। যদিও বাহ্যেন্দ্রিয়ের সহিত বহু বস্তুর একই সঙ্গে সম্বন্ধ ঘটিতে পারে, তথাপি একই সঙ্গে নানাবস্তুবিষয়ক বহু জ্ঞান হইতে পারে না। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, বহিরিন্দ্রিয় ব্যতীত আমাদের একটি আন্তর ইন্দ্রিয়ও আছে। এই আন্তরেন্দ্রিয় পরমাণুরূপ বলিয়া একই সঙ্গে কেবল একটি বাহ্যেন্দ্রিয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হইতে পারে। এই কারণেই আমাদের চতুর্দিকস্থ বহু বস্তুর মধ্যে যে বস্তুর সহিত সম্বন্ধ ইন্দ্রিয়ে আমরা মনঃসংযোগ করি কেবল সেই বস্তুই প্রত্যক্ষ করি।[১৭]

গুণের লক্ষণ হইতেছে, যাহা দ্রব্যে আছে অথচ যাহাতে গুণ বা ক্রিয়া থাকে না। এক দ্রব্য অন্য দ্রব্যের সমবায়ী কারণ হইলে প্রথম দ্রব্যের গুণ দ্বিতীয় দ্রব্যের গুণের অসমবায়ী কারণ হয়, কিন্তু উহার অস্তিত্বের কারণ হয় না। ২৪ প্রকার গুণ স্বীকার করা হইয়া থাকে। যথা—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকৃত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংস্কার, ধর্ম ও অধর্ম।[১৮]

কর্ম বলিতে জড় পদার্থের গতি বুঝায়। গুণের ন্যায় ইহাও দ্রব্যের ধর্ম কিন্তু ইহা দ্রব্য, গুণ উভয় হইতে পৃথক্। কর্ম সান্ত, ইহা জড় দ্রব্যে থাকে, কিন্তু কোন সর্বব্যাপী দ্রব্যে থাকে না। কর্ম পাঁচ প্রকার, যথা—উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমন। অন্য সকল প্রকার কর্ম গমনের অন্তর্ভুক্ত। যে দ্রব্য প্রত্যক্ষ, তাহার কর্মও প্রত্যক্ষ; দ্রব্য অপ্রত্যক্ষ হইলে তাহার কর্মও অপ্রত্যক্ষ হইবে।[১৯]

একই শ্রেণীর বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে যে সাধারণ ধর্ম বিদ্যমান তাহাকে সামান্য বলে। আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনে যাহাকে universal বলে, ইহা তাহার অনুরূপ। সামান্য নিত্য এবং ইহা একই শ্রেণীর সর্ব ব্যক্তির মধ্যে অভিন্নরূপে বিদ্যমান। কোন কোন আধুনিক বস্তুবাদী পাশ্চাত্য দার্শনিকের মতে সামান্য এমন একটি কালাতীত নিত্য বস্তু যাহা বহু ব্যক্তির মধ্যে থাকিতে পারে। এই জাতীয় পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা ন্যায় বৈশেষিকের সহিত আরও এক বিষয়ে একমত যে, সামান্যসমূহ সত্তাবান পদার্থের অন্তর্ভুক্ত নহে। তথাপি উহাদের অস্তিত্ব আছে এবং উহারা দ্রব্য, গুণ ও কর্মে থাকে। একটি সামান্যের মধ্যে অপর কোন সামান্য থাকিতে

পারে না। সামান্যগুলিকে পর, অপর এবং পরাপর এই তিনভাগে বিভক্ত করা হয়। ব্যাপকতার দিক হইতে পর হইতেছে সর্বাপেক্ষা অধিক ব্যাপক, অপর সর্বাপেক্ষা অল্পব্যাপক এবং পরাপর উহাদের মধ্যবর্তী। সত্তা সর্বাপেক্ষা ব্যাপক অথবা পর-সামান্য। ইহার উপরে আর কোন সামান্য নাই; ঘটত্ব অপর-সামান্য, কারণ উহা দ্বারা ব্যাপ্য অন্য কোনও সামান্য নাই। দ্রব্যত্ব উহাদের মধ্যবর্তী সামান্য, কারণ উহা পৃথিবীত্ব প্রভৃতি সামান্য হইতে অধিক ব্যাপক, আবার সত্তা-সামান্য হইতে কম ব্যাপক।[২০] সামান্যের সম্পূর্ণ বিপরীত হইতেছে বিশেষ। নিরংশ নিত্য দ্রব্যগুলির মৌলিক পার্থক্য ও অসাধারণত্বকে বিশেষ বলা হয়। এই বিশেষ কথাটি হইতেই বৈশেষিক নামের উৎপত্তি হইয়াছে। সংহত দ্রব্যের পার্থক্য তাহাদের অন্তর্গত অবয়ব বা অংশের পার্থক্যের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। কিন্তু নিরংশ নিত্য দ্রব্যের ব্যাখ্যা করিতে গেলে তাহাদের অন্তর্গত মৌলিক অসাধারণত্বকে স্বীকার করিতে হয়। এই মৌলিক বৈশিষ্ট্যকে বলা হয় 'বিশেষ'। যে সকল নিত্য দ্রব্যের মধ্যে বিশেষ স্বীকার করিতে হয়, তাহারা হইল দেশ, কাল, আত্মা, মন এবং একই জাতীয় পরমাণুসমূহ। যেহেতু বিশেষের অধিষ্ঠান ব্যক্তিগুলি অসংখ্য সেই হেতু বিশেষও অসংখ্য। পরমাণুর ন্যায় বিশেষগুলি ইন্দ্রিয়াতীত।[২১]

দুইটি পদার্থের মধ্যে যখন এইরূপ স্থায়ী বা নিত্যসম্বন্ধ বর্তমান যে, তাহাদের মধ্যে একটি আর একটিতে থাকে, তখন ঐ সম্বন্ধকে 'সমবায়' বলে। অংশী অংশের মধ্যে, গুণ অথবা ক্রিয়া দ্রব্যের মধ্যে, সামান্য ব্যক্তিসমূহের মধ্যে, এবং বিশেষ কতকগুলি নিরংশ নিত্য দ্রব্যে থাকে। এই সকল ক্ষেত্রেই সম্বন্ধটিকে সমবায় সম্বন্ধ বলা হয়। সংযোগ বলিতে দুইটি দ্রব্যের মধ্যে অনিত্য সম্বন্ধ বুঝায়; এক্ষেত্রে একটি অপর হইতে পৃথক্‌ভাবে থাকিতে পারে; সমবায় বলিতে এমন দুইটি দ্রব্যের মধ্যে নিত্য সম্বন্ধ বুঝায় যাহাদের মধ্যে একটি অপরটি হইতে পৃথক্‌ভাবে থাকিতে পারে না।[২২]

সকল নিষেধাত্মক বস্তু বা ঘটনা ব্যাখ্যা করিতে গিয়া অভাব স্বীকার করা হয়। ভাব হইতে স্বতন্ত্র অভাব-পদার্থের অস্তিত্ব অনস্বীকার্য। যেমন এক বস্তু একটি বিশেষ দেশে ও কালে আছে ইহা সহজ সত্য তেমনি অপর কোন বস্তু উক্ত বিশেষ দেশ ও কালে নাই ইহাও সত্য। অভাব চার প্রকারের, যথা—প্রাগভাব, প্রধ্বংসাভাব, অত্যন্তাভাব, অন্যোন্যাভাব। কোন বস্তুর উৎপত্তির পূর্বে উহার যে অভাব থাকে তাহাকে প্রাগভাব বলে; যেমন উৎপত্তির পূর্বে কারণে কার্যের

অভাব। উৎপত্তির পরে ধ্বংস হইয়া গেলে উহার যে অভাব ঘটে, তাহাকে ধ্বংসাভাব বলে। যথা—ঘট ভাঙিয়া গেলে ঘটের ধ্বংসাভাব হইল। দুইটি বস্তুর মধ্যে সম্বন্ধের নিত্য অভাবকে বলা হয় অত্যন্তাভাব। যথা—বাতাসে বর্ণের অভাব। দুই পদার্থের পরস্পরের ভেদকে বলা হয় অন্যোন্যাভাব। এক বস্তু অপর বস্তু হইতে ভিন্ন হইলে একটি অপর রূপে থাকিতে পারে না। যথা-গো অশ্ব হইতে ভিন্ন। ইহাতে বুঝা যায় যে, কোনওটি অপরের রূপে থাকে না। বিশ্বজগৎসম্বন্ধে ন্যায়-বৈশেষিকের মতবাদ ভারতীয় দর্শনের সাধারণ আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বিশ্বজগতের উৎপত্তি ও ধ্বংস ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ন্যায়-বৈশেষিক সকল সংহত বস্তুকে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, বায়ু—এই চারি প্রকার পরমাণুর সমষ্টিতে পরিণত করিয়া থাকে। এইজন্য এই মতকে পরমাণুবাদ বলা হয়। ইহা অবশ্য পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও দর্শনের যান্ত্রিক বা জড়বাদীয় পরমাণুবাদের অনুরূপ নয়। ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায় পরমাণুসমূহের সংহতি ও বিচ্ছেদের মূলে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক নিয়মের অস্তিত্ব অস্বীকার করে না। তাহা ছাড়া নয়টি দ্রব্যের মধ্যে পাঁচটি, যথা—আকাশ, দেশ, কাল, মন ও আত্মাকে জড় পরমাণুতে অথবা উহাদের সম্বন্ধে পরিণত করা হয় নাই। ন্যায়-বৈশেষিকের পরমাণুবাদ কেবল অনিত্য, সংহত দ্রব্যের ব্যাখ্যা করিয়া থাকে। সব সান্ত জড় দ্রব্য চারি প্রকারের পরমাণু হইতে সৃষ্ট হইয়া থাকে; এই সৃষ্টির বিভিন্ন পর্যায়ে আমরা পাই দ্ব্যণুক (অর্থাৎ যাহা দুইটি পরমাণুর সংযোগে গঠিত) ত্র্যণুক (অর্থাৎ যাহা তিনটি দ্ব্যণুক দ্বারা গঠিত) এবং উহাদের দ্বারা নির্মিত অন্যান্য বৃহত্তর যৌগিক দ্রব্য। বিশ্বজগৎ দুই প্রকার পদার্থের সংহতি—একদিকে জড় পদার্থ, অপর দিকে মন, বুদ্ধি, অহংকার, ইন্দ্রিয় এবং দেহসমন্বিত জীব। দেশ, কাল ও আকাশে ইহাদের অবস্থিতি এবং ইহারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি ক্রিয়াশীল। বিশ্বজগৎ নৈতিক নিয়মের অধীন; এখানে প্রাণিসমূহের জীবন ও ভবিষ্যৎ কেবল যে জড় নিয়মের অধীন তাহা নহে; অধিকন্তু কর্মের নৈতিক নিয়মেরও অধীন। এই জগতের সৃষ্ট জীবের নৈতিক গুণাগুণ অদৃষ্ট দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়। এবং এই সৃষ্টির উদ্দেশ্য হইতেই নৈতিক নিয়মের চরিতার্থতা।

ন্যায়-বৈশেষিক ঈশ্বরবাদের সহিত বহুবস্তুবাদের সমন্বয়সাধন করিয়াছে। ইহা পরমাত্মরূপ ঈশ্বরে বিশ্বাসী; এই মতে ঈশ্বর পরম পুরুষ, এক অনন্ত এবং নিত্য। জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের তিনিই সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিমান কারণ। ঈশ্বর শূন্য হইতে জগতের সৃষ্টি করেন নাই; তিনি নিত্য পরমাণু, দেশ, কাল

আকাশ, মন এবং আত্মার দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি জগতের মূল নিমিত্তকারণ; কিন্তু তিনি জগতের উপাদান-কারণ নহেন। অর্থাৎ তিনি এই সুসমঞ্জস বিশ্বজগতের স্রষ্টা অথবা শিল্পী। ঈশ্বর চৈতন্যময় পুরুষ এবং তিনি বিশ্ব-জগতের দ্বারা সীমাবদ্ধ নহেন। তিনি জগতের নৈতিক শাসনকর্তাও বটেন। তিনি পক্ষপাত না করিয়া আমাদের কর্মফল এবং সুখদুঃখের চরম বিধান করিয়া থাকেন।

ন্যায়দর্শনে কার্যকারণ-সম্বন্ধরূপ নৈতিক নিয়ম প্রভৃতির উপর ভিত্তি করিয়া কতকগুলি অনুমানের সাহায্যে এবং অদৃষ্ট, শ্রুতি-প্রামাণ্য প্রভৃতির সাহায্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা হয়। ঈশ্বরাস্তিত্বের কার্যকারণসম্বন্ধীয় যুক্তিটি সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। যুক্তিটি এইরূপ: ক্ষিতি, জল প্রভৃতি সকল সংহত অথবা জটিল বস্তুরই কারণ থাকিবে যেহেতু তাহারা কার্যাত্মক। যেহেতু তাহারা অবয়বদ্বারা গঠিত এবং উহাদের পরিমাণ সান্ত, সেইজন্য উহারা কার্য। দেশ, কাল, পরমাণু প্রভৃতি কার্য নহে। কারণ উহাদের অবয়ব নাই এবং তাহারা হয় সীমাহীন অথবা সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম। অতএব সকল সংহত অবয়বীর কারণ থাকিবে। এই কারণ কোন বুদ্ধিমান কর্তা না হইয়া পারে না। বুদ্ধিমান কারণের নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত যৌগিক দ্রব্যের উপাদানীভূত পরমাণুসমূহ হইতে সেই সেই কার্য সেই সেই সুসমঞ্জস নির্দিষ্ট আকারে উৎপন্ন হইতে পারে না। এই বুদ্ধিমান কারণের পক্ষে উপাদানকারণের প্রত্যক্ষজ্ঞান, নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাইবার ইচ্ছা এবং অভীষ্টসিদ্ধির জন্য প্রযত্নের ক্ষমতা থাকা আবশ্যক (জ্ঞান, ইচ্ছা ও প্রযত্ন)। কোন জীবের এই জাতীয় জ্ঞান ও প্রযত্ন নাই। অতএব, জাগতিক অবয়বী দ্রব্যের কারণ পরমাত্মা বা ঈশ্বর।[২৪]

ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে গিয়া ন্যায়-বৈশেষিক কারণাত্মক যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন। তাহার মধ্যে পাশ্চাত্য দর্শনে ব্যবহৃত কার্যকারণীয় ও উদ্দেশ্যবাদী এই দুইটি যুক্তির সমন্বয় দেখিতে পাওয়া যায়। উহা এইরূপ প্রতিপাদন করে যে, জগতের আদি কারণ হইতেছে এক বুদ্ধিমান সত্তা। উহা প্রমাণ করিবার জন্য পৃথক উদ্দেশ্যবাদী যুক্তির প্রয়োজন নাই। এই ব্যাপারে ন্যায়-বৈশেষিক মতের সহিত পল জ্যানেট, হারম্যান্ লোটজে এবং জেমস মারটিন্যু প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকের মতের ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহারাও বলিয়া থাকেন যে, জগতের আদি কারণ এক বুদ্ধিমান কর্তা হইতে বাধ্য। পাশ্চাত্য আস্তিকগণ বিশ্বাস করেন যে ঈশ্বর শুধু জাগতিক দ্রব্যসমূহের শৃঙ্খলা ও নিয়মের কর্তা নহেন, তিনি ঐ উপাদান সহ ঐসব দ্রব্যেরও স্রষ্টা। কিন্তু ন্যায়-বৈশেষিকের মতে ঈশ্বর পরমাণুর কারণ নহেন, তিনি শুধু জগতের নিয়মশৃঙ্খলার কারণ। তথাপি ন্যায়-

বৈশেষিক ঈশ্বরবাদী, কারণ ইহাদের মতে ঈশ্বরের সহিত জগতের নিরবচ্ছিন্ন সম্পর্ক। (ঈশ্বর জগতের শুধু স্রষ্টা নহেন, তিনি ইহার পালক ও সংহারকর্তাও)। ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে এমন ধারণারও আভাস পাওয়া যায় যে, বিশ্বজগতের সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ ঠিক দেহের সহিত আত্মার সম্বন্ধের অনুরূপ। কিন্তু এই ধারণাগুলি এমন পূর্ণতা লাভ করে নাই যাহাতে আমরা ন্যায়-বৈশেষিককে ঐরূপ পূর্ণাঙ্গ ঈশ্বরবাদী দর্শন বলিতে পারি, যাহাতে ঈশ্বরকে শুধু বিশ্বজগতের নিয়মশৃঙ্খলারই কারণ বলিয়া গ্রহণ করা হয় না, অধিকন্তু তাঁহাকে জগতের অন্তিম উপাদানগুলিরও কারণ বলিয়া গ্রহণ করা হয়; এবং ঈশ্বরকে সমগ্র জগতের হৃদয়কেন্দ্র বলিয়া উপলব্ধি করা হয়।

দ্রষ্টব্য

১। ন্যায়-সূত্র, ভাষ্য এবং বার্তিক, ১।১।১-৩, ১।১।১০, ১।১।১৫ ; প্রশস্তপাদভাষ্য এবং ন্যায়কন্দলী (বারাণসী সংস্করণ, ১৮৯৫) পৃঃ ১৭১ হইতে ; তর্কসংগ্রহ (কলিকাতা সংস্করণ, ১৮৯৭) পৃঃ ৩২ হইতে।

২। ন্যায়-ভাষ্য, ১।১।১, ন্যায়-বার্তিক-তাৎপর্য-টীকা (বারাণসী সংস্করণ), পৃঃ ১১ হইতে; তাৎপর্য-পরিশুদ্ধি (বিবলিওথিকা ইণ্ডিকা সং) পৃঃ ১১৯-২০

৩। প্রশস্তপাদভাষ্য, পৃঃ ২১৩ ; ভাসর্বজ্ঞ, ন্যায়-সার (বিবলিওথিকা ইণ্ডিকা সং) পৃঃ ৩০ হইতে ব্যোমশিব, ব্যোমবতী (চৌখাম্বা গ্রন্থমালা) পৃঃ ৫৫৪ বল্লভাচার্য, ন্যায়লীলাবতী (নির্ণয়-সাগর সং) পৃঃ ৬৭ হইতে।

৪। ন্যায়-সূত্র এবং ভাষ্য, ১।১।৪ ; প্রশস্তপাদভাষ্য এবং ন্যায়-কন্দলী পৃঃ ১৮৬ হইতে ; লক্ষণাবলী (বারাণসী সং) পৃঃ ৩

৫। ন্যায়-সূত্র, -ভাষ্য এবং তাৎপর্য, ১।১।৪, ৩।১।৭, ৩।২।২ ; প্রশস্তপাদভাষ্য—ঐ

৬। ন্যায়-সূত্র,-ভাষ্য এবং বার্তিক, ১।১।৫ ; প্রশস্তপাদ, পৃঃ ২০০ হইতে।

৭। ন্যায়-সূত্র এবং -ভাষ্য, ১।১।৩২-৯, প্রশস্তপাদ, পৃঃ ২৩১ হইতে।

৮। ন্যায়-সূত্র, -ভাষ্য এবং -বার্তিক, ১।১।৫ , প্রশস্তপাদ, পৃঃ ২০৫ হইতে।

৯। বৈশেষিক-সূত্র, ৩।১।১৫ , প্রশস্তপাদ, পৃঃ ২৩৮ , ন্যায়-সার, পৃঃ ৭, সপ্ত-পদার্থী (আদিয়ার, মাদ্রাজ, ১৯৩২) পৃঃ ২৯

১০। ন্যায়-সূত্র এবং -ভাষ্য, ১।২।৪৫-৫০ , প্রশস্তপাদ, পৃঃ ২৩৩

১১। ন্যায়-সূত্র এবং -ভাষ্য, ১।১।৬ , ন্যায়-মঞ্জরী (বারাণসী সংস্করণ) পৃঃ ১২৮ হইতে ; শাস্ত্রদীপিকা, পৃঃ ৭৪-৬ ; বেদান্ত-পরিভাষা, অধ্যায় ৩

১২। ন্যায়-সূত্র এবং -ভাষ্য, ১।১।৭-৮, ন্যায়-বৈশেষিক জ্ঞানতত্ত্বের বিশদ বিবরণের জন্য S. C. Chatterjee, **The Nyaya Theory of Knowledge** দ্রষ্টব্য।

১৩। বৈশেষিক-সূত্র, ১।১।৪ ; প্রশস্তপাদ-ভাষ্য এবং ন্যায়-কন্দলী পৃঃ ৬-৭ ; কিরণাবলী পৃঃ ৫-৬

১৪। **ন্যায়-সূত্র, এবং ভাষ্য,** ১।১।১ ; ১।১।৯

১৫। বৈশেষিক-সূত্র, ১।১।৫ ; ১।১।১৫ ; **প্রশস্তপাদ,** পৃঃ ৮, ২৭ **ন্যায়-কন্দলী,** পৃঃ ৩১ হইতে ; **কিরণাবলী,** পৃঃ ৫০ হইতে।

১৬। **ন্যায়-সূত্র** এবং -ভাষ্য, ১।১।১০, ১।১।২২ ; **ন্যায়-বার্তিক,** ২।১।২২ ; **প্রশস্তপাদ-ভাষ্য** এবং **ন্যায়-কন্দলী** পৃঃ ৬৯ হইতে , **কিরণাবলী** পৃঃ ১২৭-১৪০ , **ন্যায়মঞ্জরী,** পৃঃ ৪৩২

১৭। **ন্যায়-সূত্র** এবং -ভাষ্য, ১।১।১৬ ; বৈশেষিক-সূত্র, ৩।২।১ **প্রশস্তপাদ-ভাষ্য** এবং **ন্যায়-কন্দলী** পৃঃ ৮৯ হইতে ; কিরণাবলী, পৃঃ ১৫২ হইতে।

১৮। বৈশেষিক-সূত্র, ১।১।৬ ; ১।১।১৬ ; প্রশস্তপাদ এবং **ন্যায়-কন্দলী** পৃঃ ৯৪ হইতে ; **কিরণাবলী,** পৃঃ ১৬১

১৯। বৈশেষিক-সূত্র, ১।১।৭ , ১।১।১৭ , প্রশস্তপাদ এবং **কন্দলী** পৃঃ ২৯০ হইতে ; **কিরণাবলী,** পৃঃ ৩৫৭

২০। প্রশস্তপাদ এবং **কন্দলী** পৃঃ ১১ হইতে , ৩১১ হইতে ; **কিরণাবলী** পৃঃ ৩৭০ , **ন্যায়-লীলাবতী,** পৃঃ ৮০-১ , তর্কামৃত, অধ্যায় ১

২১। প্রশস্তপাদ এবং **কন্দলী** পৃঃ ১৩, ৩২১ হইতে , কিরণাবলী, পৃঃ ৩৭২

২২। ঐ পৃঃ ১৪, ৩২৪ হইতে ; কিরণাবলী, পৃঃ ৩৭২ হইতে।

২৩। **ন্যায়-ভাষ্য** এবং বার্তিক, ১।১।১ , প্রশস্তপাদ এবং **কন্দলী** পৃঃ ২২৫-৩০, কিরণাবলী, পৃঃ ৩২৬-৩০ ; **ন্যায়-মঞ্জরী,** পৃঃ ৫৪

২৪। **ন্যায়-সূত্র** এবং ভাষ্য, ৪।১।১৯-২১ , বৈশেষিক-সূত্র, ২।১।১৭-১৯ ; প্রশস্তপাদ এবং **কন্দলী,** পৃঃ ৫৪ ; কিরণাবলী পৃঃ ৯৭ , কুসুমাঞ্জলি, স্তবক, ৫, **ন্যায়-লীলাবতী,** পৃঃ ২০ হইতে। ন্যায়-বৈশেষিক তত্ত্ববিদ্যার বিশদ বিবরণের জন্য **S. C. Chatterjee and D. M. Datta, An Introduction to Indian Philosophy** দেখুন।

ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন

খ। পরবর্তী ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন

১। ভূমিকা

জড় ও চেতন উভয়বিধ বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞান দেওয়া প্রাচীন ন্যায় ও বৈশেষিক সাহিত্যের সাধারণ উদ্দেশ্য। ইহাদের মতে যথার্থ জ্ঞান আমাদিগকে দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করিতে সহায়তা করে। সত্য নির্ধারণের উপায়রূপে সাধারণ বিচার প্রণালী অতি প্রাচীন কালেই উৎকর্ষলাভ করিয়াছিল। কিন্তু তৎকালীন অন্যান্য সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধ সমালোচনার ফলে ন্যায়-বৈশেষিক দার্শনিকেরা তার্কিক মনোবৃত্তির অধিকাধিক বিকাশসাধন করিতে থাকেন। তাঁহারা তাঁহাদের প্রতিপক্ষের মতবাদসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করিতে থাকিলেন। যেহেতু তাঁহাদের মতসমূহের প্রচণ্ড সমালোচনা হইয়াছিল, সেইজন্য তাঁহারা তাঁহাদের এবং বিরুদ্ধ-বাদীদের ব্যবহৃত প্রত্যেকটি শব্দ, এমন কি উপসর্গ ও প্রত্যয়গুলিকেও বিচার করিয়া দেখিতে বাধ্য হন। ইহার স্বাভাবিক পরিণতি হইল এই যে, বিরুদ্ধবাদীদের ন্যায় তাঁহাদিগকেও স্বীয় বক্তব্যাদি প্রকাশ করিবার সময় অতীব সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। ন্যায় বৈশেষিকের প্রাচীন যুগ এই অবস্থায় প্রায় ১২০০ খৃষ্টাব্দে শেষ হইল। এই সকল দর্শনের বিকাশের পরবর্তী যুগ বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।[১]

যদিও ন্যায়-বৈশেষিক সাহিত্য প্রধানতঃ ভাষ্য, টীকা, টিপ্পনী প্রভৃতিদ্বারা গঠিত, তথাপি এরূপ বুঝা ঠিক হইবে না যে ইহাতে মৌলিক চিন্তার অবকাশ নাই। সূত্র-গুলির স্পষ্ট ব্যাখ্যার ব্যাপারে বিশেষ স্বাধীনতা নাই এরূপ মানিয়া লইলেও ইহা অস্বীকার করা যায় না যে, স্ব স্ব সম্প্রদায়ের মতবাদের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও যুক্তিপূর্ণ উপস্থাপনে লেখকদের স্বকীয় দার্শনিক তীক্ষ্ণদৃষ্টির পরিচয় প্রদানের যথেষ্ট সুযোগ আছে। গৌতম ও কণাদ তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত সূত্রগুলিতে নিজ নিজ বিশিষ্ট দার্শনিক দৃষ্টির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া বিভিন্ন পদার্থ সম্বন্ধে তাঁহাদের প্রমাণ বিষয়ক ও সত্তা-বিষয়ক সাধারণ ও মূল তত্ত্বগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অন্যান্য লেখকেরা সূত্রগুলির প্রতি তাঁহাদের আনুগত্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া উহাদের ব্যাখ্যা ও অন্যান্য প্রশ্ন সম্বন্ধে নিজ নিজ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন।[২]

ইতিহাস এইরূপ সাক্ষ্য দেয় যে, ৯০০ হইতে ১২০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই তিন শতাব্দী ন্যায়-বৈশেষিক সাহিত্যের জড়তার যুগ। ইহার কারণ প্রবল বিরুদ্ধ সমালোচনার অভাব। এই সময়ে বেদান্তে দৃঢ়বিশ্বাসী মহাতার্কিক শ্রীহর্ষ রণাঙ্গনে প্রবেশ করিয়া তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ খণ্ডনখণ্ডখাদ্যে এই দুই দর্শনের ভিত্তিকে কঠোর আঘাত করিলেন।

এই গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য ইহা প্রমাণ করা যে, কোন পদার্থ আছে কি নাই তাহা কখনও নিশ্চিন্তভাবে নির্ণয় করিতে পারা যায় না। নৈয়ায়িকেরা পদার্থের যে সকল লক্ষণ দিয়াছেন সেইগুলি পরীক্ষা করিয়া গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন যে ইহাদের একটিও যুক্তিসহ নয়। চিন্তা এবং ভাষার প্রাথমিক ভিত্তি সম্বন্ধে তাঁহার এই সমালোচনা-মূলক বিচার নৈয়ায়িক পণ্ডিতদিগকে বিশ্লেষণাত্মক চিন্তা ও নূতন অনুসন্ধানে প্রবল উদ্দীপনা দিয়াছিল। ইহার ফলেই আনুমানিক ১ ২৫ খৃষ্টাব্দে নব্যন্যায় মতবাদের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া বহুল পরিচিত গঙ্গেশ উপাধ্যায় প্রায় সমানখ্যাতিসম্পন্ন 'তত্ত্বচিন্তামণি' নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

এই গ্রন্থখানি রচিত হওয়ার পর ইহা সংস্কৃত সাহিত্যের সমগ্রক্ষেত্রে বিরাট এবং বস্তুতঃ এক বৈপ্লবিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ইহাকে শ্রীহর্ষের সমালোচনার একটি প্রত্যুত্তর মাত্র মনে করা উচিত হইবে না। এই গ্রন্থ স্বাত্মপরীক্ষার দৃষ্টিতে রচিত। গঙ্গেশের মতে অন্যান্য লেখকদের সমালোচনার প্রত্যুত্তর দেওয়া অপেক্ষা পদার্থসমূহের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য তাঁহাদের নিজস্ব জ্ঞানসম্বন্ধীয় তত্ত্ব ও লক্ষণ নিরূপণের প্রণালীকে সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া দেখাই নৈয়ায়িকদের পক্ষে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। নির্দোষ লক্ষণ ও অকাট্য প্রমাণের ভিত্তিতেই নৈয়ায়িকগণ পদার্থের অস্তিত্ব বিশ্বাস করেন। এই দুইটি সম্পূর্ণ নির্ভুল এবং যথাযথ না হইলে নৈয়ায়িকের পক্ষে সমগ্রভাবে জগতের স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁহার মত পোষণ করা সম্ভবপর নয়। শ্রীহর্ষের সমালোচনা নিশ্চয়ই নৈয়ায়িকের দৃষ্টির আবরণ উন্মোচন করিয়াছিল। গঙ্গেশের মতে যদিও এই সকল সমালোচনা তাঁহার বস্তুবাদী বিশ্বাসের ভিত্তিকে বিচলিত করিতে পারে নাই, তথাপি নিঃসন্দেহে উহাদের দ্বারা ইহা বুঝা গেল যে, নৈয়ায়িকসম্মত লক্ষণ ও প্রমাণ-প্রণালী অধিক স্পষ্ট ও যৌক্তিক দৃষ্টিতে নির্ভুলভাবে নির্বচন করা প্রয়োজন। সুতরাং গঙ্গেশ সমগ্র প্রমাশাস্ত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার আরম্ভ করিলেন, প্রচলিত লক্ষণ সমূহের প্রয়োজনমত সংশোধন করিলেন এবং উদাহরণের সাহায্যে তাহাদিগকে সুপরিস্ফুট করিলেন।

বাদীন্দ্র নামক একজন বৈশেষিক পণ্ডিতও (আনুমানিক, ১২২৫ খৃঃ) এই একই

মনোভাব লইয়া কর্মে প্রবৃত্ত হন। বৈশেষিক দার্শনিকদের মধ্যে বিতর্কে জয়লাভের যে অদম্য প্রবৃত্তি ছিল তাহা সংশোধন করিতে তিনি সফল প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন। যে কোন উপায়ে বিতর্কে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে জয়লাভের জন্য কোন কোন বৈশেষিক পণ্ডিত মহাবিদ্যা নামক যে বিচারপদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তিনি তাহাকে ভ্রমাত্মক বলিয়া নিন্দা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অনুগামীদিগকে অনুরূপ পদ্ধতি-সমূহ প্রয়োগ করিতে নিষেধ করেন।[৩]

ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে যে, ন্যায় ও বৈশেষিক সম্প্রদায় এই সময়ে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছিল এবং বস্তুবাদের বিরুদ্ধে নানাদিক হইতে যে সকল আক্রমণ চলিতেছিল তাহাদের হাত হইতে উহাকে একযোগে রক্ষা করিয়াছিল। এই সময়ে কেবলমাত্র বৈশেষিক মতাবলম্বনে কয়েকখানি গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু এই দুইটি মতবাদের সমন্বয় সাধনের অভিমুখেই তৎকালীন জ্ঞানচর্চার ধারা পরিচালিত হইয়াছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, জ্ঞানসম্পর্কিত নৈয়ায়িক মত বৈশেষিকদের প্রভাবিত করিয়াছিল এবং যে সকল পদার্থের জ্ঞান পরম পুরুষার্থলাভের জন্য অপরিহার্য বলিয়া বিবেচিত হইত, বৈশেষিক দর্শনে সেই সকল পদার্থের যে শ্রেণী-বিভাগ করা হইয়াছিল নৈয়ায়িকেরা তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এতদ্‌ব্যতীত, বাঙ্গলাদেশের নবদ্বীপে এই সময়ে রঘুনাথ শিরোমণি নামক একজন স্বাধীনচিত্ত পণ্ডিতের আবির্ভাব ঘটে। বৈশেষিক পদার্থ-সমূহের তিনি যে শ্রেণীবিভাগ করিয়াছিলেন তাহা অত্যন্ত মৌলিক এবং তৎকালীন বৈশেষিক সম্প্রদায় কর্তৃক গৃহীত শ্রেণীবিভাগের সহিত ইহার গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য দেখা যায়।[৪] এই প্রসঙ্গে আমরা যেন শঙ্কর মিশ্র ও দ্বিতীয় বাচস্পতি মিশ্র এই দুইজন পূর্ববর্তী পণ্ডিতের নাম বিস্মৃত না হই। ইঁহাদের মধ্যে প্রথম জন বৈশেষিক সূত্রের টীকা রচনা করেন এবং দ্বিতীয় জন 'খণ্ডনোদ্ধার' নামক গ্রন্থে ন্যায়-বৈশেষিকদের পক্ষ হইতে শ্রীহর্ষের সমালোচনার প্রত্যুত্তর প্রদান করেন। এই সময়ের সর্বাপেক্ষা সম্মানিত লেখকগণ হইতেছেন—মথুরানাথ, জগদীশ এবং গদাধর। তৎকালীন ন্যায় এবং বৈশেষিক মতবাদ বিশদভাবে বুঝিতে হইলে 'কিরণাবলী', 'লীলাবতী' এবং 'তত্ত্বচিন্তামণির' উপর মথুরানাথের ভাষ্য একেবারে অপরিহার্য। জগদীশ শাব্দজ্ঞানের প্রণালী ও লক্ষ্য-বিষয়ক তাঁহার 'শব্দশক্তি-প্রকাশিকা' গ্রন্থের মাধ্যমে ভারতীয় এবং বিশেষতঃ বঙ্গীয় বৈশেষিকদিগকে গভীর-ভাবে প্রভাবিত করেন। মূর্তিমান নব্যন্যায় আখ্যায় সচরাচর যাঁহাকে স্তুতি করা হইয়া থাকে, সেই গদাধর তর্কশাস্ত্রের বহু জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করেন এবং অক্ষুর বলিয়া খ্যাত জ্ঞানের কতকগুলি বাস্তবিক অথবা কাল্পনিক স্থলের সাহায্যে অনেক

কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়েরও উত্থাপন করেন। এই সময়ে নবদ্বীপ সম্প্রদায়ের গৌরব চরমে উঠিয়াছিল। আমরা দেখিতে পাই যে, আনুমানিক সপ্তদশ শতাব্দীতে মান্দালয় (ব্রহ্ম) প্রভৃতি দূরদেশ হইতে ছাত্রেরা নবদ্বীপে আসিয়া বিশিষ্ট মনীষীদের নিকট দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছেন।[৫]

এখন আমরা অনুমান, শব্দপ্রমাণ ও লক্ষণ সম্বন্ধে এই সম্প্রদায়ের মতসমূহ আলোচনা করিব।

২। অনুমান

যাহাকে অনুমান করিতে হইবে (সাধ্য) সেই চিহ্নিতের বা লিঙ্গীর (অর্থাৎ উহা যাহার চিহ্ন তাহার) সহিত চিহ্ন বা লিঙ্গের (হেতুর) নিয়ত সম্বন্ধের জ্ঞান (ব্যাপ্তিজ্ঞান) হইতে সঞ্জাত এক শ্রেণীর জ্ঞানকে অনুমান বলা হয়। পাশ্চাত্য তর্কশাস্ত্রে যাহাকে মধ্যম পদ বলা হয়, হেতু তাহারই অনুরূপ এবং যাহাকে প্রধান পদ বলা হয়, সাধ্য তাহারই অনুরূপ। নিয়তসম্বন্ধের জ্ঞানের ফলে পক্ষে লিঙ্গীর সহিত অব্যভিচারীরূপে সম্বদ্ধ লিঙ্গের অবস্থিতির জ্ঞান উদ্ভূত হয়। ইহা লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, যদিও অনুমান পূর্বোল্লিখিত জ্ঞান অর্থাৎ পরামর্শ হইতেই সাক্ষাৎ-ভাবে উদ্ভূত, তথাপি নিয়তসম্বন্ধের জ্ঞানই ইহার প্রকৃত কারণ। মনস্তত্ত্বের দিক হইতে বলা যায় যে, অন্যান্য ঐচ্ছিক ক্রিয়ার ন্যায় অনুমানের জন্য নিয়ত পূর্ববর্তী রূপে তিনটি ব্যাপারের প্রয়োজন হয়। এই গুলিকে যুক্তিসম্মতরূপে সাজাইলে আমরা নিম্নলিখিত তিনটি মানসিক উপাদান পাই :

(১) প্রয়োজনের জ্ঞান এবং যাহাদের দ্বারা প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে তাহাদের জ্ঞান,

(২) প্রয়োজন সিদ্ধির ইচ্ছা,

(৩) প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার প্রচেষ্টা (প্রবৃত্তি)।

যে কোন ব্যক্তি কোন অনুমান করিতে চেষ্টা করিবেন তাঁহার পক্ষে এইগুলি থাকা আবশ্যক :

(১) লিঙ্গীর সহিত লিঙ্গের নিয়ত সম্বন্ধের জ্ঞান।

(২) প্রয়োজন এবং উপায়ের জ্ঞান।

(৩) প্রয়োজন সিদ্ধির ইচ্ছা।

(৪) প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার প্রচেষ্টা।

(৫) কেবলমাত্র লিঙ্গ হিসাবেই লিঙ্গের জ্ঞান নয় পরন্তু পক্ষে বর্তমান লিঙ্গের জ্ঞান।

(৬) নিয়তসম্বন্ধের স্মরণ ; এবং

(৭) লিঙ্গ হিসাবেই লিঙ্গের জ্ঞান—যাহা লিঙ্গীর সহিত লিঙ্গের নিয়তসম্বন্ধের জ্ঞান এবং পক্ষে ইহার অবস্থিতির জ্ঞানকে সূচিত করে।

ইহাই হইতেছে অনুমানের জন্য আবশ্যক প্রকৃত প্রক্রিয়া—এবং ইহা দ্বারাই লিঙ্গী অথবা সাধ্যের জ্ঞানে (সিদ্ধান্তে) উপনীত হওয়া যায়।

নৈয়ায়িক গ্রন্থসমূহে উপরোক্ত প্রক্রিয়াকে নিম্নলিখিত সুপ্রাচীন দৃষ্টান্তের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে :

(১) যেখানে ধূম (লিঙ্গ) আছে সেখানে অবশ্যই অগ্নি (লিঙ্গী) থাকিবে ;

(২) অগ্নির জ্ঞান এবং সেই জ্ঞানের উপায়ের জ্ঞান ;

(৩) এবং (৪) "অগ্নি সম্পর্কে জ্ঞান হউক"—এই ভাবে অভিব্যক্ত ইচ্ছা এবং

(৫) কেবলমাত্র লিঙ্গ রূপে নয় পরন্তু, যেমন ধরা যাক্, পর্বতে বিদ্যমান বস্তুরূপে ধূমের জ্ঞান ;

(৬) উপরে প্রথম পঙ্‌ক্তিতে উল্লিখিত ব্যাপ্তির স্মরণ ; এবং

(৭) পর্বতোপরি অবস্থিত অগ্নির সহিত নিয়ত সম্বন্ধযুক্ত লিঙ্গরূপে পর্বতোপরি দৃষ্ট ধূমের জ্ঞান।

অনুমানের অপরিহার্য অঙ্গ নিয়তসম্বন্ধ অর্থাৎ ব্যাপ্তির লক্ষণ এইভাবে দেওয়া হইয়াছে (i) সাধ্যের অভাবের সর্ব-অধিষ্ঠানে লিঙ্গের অভাব এবং (ii) লিঙ্গের অধিষ্ঠানে অবস্থিত যে সকল অভাব নিজ প্রতিযোগীর সহিত একাধিকরণে থাকে না, সেই সকল অভাবের কোনওটিরই প্রতিযোগী নয়, এমন লিঙ্গীর সহিত লিঙ্গের সহাবস্থান (সামানাধিকরণ্য)।[৬]*

পরবর্তী নৈয়ায়িক পণ্ডিতেরা বাস্তবিক ও সম্ভাব্য আপত্তিসমূহের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা হিসাবে তাঁহাদের উক্তিগুলিকে যথাযথ করিবার জন্য যে কি ভাবে চেষ্টা করিতেন এই কথঞ্চিৎ জটিল লক্ষণ তাহার একটি সহজ দৃষ্টান্ত।

ব্যাপ্তির নিশ্চয়ের উৎপত্তির জন্য নয় তাহাকে সুদৃঢ় করিবার জন্যই ভূয়োদর্শন আবশ্যক এইরূপ বলা হইয়াছে। এস্থলে ইহা বলা যাইতে পারে যে, দুইটি বস্তুর, ধরা

* যাহার অভাব ঘটে (অথবা যাহা অবিদ্যমান) তাহাকে ঐ অভাবের প্রতিযোগী বলে।

যাক্ ধূম এবং অগ্নির, একত্রাবস্থানের প্রথম দৃষ্টান্ত হইতেই ব্যাপ্তির অলৌকিক সামান্য লক্ষণ প্রত্যক্ষ ঘটিয়া থাকে।†

এই জাতীয় অলৌকিক সামান্যলক্ষণ প্রত্যক্ষের উপায় হইতেছে ঐ প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত বস্তুসমূহের সহিত কোন ইন্দ্রিয়ের অলৌকিক সন্নিকর্ষ। যে সকল বিশেষ বস্তুর সহিত আমাদের ইন্দ্রিয়ের লৌকিক সন্নিকর্ষ হয়, তাহাদের মধ্যে যে সামান্যকে প্রত্যক্ষ করা হয়, অথবা প্রত্যক্ষ করা হইয়াছে বলিয়া মনে করা হয়, সেই সামান্যই ঐ অলৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত বস্তুগুলির মধ্যেও নিহিত আছে বলিয়া এইরূপ অলৌকিক সন্নিকর্ষ হইয়া থাকে। এইরূপ সন্নিকর্ষকে সামান্য লক্ষণ সন্নিকর্ষ বলা হয়।[৭] ইহা বলা হইয়াছে যে, কোন বিশেষ ক্ষেত্রে সহচার সম্বন্ধের প্রযোজ্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করিতে হইলেও এই সন্নিকর্ষলব্ধ অলৌকিক সামান্য প্রত্যক্ষ অপরিহার্য, কারণ ন্যায়ের মতে কোন বিষয় সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকৃতপক্ষে উহা সম্বন্ধে অনিশ্চিত জ্ঞানেরই দ্যোতক। আমাদের মনে এই বিষয় সম্বন্ধে একটা সাধারণ জ্ঞান না থাকিলে এরূপ সন্দেহ সম্ভবপর নয়।

ব্যাপ্তি সম্পর্কে সামান্যজ্ঞান থাকা সত্ত্বেও কোন একটি বিশেষ বিষয়ে সন্দেহ থাকা সম্ভবপর। যদিও আমরা সাধারণভাবে উহা জানি যে ধূম থাকিলেই অগ্নি থাকিবে তথাপি পর্বতের উপরে ধূম দেখিয়াও ঐস্থানে অগ্নির অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ থাকিতে পারে। সুতরাং অনুমানের সাহায্যেই তাহা জানিয়া লইতে হয়। এই ধরণের সন্দেহ দূর করিবার জন্যই তর্ক বা পরোক্ষযুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়া থাকে।

কোন বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যাপ্তি সম্বন্ধে সন্দেহ করিলে যাহা পূর্বেই নিশ্চিতভাবে জানা আছে তাহা অস্বীকার করিতে হয়, অথবা যাহা সত্য নয় তাহা স্বীকার করিতে হয়—ইহা প্রতিপন্ন করাই তর্কের উদ্দেশ্য। যেমন, পর্বত হইতে যখন ধূম উদ্‌গিরণ হইতেছে দেখা যায়, তখন সেখানে অগ্নির উপস্থিতি সম্বন্ধে সন্দেহ নিম্নোক্ত যুক্তির সাহায্যে দূর করা যায় "পর্বতে যদি অগ্নি না থাকিত, তাহা হইলে ইহার অর্থ হইত এই যে, ধূম অগ্নির কার্য নয়; কিন্তু এই সম্পর্কে জ্ঞান ইতিপূর্বেই প্রত্যক্ষের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে।" এইভাবে যুক্তির সাহায্যে প্রয়োজনীয় নেতিমূলক প্রমাণটি পাওয়া গেল।[৮]

† গো অথবা ধূমকে ব্যক্তিধর্মবিশিষ্ট বস্তুরূপে প্রত্যক্ষ না করিয়া গোত্ব অথবা ধূমত্ব এই সামান্য ধর্মবিশিষ্ট রূপে প্রত্যক্ষ করাকেই সামান্য লক্ষণ প্রত্যক্ষ বলে।

ব্যাপ্তি সম্পর্কে সন্দেহ দূর করিবার তর্ক পাঁচ প্রকার। (১) আত্মাশ্রয়—ইহা দেখাইয়া দেয় যে ব্যাপ্তি স্বীকার না করিলে যাহাকে অনুমান করা হইবে তাহা নিজের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িবে। (২) অন্যোন্যাশ্রয়—ইহা দেখাইয়া দেয় যে, ব্যাপ্তি স্বীকার না করিলে সাধ্য এমন একটি বস্তুর উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়ে যাহা আবার উহার উপরেই নির্ভরশীল। (৩) চক্রক প্রমাণ করিয়া দেয় যে, ব্যাপ্তিকে অস্বীকার করিলে হেতুকে সাধ্যের উপর নির্ভরশীল বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। (৪) চতুর্থতঃ, এক বস্তু অপরের উপর নির্ভরশীল, তাহা আবার অপর এক বস্তুর উপর নির্ভরশীল এই জাতীয় অনবস্থা দোষ। (৫) পঞ্চম প্রকারের নাম হইতেছে "তদন্য বাধিতার্থ প্রসঙ্গ"—যে যে স্থলে কোন ব্যাপ্তিকে অস্বীকার করিলে ইতঃপূর্বে প্রত্যাখ্যাত প্রতিজ্ঞাগুলি স্বীকার করিতে আমরা বাধ্য হই, সেইগুলি ইহার অন্তর্ভুক্ত। প্রথম তিনটি প্রকারকে আবার তিন-তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। উদাহরণ-স্বরূপ, স্বাশ্রয়ের দৃষ্টান্তের ক্ষেত্রে (ক) কোন জিনিসের উৎপত্তিকে যদি সেই জিনিষেরই উৎপত্তির উপর নির্ভরশীল বলা হয়, তাহা হইলে তাহা উৎপত্তি-সম্বন্ধে স্বাশ্রয়ের দৃষ্টান্ত হইয়া দাঁড়ায়, (খ) যদি একটি জিনিসের অস্তিত্ব তাহার নিজস্ব অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল বলিয়া কথিত হয় তবে তাহা অস্তিত্ব সম্বন্ধে স্বাশ্রয়ের দৃষ্টান্ত হইয়া দাঁড়ায়, এবং (গ) তৃতীয়তঃ, যদি কোন জিনিস সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান সেই জিনিসের জ্ঞপ্তির উপরই নির্ভরশীল বলা হয়, তাহা হইলে তাহা জ্ঞপ্তির সম্বন্ধে স্বাশ্রয়ের দৃষ্টান্ত হইয়া দাঁড়ায়। এই প্রকার ত্রিবিধ বিভাগ, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রকার তর্কের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

তর্ক আসলে একপ্রকার অনুমান, অথবা আরও সঠিকভাবে বলিতে গেলে, অনুমানের প্রতিভাস। এই প্রকার অনুমানে মূল অনুমানের জন্য যে ব্যাপ্তিটি আবশ্যক এবং যাহার প্রতিষ্ঠার জন্য এই তর্কের অবতারণা, সেই ব্যাপ্তিটি মিথ্যা বলিয়া ধরিয়া লইয়া দেখান হয় যে, তাহার ফলে পূর্বে যাহা মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে তাহাকে স্বীকার করিতে হয়, অথবা যাহা সত্য বলিয়া জ্ঞাত তাহাকে অস্বীকার করিতে হয় ; সুতরাং ইহাতে মূল ব্যাপ্তির অভ্যুপগত (অর্থাৎ সত্য না হইলেও তর্কের খাতিরে সত্য বলিয়া গৃহীত) অভাবের সহিত একটি আপত্তিজনক ফলের ব্যাপ্তি থাকে। ইহাতে তর্ক এবং ব্যাপ্তির অন্যোন্যাশ্রয় রূপ দোষ উৎপন্ন হয়। এই আপত্তির উত্তরে নৈয়ায়িক বলেন যে, কেবলমাত্র ব্যাপ্তিসম্বন্ধে সন্দেহ দূর করিয়া দিবার জন্যই এইরূপ তর্ক প্রয়োগ করা হয়। কারণ, ব্যাপ্তি ব্যতীত অনুমান অসম্ভব।

কোন পদার্থকে অনুমিতির পক্ষ হইতে হইলে কি প্রয়োজন—এই সম্পর্কে নৈয়ায়িকদের বিশ্লেষণ যেমনই চিত্তাকর্ষক তেমনই সূক্ষ্ম। কিন্তু ইহার আলোচনার পূর্বে এই কথাটি বলা দরকার যে, নৈয়ায়িকদের মতে কোন পদার্থ-সম্বন্ধে অন্য প্রমাণদ্বারা লব্ধ জ্ঞানকে শক্তিশালী করিবার জন্যও অনুমানের ইচ্ছা সম্ভবপর। এই কথার তাৎপর্য এই যে, ইহা বিশিষ্ট একপ্রকার ইচ্ছার দৃষ্টান্ত। এই পক্ষতার জন্য যে সাধ্য-নিশ্চয়ের সহিত অনুমিতির বিশিষ্ট ইচ্ছা থাকে না, সেই সাধ্য-নিশ্চয়ের অভাব চাই। অন্য ভাষায় বলিতে গেলে শুধু সাধ্যধর্মের নিশ্চয় থাকিলে, উক্ত ধর্মযুক্ত পদার্থটি অনুমিতির যথার্থ পক্ষ হইতে পারে না। কিন্তু যেহেতু এখানে অনুমিতির বিশিষ্ট ইচ্ছা বর্তমান, তাই সাধ্যের নিশ্চয়ও অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয় না। অবশ্য অনুমিতির বিশিষ্ট ইচ্ছা ব্যতীত সাধ্যের নিশ্চয় অনুমিতির প্রতিবন্ধক। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সাধ্যের নিশ্চয় না থাকিয়া সঙ্গে সঙ্গে যদি অনুমিতির বিশিষ্ট ইচ্ছা না থাকে তাহা হইলে অনুমিতি হইবে। নৈয়ায়িকদের যথাযথ যুক্তিশাস্ত্রীয় পদ্ধতিতে এই কথাটি এইভাবে বলা যাইতে পারে: অনুমিতির ইচ্ছার অভাবযুক্ত যে সাধ্যের নিশ্চয় উহার অভাব হইতেছে পক্ষতার অবশ্য-প্রয়োজনীয় ধর্ম।[৯]

৩। শব্দ প্রমাণ

যেহেতু নৈয়ায়িক তর্কশাস্ত্র বৈশেষিক তত্ত্ববিদ্যার সহিত যুক্ত, সেইজন্য এই সময়ের বৈশেষিক গ্রন্থাদিতেও যথার্থ জ্ঞানের উপায় হিসাবে শব্দ প্রমাণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রহিয়াছে। শব্দ প্রমাণ সম্পর্কে প্রাচীন মত এই যে ইহা শব্দের বা বাক্যের অর্থের যথার্থ জ্ঞানের অধিকারী এবং এই জ্ঞান অন্যকে জানাইতে ইচ্ছুক ব্যক্তির উচ্চারিত শব্দ বা বাক্য। শব্দ প্রমাণের এই সুপ্রাচীন মত এই যুগের প্রথম দিকে ব্যাপকভাবে গৃহীত ছিল। গঙ্গেশ বলিয়াছেন যে, যে শব্দ বা বাক্যের উচ্চারণের পূর্বে উহার অর্থের যথার্থ জ্ঞান থাকে, তাহাকে শব্দপ্রমাণ বলা হয়। প্রাচীনপন্থী পণ্ডিতগণ এই মতকে সমর্থন করিয়া এই অভিমত পোষণ করিতেন যে, শব্দপ্রমাণের জন্য এইগুলি থাকা প্রয়োজন: (১) যে শব্দ বা বাক্য কথিত হইবে, তাহার অর্থের যথার্থ জ্ঞান যে কোন প্রমাণের সাহায্যে গৃহীত হইয়া বক্তার মনে উপস্থিত থাকিবে; (২) সেই যথার্থ জ্ঞানের একটি জ্ঞান এবং (৩) সেই যথার্থ জ্ঞান অন্যেরাও লাভ করুক এইরূপ ইচ্ছা।[১০]

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, শব্দ বা বাক্যের শ্রবণমাত্র হইতেই শাব্দ জ্ঞানের উৎপত্তি। কিন্তু নবদ্বীপের দার্শনিকগণের অভিমত এই যে, কেবলমাত্র উচ্চারিত শব্দ বা বাক্যের শ্রবণ নয়, বরং সেই শব্দ বা বাক্যের প্রাসঙ্গিক চিহ্ন বা প্রতীকের উপর প্রতিষ্ঠিত আনুমানিক উপলব্ধিও যথার্থ জ্ঞানলাভের ক্ষেত্রে সহায়তা করিতে পারে। শেষোক্ত জ্ঞানের দৃষ্টান্ত হিসাবে তাঁহারা বলেন যে কোনো গ্রন্থকারের মনোভাব তাঁহার উক্তিগুলি উচ্চকণ্ঠে পাঠ না করিয়াও সহজে অনুধাবন করা যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে শব্দ বা বাক্যের কেবলমাত্র বাস্তব-প্রত্যক্ষ নয়, বরং যে কোনো প্রকারেই হউক শব্দ বা বাক্যের জ্ঞানই শব্দ প্রমাণের পক্ষে যথেষ্ট। একটি শব্দ বা বাক্যের মাধ্যমে বিজ্ঞাপিত কোনো বিষয় বা ভাব সম্পর্কে জ্ঞানের উদ্ভব হইতে গেলে এই উপাদানগুলি ক্রমানুসারে আবশ্যক হয়। যেমন : (১) কথিত শব্দের ক্ষেত্রে উচ্চারিত শব্দসমূহের প্রত্যক্ষ অথবা লিখিত শব্দ পাঠের ক্ষেত্রে প্রতিনিধিস্থানীয় প্রতীকের সাহায্যে তাহার অনুমান। (২) পূর্বকথিত শব্দগুলি এবং তাহাদের অর্থসমূহের মধ্যে যে সম্বন্ধ আছে তাহার স্মরণ, এবং (৩) শব্দগুলিদ্বারা লক্ষিত বস্তুর ধারণারূপে অবস্থিতি। পূর্বোল্লিখিত ধারণার অবস্থিতির সহায়ক বিভিন্ন ধরণের জ্ঞান হইতেছে, (ক) আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ অন্য কোনো শব্দের উপস্থিতি ব্যতীত দুইটি শব্দের পক্ষে একটি অর্থ প্রকাশে অক্ষমতা সম্পর্কে জ্ঞান, (খ) যোগ্যতার জ্ঞান অর্থাৎ বাক্যের বা শব্দের অবিসম্বাদিত অর্থের সম্বন্ধে জ্ঞান, (গ) সন্নিধির জ্ঞান অর্থাৎ উচ্চারণ বা লিখনের ক্ষেত্রে একটি শব্দের সহিত অপর শব্দের নৈকট্যের জ্ঞান, (ঘ) বাক্যের রচয়িতার উদ্দেশ্য (উদ্দিষ্ট অর্থ) বা তাৎপর্য সম্পর্কে জ্ঞান। কোন ব্যক্তি একটি কলমের নীলত্ব সম্পর্কে তাঁহার জ্ঞান অন্য কাহাকেও জানাইতে ইচ্ছা করিলে বলিয়া থাকেন "কলমটি নীল।" এই জ্ঞান গ্রহণ করিতে হইলে দ্বিতীয় ব্যক্তির প্রথম প্রয়োজন হইল এই কথিত বাক্যটির উচ্চারিত শব্দের উপলব্ধি এবং তাহার পর সেই শব্দগুলির এবং তদ্দ্বারা লক্ষিত বস্তুগুলির মধ্যে সম্বন্ধের স্মৃতি। এই স্মৃতির সাহায্যেই শ্রোতা ঐ সব জ্ঞান অর্জন করিয়া থাকেন। আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা, সন্নিধি ও তাৎপর্য সম্বন্ধে শ্রোতার জ্ঞানের সাহায্যে উপরোক্ত জ্ঞান শ্রোতার মনে আরও নূতন জ্ঞান উৎপন্ন করে, যাহা বক্তা যে জ্ঞান অপরের মনে সঞ্চারিত করিতে ইচ্ছা করেন, যথা—"কলমটি নীল" তাহার অনুরূপ। যে জ্ঞান বক্তা অপরের মনে সঞ্চারিত করিতে ইচ্ছা করেন তাহার অনুরূপ একটি বিশেষ শব্দ কেন একটি বিশেষ অর্থ ব্যক্ত করে ইহা ব্যাখ্যা করিবার জন্য শব্দ এবং উহার অর্থের (অর্থাৎ উদ্দিষ্ট পদার্থ) মধ্যে দুই প্রকার সম্বন্ধ

স্বীকৃত হইয়াছে। প্রথমটিকে শক্তি বলা হয়। ইহা লোক-প্রচলিত অর্থের (রুচির) প্রতিপাদক। দ্বিতীয়টিকে লক্ষণা বলে। ইহা প্রচলিত অর্থের সহিত সম্বন্ধযুক্ত অর্থকে পরোক্ষভাবে সূচিত করিয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যখন মঞ্চস্থ লোকেরা চীৎকার করিতে থাকে, তখন বলা হয় যে মঞ্চ চীৎকার করিতেছে।

শক্তি জ্ঞানের আটটি উপায় আছে: যথা—(১) ব্যাকরণ, (২) উপমান, (৩) কোষ, (৪) প্রামাণ্য ব্যক্তির বাক্য (আপ্তবাক্য), (৫) ব্যবহার, (৬) প্রসঙ্গ, (৭) টীকা অথবা ব্যাখ্যা এবং (৮) সন্নিধি। প্রারম্ভিক স্তরে এই জ্ঞান কেবলমাত্র ব্যবহার হইতেই লাভ হয়। ঐ স্তরে অন্যান্য উপায়গুলির স্থান গৌণ।

শিশু যে ভাবে এই শক্তি সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করে, তাহা হইতেছে একপ্রকার অনুমান। এই অনুমানের ভিত্তি হইতেছে এক ব্যক্তির (যথা ঘ-এর) আহ্বানে অপর ব্যক্তির (যথা ক-এর) যে প্রতিক্রিয়া হয়, তাহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান। এই অনুমানটি নিম্নোক্তভাবে ব্যক্ত করা যাইতে পারে। (১) কোন প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য ক-এর যে ক্রিয়া, উহা তাহার আত্মাতে অবস্থিত ইচ্ছা হইতে সঞ্জাত যে প্রযত্ন তাহা হইতে উৎপন্ন হয়; (২) এই প্রযত্নের পূর্বে উক্ত প্রয়োজন এবং তৎসিদ্ধির উপায়ের জ্ঞান থাকা আবশ্যক, যেমন সচরাচর (আমার ক্ষেত্রে) লক্ষিত হয়। এই জ্ঞানের কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে উক্ত শক্তি-সম্বন্ধের জ্ঞানলাভ করা যায়।

এইভাবে ইহা স্পষ্ট যে, খ-কর্তৃক উচ্চারিত শব্দগুলির জ্ঞানই ঐ সকল শব্দের অর্থবিষয়ক ক-এর জ্ঞানের কারণ। কারণ এইরূপ দেখা যায় যে, খ-কর্তৃক উচ্চারিত ঐ শব্দগুলি শুনিয়া প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ক কর্ম করে। এই জ্ঞানের পর এবং ক্রিয়া আরম্ভ হওয়ার পূর্বে ক-এর ইচ্ছা এবং প্রযত্ন উৎপন্ন হয়।

এই প্রণালী দ্বারা পৃথকভাবে ভিন্ন ভিন্ন শব্দগুলির অর্থ নহে, কিন্তু সমগ্র বাক্যটির অর্থ জানিতে হইলে উহাদিগকে বিভিন্ন শব্দ সমুদায়ে এবং বিভিন্ন প্রসঙ্গে শ্রবণ করা আবশ্যক।

প্রাচীন মতে শব্দের শক্তি, জাতি, ব্যক্তি, এবং আকৃতি থাকে, (অর্থাৎ শব্দের প্রাথমিক অর্থ হইতেছে জাতি, ব্যক্তি এবং আকৃতি)।

সুতরাং ইহা হইতে সুস্পষ্ট ধারণা করা যায় যে, 'খ'-কর্তৃক উচ্চারিত শব্দগুলিই হইতেছে আহ্বানের বিষয় সম্পর্কে 'ক'-এর জ্ঞানের হেতু—কারণ 'খ'-এর শব্দ শুনিলেই 'ক'-কে অনিবার্যভাবে কাজ করিতে দেখা যায়। এই জ্ঞানের পর কার্য আরম্ভের পূর্বে 'ক'-এর পক্ষ হইতে কর্মের প্রবৃত্তি ও অভিপ্রায় জাগিয়া উঠে।

এই প্রক্রিয়ার ফলেই পৃথক পৃথক শব্দ সম্পর্কে নয় বরং সমগ্র বাক্যের অর্থ বিষয়েই জ্ঞানের উদ্ভব হয়। পরবর্তী উদাহরণে দেখা যায় নানাবিধ সমবায়ে ও বিভিন্ন প্রসঙ্গে শ্রুত শব্দ হইতেই জ্ঞান জন্মে।

প্রাচীন সম্প্রদায়ের মতে জাতি, ব্যক্তি ও ব্যক্তির আকৃতির সহিতই হইতেছে শব্দের সম্বন্ধ—কিন্তু আধুনিক সম্প্রদায় মনে করেন এই সম্বন্ধ হইতেছে শব্দ এবং সামান্যাশ্রিত ব্যক্তির মধ্যেকার ব্যাপার। ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কোন ব্যক্তি সম্বন্ধে সবিকল্প জ্ঞানের ক্ষেত্রে জাতিও বিশেষণ হিসাবে উপস্থিত থাকে; কিন্তু নির্বিকল্প জ্ঞানের ক্ষেত্রে দুইটি উপাদানই সম্বন্ধহীন।

৪। লক্ষণ-নির্ণয়

লক্ষণ-নির্ণয়ের প্রণালী নৈয়ায়িকদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। এই বিষয়ে তাঁহাদের আলোচনা দার্শনিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে পরাকাষ্ঠার নিদর্শন। সমজাতীয় বা বিষমজাতীয় পদার্থ হইতে লক্ষ্যকে ব্যাবৃত্ত করিতে পারে এইরূপ বৈশিষ্ট্যপ্রকাশক ধর্মের (লক্ষণের) বিবৃতিই হইতেছে লক্ষণ-বাক্য। লক্ষণ-বাক্যের যথার্থতা বলিতে অব্যাপ্তি, অতিব্যাপ্তি ও অসম্ভব এই দোষগুলির অভাব বুঝায়। (১) যখন লক্ষণ-ধর্মটি প্রত্যেক লক্ষ্য বস্তুতে থাকে না, তখন অব্যাপ্তি অথবা সঙ্কীর্ণতা দোষ ঘটে (২) যখন লক্ষণ-ধর্মটি লক্ষ্যাতিরিক্ত পদার্থেও থাকে তখন অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটে এবং (৩) যখন লক্ষণ-ধর্মটি কোন পদার্থেই থাকে না তখনই অসম্ভব দোষ ঘটে। শ্বেতবর্ণ, শৃঙ্গ এবং অবিভক্ত ক্ষুর যদি গরুর লক্ষণরূপে নির্দেশ করা হয়, তাহা হইলে ক্রমান্বয়ে পূর্বোক্ত তিনটি দোষের উদাহরণ পাওয়া যাইবে। কখনও কখনও এইরূপ হয় যে, লক্ষণবাক্যের জন্য অত্যাবশ্যক কোন বিশেষ ধর্ম সহজলভ্য নয়। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য নৈয়ায়িকগণ একটি সাধারণ ধর্মকেও লক্ষণ-রূপে গ্রহণ করিয়া উহাকে কোন অসাধারণ ধর্মের সাহায্যে এমনভাবে ব্যক্ত করেন যে, তাহাতে অতিব্যাপ্তি দোষের পরিহার হয়। এইভাবে বিশেষ ধর্মের অভাবে যখন কোন সাধারণ ধর্মের ভিত্তিতে লক্ষণ-বাক্য দেওয়া হয়, তখন নৈয়ায়িকদের তর্কবুদ্ধির চরম উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায়, কারণ ইহাতে একটি সাধারণ ধর্মকে বিশেষ ধর্মে পরিণত করিতে হয় এবং তখন উহাই লক্ষণের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিতে পারে।[১১]

জ্ঞান, ইচ্ছা, অভাব প্রভৃতি আপেক্ষিক পদার্থের যথাযথ বর্ণনার সমস্যা

নৈয়ায়িকেরা যেভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহাতে বিশেষভাবে পূর্ববর্ণিত সূক্ষ্ম তর্ককৌশল লক্ষিত হয়। উদাহরণস্বরূপ জ্ঞান সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, উহা বিষয়সাপেক্ষ, কারণ বিষয়শূন্য জ্ঞান অসম্ভব (ইচ্ছা, প্রযত্ন প্রভৃতিও বিষয়সাপেক্ষ) অতএব বিষয়ের নির্দেশ ব্যতীত কোন জ্ঞানেরই যথাযথ বর্ণনা দেওয়া যাইতে পারে না। এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, উদ্দেশ্য, বিধেয় এবং উহাদের সম্বন্ধ প্রত্যেক জ্ঞানের সহিতই জড়িত থাকে এবং এই তিনটিই জ্ঞানের বিষয়। সুতরাং যে কোন জ্ঞানের যথাযথ বর্ণণার জন্য ইহাদের প্রত্যেকটিরই যত্নপূর্বক বিশ্লেষণ করা আবশ্যক। "ইহা একটি লেখনী" এই বাক্যদ্বারা প্রকাশিত জ্ঞান "ইহা একটি পুস্তক" এই বাক্যদ্বারা প্রকাশিত জ্ঞান হইতে পৃথক্। এই পার্থক্য উক্ত জ্ঞান দুইটির উদ্দেশ্য, বিধেয় এবং সম্বন্ধসাপেক্ষ ভেদের উপর নির্ভর করে। কিন্তু একটু বিচার করিলেই বুঝা যাইবে যে, এই বাক্যদ্বয়ে ব্যবহৃত 'ইহা' শব্দ জ্ঞানে যাহা সাক্ষাৎভাবে পাওয়া যায়, শুধু তাহাকেই ব্যক্ত করে। অতএব উদ্দেশ্যরূপে উদ্দেশ্যটি উভয়ক্ষেত্রেই এক। তাহাদের মধ্যে যেটুকু পার্থক্য আছে তাহা লেখনীত্ব এবং পুস্তকত্ব এই দুইটি বিধেয়ের ভেদের উপরই নির্ভর করে। "ইহা একটি লেখনী" এবং "ইহা একটি পুস্তক" এই উভয়ের জ্ঞানের ক্ষেত্রেই 'ইহা' রূপ একই উদ্দেশ্যকে নির্দেশ করা হয়। উহাদের পার্থক্য বিধেয়গত (উদ্দেশ্যগত নহে)। প্রথম স্থলে 'ইহা'র ধর্ম হইতেছে লেখনীত্ব, দ্বিতীয় স্থলে পুস্তকত্ব। নৈয়ায়িকের মতে 'ইহা একটি পুস্তক' এই জ্ঞানের সম্পূর্ণ এবং যথাযথ বর্ণনা এই : এই জ্ঞান 'পুস্তকত্ব' বিশিষ্ট 'ইদং' বিশেষ্যক এবং 'ইহা একটি লেখনী' এই জ্ঞানের বর্ণনা এই : এই জ্ঞান 'লেখনীত্ব' বিশিষ্ট 'ইদং' বিশেষ্যক।

একই ভাবে উদ্দেশ্যের (বিশেষ্যের) ভেদে জ্ঞানেরও ভেদ হয়। উদাহরণস্বরূপ, 'লেখনীটি কাল' এবং 'পাদুকাটি কাল' এই দুইটি জ্ঞানের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাক। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, শুধু জ্ঞানের সম্পর্কেই পদার্থ উদ্দেশ্য বা বিশেষ্য হয়। নৈয়ায়িকরা ইহাও বলেন যে, একটি উদ্দেশ্যতার অথবা বিশেষ্যতার জন্যই পদার্থ উদ্দেশ্য অথবা বিশেষ্য হয়। সুতরাং উদ্দেশ্যের ভেদ উদ্দেশ্যতারই ভেদ। কিন্তু এই উদ্দেশ্যতা পদার্থটি জ্ঞানসাপেক্ষ। উদ্দেশ্যতা অর্থাৎ জ্ঞানের সহিত সংশ্লিষ্ট পদার্থ হিসাবে তাহারা তাহা হইলে সকলেই এক প্রকারের। তথাপি জ্ঞানের এই দুইটি দৃষ্টান্তের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। এই পার্থক্য কি জন্যে ঘটে এই প্রশ্নের উত্তরে নৈয়ায়িকগণ বলেন,- এমন একটা কিছু অবশ্যই আছে যাহাদ্বারা পদার্থগুলির উল্লিখিত উদ্দেশ্যতা অবচ্ছিন্ন বা সীমিত হয়। আমাদের গৃহীত

উদাহরণগুলিতে লেখনী ও পাদুকাতে অবস্থিত উদ্দেশ্যতার অবচ্ছেদক ধর্ম হইতেছে যথাক্রমে লেখনীত্ব ও পাদুকাত্ব। লক্ষ্য করিতে হইবে যে, লেখনী ও পাদুকাতে সমবেত লেখনীত্ব এবং পাদুকাত্ব এই জাতি দুইটি যে এইস্থলে উদ্দেশ্যতার অবচ্ছেদক ধর্ম হইয়াছে তাহার কারণ লেখনী ও পাদুকাতে উদ্দেশ্যতা নামক আগন্তুক ধর্ম; আর এই উদ্দেশ্যতা জ্ঞান—সাপেক্ষতা ছাড়া অন্য কিছুই নহে। অতএব, নৈয়ায়িকের মতে 'লেখনীটি কাল' এই জ্ঞানের পূর্ণ বিবরণ হইবে: এই জ্ঞানটি হইতেছে কৃষ্ণত্বপ্রকারক এবং লেখনীত্বাবচ্ছিন্ন বিশেষ্যতাক (অর্থাৎ এই জ্ঞানে বিধেয় হইতেছে কৃষ্ণত্ব এবং উদ্দেশ্য হইতেছে লেখনীরূপে লেখনী)।

উদ্দেশ্যতা যেমন একটি পদার্থকে উদ্দেশ্যে পরিণত করে, তেমনি বিধেয়তা একটি জিনিসকে বিধেয় করে। জ্ঞানের এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে যাহার পরিপূর্ণ বিবরণের জন্য বিধেয়তার অবচ্ছেদকের নির্দেশ প্রয়োজন। 'টেবিলটি ঘটবান্' জ্ঞানের এই উদাহরণটি বিবেচনা করা যাউক। এখানে টেবিল সম্বন্ধে ঘটের বিধান করা হইয়াছে; ইহার অর্থ এই যে, যে পদার্থে ঘটত্ব আছে উহাকে টেবিলের বিধেয় করা হইয়াছে। কিন্তু বিধেয়গুলির বিধেয়রূপে অর্থাৎ বিধেয়ত্ববান্ পদার্থরূপে এমন কিছু নাই যাহা উহাদিগকে পরস্পর হইতে ভিন্ন করিতে পারে। সুতরাং বিধেয়তার অবচ্ছেদক নির্দেশ করা আবশ্যক। পূর্বোক্ত উদাহরণে ঘটে অবস্থিত বিধেয়তার অবচ্ছেদ হইতেছে ঘটত্ব। অতএব, নৈয়ায়িকের মতে 'টেবিলটি ঘটবান্' এই জ্ঞানের পূর্ণ বিবরণ হইবে এইরূপ: এই জ্ঞানটি হইতেছে ঘটস্থ ঘটত্বাবচ্ছিন্ন বিধেয়তাক এবং টেবিলস্থ টেবিলত্বাবচ্ছিন্ন উদ্দেশ্যতাক। অর্থাৎ এই জ্ঞানের বিশেষ্য হইতেছে টেবিল রূপে টেবিল এবং বিধেয় হইতেছে ঘটরূপে ঘট। যে বিশিষ্ট সম্বন্ধে বিধেয়ক উদ্দেশ্যের বিধেয় করা হয়, সেই সম্বন্ধের ভেদের জন্যও জ্ঞানের ভেদ হইয়া থাকে—ইহা পরবর্তী নৈয়ায়িকদের গ্রন্থে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচিত হইয়াছে।

অনেকের কাছে নৈয়ায়িকের এই ব্যাখ্যাপদ্ধতি সূক্ষ্ম বলিয়া মনে হইলেও তাহার আলোচনা অনেক ক্ষেত্রেই অর্থহীন চুলচেরা বিচার বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু আসল সত্য ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। নৈয়ায়িকের যাথার্থপ্রীতি এত উচ্চস্তরে উঠিয়াছিল যে, তাহার ব্যবহৃত বাক্য হইতে অভীষ্ট অর্থের ক্ষতি না করিয়া একটি শব্দও বর্জন করা সম্ভবপর নহে।

কেবল অনুপস্থিতি হিসাবে অভাবের বর্ণনায় এবং ভেদের বর্ণনার যে পদ্ধতি পরবর্তী ন্যায়শাস্ত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে, যুক্তিশাস্ত্রের দিক হইতে তাহারও খুব মূল্য আছে। কিন্তু এই বিষয়ের বিশদ ব্যাখ্যার জন্য এখানে যথেষ্ট স্থান নাই।

দ্রষ্টব্য

১। উমাপতি তাঁহার "পদার্থীয় দিব্য চক্ষু" গ্রন্থে ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের ঐতিহাসিক বিকাশকে প্রাচীন, মধ্য এবং নব্য কালানুক্রমিক এই তিন ভাগে ভাগ করিয়াছেন। বর্তমান নিবন্ধের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে মধ্যযুগের কিছু অংশও রহিয়াছে।

২। ইহা মনে করিলে ভুল হইবে যে, ভারতীয় দর্শনে সূত্রকে অন্ধভাবে অথবা জোর করিয়া অনুসরণ করা হইত। কারণ, বার্তিক নামে যে শ্রেণীর টীকা প্রচলিত আছে, তাহা প্রয়োজন হইলে সূত্রকে সমালোচনা করিয়া থাকে আবার সূত্রের মধ্যে কোন অভাব থাকিলে তাহা পূরণ করিয়াও থাকে। সূত্রের অন্তর্নিহিত ভাব হইতে অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছেন এবং স্বাধীন ভাবে দর্শনের সমস্যাগুলির বিচার করিয়াছেন এমন বিখ্যাত ভাষ্যকারের অভাব নাই।

৩। মহাবিদ্যাবিড়ম্বনম্ (বরোদা সংস্করণ) দ্রষ্টব্য।

৪। ঈশ্বর হইতে পৃথক্ ভাবে অবস্থিত আকাশ, কাল ও দেশের অস্তিত্বে তিনি বিশ্বাস করেন না। পদার্থ-তত্ত্ব-নিরূপণম্ (কাশী সংস্করণ) দ্রষ্টব্য।

৫। বর্মীয় লিপিতে লিখিত সংস্কৃত পাণ্ডুলিপির ইণ্ডিয়া অফিস ক্যাটালগ দ্রষ্টব্য।

৬। বর্ধমানের মত সমর্থন করিয়া দ্বিতীয় বাচস্পতি তাঁহার খণ্ডনোদ্ধার গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, ব্যাপ্তি হইতেছে চিহ্ন ও চিহ্নিতের মধ্যে অনৌপাধিক সম্বন্ধ। তত্ত্বচিন্তামণিতে যে লক্ষণগুলি দেওয়া হইয়াছে (যাহা পূর্বে অনূদিত হইয়াছে), তাহা তাঁহাদের মতে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। খণ্ডনোদ্ধার (কাশী সংস্করণ) পৃঃ ১৬-৭ দ্রষ্টব্য।

৭। সন্নিকর্ষের প্রকৃতি সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কোন কোন লেখকের মতে ইহা বস্তুতঃ 'সামান্য' নহে, কিন্তু সামান্যের লৌকিক প্রত্যক্ষ যাহার মাধ্যমে অলৌকিক সন্নিকর্ষ স্থাপিত হয়। ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, রঘুনাথ শিরোমণি সামান্য লক্ষণ সন্নিকর্ষ মত খণ্ডন করিয়াছেন। সিদ্ধান্তমুক্তাবলী এবং সামান্য লক্ষণ পরিচ্ছেদে তত্ত্বচিন্তামণির উপর দীধিতি দ্রষ্টব্য।

৮। তার্কিক রক্ষায় (কাশী সংস্করণ) তর্ক-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৯। সিদ্ধান্তমুক্তাবলীতে অনুমান-খণ্ড দ্রষ্টব্য।

১০। তত্ত্বচিন্তামণি (শব্দ-অনুচ্ছেদ) এবং তাহার উপর মথুরানাথের ভাষ্য (বিব্‌লিওথিকা ইণ্ডিকা) দ্রষ্টব্য।

১১। পৃথ্বী ইত্যাদি (কাশী সংস্করণ)-তে শঙ্কর মিশ্রের কণাদরহস্য দ্রষ্টব্য।

গ্রন্থবিবরণী

যে সকল গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া বর্তমান প্রবন্ধ রচিত হইয়াছে তাহাদের উল্লেখ 'দ্রষ্টব্য' অংশে করা হইয়াছে। নিম্নলিখিত দুইখানি গ্রন্থও (যাহাদের সম্বন্ধে পূর্বে উল্লেখ নাই) এই প্রবন্ধ রচনায় ব্যবহৃত হইয়াছে :

শশধর রচিত ন্যায়-সিদ্ধান্ত-দীপ (কাশী সংস্করণ)।

জানকীনাথ রচিত ন্যায়-সিদ্ধান্ত-মঞ্জরী (কাশী সংস্করণ)।

সাংখ্য যোগ

১। ভূমিকা

সাংখ্য দর্শন ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন দর্শন বলিয়া মনে হয়। উপনিষদ্‌গুলির মধ্যেই সাংখ্য দার্শনিক চিন্তার বীজ দেখিতে পাওয়া যায়। কঠ, শ্বেতাশ্বতর ও মৈত্রায়ণী উপনিষদ্‌গুলিতে সাংখ্যসম্মত ধারণার অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের পূর্বেই সাংখ্য দার্শনিক চিন্তা নির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল, ইহা ধরিয়া না লইলে উক্ত উপনিষদ্‌সমূহে এই ধারণাগুলির অস্তিত্ব ব্যাখ্যা করা যায় না। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে সাংখ্য মতবাদের প্রখ্যাত প্রতিষ্ঠাতা কপিলের যে উল্লেখ আছে, শঙ্কর উহার ঐতিহাসিক মূল্য অস্বীকার করিলেও উহা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ইহা সত্য যে প্রচলিত সাংখ্য দর্শনের বৈশিষ্ট্য নাস্তিক মতবাদ এই সকল গ্রন্থে সমর্থিত হয় নাই।

সমস্ত দর্শনগুলির মধ্যে সাংখ্যেরই ক্ষতি হইয়াছে সর্বাপেক্ষা বেশী। কপিল, তাঁহার সাক্ষাৎ শিষ্য আসুরি এবং পঞ্চশিখের সমস্ত গ্রন্থই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যে একটি মাত্র গ্রন্থ ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে, তাহা হইতেছে ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকা। কিন্তু ঈশ্বরকৃষ্ণ খৃষ্টীয় যুগের পূর্ববর্তী হইতে পারেন না। যদিও পুস্তকটির রচনাকাল সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে তবুও সাধারণ ঘটনাপঞ্জী অনুসারে উহার স্থান অনিশ্চিত নয়। কোন মতেই আমরা এই গ্রন্থকে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের পরে ফেলিতে পারি না। এই গ্রন্থের প্রাচীন টীকাগুলিও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সুতরাং গৌড়পাদের ভাষ্য ও বাচস্পতির সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীকেই ইহার প্রাচীনতম ব্যাখ্যা হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে। গৌড়পাদের জন্মকাল ও ব্যক্তিগত পরিচয় লইয়া অবশ্য মতদ্বৈধ রহিয়াছে। 'যুক্তিদীপিকা' নামক যে একখানি প্রাচীন ভাষ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে ভর্তৃহরির 'বাক্যপদীয়' হইতে উদ্ধৃতি থাকায় উহা ভর্তৃহরির পরবর্তী কালের গ্রন্থ; অপরদিকে, সম্ভবতঃ উহা কুমারিল ও ধর্মকীর্তির পূর্ববর্তী। কারণ এই দুই জনের কোন উল্লেখ উক্ত গ্রন্থে নাই। সৌভাগ্যক্রমে, 'যুক্তিদীপিকা'র আবিষ্কারের ফলে আমরা এখন বিভিন্ন সাংখ্য সম্প্রদায় সম্বন্ধে প্রাচীনতর নির্ভরযোগ্য তথ্যাদি পাইয়াছি।

পতঞ্জলির যোগসূত্রে এবং ব্যাস কর্তৃক রচিত বলিয়া কথিত ভাষ্যে সাংখ্যসম্মত তত্ত্ব ও মতগুলির প্রচুর আলোচনা রহিয়াছে। পতঞ্জলির কাল ও তাঁহার ব্যক্তিগত পরিচয় লইয়া মতভেদ আছে। খুব সম্ভব তাঁহার গ্রন্থের রচনাকাল হইতেছে খৃষ্টীয় যুগের প্রথম শতকগুলি। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের রচনা বলিয়া অনুমিত যুক্তিদীপিকা সাংখ্য দর্শনের সুদীর্ঘ বিবর্তনের ধারার উপর প্রচুর আলোকপাত করিয়াছে। ইহাতে বহু প্রাচীন লেখকের উল্লেখ রহিয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই নিজ নামানুসারে ভিন্ন ভিন্ন উপসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের বিভিন্ন মতবাদের উদ্ধৃতি বা উল্লেখও যুক্তিদীপিকাতে রহিয়াছে। বহুশতাব্দী ধরিয়া সাংখ্য দর্শনের চর্চা না চলিলে এই সকল মতভেদ অবশ্যই দেখা দিত না। মহাভারত ও গীতায় সাংখ্যসম্মত দার্শনিক চিন্তার যে বিবরণ রহিয়াছে তাহা সাংখ্য মতবাদের সুপ্রাচীনত্বের অকাট্য প্রমাণ। এতদ্‌ব্যতীত, বুদ্ধচরিত গ্রন্থে আলারা কালামের নিকট বুদ্ধ যে সাংখ্য দর্শনের শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন—তৎকালে প্রচলিত এই বিশ্বাস লিপিবদ্ধ আছে। সাংখ্যমত যে বুদ্ধের পূর্বেই বিকাশলাভ করিয়াছিল ইহা হইতেই তাহার অধিকতর সমর্থন পাওয়া যায়। এই সকল দ্ব্যর্থহীন নিশ্চিত উক্তিকে নিতান্ত কল্পকাহিনী মনে করা সমীচীন নয়। তবে প্রাচীন নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাদির অভাববশতঃ সাংখ্য চিন্তাধারার সর্বপ্রথম উদ্ভাবন কালে এবং ঈশ্বরকৃষ্ণের রচনার প্রকাশকাল পর্যন্ত মধ্যকালীন শতাব্দীগুলিতে সাংখ্য চিন্তাধারার প্রকৃত আকার ও গঠন সম্বন্ধে নিশ্চিত মতামত জ্ঞাপন করা অত্যন্ত বিপজ্জনক।

ন্যায়সূত্র এবং ব্রহ্মসূত্রে সাংখ্য দর্শনের মৌলিক মতগুলির যে বিস্তারিত সমালোচনা রহিয়াছে, তাহা সাংখ্য দর্শনের সুপ্রাচীনত্বের অতিরিক্ত প্রমাণ। এতদ্‌ব্যতীত চরকসংহিতাতেও সাংখ্য চিন্তার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতেও অনুরূপভাবে সাংখ্যমতের ব্যাখ্যা রহিয়াছে। অহির্বুধ্ন্য সংহিতাতেও প্রয়োজনানুযায়ী পরিবর্তন ও পরিবর্ধনসহ সাংখ্যমতের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়।

সুতরাং সাংখ্য দর্শনের মতগুলি যে প্রাক্‌বৌদ্ধযুগীন এইরূপ সিদ্ধান্ত করা নিতান্তই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রণীত সাংখ্যকারিকাতেই এই দর্শনের তত্ত্বগুলির যৌক্তিক ও সুবিন্যস্ত ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ইহাই আমাদের বিবৃতির প্রধান ভিত্তি হইবে। এই পুস্তকটিকে অসাধারণ বলিতে হইবে, কারণ আটষট্টি শ্লোকে ইহাতে এই দর্শনের মূল ধারণাগুলি উহাদের যৌক্তিক সমর্থনসহ সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। অবশ্য কোন কোন স্থলে ইহার ভাষা দ্ব্যর্থক এবং অস্পষ্ট। বাচস্পতির সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী ইহার একটি প্রামাণিক টীকা। যুক্তিদীপিকার

আবিষ্কারের ফলে আমাদের পক্ষে সাংখ্য বিচারের ক্রমবিবর্তনের অনেকগুলি হারানো যোগসূত্র খুঁজিয়া পাওয়া সম্ভবপর হইয়াছে। বিজ্ঞানভিক্ষুর ভাষ্যসহ সাংখ্যপ্রবচন-সূত্রও একটি বেশ মূল্যবান্ গ্রন্থ।

২। সাংখ্য দর্শনের চতুর্বিংশতি তত্ত্ব

সাংখ্য এমন দুইটি মূলতত্ত্ব স্বীকার করিয়াছে, যাহাতে চেতন ও অচেতনাত্মক সমগ্র বাস্তব জগৎ অন্তর্ভুক্ত। তত্ত্ব দুইটি পুরুষ ও প্রকৃতি। পুরুষ বলিতে স্বরূপে স্থিত আত্মাসমূহ বুঝায়। এইগুলি নিশ্চল, কূটস্থ ও শাশ্বত পদার্থ। একমাত্র শুদ্ধচৈতন্যই উহাদের স্বরূপ। শুদ্ধচৈতন্যের বিষয়ের সহিত কোন অনিবার্য সম্বন্ধ নাই। এইরূপ চৈতন্যের সহিত বিষয়ের সংসর্গ আধ্যাসিক হইতে বাধ্য। আত্মাগুলির সংখ্যা অনন্ত বলিয়া ধরা যাইতে পারে। সুতরাং পুরুষকে আত্মাদের সমষ্টিরূপে একপ্রকার বস্তু এবং প্রকৃতিকে অপর একপ্রকার বস্তু বলিয়া গ্রহণ না করিলে সাংখ্যকে দ্বৈতবাদী দর্শন বলা সম্পূর্ণ সঙ্গত হইবে না। প্রকৃতি হইতেছে সমগ্র জড় ও মানসিক ঘটনাবলীর আদিতত্ত্ব। যদিও সংখ্যায় প্রকৃতি এক, তথাপি ইহাকে কোনপ্রকারেই অমিশ্র একরস দ্রব্য বলা চলে না। ইহা "পরস্পরবিরোধী পদার্থসমূহের ঐক্য।" ইহা স্বভাব ও ক্রিয়ায় পরস্পরবিরোধী সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণদ্বারা গঠিত। সৃষ্টির পূর্বে প্রকৃতি যখন শুদ্ধ সাম্যাবস্থায় থাকে, তখন এই পারস্পরিক বিরোধ অভিভূত থাকে। প্রকৃতির স্ব-পরিপালন এবং স্বাভিব্যক্তির জন্য প্রধানতঃ সত্ত্বই দায়ী। রজ হইতেছে সর্বপ্রকার ক্রিয়া ও প্রেরণার কারণ। জড়তা ও ক্রিয়ানিরোধের জন্য তম দায়ী। জড় ও মনোজগতে এই তিন গুণের অভিব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। প্রকৃতিতে যে পরিণাম ঘটে, তাহার ক্রম যৌক্তিক অনিবার্যতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও সমর্থনযোগ্য। অভিব্যক্তির প্রক্রিয়াতে প্রকৃতি যে সকল বিভিন্ন স্তরে উপনীত হয়, তাহাদিগকে বিভিন্ন তত্ত্ব বলিয়াও মনে করা হয়। সমগ্র পরিণাম-প্রক্রিয়াটিকে সংক্ষেপে চতুর্বিংশতি তত্ত্বের অভিব্যক্তি বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে প্রকৃতি হইতেছে আদি ও মূল। ইহা এমন এক কারণ যাহার আর কারণ নাই ; এইজন্য উহাকে প্রথম মূল কারণ বলা হয়। সর্বশেষ অভিব্যক্তি, অর্থাৎ কেবল বিকৃতি হইতেছে পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এবং মন। এই আদি ও অন্ত্য তত্ত্বের মধ্যে আরও সাতটি তত্ত্ব আছে: যথা—(১) মহৎ অথবা বুদ্ধি—ইহা শুদ্ধচৈতন্যের জড়াত্মক প্রতিরূপ ও অভিব্যঞ্জক। (২) অহঙ্কার এবং (৩), (৪), (৫), (৬), (৭)—পঞ্চতন্মাত্র অর্থাৎ

সূক্ষ্মভূত। এই সাতটি তত্ত্ব প্রকৃতিও বটে আবার বিকৃতিও বটে। প্রকৃতি হইতে প্রথম বিকৃতি হইল বুদ্ধি। ইহা আবার নিজে অহঙ্কারের প্রকৃতি। অহঙ্কার একদিকে বুদ্ধির বিকৃতি এবং অপরদিকে পঞ্চ সূক্ষ্মভূতের অর্থাৎ শব্দ, বর্ণ, স্পর্শ, স্বাদ ও গন্ধের এবং একাদশ ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতি। পঞ্চ সূক্ষ্মভূত অহঙ্কারের বিকৃতি এবং পঞ্চ স্থূলভূতের (মহাভূতের) অর্থাৎ আকাশ, বায়ু, তেজ, জল এবং পৃথিবীর প্রকৃতি। এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব পুরুষের (শুদ্ধচৈতন্যের) সহিত মিলিত হইয়া পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব হয়। এই পঞ্চ-বিংশতি তত্ত্বের মধ্যে সমগ্র আধ্যাত্মিক ও জড়জগৎ অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু চৈতন্য (পুরুষ) কোন কিছুর কারণও নহে, কার্যও নহে ; সুতরাং উহা পরিণাম-প্রক্রিয়ার বাহিরে এবং উহার ব্যাপারে উদাসীন।

এখন প্রশ্ন উঠে : বিশ্বের আদি উপাদান এবং মূল কারণ রূপে প্রকৃতিতত্ত্বকে স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি ? কার্যকারণ নিয়মের অনুরোধে এই তত্ত্ব স্বীকার করা হয়। প্রতিভাত জগতের সুব্যবস্থা, নিয়ম এবং সুশৃঙ্খল কার্য অকারণে সংঘটিত ও আকস্মিক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। সর্বপ্রকার পরিবর্তনের প্রধান নিয়ামক তত্ত্ব হইতেছে কারণতা। যে স্থূল জগৎ আমরা প্রত্যক্ষ করি, তাহা নিশ্চয়ই সত্তার কোন পূর্ববর্তী অবস্থা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। কার্যকারণ সম্বন্ধের বৈশিষ্ট্য এই যে, কার্য কারণ হইতে ভিন্ন হইলেও উহাতে কারণের স্বরূপগত ধর্মগুলি থাকিতে বাধ্য। কার্যের এই সকল সাধারণ ধর্ম কারণ হইতেই আসে। কার্যের যে সকল বিশেষ ধর্মদ্বারা উহাকে কারণ হইতে পৃথক্ করা হয়, সেগুলিও কারণতা দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত।

বৈশেষিক মতে দুইটি পরমাণু মিলিত হইয়া একটি দ্ব্যণুকের উৎপত্তি হয়, এবং এইরূপ তিনটি দ্ব্যণুকের সম্মিলনে ত্র্যণুক উৎপন্ন হয়, ইত্যাদি। পরমাণু হইতে দ্ব্যণুকের পরিমাণ বেশী নয়, কিন্তু ত্র্যণুকের পরিমাণ বেশী, অর্থাৎ ত্র্যণুকের পরিমাণ দ্ব্যণুক ও উহার উপাদানীভূত পরমাণুগুলির পরিমাণ হইতে অধিক। কিন্তু স্থূলবস্তুর উৎপত্তির এই ব্যাখ্যাতে একটি গুরুতর দোষ আছে। পরমাণুগুলির কোন বিস্তার নাই ; তাহা হইলে উহা হইতে বিস্তারযুক্ত বস্তু কি করিয়া উৎপন্ন হইতে পারে ? যাহা অণু তাহা কখনও বৃহৎ হইতে পারে না। কিন্তু কারণ যদি বৃহৎ পরিমাণ হয়, তাহা হইলে উহা হইতে ক্ষুদ্রতর কার্যের উৎপত্তি হইতে পারে। কারণ, ক্ষুদ্র বৃহতের অন্তর্ভুক্ত। যাহা পূর্বেই কারণে বিদ্যমান, শুধু তাহাই ঐ কারণ হইতে পারে। আবার বিশেষ সাধারণ হইতে উৎপন্ন হইতে পারে ; কারণ, বিশেষ সাধারণের অন্তর্ভুক্ত এবং উহার বিরোধী নহে। কার্যের পরিমাণ ব্যাখ্যা করার জন্য যাহা

আবশ্যক তাহা হইতেছে কারণস্থ এমন একটি পরিমাণ যাহা কার্যের পরিমাণ হইতে ব্যাপকতর এবং বৃহত্তর ; কারণ, সর্ব বিশেষ বিশেষ পরিমাণ সাধারণ পরিমাণের অন্তর্ভুক্ত। তাই সাংখ্যের সিদ্ধান্ত এই যে, কারণ কার্য হইতে অধিক ব্যাপক হইতে বাধ্য। পরাজাতি হইতে অপরাজাতির নিগমন করা সম্ভবপর, কিন্তু ইহার বিপরীত প্রক্রিয়া সমর্থনযোগ্য নহে।

এখানে কারণতার স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা করা দরকার। বস্তুতঃ কারণতা হইতেছে সাংখ্য তত্ত্বজ্ঞানের ভিত্তি এবং কার্যকারণ নিয়মের প্রয়োগদ্বারাই সাংখ্যের বিভিন্ন তত্ত্বগুলিকে নিগমন করা হয়। ইহা সর্ববাদিসম্মত যে, কারণ ব্যতীত কোন ঘটনাই ঘটিতে পারে না। অধিকন্তু সাংখ্যমতে ইহাও বলা হয় যে, কার্য তাহার উপাদান কারণে পূর্ব হইতেই বিদ্যমান থাকে। ইহাকে সৎকার্যবাদ বলা হয়। সাংখ্য দর্শনের পরিণামবাদ কার্যকারণের এই সৎকার্যবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত।

যেহেতু কার্য উপাদান কারণের পরিণাম মাত্র এবং তজ্জন্য দ্রব্যরূপে উভয়ে অভিন্ন, সুতরাং সাংখ্য মতে কারণ এবং কার্য একই সঙ্গে থাকে। বৌদ্ধিক এবং জড়ীয় সর্বপদার্থের ত্রিতয় ধর্মের উপপত্তির জন্য ত্রিগুণের ঐক্যরূপে প্রকৃতির অস্তিত্ব অনুমান করা হয়। প্রতিভাত জগতকে কোন চরমতত্ত্বের পরিণাম বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইলে প্রথমটির স্বরূপগত ধর্মগুলি দ্বিতীয়টিতে থাকা আবশ্যক। কার্য ও কারণের স্বরূপগত অভেদ স্বীকার করিলেই এইরূপ সিদ্ধান্ত সমর্থন করা যায়। ইহাতেই কারণতা বিষয়ক সাংখ্য মতের সাতিশয় গুরুত্ব।

সাংখ্যকারণতাবাদের বিরুদ্ধে ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায় গুরুতর আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন : (১) কার্য পদার্থটি উহার উপাদানীভূত অংশসকল হইতে পৃথক্ একটি নূতন অবয়বী—উহা শুধু তাহাদের অবিন্যস্ত সমূহমাত্র নয়। (২) উৎপত্তির পূর্বে কার্য-পদার্থটিকে জানা যায় না। উহা যদি কারণ হইতে অভিন্ন হইত তাহা হইলে কারণের জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে সর্বদাই উহাও জ্ঞাত হইত। (৩) উৎপত্তির পূর্বে কার্য উহার উপাদান কারণে থাকিতে পারে না। কারণ, তাহা হইলে কার্যের জন্য কর্তার প্রযত্ন ও ক্রিয়া অনাবশ্যক হইত। সাংখ্যমতে বলা হয় যে, কর্তা শুধু অংশগুলির যথাযোগ্য বিন্যাসদ্বারা উপাদানের পরিণাম ঘটাইয়া থাকেন, কিন্তু নূতন পদার্থ সৃষ্টি করেন না। কিন্তু এই যুক্তি সাংখ্যের নিজের বিরুদ্ধেই যাইবে। যে নূতন পরিণাম পূর্বে ছিল না, তাহার উৎপাদন এবং উপাদানের পূর্ববর্তী অবিন্যস্ত অবস্থার বিনাশ স্বীকার করিলে কোন সদ্বস্তুরই বিনাশ হয় না এবং কোন অসৎবস্তুই উৎপন্ন হয় না সাংখ্যের এই মত পরিত্যাগ করিতে হয়। (৪) কার্য যদি নিজের

উৎপত্তির পূর্বেই বিদ্যমান থাকিত, তাহা হইলে প্রথমে ও শেষে অর্থাৎ কার্যোৎপত্তির পূর্বে এবং পরে কারণের অবস্থার মধ্যে কোন ভেদ থাকিত না। (৫) উৎপত্তির পূর্বে কার্যের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে অস্তিত্ব এবং উৎপত্তি এক হইয়া যাইবে। কিন্তু স্ব-বিরোধ ব্যতীত উহাদের ভেদ বিলোপ করা যায় না।

প্রথম আপত্তিটি সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, সাংখ্যমতে অবয়বী উহার উপাদান হইতে পৃথক্ কোন বস্তু নহে। যদি পৃথক্ হইত তাহা হইলে উহার অধিষ্ঠান হইতে পৃথক্রূপেই উহা প্রত্যক্ষ হইত। কিন্তু অবয়বী কখনও উহার অবয়বগুলি হইতে পৃথক্ভাবে প্রত্যক্ষ হয় না। অবয়বীকে উহার অংশগুলি হইতে ভিন্ন একটি বস্তু বলিয়া মানিলে, যাহা প্রমাণ করিতে হইবে তাহাই ধরিয়া লওয়া হয়। বলা যাইতে পারে, যেহেতু অবয়বী একটি কার্য পদার্থ, সুতরাং উহা যেমন কর্তা করণ প্রভৃতি অন্যান্য কারণ হইতে ভিন্ন, তেমনই উপাদানকারণ হইতেও ভিন্ন হইতে বাধ্য ; কিন্তু এইরূপ যুক্তি নৈরাশ্যব্যঞ্জক। কারণ, এই কথা সত্য হইলে অবয়বী যেমন উহার করণ হইতে পৃথক্ভাবে প্রত্যক্ষ হয়, তেমনিই উহার অংশগুলি হইতেও পৃথক্ভাবে প্রত্যক্ষ হওয়া উচিত। তাহা ছাড়া, অবয়বী পৃথক্বস্তুরূপেও কিভাবে তাহার অবয়বগুলিতে থাকিতে পারে তাহার কোন যুক্তিসম্মত অর্থ নিরূপণ করা অসম্ভব। অবয়বী কি উহার সর্ব অংশে একত্রভাবে সম্মিলিত হইয়া থাকে অথবা পৃথক্ পৃথক্ভাবে প্রত্যেকটি অংশে থাকে ? প্রথম বিকল্পটি সমর্থন করা যায় না। কারণ, তাহা হইলে সর্ব অবয়বের প্রত্যক্ষ ব্যতীত অবয়বীর প্রত্যক্ষ হইবে না। কিন্তু বস্তুতঃ একটি ব্যঞ্জক অংশ প্রত্যক্ষ করিয়াই আমরা অবয়বীকে প্রত্যক্ষ করিতে পারি। কোন ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ করিতে হইলে, আমরা তাহার পৃষ্ঠ অথবা অভ্যন্তর প্রত্যক্ষ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করি না। যদি মনে করা হয় যে, অবয়বী উহার প্রত্যেক অংশে নিঃশেষে এবং সম্পূর্ণভাবে অবস্থান করে, তাহা হইলে যতগুলি অবয়ব আছে ঠিক ততগুলি অবয়বীই স্বীকার করিতে হয়। এইরূপ বলা হইয়াছে যে, যখন অবয়ব সমূহের একটি বিশেষ ধরণের সম্মেলন ঘটে, তখনই অবয়বীর আবির্ভাব হয়, আবার সেই সম্মেলন বিনষ্ট হইলে অবয়বীও বিনষ্ট হইয়া যায়, যদিও অবয়বগুলি পূর্ববৎ বিদ্যমান থাকে। সুতরাং অবয়বী ইহার অবয়বগুলি হইতে ভিন্ন হইতে বাধ্য। সাংখ্যমতে এই যুক্তি চক্রক দোষে দুষ্ট। কারণ, সাংখ্য অবয়বীকে একটি সঞ্জাত বা বিনাশী অভিনব পদার্থ বলিয়া মনে করে না। সাংখ্যের মতে একটি সুশৃঙ্খল বিশেষ নিয়মে বিন্যস্ত হইলে অবয়বগুলি অবয়বীর কার্য সম্পাদন করে মাত্র। উদ্ভবের পূর্বেই কার্যের অস্তিত্ব থাকে ইহা স্বীকার করিলে, কার্যের উৎপত্তি বিষয়ে

কর্তার প্রযত্ন নিরর্থক হইয়া পড়ে—এই তৃতীয় আপত্তি খণ্ডন করিবার জন্য সাংখ্য কতকগুলি যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছে।

প্রথমতঃ, কারণের মধ্যে কার্যকে থাকিতেই হইবে, কারণ, যাহা নাই তাহা উৎপন্ন হইতে পারে না। যথাসাধ্য চেষ্টা সত্ত্বেও একটি চতুষ্কোণ বৃত্তকে উৎপন্ন হইতে কখনও দেখা যায় নাই। কার্যের সহিত উৎপাদনক্রিয়ার নিয়ত সম্বন্ধ আছে এবং কর্তা ও করণাদির ক্রিয়ার ঐ সম্বন্ধের সহিত সম্পর্ক থাকিলেই উহার সার্থকতা বুঝা যায়। কিন্তু উৎপাদনক্রিয়ার পূর্বে কার্য অবর্তমান থাকে এবং এই প্রক্রিয়ার সমাপ্তির পরই ইহার উদ্ভব ঘটে বলিয়া মনে করা হয়। এই দুয়ের মধ্যবর্তীকালে কার্যের কোন সত্তা থাকে না এবং সেইজন্য ইহার উপর কোন ক্রিয়ার প্রয়োগ হইতে পারে না। সাংখ্য এই আপত্তির নিরসন করিতে পারে। শূন্য হইতে কার্যের উৎপত্তি হয় এই কথা বলিয়া শূন্যবাদী কার্যকারণ সম্বন্ধটিকেই অস্বীকার করে। এক নির্দিষ্ট কারণ হইতে অন্য এক নির্দিষ্ট কার্যই উৎপন্ন হয়। এইরূপ নিয়তত্বই কার্যকারণসম্বন্ধের স্বভাব। অভাব যদি কার্যক্ষম হইত তাহা হইলে যেহেতু অভাব সর্বত্রই সুলভ, সুতরাং যে কোন বস্তু হইতে অন্য যে কোন বস্তু উৎপন্ন হইতে পারিত। অদ্বৈতবেদান্তী যখন বলেন যে, একমাত্র কারণই সত্য এবং কার্য হইতেছে অবভাসমাত্র তখন তিনি সমস্যাকে শুধু এড়াইয়া যান, উহার কোন সমাধান দেন না। ন্যায়-বৈশেষিকের মত এই যে, কারণ-ব্যাপারের পর কার্য অস্তিত্বলাভ করে এবং তাহার পূর্বে উহার কোন অস্তিত্বই ছিল না। ইহার বিরুদ্ধে বহু গুরুতর আপত্তি তোলা যায়। "কার্যঅস্তিত্বহীন" এই বাক্যটি অর্থহীন ; কারণ, অস্তিত্বাভাব উদ্দেশ্যের ধর্ম হইলেই উহাকে বিধেয় করা যায় ; কিন্তু ধর্ম হইতে গেলে সম্বন্ধ আবশ্যক, এবং সম্বন্ধ শুধু অস্তিত্ববান্ পদার্থের মধ্যেই সম্ভবপর। অস্তিত্বাভাবরূপ বিধেয়টি যদি উদ্দেশ্যের সহিত সম্বদ্ধ না হয়, তাহা হইলে কার্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না ; কারণ, অস্তিত্বাভাবরূপ বিধেয়টি উহার সহিত অসম্বদ্ধ। উৎপত্তির পূর্বে কার্যকে অস্তিত্ববান্ বলিয়া ধরিলে প্রশ্ন উঠে —তাহা হইলে কারণব্যাপারে কি সম্পাদিত হয় ? উত্তর এই যে, কারণব্যাপারে যাহা অব্যক্ত ছিল তাহা অভিব্যক্ত হয়। উৎপত্তি মানে অভিব্যক্তি ছাড়া অন্য কিছু নহে।

দ্বিতীয়তঃ, কোন বিশিষ্ট কার্যের জন্য বিশেষপ্রকার উপাদান বাছিয়া লইতে হয়। ইহাতেও প্রমাণিত হয় যে, উৎপত্তির পূর্বে কার্য বিদ্যমান থাকে। তৈল উৎপন্ন করার জন্য তৈলবীজই গ্রহণ করিতে হয়, বালুকণা নহে ; কারণ, তৈলবীজে তৈল অব্যক্ত-রূপে বিদ্যমান থাকে। কার্যের সহিত যাহা সম্বদ্ধ, শুধু তাহাই কারণ হইতে পারে।

কতকগুলি অংশের সাহায্যে একটি সমুদায় উৎপত্তির ব্যাপারে আমরা পূর্বেই দেখাইয়াছি যে, উক্ত সমুদায় উহার অংশসকল হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে। মূলতঃ কার্য ও কারণ পরস্পর হইতে অভিন্ন।

তৃতীয়তঃ, উৎপাদন অনিয়মিত নহে। যেহেতু কার্য উহার যোগ্য কারণের সহিত অভিন্ন অতএব উহা হইতে ভিন্ন কোন পদার্থ উৎপন্ন হইতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, বস্ত্র যেমন বয়নযন্ত্র হইতে ভিন্ন, সেইরূপ যদি তন্তু হইতেও ভিন্ন হইত, তাহা হইলে উহা তন্তুগুলির সজাতীয় হইত না এবং উহার আশ্রয় যেমন বয়নযন্ত্র হইতে ভিন্ন, তেমনই তন্তু হইতেও ভিন্ন হইত। সুতরাং কার্য ও কারণের সম্বন্ধ অভেদ ব্যতীত অন্য কিছু হইতে পারে না। এইভাবে ন্যায়-বৈশেষিকের প্রথম আপত্তিটির নিরসন করা যায়।

উৎপত্তির পূর্বে কার্যের উপলব্ধি হয় না বলিয়া তখন উহার অস্তিত্ব থাকে না, ন্যায়-বৈশেষিকের এই দ্বিতীয় আপত্তি সম্বন্ধে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, অনুপলব্ধি অনস্তিত্বের যোগ্য হেতু নহে। উহা অনভিব্যক্ত ছিল বলিয়াই উপলব্ধ হয় নাই। কারণ ব্যাপার শুধু উহাকে অভিব্যক্ত করে।

ন্যায়-বৈশেষিকের তৃতীয় আপত্তিটি এই যে, পরিণাম ও অভিব্যক্তির উৎপত্তি স্বীকার করিলে নূতন পদার্থের উৎপত্তিই স্বীকার করা হয়। সাংখ্যমতে এই পরিণামের স্বরূপসম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণাই এই আপত্তির জনক। পরিণাম বলিতে প্রাগস্তিত্ববান্ ধর্মের নাশ অথবা প্রাগস্তিত্ববিহীন ধর্মের উৎপত্তি বুঝায় না। পরিণামের অর্থ অব্যক্তরূপে বিদ্যমান ধর্মের অভিব্যক্তি এবং নাশের অর্থ অভিব্যক্ত ধর্মের পুনরায় অনভিব্যক্ত অবস্থা প্রাপ্তি। সুতরাং এই আপত্তি বিচারসহ নহে। কার্যোৎপত্তির জন্য উপাদানের যে নূতন বিন্যাস করিতে হয়, তাহা কারণপদার্থেরই ধর্ম বলিয়া উহা হইতে ভিন্ন কিছু নহে। অবশ্য সাংখ্য অস্তিত্ব ও উৎপত্তির ব্যবহারিক ভেদ অস্বীকার করে না। উৎপত্তি বলিতে শুধু অব্যক্ত পদার্থের অভিব্যক্তি বুঝায় এবং যেহেতু এই অভিব্যক্তি উক্ত পদার্থের সহিত অভিন্ন অতএব উহা কোন সম্পূর্ণ নূতন ঘটনার সৃষ্টি বুঝায় না।

চতুর্থতঃ, কার্যকারণ সম্বন্ধ মানিলে ইহাও মানিতে হয় যে, কারণের মধ্যে বিশিষ্ট একপ্রকার কার্য উৎপন্ন করিবার একটি বিশিষ্ট শক্তি থাকে। যাহা উৎপন্ন হইবে তাহার সহিত যদি এই শক্তির একটি সম্বন্ধ থাকে, শুধু তাহা হইলেই এই শক্তি সক্রিয় হইতে পারে। ইহার অর্থ এই যে, কারণের মধ্যে কার্য বীজরূপে বিদ্যমান থাকে। শক্তির ধারণার সহিত উহার আশ্রয় এবং বিষয়ের ধারণা ও অনিবার্যভাবে সম্বন্ধ

থাকে। কিন্তু কারণরূপে আশ্রয়টি পূর্ব হইতেই অস্তিত্ববান্। প্রশ্ন হইতেছে, কার্যরূপে বিষয়টিও কি পূর্ব হইতে অস্তিত্ববান্ অথবা অস্তিত্ববান্ নহে? কিন্তু শক্তি বলিতে একটি দ্বিমুখ পদার্থ বুঝায়। অপর সম্বন্ধীটির অভাবে এই শক্তি পদার্থ অস্তিত্ববান্ এবং সক্রিয় হইতে পারে না। শক্তির বিষয় অবিদ্যমান হইলে কারণের শক্তি উহার উপর কি ভাবে ক্রিয়া করিবে? যদি কারণের শক্তি অবিদ্যমান বিষয়ের উপর ক্রিয়া করিতে পারিত, তাহা হইলে যে কোন বস্তুর উৎপত্তি সম্বন্ধেই অব্যবস্থিততা দোষ পরিহার করা যাইত না।

পঞ্চমতঃ, কারণে কার্য আছে শুধু এই কথা ধরিয়া লইলেই কারণতা সম্ভবপর। যাহা অ-বস্তু তাহার কারণের কোন আবশ্যকতা নাই। দুইটি অ-বস্তুর মধ্যে কোন স্বরূপগত ভেদ বাহির করা কঠিন। বস্তু যদি চতুষ্কোণ বৃত্তের মত নিজ কারণে না থাকিত, তাহা হইলে প্রথমটির উৎপত্তি হয় এবং দ্বিতীয়টির হয় না ইহার ব্যাখ্যা দেওয়া অসম্ভব হইত। এক অ-বস্তু হইতে অন্য অ-বস্তুকে যদি স্বরূপতঃ পৃথক্ করা যাইত, তাহা হইলে হয়ত উহার ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভবপর হইত। কিন্তু অবস্তুতে গুণ, ক্রিয়া অথবা জাতির আকারে এইরূপ স্বরূপগত ভেদ স্বীকার করা অসম্ভব। সাংখ্য স্বীয় মত সমর্থনের জন্য যে সকল বিভিন্ন যুক্তি দিয়াছেন উহাদের সকলগুলিই সাংখ্যের এই মূল সিদ্ধান্তের যুক্তিসম্মত অনুসিদ্ধান্তমাত্র যে, কার্য ও কারণ দ্রব্যরূপে এক। এই মূল সিদ্ধান্তের সমর্থনে অনেক সুযুক্তি আছে। যে অধিকরণে উপাদান কারন নাই সেখানে কার্য থাকিতে পারে না এই অর্থে কার্য হইতেছে উপাদান কারণের একটি ধর্ম। কিন্তু এই ধর্ম-ধর্মী সম্বন্ধ বিভিন্ন দ্রব্যের মধ্যে থাকিতে পারে না। গরু ঘোড়ার ধর্ম নহে, সুতরাং কার্য ও কারণের মধ্যে এই যে ধর্ম-ধর্মীভাব আছে, তাহাতে প্রমাণিত হয় যে উহারা পরস্পর হইতে ভিন্ন নহে এবং তজ্জন্য উহারা পরস্পরের সহিত অভিন্ন হইতে বাধ্য। এমন কি উপাদানও পরিণামের সম্বন্ধ দুইটি বিভিন্ন পদার্থের মধ্যে থাকিতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, ঘট ও বস্ত্রের মধ্যে এইরূপ সম্বন্ধ নাই। তন্তু এবং বস্ত্রের মধ্যে যে উপাদান ও কার্যের সম্বন্ধ আছে তাহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, উহারা পরস্পর হইতে ভিন্ন নহে। অপর একটি মূল্যবান যুক্তিদ্বারাও এই মত সমর্থন করা যায়। কার্যরূপে কোনও অবয়বী যদি উহার উপাদানীভূত অংশগুলি হইতে ভিন্নদ্রব্য হইত, তাহা হইলে উহাদের ওজন বিভিন্ন হইত। কিন্তু, কার্য পদার্থের (যথা বস্ত্রের) ওজন উহার উপাদানীভূত তন্তুগুলির ওজন হইতে অল্প বা অধিক বলিয়া লক্ষিত হয় না।

কার্য ও কারণের মধ্যে উৎপাদকশক্তি, নাম, উৎপত্তি এবং ধ্বংস এই সকল

ব্যাপারে যে ভিন্নতা আছে তাহাতে কার্য ও কারণের আত্যন্তিক প্রভেদ প্রমাণিত হয় না। একটি বাস্তব উদাহরণ দ্বারা এই কথার সত্যতা স্পষ্ট হইবে। কচ্ছপ তাহার বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রসারণ করে আবার নিজের শরীরের মধ্যে প্রত্যাহরণ করে। এই সম্প্রসারণ ও সঙ্কোচন উৎপত্তি ও ধ্বংসের প্রতীক। একই স্বর্ণখণ্ড হইতে বিভিন্ন অলঙ্কারের উৎপত্তি এবং উহাতেই তাহাদের বিলয়কে বরং সম্প্রসারণ ও সঙ্কোচন অথবা ব্যক্তাবস্থা ও অব্যক্তাবস্থা বলা ঠিক হইবে। এই উদাহরণগুলি কার্য-কারণ সম্বন্ধের নিদর্শনস্বরূপ। ইহাদের দ্বারা বুঝা যায় যে, পূর্বে অসৎ ছিল এইরূপ সম্পূর্ণ কোন নূতন পদার্থের উৎপত্তি হয় না এবং কোন বিদ্যমান বস্তুর ধ্বংসও হয় না। মৃত্তিকা ও ঘটের মধ্যে উৎপাদকশক্তির ব্যাপারে যে পার্থক্য আছে তাহাও উহাদের ভেদানুমিতির হেতু হইতে পারে না। যদিও এক ব্যক্তি নিপুণভাবে পথপ্রদর্শকের কাজ করিতে পারে তথাপি খাট বহন করিতে পারে না। কিন্তু তাহার মত একাধিক ব্যক্তি খটিটি বহন করিতে সমর্থ। তেমনই একটি তন্তু উত্তরীয়ের কাজ করিতে পারে না, কিন্তু বহু তন্তু মিলিতভাবে বস্তুতঃই এই উদ্দেশ্য সাধন করে। সুতরাং কারণের শক্তি ও ব্যাপারের পার্থক্য কার্য ও কারণের ভেদের সপক্ষে যুক্তি নহে।

প্রকৃতি: প্রকৃতি হইতেছে জাগতিক সুশৃঙ্খল সমগ্র প্রবাহের চরম উপাদান কারণ এবং মূল। আমরা দেখিতে পাই যে, বিভিন্ন ঘটনাবলী উৎপন্ন হয়, বিনষ্ট হয়, পরিমিত স্থান অধিকার করে, একস্থান হইতে অপরস্থানে গমন করে, স্থিতি ও ক্রিয়ার জন্য অন্যের উপর নির্ভর করে। কিন্তু এই সকলের কারণ থাকিতে বাধ্য। আমরা দেখিয়াছি যে কার্য অপেক্ষা কারণ পরিমাণে ও ব্যাপকতায় অধিক না হইয়া পারে না। এক বিশিষ্ট ব্যক্তি অন্য এক বিশিষ্ট ব্যক্তি হইতে পারে না। প্রথমে আমরা স্থূল জড় বস্তু সকলের কথা বিচার করিব। এইগুলি পাঁচটি স্থূল ভূতের শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়া থাকে। কিন্তু ইহাদের এমন কারণ খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে যাহা উহাদের তুলনায় অল্প বৈশিষ্ট্যযুক্ত এবং অধিক ব্যাপক। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, পঞ্চ স্থূলভূতের কারণ হইতেছে পঞ্চ সূক্ষ্মভূত, এবং ইহাদিগকে পঞ্চ তন্মাত্র বলা হয়। একাদশ ইন্দ্রিয় সহ এই পঞ্চভূত অহঙ্কার হইতে, অহঙ্কার বুদ্ধি হইতে এবং বুদ্ধি প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হয়। আমরা বলিয়াছি প্রকৃতি হইতেছে সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণের একটি মিশ্র ঐক্য। সত্ত্বের ধর্ম লঘুত্ব ও প্রকাশ। ইহা পদার্থসমূহের লঘুত্বের কারণ এবং উহা জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিতে থাকাতে উহারা তাহাদের বিষয়গ্রহণে যোগ্য ও পটু হয়। রজের ধর্ম হইতেছে ক্রিয়া। উহা সর্বপ্রকার গতির কারণ। ইহার

সাহায্য ব্যতীত সত্ত্ব ও তম কোন কার্যই করিতে পারিত না। ইহার দরুণই সর্বক্রিয়া, আভ্যন্তর পরিবর্তন ও বাহ্যগতি সম্ভবপর হয়। তমের ধর্ম গুরুত্ব ও প্রতিবন্ধকতা। ইহা জড়বস্তুর গুরুত্বের এবং ইন্দ্রিয় সকলের জড়তার কারণ। সত্ত্বের ফল যেমন প্রকাশ তেমনই তমের ফল হইতেছে অস্পষ্টতা বা আবরণ। ভৌতিক অথবা মানসিক সর্বপ্রকার বস্তুতেই উহাদের স্বাভাবিক বিরোধসত্ত্বেও এই তিনটি গুণকেই পরস্পরের সহিত সহযোগিতা করিতে দেখা যায়। সলিতা, শিখা ও তৈল মিলিয়া যেমন আলোক উৎপন্ন করে তেমনই প্রকৃতির পরিণামে প্রবাহের সর্বত্রই উহারা পরস্পরের সহিত সর্বদা সহযোগিতা করে। বিভিন্ন প্রকারে এবং মাত্রায় একের প্রাধান্য এবং অন্য দুইটির অপ্রাধান্য বশতঃ অনন্ত জটিলতা বিশিষ্ট অসংখ্য ও বিভিন্ন ঘটনাবলী উৎপন্ন হয়। কিন্তু এই সমগ্র সৃষ্টি প্রবাহ একটি অচেতন উদ্দেশ্যদ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সৃষ্টির উদ্দেশ্য হইতেছে জীবের ভোগ অথবা মোক্ষ সৃষ্টির প্রত্যেক স্তরেরই উদ্দেশ্য আছে। অবশ্য প্রকৃতি ইহার সম্বন্ধে সচেতন নহে।

এইক্ষণে আমরা এই অভিব্যক্তির বিভিন্ন স্তরগুলির যুক্তিসম্মত অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করিব।

পরিণাম : প্রকৃতির প্রথম বিকার হইতেছে 'মহৎ' অর্থাৎ 'বৃহৎ'। ইহাকে বুদ্ধিও বলা হয়। ইহাকে মহৎ বলার কারণ এই যে, বিকারগুলির মধ্যে ইহারই দৈশিক এবং কালিক পরিমাণ সর্বাপেক্ষা অধিক। অদ্ভুত শুনাইলেও সাংখ্যের মতে বুদ্ধি, মনন, অনুভূতি সঙ্কল্প এবং অন্য সকল মানসিক অবস্থাই প্রকৃতির বিকার। স্থূল জড় পদার্থ হইতে ইহাদের পার্থক্য শুধু এই ব্যাপারে যে উহারা অধিক সূক্ষ্ম ও বিশুদ্ধ পদার্থদ্বারা গঠিত। প্রকৃতি হইতেছে পরস্পরবিরোধী তিনশক্তি বা তত্ত্বের সাম্যাবস্থা। ব্যাস-ভাষ্যে এইরূপ বলা হইয়াছে যে, সৃষ্টির উদ্দেশ্যের কথা বিবেচনা করিলে (যেহেতু এই সাম্যাবস্থায় কোন পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় না, অতএব) উহাকে প্রায় অস্তিত্বহীন বলা যাইতে পারে।[২] ইহা অব্যক্ত ও প্রত্যক্ষাতীত। কিন্তু যেহেতু সাংখ্যের মতে বিশিষ্ট কার্যের কারণ অবিশিষ্ট অতএব কারণতা সম্বন্ধে সাংখ্যের মত গ্রহণ করিলে সৃষ্টির মূল রূপে প্রকৃতির অস্তিত্ব না মানিয়া উপায় নাই। সর্ব কারণের যে কারণ তাহা সর্ব বিশেষ বর্জিত হইতে বাধ্য এবং উহাকে শুদ্ধসত্তা বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে শুদ্ধসত্তা অশুদ্ধ সত্তার ন্যায়ই ধারণা ও কল্পনার অযোগ্য। সেইজন্য সাংখ্যকার কেবল নেতি নেতি রূপেই প্রকৃতির বর্ণনা দিয়াছেন।

মূল প্রকৃতি উহার উপাদানীভূত গুণসমূহের সম্পূর্ণ সাম্যাবস্থাবিশিষ্ট এবং যদিও

উহার স্বভাববশতঃ উহা সদাই পরিবর্তনশীল, তথাপি এই পরিণাম সদৃশ বিকার হইতে সদৃশ বিকারেই ঘটে। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, এই সম্পূর্ণ সাম্যাবস্থাবিশিষ্ট প্রকৃতি প্রায় অস্তিত্বহীন, কারণ উহার দ্বারা কোন পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় না। প্রকৃতির অন্তঃস্থ এই উদ্দেশ্যাভিমুখী প্রবণতা দুই সৃষ্টির মধ্যবর্তীকালে সাময়িকভাবে বদ্ধাবস্থায় থাকে, কিন্তু পরে ইহা মুক্ত হয় এবং সাম্যাবস্থায় বিক্ষোভ দেখা দেয়। বিক্ষোভের অর্থ কোন একটি গুণের অন্যান্য গুণের উপর প্রাধান্য। প্রথম বিকার মহতের বৈশিষ্ট্য হইতেছে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য। ইহা হইতেছে সর্বাপেক্ষা উচ্চ (আদি) ও অমিশ্র অস্তিত্ববান্ পদার্থ। পরিণাম বা বিকৃতি হইতেছে অমিশ্র হইতে মিশ্রে, সাধারণ হইতে বিশেষে, অনির্দিষ্ট হইতে নির্দিষ্টে রূপান্তর; এবং ইহার স্বভাব সর্বাপেক্ষা ব্যাপক বলিয়াই সম্ভবতঃ উহাকে পরিণাম প্রক্রিয়ার আদিতে রাখা হইয়াছে। ইহা হইতেছে বিশুদ্ধ বুদ্ধি এবং উহা বিশ্বব্যাপী বলিয়া সব সসীম বুদ্ধি উহার অন্তর্গত। সসীম বুদ্ধি এবং বিশুদ্ধ বুদ্ধির মধ্যে এইটুকু পার্থক্য আছে যে, প্রথমটির বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ আছে, কিন্তু দ্বিতীয়টির সেইরূপ কোন সম্বন্ধ নাই, কারণ উহা গ্রহণ করিতে পারে এমন কোন বিষয়ই নাই। দ্বিতীয় বিকার হইতেছে অহঙ্কার অথবা অহং-বোধ। ইহার ক্ষেত্র অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ, কারণ অহম্-এর সহিত ইহার সম্বন্ধ আছে কিন্তু মহৎ ঐরূপ কোন সম্বন্ধদ্বারা অবচ্ছিন্ন নহে। প্রত্যেক বস্তুই ইহার সম্ভাব্য বিষয়। সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টি হইতে বলা যায় যে, প্রত্যক্ষ-জগৎ উৎপন্ন হওয়ার পূর্বেও উহাকে অহঙ্কারের বিষয় করার সম্ভাবনা বীজরূপে বিদ্যমান থাকে। অহঙ্কার হইতে আন্তর ও বাহ্য এই দুইটি সমান্তরাল বিকার-ধারা উৎপন্ন হয়। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এবং মন প্রথমটির অন্তর্গত। মনের স্বভাব দ্বিবিধ। কারণ জ্ঞান ও কৃতি উভয়েই মনের দ্বারা জনিত। বাহ্য বিকার ধারার মধ্যে পঞ্চ সূক্ষ্মভূত অন্তর্ভুক্ত। আন্তর বিকার-ধারা মহতের সত্ত্বাংশ হইতে এবং বাহ্য বিকার-ধারা উহার তম-অংশ হইতে নিঃসৃত হয়। আর রজ অংশের কার্য হইতেছে এই দুইটি গুণকে সক্রিয় করা। উহাদের প্রত্যেকটিতে অহঙ্কার অনুস্যূত থাকে বলিয়া ইহা যুক্তিসিদ্ধ যে এই সকল বিকার অহঙ্কার হইতে উদ্ভূত হয়। বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গুলি অহম্-এর প্রয়োজন সিদ্ধির উপায় এবং আত্মসাৎ করার প্রবৃত্তির চরিতার্থতার জন্য বাহ্য বিষয়গুলি আবশ্যক। বাহ্য বিষয়গুলি হইতেছে অহম্-এর সম্পত্তি এবং অহম্ হইতেছে উহাদের স্বামী। ইন্দ্রিয় এবং বিষয়ের সহিত অহম্-এর যে তাদাত্ম্য ঘটে তাহাতে অহঙ্কারের উহাদের মধ্যে অনুস্যূততা স্পষ্টভাবে অনুভূত হয়। এই জন্যই ইন্দ্রিয় এবং বিষয়ের অবস্থাদ্বারা অহং প্রভাবিত হয়।

উদাহরণস্বরূপ, চক্ষু নষ্ট হইলে অহম্ মনে করে যে উহা অন্ধ এবং জড়বস্তুসকল উহার আয়ত্তে থাকিলে অথবা না থাকিলে উহা নিজেকে ধনী অথবা দরিদ্র বলিয়া মনে করে। সূক্ষ্মভূত হইতে স্থূলভূতের উৎপত্তিতে যৌক্তিক অনিবার্যতা আছে। কারণ, কেবল স্থূল বস্তুই অহম্-এর কাজে লাগিতে পারে। ইহা স্পষ্ট যে ইন্দ্রিয়গুলি অহঙ্কারেরই বিশিষ্ট রূপ; কারণ, ইন্দ্রিয়গুলির সম্বন্ধ বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রের সহিত, কিন্তু অহঙ্কারের সম্বন্ধ উহাদের সকলের সহিত।

লক্ষ্য করিতে হইবে যে, সাংখ্যের তত্ত্বগুলিকে মূল প্রকৃতি হইতে যুক্তিসম্মত প্রণালীতে নিগমন করা হয়। এখানে বিশেষকে সাধারণ হইতে নিগমন করা হয় এবং অবরোহাত্মক যুক্তিতেও তাহাই করা হয়। সাংখ্য অভিব্যক্তিবাদের অপর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, জ্ঞাতৃগত ও বিষয়গত উভয়প্রকার তত্ত্বগুলিকে একই তত্ত্ব হইতে নিগমন করা হয়। উচ্চ-নীচ তত্ত্বগুলির অভিব্যক্তিতে জ্ঞাতৃগত তত্ত্বগুলিকে মহৎ বা বিশুদ্ধ বুদ্ধি এবং অহঙ্কারকে বিষয়গত তত্ত্বগুলি (যথা সূক্ষ্ম ও স্থূলভূত সকল) অপেক্ষা উচ্চস্থান দেওয়া হইয়াছে—ইহা যৌক্তিক অনিবার্যতাদ্বারা নিয়ন্ত্রিত বলিয়া মনে হয়। জ্ঞাতৃগত তত্ত্বগুলির বিষয়ের সহিত একটি অবশ্যম্ভব সম্বন্ধ আছে। সুতরাং এই প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য বিষয় সকলের অস্তিত্ব অত্যাবশ্যক। জগৎ-ব্যবস্থায় জ্ঞাতৃগত এবং বিষয়গত উভয় দিকই রহিয়াছে।

পরিশেষে লক্ষ্য করা যাইতে পারে যে, এই অভিব্যক্তি পূর্বাপরক্রমে ঘটিলেও উহাতে একটি অবিচ্ছেদ্যতা রহিয়াছে। পূর্ববর্তী তত্ত্ব পরবর্তী তত্ত্বের মধ্যে অনুস্যূত এবং সংগৃহীত থাকে। পূর্ববর্তী স্তর পরবর্তী স্তরে বিলুপ্ত হইয়া যায় না। বিভিন্ন প্রকার তত্ত্বান্তর ঘটিলেও সর্বতত্ত্বের অভ্যন্তরে একই সর্বব্যাপী মূল প্রকৃতি প্রবাহিত। প্রত্যেক স্তরই প্রকৃতির ত্রিগুণে গুণান্বিত। অভিব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন সর্বস্তরে এই সাধারণ সূত্রের অস্তিত্ব বশতঃ উহাদিগকে যুক্তিশাস্ত্রীয় পদ্ধতিতে একই সাধারণতত্ত্বের কার্য বলিয়া প্রদর্শন করা সম্ভবপর।

বন্ধন ও মুক্তি : বুদ্ধিও অহঙ্কারের সহিত তাদাত্ম্য হইতে আত্মার বন্ধন উৎপন্ন হয়। বুদ্ধিতে শুদ্ধচৈতন্যের প্রতিবিম্ব পড়িলে এবং তজ্জন্য বুদ্ধি হইতে চৈতন্য নিজেকে পৃথক করিতে না পারিলে এই তাদাত্ম্য উৎপন্ন হয়। এই ভেদাগ্রহের ফল হইতেছে উভয়ের তাদাত্ম্য, এবং এই তাদাত্ম্য ক্রমে ক্রমে পরবর্তী বিকারগুলির সহিত শুদ্ধ আত্মার তাদাত্ম্য, ঘটায়। এইজন্য যদিও বিশুদ্ধ চৈতন্য নিজ স্বরূপে মুক্ত এবং দুঃখ, পাপ এবং নৈতিক ও বৌদ্ধিক দোষ বর্জিত তথাপি উহা নিজেকে এই সকল বন্ধনের অধীন বলিয়া অনুভব করে।

এই সকল বন্ধন ও দোষের সংক্ষিপ্ত রূপ হইতেছে দুঃখ এবং এই দুঃখের অস্তিত্ববশতঃ আত্মা এই দুঃখজাল হইতে উদ্ধারের উপায় চিন্তা করে। এই জন্যই তত্ত্বজ্ঞান আবশ্যক। শুদ্ধ চৈতন্যরূপে জ্ঞাতা স্বভাবতঃ দুঃখ ও ক্লেশের সর্ব-স্পর্শ হইতে মুক্ত—যখন এইরূপ যুক্তিসিদ্ধ ও সক্রিয় বিশ্বাস উৎপন্ন হয়, তখন উহাই পরিশেষে মুক্তির কারণ হয়। আত্মা অনাত্মা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং অনাত্মার প্রভাববর্জিত এইরূপ বিবেকজ্ঞানদ্বারা মুক্তিলাভ হয়। কিন্তু ইহা সহজ-সাধ্য নহে। ইহার জন্য বিচারজনিত বিশ্বাস পরিপক হইয়া পরিশেষে সত্যের সাক্ষাৎ অনুভূতিতে পরিণত হওয়া আবশ্যক। আবার ইহার জন্য দীর্ঘকাল নৈতিক সাধনার প্রয়োজন। প্রথমে ইহার জন্য সম্মান, অর্থ, পদ এবং ক্ষমতা প্রভৃতি জগতের লোভনীয় পদার্থগুলির প্রতি আসক্তি বর্জন করা আবশ্যক। এই উদ্দেশ্যে যোগসাধনা বিহিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা আত্মা নিজের স্বাধীনতাবোধ পুনরায় প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হয়।

পুরুষ ঃ শুদ্ধ-জ্ঞানাত্মক কূটস্থ ও নিত্য চৈতন্যরূপ পুরুষের অস্তিত্ব লৌকিক অনুভবের বিষয় নহে। ইহার কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যগুণ না থাকায় কোন বহিরিন্দ্রিয়-দ্বারা উহার প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। অন্তরিন্দ্রিয়দ্বারাও ইহাকে প্রত্যক্ষ করা যায় না কারণ, মানসপ্রত্যক্ষের বিষয়মাত্রই সুখ-দুঃখের বেদনাযুক্ত বলিয়া সর্বদাই ত্রিগুণের বিকার।

কিন্তু সাংখ্যে এই যুক্তি দেওয়া হয় যে, সমুদায় এবং মিশ্র পদার্থসমূহ পরার্থ, অর্থাৎ অন্যের উদ্দেশ্য সাধন করে। আবার, প্রকৃতিও উহার সর্ববিকার ত্রিগুণের জটিল সমুদায়, অতএব উহারা নিশ্চয়ই অন্য কোন তত্ত্বের উদ্দেশ্য সাধন করে। শয্যা, আসন, আসবাবপত্র প্রভৃতি বিভিন্ন উপাদানদ্বারা গঠিত মিশ্র পদার্থ এবং উহাদের অস্তিত্ব যে উহাদের নিজেদের জন্য নহে তাহা সাধারণ অনুভবের বিষয়। ইহাদের অস্তিত্ব অনিবার্যভাবে কোন প্রয়োজনসিদ্ধির জন্যই। সুতরাং সমগ্র জড় ও মনোজগৎ সম্বন্ধেই বলা যাইতে পারে যে, উহাদের অস্তিত্ব উহাদের নিজেদের জন্য নহে। যে অন্য তত্ত্বের জন্য উহাদের অস্তিত্ব এবং ক্রিয়া, অন্তিম বিশ্লেষণে তাহা কোন অমিশ্র চেতনাপদার্থ হইতে বাধ্য। যদিও লৌকিক অনুভবে আমরা এইরূপ বিশুদ্ধ চৈতন্যকে জানিনা তথাপি ইহার অস্তিত্ব অবশ্যস্বীকার্য ; কারণ যদি এইরূপ কোন অমিশ্র বস্তু না থাকিত, তাহা হইলে মিশ্রবস্তু কাহার জন্য এই প্রশ্নের কোন অবধি থাকিত না। অমিশ্রবস্তু অস্বীকার করিলে যে অনবস্থা উৎপন্ন হয়, তাহাদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইহা অস্বীকার করা একান্তই অযৌক্তিক।

সাংখ্যের দ্বিতীয় যুক্তি হইতেছে প্রথম যুক্তিটিরই একটি অনুসিদ্ধান্ত। যেহেতু প্রকৃতি হইতেছে ত্রিগুণের সমুদায়, অতএব উহার বিরুদ্ধধর্মী কোন অমিশ্র বস্তু থাকিতে বাধ্য। প্রথম যুক্তিতে আমরা দেখিয়াছি যে, কোন মিশ্রপদার্থের জন্য একটি অমিশ্র বস্তু অবশ্যস্বীকার্য; সুতরাং উহাদের পরস্পরবিরোধিতা সুস্পষ্ট। তৃতীয় যুক্তি এই যে, সর্ব-অচেতন বস্তুর কোন চেতন নিয়ন্তা থাকিতে বাধ্য এবং শেষ পর্যন্ত উহাকে শুদ্ধচৈতন্য বলিয়া মানিতে হইবে। চতুর্থ যুক্তি এই যে, অচেতন বস্তুজগৎ উহার অনন্ত পরিবর্তন ও জটিলতাসহ কাহারও দ্বারা অনুভূত হইতে বাধ্য। এই অনুভবিতা বিশুদ্ধচৈতন্য না হইয়া পারে না।

সর্বশেষ যুক্তি এই যে, মুক্তির জন্য প্রযত্ন আমাদের অনুভবের বিষয়। অন্তহীন সংসারচক্র হইতে উদ্ধার পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রত্যেক আধ্যাত্মিক উন্নতিকামী ব্যক্তিই অনুভব করেন। এই আকাঙ্ক্ষা মুক্তির সম্ভাবনার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। কারণ, ইহাকে নিসর্গের একটি কপট প্রতারণা বলিয়া অগ্রাহ্য করা চলে না। কিন্তু মুক্তির জন্য প্রযত্ন কেবল প্রকৃতির পক্ষেই সম্ভবপর। তথাপি দুঃখ ও অপূর্ণতা হইতে পরিত্রাণ এবং মোক্ষ প্রকৃতির পক্ষে সম্ভবপর নহে। এই সকল অপূর্ণতা প্রকৃতির স্বরূপের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ; সুতরাং মোক্ষের আবশ্যকতাদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যাহার মোক্ষ হইতে পারে এমন কোন চেতন বস্তু থাকিতে বাধ্য।

এই সকল যুক্তি উদ্দেশ্যকারণতার উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃতির ক্রিয়া দ্বিবিধ উদ্দেশ্য সাধন করে। প্রথমতঃ, অন্তঃকরণদ্বারা পুরুষ যাহাতে এই বিচিত্র সংসারকে ভোগ করিতে পারে এবং দ্বিতীয়তঃ পুরুষ যাহাতে মুক্ত হইতে পারে প্রকৃতি ঐ উদ্দেশ্যে কাজ করে। ইহাই পরিণাম-প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য-কারণমূলক ব্যাখ্যা। শুধু শুদ্ধচৈতন্যের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেই এই উদ্দেশ্য অর্থপূর্ণ এবং সাধিত হইতে পারে, এই কথার উপর পূর্বোক্ত যুক্তিগুলি বিশেষ জোর দিয়াছে।

সাংখ্য অনন্তসংখ্যক পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করে। মনে হয় যে, এই পরম্পরাগত মতটিকে ধর্মবিশ্বাসের অঙ্গরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহার সমর্থনে যে সকল যুক্তি দেওয়া হইয়াছে তর্কবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সেগুলি দুর্বল এবং অপ্রত্যয়কারী। এই যুক্তিগুলির বিষয় হইতেছে বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্য, সাংখ্যসম্মত শুদ্ধচৈতন্যের প্রতি এগুলি প্রযোজ্য নহে। প্রত্যেক জীবের জন্ম ও মৃত্যু যে পৃথক্‌ভাবে নির্দিষ্ট আছে, এবং প্রত্যেকের ইন্দ্রিয় এবং তাহাদের ক্রিয়ার মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তাহা বিভিন্ন পুরুষের অস্তিত্ব প্রমাণ করে বলিয়া মনে করা হয়। পুরুষ যদি বহু না হইত তাহা হইলে এক ব্যক্তির জন্মে সকলের জন্ম এবং

এক ব্যক্তির মৃত্যুতে সকলের মৃত্যু হইত। যদি ইন্দ্রিয়গুলি একই পুরুষের না হইত তাহা হইলে তাহাদের বিভিন্ন ক্রিয়া অসম্ভব হইত। এক ব্যক্তির দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইলে সকল ব্যক্তিই অন্ধ হইয়া যাইত। কিন্তু ইহা বাস্তব ঘটনার বিরোধী। দ্বিতীয়তঃ, সমস্ত দেহে যে একই সময়ে ক্রিয়া হয় না তাহাতেই প্রমাণিত হয় যে, মন ও জড়বস্তুদ্বারা গঠিত বিভিন্ন দেহে পৃথক্ পৃথক্ পুরুষ আছে। তৃতীয়তঃ, বিভিন্ন ব্যক্তির বৌদ্ধিক ও নৈতিক গুণাবলীর বিভিন্নতা হইতেও প্রমাণিত হয় যে, তাহারা বিভিন্ন পুরুষকে আশ্রয় করিয়া থাকে।

এই সকল যুক্তির বিশ্বাসোৎপাদনক্ষমতা এবং তার্কিক মূল্য অত্যন্ত অল্প। জন্ম এবং মৃত্যু, ইন্দ্রিয়সমূহের অস্তিত্ব এবং বুদ্ধিগত ও নৈতিকশক্তির তারতম্য প্রকৃতি এবং ইহার বিভিন্ন বিকারগুলিতেই ঘটিয়া থাকে। শুদ্ধচৈতন্যের সহিত ইহাদের কোন সংস্পর্শ নাই। সুতরাং এই সকল ব্যাপার হইতে যে পুরুষের সহিত তাহাদের কোন সম্বন্ধ নাই তাহার বহুত্ব অনুমান করা যায় না।

পুরুষগুলির সহিত প্রকৃতির কোন সম্বন্ধ হইতে পারে কিনা তাহাই সাংখ্য দর্শনের সর্বাপেক্ষা কঠিন সমস্যা। ইহাকে সংযোগসম্বন্ধ বলিয়া মনে করা যায় না। কারণ, সমান্তরাল বস্তু হিসাবে পুরুষ ও প্রকৃতির নিত্য অস্তিত্ব থাকিলে এই সংযোগ অনিবার্য এবং অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে পরিণত হইবে। এই সংযোগ সম্বন্ধ থাকার জন্য যদি বন্ধনদশার উদ্ভব হয়, তাহা হইলে উহা হইতে মুক্তির কোন উপায় থাকিবে না। সুতরাং এই সম্বন্ধ অবশ্যই অন্যপ্রকার হইবে। বস্তুতঃ, বুদ্ধি এবং পুরুষের মধ্যে সম্বন্ধ আছে ইহা বলা হইয়াছে এবং কার্যকারণ নিয়মানুসারে বুদ্ধি এবং প্রকৃতি স্বরূপতঃ এক বলিয়া পুরুষের সহিত মূল প্রকৃতির সম্বন্ধকে অনুমানের বিষয় বলা হইয়াছে। কিন্তু বুদ্ধি এবং পুরুষের সম্বন্ধের স্বরূপ কি হইতে পারে? বলা হইয়াছে যে, বুদ্ধি ভাস্বর এবং স্বচ্ছ বস্তু বলিয়া উহাতে পুরুষের প্রতিবিম্ব পড়ে। কিন্তু পুরুষ সর্বব্যাপী হওয়ায় যাবতীয় বুদ্ধির সহিতই ইহার এইরূপ সম্বন্ধ না থাকিয়া পারে না, সুতরাং এইরূপ প্রতিবিম্ব উহাদের প্রত্যেকটিতেই পড়িবে না কেন তাহা আশ্চর্যের বিষয়। সাংখ্য ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, ইহা যুক্তিগম্য নয় এমন একটি চরম তথ্য। ইহাই অভিব্যক্তি প্রক্রিয়ার ভিত্তি এবং ঐ প্রক্রিয়াকে উদ্দেশ্যযুক্ত এবং সার্থক করিয়াছে।

জ্ঞানতত্ত্ব: পতঞ্জলি মনের পাঁচটি বৃত্তি স্বীকার করিয়াছেন, যথা—যথার্থ-জ্ঞান (প্রমাণ), ভ্রম (বিপর্যয়), বিষয়রহিত চিন্তা (বিকল্প), স্বপ্নহীন সুষুপ্তিকালের জ্ঞান (নিদ্রা) এবং স্মরণ (স্মৃতি)। এইগুলির মধ্যে প্রথমটি

সত্যের সন্ধান দেয় বলিয়া ইহার যৌক্তিক যাথার্থ্য আছে। অন্যগুলি মানসিক অবস্থামাত্র এবং তাহাদের কোন যৌক্তিক মূল্য নাই। প্রমাণ তিন প্রকার—প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শব্দ। কোন বস্তুর সুনির্দিষ্ট সাক্ষাৎ অনুভূতিই প্রত্যক্ষ। বহিঃপ্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়সমূহ বস্তুগুলির সহিত সাক্ষাৎ করিতে অগ্রসর হইয়া যায় এবং উহাদের সংস্পর্শ ঘটিলে ইন্দ্রিয়সমূহ বস্তুগুলির আকারে পরিবর্তিত হইয়া যায়। বুদ্ধিও তখন স্বতঃই বস্তুর আকার ধারণ করে। কিন্তু ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধি উভয়েই অচেতন হওয়ায় তাহাদের রূপান্তরকে জ্ঞান বলা যাইতে পারে না। বুদ্ধির বৃত্তি পুরুষের আলোকে আলোকিত হইলে জ্ঞান সম্ভবপর হয়। এই আলোকের স্বরূপ কি তাহা লইয়া বাচস্পতি এবং বিজ্ঞানভিক্ষুর মধ্যে মতভেদ আছে। বাচস্পতির মতে বুদ্ধির বৃত্তিতে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য থাকায় উহা অতীব স্বচ্ছ এবং দর্পণের ন্যায়। সেইজন্য ইহার সহিত শুদ্ধ পুরুষের সাদৃশ্য যতদূর সম্ভব ঘনিষ্ঠ হওয়ায় ইহাতে তৎক্ষণাৎ পুরুষের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হইয়া থাকে, এবং ইহা সচেতনের মত হইয়া পড়ে। এইভাবেই জ্ঞান হইয়া থাকে। ইহা বিষয়ী এবং বিষয় উভয়কেই নির্দেশ করিয়া থাকে। সুতরাং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষানুভূতি "ইহা একটি ঘট এবং আমি জানি যে ইহা উহাই", এইরূপ বিচার ক্রিয়ার আকার ধারণ করে। বিষয়ীকে নির্দেশ করিবার জন্য অপর একটি বুদ্ধিবৃত্তির এবং তাহাতে পুরুষের প্রতিফলন ঘটিবার কোনও আবশ্যকতা নাই। এই মতে প্রতিবিম্বের প্রতিফলন একমুখী বলিয়া ইহাকে একপ্রতিবিম্ববাদ বলা হইয়া থাকে।

বিজ্ঞানভিক্ষু পৌরাণিক গ্রন্থসমূহ অনুসরণ করিয়া অন্য একপ্রকার ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তিনি বলেন যে, বুদ্ধির পরিণতি হইলে তবেই জ্ঞান হইতে পারে। বুদ্ধি যে বস্তুর আকার ধারণ করে তাহাকে জানিতে পারে। কিন্তু বুদ্ধির এই পরিণতি (বৃত্তি) পুরুষে প্রতিফলিত হইলে তবেই ইহা জ্ঞাত হয়। বুদ্ধিতে নয়, পুরুষেই সকল জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। কোন বস্তুর বৌদ্ধিক আকারের প্রাথমিক প্রতিফলন হইতেছে বিষয়ের জ্ঞান, যথা—"ইহা একটি ঘট"। বিষয়ীঘটিত অবধারণ যথা—"আমি ঘটকে জানিতেছি" সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে ইহা অপর একটি ক্রিয়ার অপেক্ষা করে। এই অবধারণে বিষয়ের ন্যায় বিষয়ীও জ্ঞাত হয়। কিন্তু যেহেতু কোন বিষয়ের জ্ঞান হইতে গেলে তদনুরূপ একটি বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োজন, সেই হেতু জ্ঞাতা 'আমি'র জ্ঞান হইতে গেলে বুদ্ধির 'আমি' আকার ধারণ করা প্রয়োজন। বুদ্ধির এই রূপান্তর শুদ্ধচৈতন্যে প্রতিফলিত হয়; এইভাবে "আমি ঘট জানিতেছি" এই জ্ঞান হইয়া থাকে। এস্থলে একটি প্রতিবিম্বের পরিবর্তে দুইটি প্রতিবিম্ব এবং

তদনুযায়ী বুদ্ধির দুইটি বৃত্তির কথা আছে। সাংখ্যসম্মত পুরুষ-বহুত্ববাদের সহিত বাচস্পতির মতবাদের অপেক্ষা এই ব্যাখ্যার অধিক সঙ্গতি আছে বলিয়া মনে হয়। প্রতিবিম্বটি একটি ছায়াময় অবভাস হইতে পারে। কিন্তু জ্ঞাতা এবং কর্তা হিসাবে পুরুষ যাহা করে তাহাকে অবভাসিক এবং মিথ্যা বলিয়া মনে করা হয়। যে মত দুইটি প্রতিবিম্ব স্বীকার করে, তাহা অপর মতের অপেক্ষা পুরুষের এই অবভাসিক রূপের অধিকতর সুষ্ঠু ব্যাখ্যা দিতে পারে।

আর একটি প্রয়োজনীয় বিষয় আছে যাহার উল্লেখ না করা উচিত হইবে না। বাচস্পতি এবং বিজ্ঞানভিক্ষু উভয়েই প্রত্যক্ষকে নির্বিকল্প এবং সবিকল্প এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। কিন্তু ঈশ্বরকৃষ্ণের গ্রন্থ এসম্বন্ধে নীরব। ব্যাস-ভাষ্যের[৫] ব্যাখ্যায় স্পষ্টভাবেই প্রত্যক্ষকে সবিকল্প বলা হইয়াছে। যুক্তিদীপিকাতেও দুই প্রকার প্রত্যক্ষের উল্লেখ নাই। সাংখ্যকারিকার অষ্টাবিংশতিশ্লোকে আলোচন কথাটির উল্লেখ থাকাতেই এই সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। বাচস্পতি ইহাকে অস্পষ্ট প্রত্যক্ষ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অপরপক্ষে যুক্তিদীপিকায় ইহাকে ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। আরও বলা হইয়াছে যে, জ্ঞান একটি মানস ব্যাপার। তাহা ছাড়া কেবলমাত্র কোন সাধারণ ধর্মের জ্ঞান হইতে পারে না। সকল জ্ঞানই বিশেষ এবং সাধারণ এই দুইয়ের সমাবেশের জ্ঞান। ইন্দ্রিয়ের কিছু জানিবার শক্তি নাই, এরূপ শক্তি আছে স্বীকার করিলে মনের অস্তিত্ব স্বীকার করার প্রয়োজন হয় না। সুতরাং প্রত্যক্ষের নির্বিকল্প এবং সবিকল্প এই দুই শ্রেণীতে বিভাগ একটি নূতন কথা বলিয়া মনে হয়, এবং মূল গ্রন্থের সহিত ইহার সামঞ্জস্য নাই।

অনুমানকে মোটামুটি বীত এবং অবীত এই দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। বীত অনুমান অন্বয়ী ব্যাপ্তির উপর এবং অবীত অনুমান ব্যতিরেকী ব্যাপ্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। বীত অনুমান দুই প্রকার—একটি কার্যকারণ-সম্বন্ধের উপর প্রতিষ্ঠিত, অন্যটি সাধারণ সাদৃশ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। ধূম হইতে অগ্নির অনুমান এবং মেঘাচ্ছন্ন আকাশ হইতে আসন্ন বৃষ্টির অনুমান প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত। দ্বিতীয় প্রকার অনুমানের সাহায্যে মূল প্রকৃতি ইন্দ্রিয়সমূহ প্রভৃতি প্রত্যক্ষাতীত বস্তুর নিগমন হইয়া থাকে। সাধারণতঃ কার্য ও কারণের মধ্যে সাদৃশ্য দেখিয়া জগতের মূল কারণও যে ত্রিগুণের ব্যাপারে জগতের সদৃশ এইরূপ অনুমান করা হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়সমূহের অস্তিত্বের অনুমান অপর একটি দৃষ্টান্ত। ক্রিয়ামাত্রই করণ-সাধ্য। জ্ঞানও একটি ক্রিয়া, অতএব ইহারও করণ থাকিবে। ইন্দ্রিয়সমূহই নিশ্চয়ই এই

করণ। এইরূপ অনুমানের সাধ্য প্রত্যক্ষযোগ্য নহে। সুতরাং ইহাতে সাধ্য ও সাধনের ব্যাপ্তির প্রত্যক্ষ হয় না। কিন্তু প্রত্যক্ষাতীত পদার্থের সহিত প্রত্যক্ষ পদার্থের সাদৃশ্য থাকায় এইরূপ অনুমান সম্ভবপর হইয়া থাকে।

শব্দপ্রমাণ হইতে প্রত্যক্ষাতীত বস্তুসমূহের জ্ঞান হইয়া থাকে। বেদের ন্যায় সর্বতোভাবে নির্দোষ, নির্ভরযোগ্য শাস্ত্রের বচনই শব্দপ্রমাণ।

৩। যোগ

গীতায় বলা হইয়াছে যে, সাংখ্য এবং যোগ অভিন্ন এবং কেবলমাত্র নির্বোধ ব্যক্তিরাই ইহাদিগকে পৃথক্ বলিয়া মনে করে। গীতায় এই দুইটি শব্দের যে অর্থই অভিপ্রেত হউক না কেন, ইহারা এই দুইটি শাস্ত্রকে লক্ষ্য করিতেছে এরূপ মনে করিলে এই উক্তিটি সত্য হইবে। যোগ হইতেছে সাংখ্যের ব্যবহারিক প্রয়োগ। যোগও সাংখ্যের দার্শনিক ভিত্তি একই। পতঞ্জলি তাঁহার যোগসূত্রে ঈশ্বররূপ যে অপর একটি তত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন তাহার জন্যই এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য। সেই জন্যই যোগকে সেশ্বর সাংখ্য বলা হয়। জগতের বাহিরে অবস্থিত ঈশ্বরে বিশ্বাস করার ফলে, কল্পান্তে প্রলয় হইলে কিরূপে জগতের অভিব্যক্তি পুনরায় আরম্ভ হইতে পারে যোগদর্শনে সেই সমস্যার সমাধান করা সহজ হইয়াছে। ঈশ্বরই জগৎ প্রক্রিয়াকে নিরুদ্ধ করিয়া দেন এবং তাঁহা হইতেই পরবর্তী অভিব্যক্তি-প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়। যোগ-সূত্রে ঈশ্বরের জগৎ সম্বন্ধীয় ক্রিয়ার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয় নাই, কিন্তু ভাষ্যকার ব্যাসদেব ঈশ্বরের এই সকল ক্রিয়া আছে বলিয়া বিশ্বাস করেন এবং তাঁহার ব্যাখ্যাকারেরা এইগুলি প্রমাণ করিতে বিশেষ শ্রম করিয়াছেন। ভামতী টীকায় বাচস্পতি বলেন যে, ঈশ্বর প্রকৃতির গতি-পরিচালনাও নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন।[৫] ঈশ্বরের অস্তিত্ব অবশ্য জগতের উৎপত্তি সম্বন্ধীয় যুক্তিদ্বারা প্রতিপাদিত হয় নাই। ইহা এইভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে। বিভিন্ন ব্যক্তির জ্ঞানের পরিমাণ ও পরিসরের দিক্ হইতে ন্যূনাধিক্য আছে। যাহার উৎকর্ষের বিভিন্ন মাত্রা আছে, তাহার চরম মাত্রার নিশ্চয়ই কোন আধার থাকিবে। উদাহরণস্বরূপ, পরিমাণের সর্বনিম্ন মাত্রা পরমাণুতে এবং সর্বোচ্চ মাত্রা দেশে বর্তমান। সুতরাং যাঁহাতে জ্ঞানের সর্বোচ্চ মাত্রা বর্তমান এমন একজন পুরুষ নিশ্চয়ই আছেন। তিনিই ঈশ্বর। তিনি কালকর্তৃক অবচ্ছিন্ন হইতে পারেন না, কারণ তিনি অবশ্যই অনন্তকালব্যাপী হইবেন। তাহা না হইলে নিত্য ও অভ্রান্ত জ্ঞানের উৎস বেদের প্রকাশ সম্ভবপর হইত না।

পতঞ্জলি কিন্তু পুনর্জন্মের বন্ধন হইতে মুক্তির পথে লইয়া যায় এমন জ্ঞানলাভের জন্য ঈশ্বরের ভক্তিপূর্ণ ধ্যানকেই একমাত্র উপায় মনে করেন না। সাংখ্যের ন্যায় তিনিও অনাত্মা হইতে আত্মার ভেদজ্ঞানকেই মুক্তির একমাত্র ও যথেষ্ট কারণ বলিয়া মনে করেন। পতঞ্জলির যোগসূত্রে শুদ্ধ আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করিবার জন্য নানাবিধ ধ্যানের পদ্ধতি বিহিত হইয়াছে।

যোগ বলিতে সাধারণভাবে কি বুঝায় তাহা আমরা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করিব। যে পাঁচটি চিত্তবৃত্তির কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে তাহাদের নিরোধ ও নিয়ন্ত্রণকেই যোগ বলা হইয়াছে। যে মনের সহিত আত্মা আপনাকে অভিন্ন বলিয়া মনে করে তাহার অবিরাম চাঞ্চল্যের ফলে আত্মার বিশুদ্ধতা ও মুক্তস্বভাব ম্লান হইয়া যায়। যে আদি অবিদ্যা একটি সদর্থক পদার্থ এবং বিভিন্ন ভ্রান্ত জ্ঞানের মধ্যে যাহার প্রকাশ, তাহার ফলেই এই অভিন্নতাবোধ সম্ভবপর। অবিদ্যার বশীভূত হইয়া আত্মা অনিত্যকে নিত্য, অশুদ্ধকে শুদ্ধ, দুঃখকে সুখ এবং অনাত্মাকে আত্মা বলিয়া মনে করে। ইহার প্রভাবেই আত্মা বুদ্ধির সহিত আপনাকে অভিন্ন বলিয়া অনুভব করে এবং অনুরাগ ও দ্বেষ এবং শেষ পর্যন্ত বাঁচিবার আকাঙ্ক্ষা এবং অদম্য মৃত্যুভয় সৃষ্টি করে। এই সকল ক্লেশ (রাগদ্বেষাদি) এবং অশুদ্ধির জন্যই আধ্যাত্মিক জীবনের অভ্যুদয় কঠিন হইয়া পড়ে। এই সকল ক্লেশ ও অশুদ্ধির প্রতিষেধক রূপে কতকগুলি বৌদ্ধিক, নৈতিক এবং শরীর-সম্পর্কিত সাধনার প্রয়োজন। মন এবং শরীরকে নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য এই সকল সাধনা বিহিত হইয়াছে।

আমরা এই স্থলে পরিকর্ম অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধিকারী সাধনা সমূহের উল্লেখ করিতে পারি। এইগুলি হইতেছে মৈত্রী, অর্থাৎ যাহারা সুখে আছে তাহাদের প্রতি প্রীতি এবং বন্ধুত্বভাবের অনুশীলন ; করুণা, অর্থাৎ দুঃখক্লিষ্ট লোকদের প্রতি অনুকম্পা ; মুদিতা, অর্থাৎ ধার্মিক ব্যক্তিদের আধ্যাত্মিক উন্নতিতে আনন্দ এবং উপেক্ষা, অর্থাৎ পাপীদের প্রতি ঔদাসীন্য। ইহা ছাড়াও যোগের প্রাথমিক অঙ্গ হিসাবে অহিংসা, সত্য, অ-স্তেয়, ব্রহ্মচর্য এবং অপরিগ্রহের প্রয়োজন। এইগুলির মধ্যে অহিংসাই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিহার্য। এই মৌলিক ধর্মের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়াই অন্যান্য ধর্মগুলি পালন করিতে হইবে। উদাহরণস্বরূপ, যে সত্য হিংসার কারণ তাহা প্রকৃত সত্য নহে।

মনের শান্তি অথবা সমাধিলাভের জন্য এই সকল বিভিন্ন কর্মপদ্ধতি এবং সাধনা বিহিত হইয়াছে। এই সমাধি দুই প্রকার, যথা—সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত। সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে আত্মা এবং চিত্তের সত্তাগত এবং ক্রিয়াগত পার্থক্যের উপলব্ধি হইয়া

থাকে, অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে এই উপলব্ধিরূপ চিত্তবৃত্তিরও নিরোধ হইয়া থাকে এবং আত্মা মুক্ত হইয়া অসঙ্গ পুরুষ হিসাবে পুনরায় স্বরূপে অবস্থান করে।

পরিশেষে বলা যায় যে, যোগশাস্ত্রে বৈরাগ্য ও অনাসক্তিকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। মুক্তিকামী ব্যক্তিকে জগতের বস্তুসমূহের অসারতা উপলব্ধি করিতে হইবে এবং সাংসারিক কর্ম হইতে বিরত থাকিতে হইবে। আত্মা ও অনাত্মার ভেদের সুখময় অনুভূতির প্রতি আসক্তি পরিহারই পরম বৈরাগ্যের অবস্থা। কারণ, ইহা ব্যতীত চরম মুক্তিলাভ হইতে পারে না। তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত বৈরাগ্য কেবলমাত্র বিভ্রমের সৃষ্টি করিয়া থাকে।

১। পৃঃ ১৪, ৩৮

২। যোগসূত্র ২।১৯

৩। যুক্তিদীপিকা পৃঃ ১১৪

৪। যোগসূত্র ১।৭

৫। "চেতনাধিষ্ঠিতম্ অচেতনম্ প্রবর্ততে যথা যোগিনাম্ ঈশ্বর-বাদিনাম্"—ভামতী ব্রহ্মসূত্র ২।২।২

গ্রন্থবিবরণী

ঈশ্বর কৃষ্ণের সাংখ্যকারিকা, গৌড়পাদ, মাঠর এবং বাচস্পতির টীকা সমেত। যুক্তি-দীপিকা।

সাংখ্য-প্রবচন সূত্র অনিরুদ্ধের টীকা এবং বিজ্ঞানভিক্ষুর ভাষ্য সমেত।

পতঞ্জলির যোগসূত্র ব্যাস-ভাষ্য এবং বাচস্পতি, বিজ্ঞানভিক্ষু এবং ভোজরাজের টীকা সমেত।

ভারতীয় দর্শন ২য় খণ্ড, এস্ রাধাকৃষ্ণন্

ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস ১ম খণ্ড, এস্ এন্ দাসগুপ্ত

প্রথম খণ্ডের

প্রথম ভাগ সমাপ্ত